বিদ্যাসাগর

নমিতা চক্রবর্তী

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা ৯ ॥ কলিকাতা ২৯

বিদ্যাসাগর

ভূমিকা

বীরসিংহের বীরশিশুর জীবনচরিত লেখক ও পাঠক সকলের পক্ষেই পরম উপাদেয় সন্দেহ নাই। আমার প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী নমিতা চক্রবর্তী এম-এ, বি-টি, ডি-ফিল ইহা নূতন করিয়া আলোচনা করিয়া আমাদের পাঠকসমাজের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

সমাজসংস্কারক, শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নানা দিকে বাঙালী সমাজের মধ্যে যে আলোড়ন আনিয়াছিলেন এই স্বল্প পরিসরের পুস্তকে তাহার সম্যক আলোচনা সম্ভব নহে, আবার পূর্ণাঙ্গ আলোচনাও এই পুস্তকের আয়তনের বাহিরে।

শ্রীমতী চক্রবর্তী নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহার বলিবার ভঙ্গীও সম্পূর্ণ নিজস্ব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রমহিমা উদ্‌ঘাটিত করিবার এই চেষ্টা বিশেষ অভিনন্দনীয়। তাঁহার ধর্ম কি ছিল এবং তাঁহার জীবন সুখে কাটিয়াছিল না দুঃখে কাটিয়াছিল, এরূপ আলোচনা নিষ্ফল এবং তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব তাহাতে ব্যাহতও হয় না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

আশা করি, উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের এইরূপ জীবনকথা লিখিয়া শ্রীমতী চক্রবর্তী আমাদের সাহিত্য পুষ্ট করিতে থাকিবেন।

প্রিয়রঞ্জন সেন

উৎসর্গ

মাতুলকে

তারপর কাটল কতদিন। বাংলার নবাবকে হারিয়ে ইংরেজ হয়ে বসল দেশের প্রভু। বণিক হল শাসক। কিন্তু সে তো ইতিহাসের কথা। ইংরেজের শাসন আর শোষণের কাহিনী আছে বাংলাদেশের ইতিহাসে।

অভাবনীয় রাষ্ট্রবিপ্লব বহু পরিবর্তন আনল দেশে। দুঃখে-দারিদ্র্যে অবসন্ন হল বাঙালি। তবু তারি মধ্যে দেখা দিল অরুণোদয়ের সূচনা—নূতন দিনের আভাস। পাশ্চাত্য শিক্ষায় ধীরে ধীরে বাঙালি আত্মসচেতন হয়ে উঠতে লাগল। যুগপুরুষ রামমোহন জাতিকে নবযুগের দেহলীপ্রান্তে উপস্থিত ক'রে দিলেন। হিন্দু, ইস্‌লামী এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান বাঙালি চাইল যুগের উপযুক্ত শিক্ষা—ব্যাবহারিক শিক্ষা, ইংরেজি শিক্ষা।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালি কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন করল। ইংরেজ-শাসিত ভারতে প্রথম ইংরেজি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজ। আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তায় সমৃদ্ধ বাঙালি সমস্ত ভারতবর্ষকে উপহার দিল শিক্ষার নবরূপ, সংস্কারের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা।

বণিক-শাসন কিন্তু সম্পদ্‌ময়ী বাংলাকে একেবারে নিঃস্ব ক'রে দিতে লাগল। চরকার দৌলতে বাংলাব তাঁতীর দুয়াবে আর হাতী বাঁধা থাকে না। হাতের আঙুল কেটে ফেলে তারা বাঁচ্‌ছে সরকাবী রোষ হতে। চারদিকে অনটন, অনশনেব মূর্তি। অভাবে বাংলার লক্ষ্মীশ্রী অন্তর্হিত হতে বসেছে।

মেদিনীপুরের অখ্যাত এক গ্রাম বীরসিংহ। গ্রামের একধারে পর্ণকুটীর বেঁধে বাস করছেন গ্রামের মেয়ে দুর্গা, ছেলেমেয়ে নিয়ে। না, না। উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গা দেবী বিধবা নন। সিঁথিতে তাঁর সিঁদুরের রেখা, দু'টি হাত ঘিবে আছে শঙ্খবলয়। বনমালীপুরে ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের মধ্যম পুত্র রামজয় তর্কভূষণের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল দুর্গার। পারিবারিক অশান্তির হাত এড়াতে রামজয় গৃহত্যাগী, দেশান্তরী হয়েছেন। কোথায় কোথায়, কোন্ তীর্থে তীর্থে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছেন উদাসীন স্বামী। শ্বশুরালয়ে অনাদর, তাই পিতার গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন দুর্গা। আশ্রয় নিয়েছেন সত্য,

কিন্তু স্বামীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নি। পরনের বস্ত্র শতগ্রন্থিযুক্ত, সুতো কেটে অনশনে অর্ধাশনে ছেলেমেয়েসহ দিন যাপন করছেন তিনি, তবু পিতৃগৃহে ভাইদের অবহেলার অন্ন গ্রহণ করেন নি। সামনে জ্বলছে আশার দীপ—দুই পুত্র, ঠাকুরদাস ও কালিদাস।

তারা ভাল ছেলে; বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী। ছেলেরা পড়ছে কেনারাম বাচস্পতির টোলে। তারা বড় হবে, মানুষ হবে, দূর করবে মায়ের সব দুঃখ-কষ্ট, এই আশায় বুক বেঁধেছেন দুর্গা।

বড়? আর কত বড় হবেন ঠাকুরদাস? চোদ্দ, পনর বছর বয়স তো হয়েছে তাঁর। শৈশবের খেলাধূলার দিন চলে গেছে। মায়ের দুঃখ আর দেখতে পারেন না তিনি। ভাইবোনদের শুকনো মুখ। সুতো কেটে কেটে একতিল বিশ্রাম নেই মায়ের, তবু জোটে না ক্ষুধার অন্ন, পরবার দু'খানি মোটা কাপড়। এই কি বসে বসে পাঠ নেবার সময়? এখন সে সব ছেড়ে রোজগারের চেষ্টায় লাগতে হবে ঠাকুরদাসকে। কিন্তু কোথায়, কেমন ক'রে টাকা উপায় করবে চোদ্দ বছরের ছেলে! অজ পাড়াগাঁ, এখানে কাজ কই? ক্ষীরপাইয়ের হাটে যাবে বেসাতি নিয়ে? তাতে কি উপায় হবে, হবে অভাব মোচন? কেন, কলিকাতায় তো নূতন শহর বানিয়েছে ইংরেজ। সেখানে ধূলায় সোনা, কেবল মুঠিভরে তুলে নিতে জানলেই হল। কলিকাতা গেলেই টাকা রোজগার করতে পারবেন ঠাকুরদাস। সব কষ্ট ঘুচে যাবে তখন। তাই ঠিক, কলিকাতায় যাবেন ঠাকুরদাস।

দিনক্ষণ স্থির হল। মায়ের পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে যাত্রা করলেন বীর বালক দারিদ্র্য-দৈত্যকে প্রতিরোধ করবার অস্ত্রের সন্ধানে।

কলিকাতা, ইংরেজ-শাসিত ভারতের রাজধানী। লর্ড ওয়েলেস্‌লি কলিকাতাকে প্রাসাদনগরী ক'রে গড়েছিলেন। প্রশস্ত রাজপথ, আকাশচুম্বী হর্ম্য, লাটসাহেবের জন্য নূতন প্রাসাদ আর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ আছে এখানে। কলিকাতার বাঙালি ইংরেজি শিখে রাজসরকারে চাকুরী করছে, ব্যবসা করছে ইংরেজের সঙ্গে। বাঙালি ইংরেজি শিখতে চায় তাই আরাতুন পিদ্রুস সাহেবদের ইংরেজি স্কুল বসেছে কলিকাতায়। আবার তারই আশে-পাশে বাচস্পতি, ন্যায়লঙ্কার, তর্করত্নদের চতুষ্পাঠীও আছে। কত আফিস,

সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত আছে কলিকাতায়। পাল্কী, ফিটনে চলছে ভাগ্যবান লোকেরা রাজপথ দিয়ে, পথচারীরা দেখছে তাদের ফিরে ফিরে।

কত পথ চলে চলে, পা দুটি ক্ষতবিক্ষত ক'রে, ঠাকুরদাস এসে পৌঁছলেন কলিকাতায়, আশ্রয় নিলেন এক আত্মীয়ের ঘরে। কলিকাতায় এসেছেন, এবার ঠাকুরদাস ইংরেজি শিখবেন। ইংরেজি রাজার ভাষা, বণিকের ভাষা। লক্ষ্মীর ঝাঁপিটি খুলবার মন্ত্র আছে ওর মধ্যে। একবার শিখে নিতে পারলে, ভাল চাকুরী আটকাবে কে? ইংরেজি শিখবার চেষ্টায় লাগলেন ঠাকুরদাস। মস্তবড় শহরে গৃহহীন স্বজনহীন এক বালক। কেউ নেই ক্ষুধিতের মুখে অন্ন তুলে দেয়, স্বেদাক্ত কপাল মুছিয়ে দেয় মমতার আঁচল দিয়ে।

কেউ নেই? তাই কি হয়? ভালবাসা-ভরা আমাদের বাংলাদেশ। ঘরে ঘরে এখানে কত মা, পথে-পথে কত আত্মীয়। কাঁসার থালাটি বিক্রী করতে গেলে সন্দেহের চোখে দেখলই বা দোকানী; সে ছাড়াও আছে মানুষ, আছে মমতা। কলিকাতার পথের পাশে মুড়ি-মুড়কির দোকান করছে এক মেয়ে। একটু তৃষ্ণার জল তার কাছে চাইলেন ঠাকুরদাস। জল দিতে এসে মেয়ের চোখে পড়ল ঠাকুরদাসের মলিন মুখখানি। প্রশ্ন ক'রে নিল মলিনতার কারণ। তারপর থালা ভ'রে দিল মুড়ি-মুড়কি আর পিপাসার জল। বারে বারে বলে দিল ঠাকুরদাসকে ক্ষুধার সময় উপস্থিত হতে তার কাছে। নাই বা দিতে পারবে অন্ন-পরমান্ন, গুড়ের মুড়কি তো খাওয়াবে ইচ্ছামত। তাও তো ক্ষুধিতের অমৃতভোগ। বড় হয়ে পিতার কাছে এ কাহিনী কতবার শুনেছেন ঈশ্বরচন্দ্র। জেনেছেন নারীকে করুণাময়ী বলে।

অনেক কষ্টে চাকুরী পেলেন ঠাকুরদাস। হলই বা বেতন দু'টাকা, কিন্তু বাড়ছে তো ক্রমে ক্রমে। বেড়ে হয়েছে পাঁচটাকা, কি আনন্দ! মায়ের আর অত কষ্ট নেই। ভাইবোনেরা রোজই খেতে পায় পেটভরে। আরো আনন্দের কারণ ঘটল কিছুদিনের মধ্যে। পিতা রামজয় ঘরে ফিরে এলেন। কত তীর্থ পর্যটন করেছেন তিনি। দেখেছেন কত দেশ, কত মানুষ আর তাদের বিচিত্র জীবন। এত দিনে ঘরের কথা মনে পড়ল তাঁর! কেবল মনে পড়া নয়, দুর্বার আকর্ষণ তাঁকে পথ হতে টেনে এনেছে ঘর ও পরিবারের মধ্যে, যেখানে বসে আছেন সন্তান-পরিবৃতা সহিষ্ণুতার ছবি হয়ে দুর্গাদেবী।

বাড়ী এসে সব শুনলেন রামজয়। কিন্তু ঠাকুরদাস কই? তাকে তো দেখতে হবে, শুনতে হবে তার সব জীবন-যুদ্ধের কাহিনী। কলিকাতার বড়বাজারে ছেলেকে দেখতে চলে এলেন রামজয়। শোনা হল, দেখা হল সব। ক্ষরিত হল আশীর্বাদ পিতৃহৃদয় মথিত ক'রে। যে কথা বলেন নি ঠাকুরদাস, তাও দেখলেন রামজয়। বড় কষ্ট ছেলের থাকবার, খাবার। কি করতে পারেন তিনি? কোন প্রতিবিধানের সাধ্য আছে কি তাঁর? ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল একজনের নাম—ভাগবতচরণ সিংহ, উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ। কাজকারবার আছে বড়বাজারের দয়েহাটায়। বড় শ্রদ্ধা করেন তিনি রামজয় তর্কভূষণকে। রামজয় দেখা করলেন ভাগবতচরণের সঙ্গে, বললেন ছেলের সব ইতিহাস। ব্রাহ্মণের দুঃখে বিগলিত হয়ে পড়লেন ভাগবতচরণ। ঠাকুরদাসকে নিজগৃহে আহ্বান ক'রে, ভ্রাতৃস্নেহে গ্রহণ করলেন তিনি। ক্ষুধার সময় অন্ন আর মাথা গোঁজার এতটুকু নিরাপদ আশ্রয়, মানুষের জীবনে এর চেয়ে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যের যে আর কি দরকার তা বোধ হয় ঠাকুরদাস জানতেন না। ভাগবতচরণের আশ্রয়ে এসে তাই তাঁর মনে হল যেন নবজন্ম লাভ হয়েছে।

ভাগ্যের প্রসন্নতর মুখ দেখা গেল কয়েক দিনের মধ্যে। দুর্গাদেবী সংবাদ পেলেন ভাগবতচরণের আনুকূল্যে ঠাকুরদাস আট টাকা বেতনে নূতন কর্মে নিযুক্ত হয়েছেন। কি সৌভাগ্য! জ্যেষ্ঠ সন্তান ঠাকুরদাস। সেই কতদিন আগে, আট দশ বছর হল, মায়ের দুঃখ দূর করবার দুর্জয় সংকল্প নিয়ে অজানা রাজ্য কলিকাতায় রওনা হয়েছিল ছেলে। ধনীর শহর, বিলাসীর শহর আর আনন্দ-উৎসবের শহর কলিকাতা। এখানে অনেক জিনিসই পাওয়া যায়, দুর্মূল্য কেবল হৃদয়। কত রোদ, ঝড়-ঝঞ্ঝা পার হয়ে, তেইশ বছরের হয়েছেন ঠাকুরদাস। তাঁর মাইনে বেড়েছে। আট টাকা, তারপর দশ টাকা। দশ টাকা তো কম নয়। একটি গৃহস্থের সংসার চলে যায়। দু' বেলা খাওয়া আর পরবার কাপড়, এর চেয়ে আর বেশী কি চাই বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে! যোগ্য হয়েছেন ঠাকুরদাস। কেবল অর্থ উপার্জনের যোগ্যতা নয়, এতদিন ধরে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা তো তাঁকে সংসারী হবার যোগ্যতাও দিয়েছে। এবার সংসারী করতে হবে ছেলেকে। বৌ আনবেন,

দুর্গাদেবীর সহকারিণী। ব্রাহ্মণ-ঘরের যোগ্য, ঠাকুরদাসের যোগ্য বধূর সন্ধানে তৎপর হলেন রামজয় তর্কভূষণ।

গোঘাটের মস্ত বড় তান্ত্রিক-সাধক রামকান্ত তর্কবাগীশ পাতুল গ্রামে শ্বশুরালয়ে বাস করছিলেন। এত বড় মানুষটা ঘরজামাই? তা নয়। মস্ত-বড় পণ্ডিত রামকান্ত যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন। কিন্তু সমস্ত জীবনের উৎস যে পরমাশক্তি, তাঁর স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য তান্ত্রিক সাধনায় নিযুক্ত হলেন তিনি। মহাশ্মশানে শবোপরি উপবিষ্ট হয়ে রামকান্ত দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভেদ করবার জন্য সিদ্ধমন্ত্র জপ করতে লাগলেন। হয় তো মহাশক্তিব অবগুণ্ঠন উন্মোচনেও তিনি কৃতকার্য হয়েছিলেন। কিন্তু সেই বিবাট প্রকাশকে উপলব্ধি ক'রে রামকান্ত একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ হয়ে আর তাঁর পক্ষে সংসার করা সম্ভব হল না। পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ জামাতা রামকান্ত ও স-সন্তানা গঙ্গাদেবীকে পাতুল গ্রামে নিজগৃহে নিয়ে গেলেন। অর্থ-সমন্বিত বাক্যের ন্যায় স্বামীসহ-কন্যা পিতৃগৃহে আদরণীয়া হলেন।

রামকান্তের কনিষ্ঠা কন্যা ভগবতীসমা ভগবতী দেবীকে রামজয়ের বড় পছন্দ হল। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি শুভদিনে বাদ্য আর শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে সপ্তপদী-অন্তে, ভগবতী ঠাকুরদাসের দরিদ্র কুটীরে এসে প্রবেশ করলেন। যাঁব নামে রামকান্ত-কন্যা মর্ত্যভূমিতে পরিচিতা হয়েছিলেন স্বয়ং সেই হিমালয় দুহিতাও তো কৈলাসে স্বামীর দীন ভবনেই এসেছিলেন। ভিখারী শিবের হাতে পড়ে তাঁর দৈন্যের অবধি ছিল না। সাধব্যের চিহ্ন দু'গাছি শঙ্খকঙ্কণও ভগবতীকে দেবার সাধ্য নাকি ছিল না মহাদেবের!

মানুষী ভগবতীও এলেন শিবের সংসারে। ঠাকুরদাসের তিনি যোগ্য সঙ্গিনী। মা, ভাইবোন সকলকে একটু স্বাচ্ছন্দ্য দেবেন বলে কত উপবাস করেছেন স্বামী, বিশ্রাম করেন নি এক তিল। স্ত্রী কি পিছিয়ে থাকবেন? ভগবতীও গ্রহণ করলেন দুঃখজয়ের ব্রত। বাইরের ভার ঠাকুরদাসের, ঘরের বোঝা ভগবতী ধরলেন নিজের দু'টি ছোট হাতে। বাড়ীর কেউ বুঝল না, দুর্গা দেবী জানতেও পারলেন না হাসিমুখে কত কৃচ্ছ্রসাধন করছে বধূ। বাংলাদেশের সমস্ত দরিদ্র ঘরের বধূই সেদিন নীরবে এমনি আত্মক্লেশ সহ্য

করতেন। অনাহার-অর্ধাহারে থেকে এবং কঠিন পরিশ্রমে, তাঁরা সংসারে লক্ষ্মীশ্রী বজায় রাখতেন।

হাসিমুখে ভগবতী দেবী সংসার করছিলেন, এরি মধ্যে এক নবজন্মের সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে আসন্ন হয়ে এল। বধূ অনাহারে থেকে সংসারের অন্য সকল দাবী পূর্ণ করতে পারেন, কিন্তু গর্ভস্থ সন্তানের প্রয়োজন তো মেটাতে পারেন না। মায়ের যে দেহরসে সন্তান পুষ্ট ও বর্ধিত হয়, তা যোগান দিতে ভগবতী প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেলেন। মায়ের সমস্ত রস গ্রহণ ক'রে সন্তান পৃথিবীতে আসবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল, আর তার ফলে ভগবতী ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সন্তানসম্ভবা নারীর অপুষ্টিজনিত রোগের উপসর্গ প্রায় উন্মাদরোগের সামিল। ভগবতীর মধ্যে উন্মাদলক্ষণ দেখা দিল। পল্লীগ্রামের প্রথম চিকিৎসক পুরোবৃদ্ধার দল। দেশীয় গাছ-গাছড়ার ভেষজগুণ তাঁদের কিছু জানা আছে, আর সবচেয়ে বেশী ক'রে জানা আছে ভূত-প্রেতের চরিতাবলী। আমিষদ্রব্য এবং সন্তানসম্ভবা নারীতে অপদেবতার অপরিমিত লোভ। সুতরাং গ্রামের অভিভাবিকাগণ একবাক্যে রায় দিলেন, বৌকে ভূতে পেয়েছে। ভূতের বৈদ্য ওঝা। ওঝা ডাকা হল। তন্ত্র-মন্ত্রের চিকিৎসা চলল যথাবিধি, কিন্তু ভূত অচল-অটল। তার যে যাবার কিছুমাত্র ইচ্ছা আছে তা তো মনে হয় না! বউ তেমনি পাগলের মতই রয়েছে। পরিবারের সকলের মন অস্থির হয়ে উঠল। এবার এলেন মস্তবড় এক জ্যোতিষী। গণনা ক'রে তিনি জানালেন— ভূত-প্রেত কিছুই নয়, বধূর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন এক মহাপুরুষ। সেই তেজ ধারণ ক'রেই ভগবতীর দেহ বিকল হয়েছে, মস্তিষ্ক হয়েছে বিচলিত। শ্বশুর-শাশুড়ী, আপনজনেরা আশ্বস্ত হয়ে শিশুর আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে এল সেই দিন। ১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর) মঙ্গলবার দুপুরবেলা তর্কভূষণের ঘরে আনন্দশঙ্খ বেজে উঠল। দুর্গাদেবীর চোখ আনন্দাশ্রুপূর্ণ। তাঁর ঠাকুরদাসের প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। পুত্রসন্তান—বংশের অবিচ্ছিন্নতা, পরলোকের ভরসা, ইহলোকের নয়নানন্দ!

জ্যোতিষী বলেছেন ভগবতীর কোলে আসছেন মহাপুরুষ। তাঁর আসবার সঙ্কেত অনেক আগেই পেয়েছেন পিতামহ রামজয়। সেই উদাসীন বিবাগী হবার দিনগুলিতে ঘুরছিলেন তীর্থে-তীর্থে। কেদার পাহাড়ে গিয়েছেন, পরিশ্রমক্লান্ত চোখে গভীর ঘুম। গভীর নিদ্রায় মগ্ন রামজয়। এমন সময় স্বপ্ন দেখলেন তাঁর বংশে আসছেন এক মহাপুরুষ। কুল পবিত্র হবে। সেই শিশু হবে অনন্য, হবে মহাকীর্তিমান।

পৌত্রের নামকরণ করলেন রামজয়—ঈশ্বর, ঈশ্বরচন্দ্র। শিশু ঈশ্বর। অপ্রতিহত, অনির্বাণ জীবনাগ্নির উৎস হবে জাতক—এই কথাটি রইল তার নামের মধ্যে গুপ্ত। উত্তরাধিকার-সূত্রে রামজয়েব অমিত তেজ ও ঋজু চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হ'ল শিশুর মধ্যে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যাসাগর-চরিতে'র একস্থানে বড় সুন্দর ক'রে বলেছেন:

"এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোনো সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রেব অংশে রাখিয়া গিয়াছেন।"

ছেলে হয়েছে। বাপের মুখে আনন্দ-সংবাদ শুনলেন ঠাকুরদাস। পৌত্রের জন্মপ্রসঙ্গ নিয়ে সেদিন রামজয় বড় রহস্য করেছিলেন পুত্রের সঙ্গে।

ঠাকুরদাস গিয়েছিলেন হাটে। বীরসিংহের কিছু দূরে কোমরগঞ্জ গ্রাম। শনি-মঙ্গলবারে কোমরগঞ্জে হাট বসে। সংসারের জিনিষপত্র কিনতে ঠাকুরদাস সেই হাটে গিয়েছিলেন। হাটবার পল্লীগ্রামের পক্ষে মস্ত দিন। প্রত্যহ বাজার বসে আর ক'টা গ্রামে? হাটেই তো সপ্তাহের কেনা-বেচা চলে। বর্ধিষ্ণু গ্রাম, যাতায়াতের সুবিধা আছে, এমন জায়গায় হাট মেলে। সারি সারি চালা-ঘর। কত দূর-দূরান্তর হতে ব্যাপারী আসে তার বেসাতি নিয়ে। ধান-চাল-সব্জীর তো কথাই নেই, ওষুধ-বিষুধ, শাড়ী-ধুতি—সংসারের দরকারী যাবতীয় দ্রব্য পাওয়া যায় হাটে। হাটবার ছাড়া অন্যদিন খালি পড়ে থাকে চালাঘর। গ্রামের কুকুর আশ্রয় নেয়, হয়তো বা

পথচলা কোন পথিক কারো বাড়ীতে অতিথি না হয়ে, রাতটুকু কাটিয়ে দেয় হট্টমন্দিরে। হাটবারে গ্রামের লোকের রোমাঞ্চ জাগে নূতন সংবাদের আশায়। জিনিসপত্র কিনে, বিক্রী করে পণ্য, ঘরে ফেরে মানুষ। তাদের দু'কান বোঝাই দুনিয়ার খবরে। কখন ফিরবে নিজের গাঁয়ে! হাতে-পায়ে-মুখে জল দিয়ে বসবে সবাই গোল হয়ে, বলাবলি হবে সব নূতন খবর।

ঠাকুরদাসও শুনলেন একটি নূতন খবর। হাটের নয়, বাড়ীর। বাড়ী ফিরবার পথে দেখা হল পিতার সঙ্গে; বললেন তিনি, একটি 'এঁড়ে বাছুর' জন্মেছে। ত্বরিত-পদে বাড়ী পৌঁছলেন ঠাকুরদাস। গাভী পূর্ণগর্ভা ছিল, গোহালে যাচ্ছেন তার শাবক দেখতে। রামজয় ফিরিয়ে আনলেন ছেলেকে। দেখালেন নূতন শিশু। পিতা হয়েছেন ঠাকুরদাস, আর রামজয় পিতামহ। ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু আচার-আচরণে পিতামহের পরিহাস প্রায় সত্য ক'রে তুলেছিলেন। এ সম্বন্ধে স্বরচিত জীবনচরিতে তিনি লিখেছেন:

"জন্ম সময়ে পিতামহদেব পরিহাস করিয়া আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন, জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল, আর সময়ে সময়ে কার্য দ্বারাও এঁড়ে গরুর পূর্বোক্ত লক্ষণ আমার আচরণে বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।"

বহুদিন পূর্বের বাংলাদেশের নূতন মা। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। অনপগত কৈশোর, জীবনের সম্পূর্ণ রহস্য জানতে তখনো অনেক বিলম্ব। খেলাঘর ছেড়ে অবগুণ্ঠিতা হয়ে স্বামীর ঘরে এসে যে মেয়েটি কিছুদিনের মধ্যে মা হয়ে বসল, তারই তখন পর্যন্ত ঘুমের জন্য জননী-বক্ষের উষ্ণ উত্তাপের প্রয়োজন।

ভগবতী দেবী মা হয়েছেন। ছোট কোলটি ভ'রে শুয়ে রয়েছে শিশুপুত্র। পৃথিবীর সব মায়ের প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করছেন বালিকা-জননী। তাঁর শিশু বড় হক, মানুষ হক, হক দশজনের একজন। দিনে-দিনে, মাসে-মাসে, বৎসরে-বৎসরে বড় হতে লাগল সন্তান। মায়ের কোল, আঙিনা ছাড়িয়ে বাইরে যেতে শিখল শিশু। বড় দুষ্টু, চঞ্চল ছেলে। গ্রামের লোক অতিষ্ঠ

হল উৎপাতে। পিতামহ-পিতামহীর আদরের দুলাল ঈশ্বর, কিন্তু পাড়া-পড়শী সইবে কেন এত অত্যাচার! ঠিক হল পাঠশালায় দিতে হবে ছেলেকে। গ্রামের পাঠশালা—কোন চণ্ডীমণ্ডপে, বড় লোকের দালানে কিম্বা অমনি একখানা চালাঘরে বসে। প্রথম পাঠ—দাগা বুলানো। তারপর তালপাতা, কলাপাতা। শুভঙ্করী, চিঠিপত্র লেখা, হিসাব রাখা—সব শেখান হয় পাঠশালাতে।

বীরসিংহ গ্রামে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালার বড় নাম। যত্ন ক'রে পড়ান, শেখান আঁক, হাতের লেখা। বেতটি কিন্তু অন্যান্য মশাইদের মত অহেতুক শিশুদের পিঠে নেচে বেড়ায় না। পাঠশালার পড়া সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বলেছেন:

"আমি পঞ্চমবর্ষীয় হইলাম। বীরসিংহে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালা ছিল। গ্রামস্থ বালকগণ ঐ পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিত। আমি তাঁহার পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম।...আট বৎসর বয়স পর্যন্ত তথায় শিক্ষা করিলাম। আমি গুরুমহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ছিলাম।"

পাঁচ বৎসর বয়সে পাঠশালায় ভর্তি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র। শিশুর মেধা দেখে সবাই চমৎকৃত, কিন্তু এক বছর পরই অসুখে পড়লেন তিনি। রোগে-রোগে শীর্ণ হয়ে গেল শিশু। ঈশ্বরের অসুখ শুনে উতলা হলেন ভগবতী দেবীর বড়মামা রাধামোহন বিদ্যাভূষণ। পাতুল গ্রামে নিয়ে এলেন স-সন্তানা ভগবতীকে। কোটরী গ্রামের রামগোপাল কবিরাজের বড় নাম। তাঁর চিকিৎসায় রইলেন ঈশ্বর, ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করলেন।

এ সময়ে প্রায় ছয় মাস কাল পাতুলে ছিলেন ভগবতী, কিন্তু একটি দিনের জন্যও মাতুলগৃহের সযত্ন আতিথ্য শ্লথ হয়নি! জননীর মাতুল-পরিবারের স্নেহ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর স্বরচিত জীবনচরিতে বলেছেন:

"আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছে মাতৃদেবী পুত্রকন্যা লইয়া মাতুলালয়ে যাইতেন এবং এক যাত্রায় ক্রমান্বয়ে পাঁচ ছয় মাস বাস করিতেন, কিন্তু এক দিনের জন্যও সমাদরের ত্রুটি ঘটিত না।"

সুস্থ হয়ে বীরসিংহ গ্রামে ফিরে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র। পড়াশুনা এবং দুষ্টুমি ঠিকমত চলতে লাগল। যেমন দুষ্ট, তেমনি মেধাবী। রাত্রি পর্যন্ত রেখে

গুরুমশাই ঈশ্বরকে নামতা শেখান, তারপর কোলে ক'রে বাড়ী রেখে আসেন। একদিন দেখা গেল কালীকান্ত বিদ্যায় ফতুর হয়ে গিয়েছেন। ছাত্রকে নূতন ক'রে শেখাবার মত আর কিছু নেই তাঁর। ঠাকুরদাসকে ডেকে তিনি বললেন :

"এখানকার পাঠশালায় যাহা শিক্ষা করা আবশ্যক ঈশ্বরের তাহা হইয়াছে। ঈশ্বরের হাতের লেখা অতি সুন্দর। ইহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া ইংরাজি শিক্ষা দিলে ভাল হয়।"

কিছুদিন পর রামজয় তর্কভূষণ পরলোকগমন করলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন। কেবল লেখাপড়ার জন্য নয়, ছেলের অতিরিক্ত চঞ্চলতা বন্ধ করবার জন্যও ঠাকুরদাস ঠিক করলেন ঈশ্বরকে কলিকাতায় নিয়ে যাবেন। স্থির হল, গুরুমশাই কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও সঙ্গে যাবেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ। ঈশ্বরচন্দ্র তখন আট বছরের শিশু। মুখে শৈশবের গন্ধ; দু'টি নিষ্পাপ চোখে যেন পৃথিবীর সব কৌতূহল ঠাঁই নিয়েছে! কত পথ-প্রান্তর পার হয়ে তাঁকে রাজধানী কলিকাতায় পৌঁছতে হবে। খরতাপে মলিন হবে মুখ, কণ্টকক্ষত হবে পা দু'খানি। মায়ের বুকে যত ভয়, তত আশা। পিতামহী দুর্গাদেবীর ওষ্ঠে দুর্গানাম। যাত্রার আয়োজন প্রস্তুত হল। দরজায় মঙ্গলঘট; কত স্নেহ বুকে নিয়ে ঈশ্বরকে যাবার বেলায় আশীর্বাদ করতে এসেছেন প্রতিবেশীরা, জড়ো হয়েছে খেলার সাথীদল। কার্তিক মাসের এক শুভ দিনে কলিকাতায় যাত্রা করলেন ঈশ্বর, চাকর আনন্দরাম গুটি চলল বোঁচ্‌কা-কাঁধে দীর্ঘ পায়ে পিছন পিছন,—চলার পথে ঈশ্বরের বাহন হবে সে।

ঈশ্বরচন্দ্রের পৃথিবীতে আসবার প্রথম দিনটির মত কলিকাতার পথে তাঁর প্রথম চলবার সঙ্গেও একটা গল্প জড়িয়ে আছে।

বাঁধা-রাস্তা ধরে চলেছেন শিশু ঈশ্বর। কৌতূহলী চোখ দেখে নিচ্ছে পথের দ্রষ্টব্য সব বস্তু। হঠাৎ চোখে পড়ল পথের পাশে পোঁতা রয়েছে চৌকো পাথর, অবিকল মায়ের বাটনা-বাটা শিলের মত। পিতাকে প্রশ্ন ক'রে জানা গেল ওগুলি শিল নয়, মাইল-স্টোন্। পথের হিসাব আছে ওর গায়ে খোদাই করা। ঠাকুরদাস ছেলেকে পাথরের কাছে নিয়ে উনিশ লেখা দেখালেন;

বললেন, সেখান হতে কলিকাতা আর উনিশ মাইল দূর। ঈশ্বরচন্দ্র ভাল ক'রে দেখে নিলেন ইংরেজি অক্ষর—এক আর নয়। পথে যেতে যেতে বাকী সবগুলি অক্ষর চেনা হয়ে গেল। পিতাকে জানালেন ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজি এক, দুই তাঁর শেখা হয়ে গিয়েছে।

ঠাকুরদাস ছেলেকে পরীক্ষা করবার জন্য 'ছয়' চিহ্নিত পাথরটি না দেখিয়ে পাঁচের কাছে এসে জানতে চাইলেন সেটা কত। ঈশ্বর বাবার চালাকী বুঝতে পারেন নি; ভাবলেন ভুল ক'রে ছয়ের স্থানে পাঁচ বসান হয়েছে। বললেন, "বাবা, এটা হবে ছয়েব অঙ্ক, কিন্তু ভুলে পাঁচ লিখিয়াছে।"

ছেলেব বুদ্ধি দেখে পিতার আনন্দের সীমা নেই। ছাত্রের কৃতিত্বে গুরুমহাশয়েরও আনন্দ। তাঁদেব আনন্দের খবর ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই অমোদের দিয়েছেন:

"এই কথা শুনিয়া পিতৃদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বীরসিংহের গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন, তিনি আমার চিবুক ধরিয়া 'বেশ বাবা, বেশ'—এই বলিয়া অনেক আশীর্বাদ করিলেন, এবং পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, 'দাদা মহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখাপড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে মানুষ হইতে পারিবেক।"

দয়েহাটায় ভাগবতচরণ সিংহের গৃহে ঠাকুরদাসের বাস। ভাগবতচরণ গত হয়েছেন, তাঁর ছেলে জগদ্দুর্লভ সিংহ পরিবারের কর্তা। তিনি ঠাকুরদাসকে কেবল 'খুড়োমশায়' বলে ডাকেন না, পিতৃব্যের উপযুক্ত সম্মানও ক'রে থাকেন। এই বাড়ীতেই থাকতেন জগদ্দুর্লভ বাবুর বিধবা ছোট বোন রাইমণি,—ঈশ্বরচন্দ্রের 'ছোড়দিদি'। স্নেহলালিত বালক ঈশ্বর রাইমণির মাতৃবক্ষে আশ্রয় লাভ করলেন, নিজ পুত্র গোপালের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনো তফাৎ রইল না। সমস্ত জীবন ধবে ঈশ্বরচন্দ্র রাইমণির স্নেহের উত্তাপ অনুভব করেছেন, জীবনের অপরাহ্ণে পৌঁছে নিজের জীবনচরিতের পাতা ভ'রে লিখে গিয়েছেন সেই করুণাময়ী মাতৃ-স্বরূপা নারীর কথা:

"রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে।"

নিজ জননী ভগবতী দেবী এবং রাইমণি ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তারই ফলে আমরা পরবর্তীকালে নারীজাতির বান্ধব ঈশ্বরচন্দ্রের সাক্ষাৎ পেয়েছি এবং একথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন :

"আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধহয়, সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির সেই দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।"

কলিকাতায় এসে ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালায় ভর্তি হলেন। জগদ্দুর্লভ বাবুর বাড়ীর কাছেই শিবচরণ মল্লিকের মস্ত বড় দালানে পাঠশালা খুলেছেন স্বরূপচন্দ্র দাস। এই পাঠশালাতেই ঈশ্বরচন্দ্র বাড়ীর অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে যাতায়াত আরম্ভ করলেন। পাঠশালা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন :

"কলিকাতায় উপস্থিতির পাঁচ সাত দিন পরেই, আমি ঐ পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই তিন মাস তথায় শিক্ষা করিলাম। পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধহয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন।"

পাঠশালার পড়া কিন্তু বেশী দিন চল্‌ল না। রক্ত-অতিসার রোগে ঈশ্বরচন্দ্র শয্যাগত হয়ে পড়লেন। সংবাদ পেয়ে উতলা হলেন পিতামহী দুর্গাদেবী। কলিকাতায় নিজে এসে পৌত্রকে বীরসিংহ নিয়ে গেলেন। গ্রামের খোলামাঠ, বিশুদ্ধ বাতাস, ওষুধ ছাড়াই ঈশ্বরকে সুস্থ ক'রে দিল। প্রায় দু'আড়াই মাস, পর ঈশ্বরচন্দ্র আবার কলিকাতায় ফিরে এলেন। এবার আর আনন্দরাম সঙ্গে নেই। শ্রান্ত বালককে বইবার ভার নিতে হল দুর্বলদেহ ঠাকুরদাসকে। বহু ক্লেশে পিতাপুত্র কলিকাতায় এসে পৌছলেন। সেখানে আছে রাইমণির স্নেহাঞ্চল ; বড় হবার, জীবনকে বিস্তৃত করবার আয়োজন।

॥ দুই ॥

ঠাকুরদাসের চিন্তা উপস্থিত হল। ছেলেকে তিনি উচ্চশিক্ষা দেবার জন্য রাজধানীতে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু কোন্ পথে হবে সেই শিক্ষা! ইংরেজি অর্থকরী বিদ্যা। ইংরেজি শিখলে ভবিষ্যতে আর্থিক সমস্যার নিরসন হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্কুল সোসাইটির ভাল স্কুল পটলডাঙ্গায় ও আরপুলীতে। আরপুলীর স্কুল হেয়ার সাহেব নিজে তত্ত্বাবধান করেন। হেয়ার সাহেবের এই স্কুল দরিদ্র বালকদের জন্য! মেধাবী ছাত্র সোসাইটির খরচে হিন্দু কলেজে পড়বার সুবিধা পায়। আরপুলীর স্কুলেই কি তবে ছেলেকে ভর্তি করে দেবেন ঠাকুরদাস? কিন্তু একটা প্রশ্ন যে তবু থেকে যায়! ব্রাহ্মণ চিরদিন জাতীয় সংস্কৃতির ধারক, আচার্য। অর্থের প্রলোভনে পড়ে ঠাকুরদাস কি ইংরেজি শিখিয়ে ছেলেকে গোত্রচ্যুত ক'রে দেবেন? নিজে অবশ্য ইংরেজি শিখেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। উপায়হীন হয়ে তাঁকে সংস্কৃতশিক্ষা ছাড়তে হয়েছে। তখন যে অর্থের বড় প্রয়োজন ছিল। বাপ দেশান্তরী, উপবাসী মা, ভাই-বোন। সংস্কৃত পড়বার সময় পান নি ঠাকুরদাস। কিন্তু স্বপ্ন রয়ে গিয়েছে। মস্তবড় • চতুষ্পাঠী। দিগ্‌দেশ হতে ছাত্র আসছে। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা—জাতীয় বৃত্তি। ঈশ্বরচন্দ্র স্বরচিত জীবনচরিতে লিখেছেন:

"গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যতদূর শিক্ষা দিবার প্রণালী ছিল, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ও স্বরূপচন্দ্র দাসের নিকট আমার সে পর্যন্ত শিক্ষা হইয়াছিল। অতঃপর কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ বিষয়ে পিতৃদেবের আত্মীয়বর্গ স্ব-স্ব ইচ্ছার অনুযায়ী পরামর্শ দিতে লাগিলেন।...আমরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত ব্যবসায়ী; পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্যবশতঃ, ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই; ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব। তিনি বলিলেন, উপার্জনক্ষম হইয়া, আমার দুঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ,

সংস্কৃতশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া, তিনি আমায় ইংরেজি স্কুলে প্রবেশ বিষয়ে, আন্তরিক অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না।”

গোলদীঘির পাড়ে মস্তবড ইমারৎ, সরকারী সংস্কৃত কলেজ। সেখানে পড়েন ঠাকুরদাসের আত্মীয় মধুসূদন। তিনিও ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে পড়াবার পক্ষপাতী। তিনি জানালেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ‘ল কমিটি’র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আদালতে জজ-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হবার সুযোগ পায়। সুতরাং চতুষ্পাঠীতে পড়বার চাইতে সংস্কৃত কলেজে পড়াই ভাল। সংস্কৃতশিক্ষাও হবে, চাকুরী পাবারও সম্ভাবনা থাকবে। নানা দিক বিবেচনা ক’রে মধুসূদন বাচস্পতির প্রস্তাবে সম্মত হলেন ঠাকুরদাস। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন, নয় বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করলেন।

পুত্রের যে শিক্ষাসমস্যা নিয়ে ঠাকুরদাস চিন্তিত হয়েছিলেন, তা তখন সমস্ত বাঙালির মনকে অধিকার ক’রে ছিল। ইংরেজ চাইছিল পুরাতন শিক্ষা নিয়ে ভারতবর্ষ তার প্রাচীন যুগে বসে থাকুক, তা’হলেই শান্তি। তা’হলেই ইংরেজ নিশ্চিন্তে রাজকার্যে মন দিতে পারবে, শাসন-শোষণের পথে তাদের রথ চলবে অব্যাহত গতিতে। সরকারী ব্যয়ে তাই স্থাপিত হল সংস্কৃত কলেজ। এদিকে সরকারী শিক্ষানীতির প্রতিবাদে ‘সামরিক শঙ্খধ্বনি’ করেছেন রামমোহন রায়। তিনি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট আমহার্স্টকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন প্রাচীন শিক্ষায় অর্থব্যয়ের প্রয়োজন নেই, আধুনিক শিক্ষা, ব্যাবহারিক শিক্ষা দেওয়া হক ভারতবাসীকে। রামমোহনের এই চিঠিখানি জাতীয় শিক্ষার ইতিহাসের প্রথম দলিল।

রামমোহনের প্রতিবাদে কোন ফল হল না। সরকার প্রাচীন শিক্ষার উন্নতিকল্পেই অর্থ বরাদ্দ করলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল সরকারী শিক্ষাসমিতির কর্মকর্তাগণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে তর্কাতর্কি শুরু ক’রে দিয়েছেন। প্রাচ্য কিম্বা পাশ্চাত্য—কোন্ শিক্ষা দিলে ভারতীয়দের প্রকৃত উন্নতি হবে এই নিয়ে দুই দলের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। প্রাচীন সরকারী

সম্পাদকের বিরুদ্ধতায় তিনি পদে পদে বাধা পেতে লাগলেন। তেজস্বী ব্রাহ্মণ যুবক ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না ক'রে সংস্কৃত কলেজের পদ ত্যাগ করলেন। প্রায় বিনা কারণে পঞ্চাশ টাকা বেতনের পদ ত্যাগ! রসময় দত্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন, "বিদ্যাসাগর খাবে কি?" কথাটি কর্ণগোচর হলে ঈশ্বরচন্দ্র বলেছিলেন, "বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে।"

এ সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের সাংসারিক দায়িত্বের কথা চিন্তা করলে আমাদের মনেও বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। কলিকাতার বাসায় তখন প্রায় ২৫।৩০ জন লোকের খাবার ব্যবস্থা করতে হত, বীরসিংহ গ্রামে পিতাকে সংসার-খরচের জন্যও প্রতিমাসে টাকা পাঠান একান্ত প্রয়োজন। এমন অবস্থায় চাকুরী-ত্যাগ, প্রায় অভাবনীয় ব্যাপার। শিক্ষাপরিষদের কর্তা ডঃ ময়েট, এবং হিতৈষী অন্যান্য বন্ধুদের সমস্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ক'বে বিদ্যাসাগর নিজ সংকল্পে অবিচল রইলেন।

এ সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড্-রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অতিরিক্ত ছাত্ররূপে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিকিৎসা-ব্যবসা গ্রহণ করবেন স্থির ক'রে ১৬ই জানুয়ারী পদত্যাগপত্র প্রেরণ করলেন।

মেজর মার্শেল এই শূন্য পদে ১লা মার্চ থেকে আশি টাকা বেতনে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিযুক্ত করলেন। দ্বিতীয় বার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এলেন বিদ্যাসাগর; কিন্তু, এখানে তাঁকে এবার অনেকদিন থাকতে হল না। সংস্কৃত কলেজ হতে আবার আহ্বান এল। ডঃ ময়েটের বিশেষ আগ্রহে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর, সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ফিরে এলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কৃত কলেজে প্রত্যাবর্তন এবং অধ্যক্ষপদ লাভের বিবরণ আমরা তাঁর নিজের কথাতেই জানতে পারি। বেতাল-পঞ্চবিংশতি গ্রন্থের একাদশ সংস্করণে তিনি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"আমি যে সূত্রে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা-পদে নিযুক্ত হই, তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত এই, মদনমোহন তর্কালঙ্কাব জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদ প্রস্থান করিলে, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক-পদ শূন্য হয়। শিক্ষা

সমাজের তৎকালীন সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ডাক্তার ময়েট সাহেব আমাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

"আমি নানা কারণ দর্শাইয়া প্রথমতঃ অস্বীকার করি। পরে, তিনি সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে, আমি কহিয়াছিলাম যদি শিক্ষাসমাজ আমাকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দেন তাহা হইলে আমি এই পদ স্বীকার করিতে পারি। তিনি আমার নিকট হইতে ঐ মর্মে একখানি পত্র লিখাইয়া লয়েন। তৎপরে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, আমি সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হই। আমার এই নিয়োগের কিছুদিন পরে, বাবু রসময় দত্ত মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা পদ পরিত্যাগ করেন। সংস্কৃত কলেজেব বর্ত্তমান অবস্থা ও উত্তরকালে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, সংস্কৃত কলেজের উন্নতি হইতে পারে, এই দুই বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত, আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয়। তদনুসারে আমি রিপোর্ট সমর্পণ করিলে, ঐ রিপোর্ট দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া, শিক্ষাসমাজ আমাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা-কার্য্য সেক্রেটারী ও অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারী এই দুই ব্যক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছিল, ঐ দুই পদ রহিত হইয়া, প্রিন্সিপালের পদ নূতন সৃষ্টি হইল। ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে, আমি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলাম।"

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ রসময় দত্তের কাজকর্মে শিক্ষাপরিষদ যে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না সে কথা তাঁদের রিপোর্ট হতেই বোঝা যায়। অধ্যক্ষের পদত্যাগ-প্রস্তাবে পরিষদ সরকারের নিকট লিখলেন:

"দশ বছর ধরিয়া বাবু রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের কাজ করিয়া আসিতেছেন। সংস্কৃতভাষায় তাঁহার জ্ঞান নাই বলিলেও চলে। তাহার উপর সারাদিন তিনি অন্যত্র দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিবিষ্ট থাকেন। কলেজের যখন কাজ চলে, তখন তিনি কলেজে উপস্থিত থাকিতে পারেন না। ফলে কলেজের শৃঙ্খলা শিথিল হইয়াছে। হাজিরা-খাতার উপর মোটেই নির্ভর করা চলে না, এবং নানারূপ গোলমাল ও অব্যবস্থায় কলেজের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে —কার্য্যকারিতা একান্তভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অথচ এই বিদ্যালয় এক বিপুল ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান, কারণ, কলেজের ছেলেদের নিকট হইতে মাহিনা লওয়া হয়

॥ এক ॥

"The Atmosphere seemed never so pure, and the stillness was more than silence: it was a holy hush, a warning that heaven was stooping low to whisper good things to listening earth"—Ben-Hur.

আশ্বিন মাসের একটি মঙ্গলবারের দ্বিপ্রহর। নীরবতা রৌদ্রময়ী রাত্রি রচনা করেছে। শরতের সুনীল চন্দ্রাতপের তলে শ্যামলী ধরণী। এক মহাপ্রত্যাশায় তার কি রোমাঞ্চ জেগেছে? অনুভব করছে কি সে কোন আবির্ভাবের সঙ্কেত?

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের এই দিনটিতে মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে জন্মাল এক শিশু—ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি।

তখন সমস্ত বিশ্বে প্রতিশ্রুতির লিপি বহন ক'রে এক নবযুগ আবির্ভূত হয়েছে। বাষ্পের পক্ষপুটে ভর ক'রে ইয়োরোপের মানুষ সঙ্কল্প করেছে বৎসরে শতক অতিক্রম করবে। যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে, রাস্তাঘাট বানিয়ে দেশের চেহারা বদলে দিয়েছে তারা। পৃথিবীকে ভোগ করবার জন্য, ভাগ করবার জন্য বাড়িয়েছে মস্তবড় লোভী হাত।

ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ। এ-দেশের তখন কি অবস্থা? ভারতে তখন ইংরেজ-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামন্তশক্তি নিঃশেষ-প্রায়। সার্বভৌমত্ব লাভের জন্য ব্রিটিশ শক্তিকে বাধা দেবে ভারতে এমন আর কেউ নেই। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দ-আইনে ইংলণ্ডের বণিক ভারতবর্ষে অবাধ বাণিজ্য করবার অধিকার পেয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের বন্দর-বাজার ভ'রে গিয়েছে বিলাতী পণ্যে। ধ্বংস হতে বসেছে বাংলা, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী,

মাদুরা, পঞ্জাব, কাশ্মীরের মত দেশের জগদ্বিখ্যাত মসলিন আর রেশমী-পশমী বস্ত্রশিল্প। বাজার পাচ্ছে না তাঞ্জোর, পুণা, নাসিক এবং বারাণসীর ধাতু ও প্রস্তরশিল্প। শিল্প, বাণিজ্য, সব ইংরেজের হাতে। সোনা-রূপার স্রোত বয়ে চলেছে ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডের দিকে।

কতদূরে, সাত সমুদ্র পার হয়ে ইংরেজের দেশ ইংলণ্ড, আর কোথায় ভারতবর্ষের এক প্রান্তে বাংলাদেশ! কেমন ক'রে ইংরেজ জানল এদেশের ঐশ্বর্যের খবর? কোম্পানী গঠন ক'রে লুট্ করতে চলে এল এখানে। নানা মতলব ক'রে একেবারে দেউলে ক'রে ছাড়ল গোটা দেশটাকে!

কিন্তু বাধা কি বাংলার সম্পদের কথা জানতে! ফরাসী বণিক টাভার্ণিয়ে (Tavernier), ইটালীর পর্যটক মানুচি (Manucci) পাতা ভ'রে ভ'রে লিখে গেছে বাংলার ধান, চিনি, তুলা, সোরা আর রেশমের কথা। বণিক-জাতি ইংরেজ, সারা পৃথিবীতে ফিরছে তারা বাণিজ্যের খোঁজে। দলে দলে বিদেশী বণিক এসে কুঠি বানিয়েছে বাংলাদেশে। ইংরেজও এল। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি স্থাপিত হল হুগলীতে।

মুসলমান নবাবের সঙ্গে কিন্তু বনল না ইংরেজের। নবাব শায়েস্তা খাঁ বিরূপ। ফৌজদারের তাড়া খেয়ে হুগলীর কুঠিয়াল জব্ চার্নক চলেছিল বালেশ্বরের ইংরেজ-কুঠিতে আশ্রয় নিতে, পথে বিশ্রামের জন্য থামল কলিকাতায়। আদিগঙ্গার পাড়ে গাছতলায় বসে সেদিন কি জব্ চার্নকের কল্পনায় কলিকাতা মহানগরীর রূপ জেগেছিল? তাই কি সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ হতে কলিকাতা, সুতানুটি আর গোবিন্দপুর নগদ তেরশ' সিক্কা-টাকা দিয়ে কিনে ভবিষ্যতের গোড়াপত্তন করল সে!

কলিকাতা, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম জমিদারি। দেখতে দেখতে জমজমাট ব্যবসায়ের জায়গা হয়ে উঠল কলিকাতা। বর্ধমানের জমিদার শোভাসিংহ আর মারাঠা বর্গীর ভয়ে ঐ অঞ্চলের বহু ধনী ও সাধারণ বাঙালি আশ্রয় নিল কলিকাতায়। আবার টাকা রোজগারের আশাতেও নানা জাতি, নানা বর্ণ ভিড় জমাল এখানে। আত্মরক্ষার অছিলা করে একটা দুর্গও বানাল ইংরেজ। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামে বাংলাদেশের কলিকাতায় স্থাপিত হল দুর্গ—ফোর্ট উইলিয়ম।

না। বাংলায় সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যের উন্নতিবিধানের যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে; কর্ম্মিষ্ঠ লোকের হাতে পড়িলে সংস্কৃত কলেজ সেই আন্দোলনের সহায়করূপে অনেক কাজ করিতে পারে। বাবু রসময় দত্তের পদত্যাগে এই প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনের একমাত্র অন্তরায় দূর হইল। কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডঃ স্প্রেঙ্গার আর্বীভাষায় যেরূপ সুপণ্ডিত, সেইরূপ সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপন্ন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পাওয়া যাইতেছে না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাপরিষদের মতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। একদিকে তিনি ইংরেজি ভাষায় অভিজ্ঞ, অন্যদিকে সংস্কৃতশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার মত উদ্যমশীল, কর্ম্মনিপুণ, দৃঢ়চিত্ত লোক বাঙালির মধ্যে দুর্লভ। তাঁহাব রচিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি ও চেম্বর্সের বায়োগ্রাফি' র বঙ্গানুবাদ সমস্ত গবর্মেণ্ট স্কুল-কলেজেই বাংলার পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পড়ান হয়। তিনি অধ্যক্ষ হইলে বর্ত্তমান সহকারী সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকেব পদ দেওযা যাইতে পারে। সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের পদ উঠিযা যাইবে। এই দুই পদের বেতন মোট ১৫০ টাকা। অধ্যক্ষকে এই ১৫০ টাকা দিলেই চলিবে। সুতরাং এই পরিবর্ত্তনে ব্যয়বৃদ্ধির কোন আশঙ্কা নাই।

গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনেব অপেক্ষায় সম্প্রতি অস্থায়ী ভাবে পণ্ডিত ঈশ্বচন্দ্রের উপরই সংস্কৃত কলেজের তত্ত্বাবধানের ভাব অর্পিত হইল।" (৪ জানুয়ারী ১৮৫১, অনুদিত) *

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের পুনর্গঠনের সূচনায় প্রথমেই শৃঙ্খলাস্থাপনের প্রতি সচেষ্ট হলেন। কলেজে নিয়মানুবর্তিতা বলে কোন জিনিষই ছিল না। সামান্য কারণেই ছাত্রগণ শ্রেণী ত্যাগ করতেন। গণ্ডগোল এবং বিশৃঙ্খলতারও অন্ত ছিল না। বিদ্যাসাগর এই সমস্ত নিবারণের জন্য অবহিত হলেন। অধ্যাপকগণ ইচ্ছামত সময়ে কলেজে আসবার অভ্যাস ত্যাগ করলেন, এবং ছাত্রগণও সংযত হতে বাধ্য

* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সাহিত্যসাধক-চরিতমালা)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হলেন। অষ্টমী ও প্রতিপদ তিথির অনধ্যায়-নিয়ম রহিত ক'রে, ইংরেজি প্রথামত রবিবার ছুটীর দিন নির্দিষ্ট হল। এর পর ঈশ্বরচন্দ্র একটি বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনে হস্তক্ষেপ করলেন। প্রাচীন প্রথামত, উচ্চবর্ণের হিন্দু ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীর ছাত্রের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার ছিল না; বিদ্যাসাগর প্রস্তাব করলেন, সমস্ত বর্ণের হিন্দু ছাত্রই সংস্কৃত কলেজে গৃহীত হবে। প্রচণ্ড বিরোধিতা ক'রেও পণ্ডিতমণ্ডলী বিদ্যাসাগরের যুক্তির নিকট পরাজিত হলেন। কায়স্থ-বংশোদ্ভব রাজা রাধাকান্ত দেব তখন হিন্দুসমাজের চূড়ামণি। তিনি সংস্কৃতচর্চা করছেন। ইয়োরোপের অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদেরও সংস্কৃত পড়তে কোন বাধা নেই। কেবল হিন্দু হয়ে জন্মাবার অপরাধেই কি বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোন বর্ণের বালক সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার পাবে না? সুতরাং যুগের প্রয়োজনের নিকট সংস্কার নত হল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হতে সমস্ত বর্ণের হিন্দু ছাত্রের নিকট সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল।

হিন্দু কলেজ ও মাদ্রাসার কৃতবিদ্য ছাত্রদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কর্মে নিযুক্ত করা হত, কিন্তু সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের সম্বন্ধে সেরূপ কোন ব্যবস্থা ছিল না। কলেজের সম্মান এবং ছাত্রদের সংস্কৃতশিক্ষার প্রতি উৎসাহ ও আগ্রহ বর্ধিত করবার জন্য বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের যোগ্য ছাত্রদের জন্যও অনুরূপ নিয়ম প্রবর্তনের জন্য আবেদন করলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রার্থনা গৃহীত হল, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ হতে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদেরও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ দেওয়া হবে বলে স্থির হল।

সংস্কৃত কলেজের অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার ফলে যে বিপুল আর্থিক অপচয় ঘটছিল, সেদিকেও ঈশ্বরচন্দ্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। তিনি দেখলেন সংস্কৃত-কলেজের বহু ছাত্র ইচ্ছামত কলেজে আসা যাওয়া করে, এবং সুবিধামত ইংরেজি বিদ্যালয়ে গিয়ে, টাকা দিয়ে পড়াশুনা করে। এরা নিয়মিত ভাবে কলেজে আসেনা বলে হাজিরা বই হতে নাম কাটা গেলেও অনুরোধ-উপরোধ ক'রে আবার ভর্তি হয়ে যায়।

আর্থিক প্রশ্ন নেই বলে, ছাত্র ও অভিভাবকদের অবহেলারও অন্ত নেই। ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ হতে এই ব্যবস্থা রহিত করলেন। বিনা বেতনে

আর সংস্কৃত কলেজে পড়া চলবে না। দু' টাকা ভর্তি-ফি, এবং নাম কাটা গেলে পুনরায় ভর্তি হবার সময়ও দু' টাকা লাগবে এই নিয়ম হল। তারপর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হতে মাসিক এক টাকা বেতন ধার্য করবার ফলে, অভিভাবক এবং ছাত্র দুই-এরই চেতনা হল, ছাত্রগণের উপস্থিতি নিয়মিত হয়ে উঠল।

শৃঙ্খলার প্রবর্তন ক'রে, ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ দিলেন। ব্যাকরণশ্রেণীতে মুগ্ধবোধের বিভীষিকা ছাত্রদের সর্বদা আতঙ্কিত ক'রে রাখত। ছাত্রজীবনের অমূল্য চার-পাঁচ বৎসর তাদের কেটে যেত বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ মুখস্থ করতেই। এই মুখস্থবিদ্যা কিন্তু তাদের সাহিত্যশ্রেণীতে বিশেষ সাহায্য করত না। ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রদের সংস্কৃতশিক্ষার পথ সহজ ক'রে দিলেন। স্বরচিত 'সংস্কৃতব্যাকরণের উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী এবং সংস্কৃত গদ্য ও কাব্য-সঙ্কলন—ঋজুপাঠ পড়ে, ছাত্রগণ তিন বছরের মধ্যেই সাধারণভাবে সংস্কৃতে জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হল।

জীবনের প্রথম সূচনা হতে বাধা ও বিপত্তির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র বুঝেছিলেন যে, জ্ঞান যদিও সংস্কৃতির ধাত্রী, তথাপি অভাব-অনটনক্লিষ্ট পণ্ডিত কখনই সংস্কৃতির বাহক হতে পারেন না। সংস্কৃতের বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার শিক্ষার্থীকে অবশ্যই প্রজ্ঞাবান ক'রে তুলবে, কিন্তু তার আর্থিক অভাব দূর করতে পারবে না। ইংরেজি অর্থকরী বিদ্যা, সুতরাং ব্যাবহারিক জীবনে ইংরেজি শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে একটি ইংরেজি বিভাগ খোলা হয়েছিল, কিন্তু আট বছর পর সেটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৪২ সালে শিক্ষাপরিষদ্ পুনরায় ইংরেজি বিভাগ খুললেন, কিন্তু ছাত্রদের ইংরেজি শিখবার একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও আশানুরূপ কাজ হল না। ঈশ্বরচন্দ্র এই বিভাগটিকে সুগঠিত করবার চেষ্টা আরম্ভ করলেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হতে মাসিক একশ টাকা বেতনে হিন্দু কলেজের বৃত্তি ও মেডেলপ্রাপ্ত ছাত্র প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীকে ইংরেজি এবং শ্রীনাথ দাসকে গণিতের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করলেন। ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী' এবং বীজগণিতের পরিবর্তে ইংরেজিতে গণিতশিক্ষা প্রবর্তিত হল এবং ইংরেজি হল অবশ্য-পাঠ্য।

সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের কিছুদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করতে লাগল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ এই পরীক্ষাতে অন্যান্য বিদ্যালয়ের বালকদের ন্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রচেষ্টাকে সফল করলেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় প্রজার নৈতিক কল্যাণ কামনায় তাদের শিক্ষাদায়িত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। প্রথমত তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য বিদ্যার সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ-কল্পে কিছু অর্থব্যয় ক'রেই কর্তব্য সমাপন করা। যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ, নানারূপ অশান্তি নিয়ে কোম্পানীর কর্মচারিগণ বিব্রত ছিলেন, ততদিন তাঁরা এ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু চিন্তাও করেন নি। কিন্তু দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবাব সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দৃষ্টি প্রজার কল্যাণের প্রতি নিবদ্ধ হল। ভারতীয়গণও প্রধানত ইংরেজদের সম্পর্কে এসেই যুগ-সচেতনতা লাভ করছিলেন, তাঁরা দাবী করছিলেন আধুনিক শিক্ষার। সুতরাং প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চা এবং তার ক্রম-প্রবর্তন সরকারী নীতি হয়ে উঠতে বাধ্য হল।

• সরকারী নীতি কাজে পরিণত করতে হলে বিদ্যাসাগরেব ন্যায় কর্মপটু এবং দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তির একান্ত প্রয়োজন। ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়োগ ক'রে সরকাব যে কোন ভুল করেন নি তার প্রমাণ-স্বরূপ দেখা গেল, নানারূপ সংস্কারের ফলে সংস্কৃত কলেজের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং ছাত্রসংখ্যাও বেড়েছে। শিক্ষা-পরিষদ্ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হতে ঈশ্বরচন্দ্রের বেতন বাড়িয়ে তিনশত টাকা ক'রে দিলেন।

সংস্কৃত কলেজের সমস্ত কর্তৃত্ব পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন। এই পবিকল্পনাটির মর্ম ছিল :

১. বাংলাদেশে শিক্ষাব উন্নতিকল্পে বাংলাসাহিত্যের উন্নতির প্রতি দৃষ্টিদান প্রধান কর্তব্য। কিন্তু ইংরেজি ভাষা-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে ইয়োরোপীয় জ্ঞান আহরণ ক'রে তাকে বাংলাভাষায় সরল ভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। সুতরাং তাঁরা এই উন্নত ধরণের বাংলাসাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন না।

২. সংস্কৃতে প্রচুর জ্ঞান ব্যতীত মার্জিত বাংলা রচনা করা সম্ভব নয়,

এজন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ইংরেজি শিক্ষা করা প্রয়োজন, তা'হলে তাঁরা প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় ইয়োরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন।

৩. অভিজ্ঞতার ফলে জানা যায়, ইংরেজিনবিস ব্যক্তিগণকে সংস্কৃত কিছুটা শিক্ষা দিলেও তাঁরা মার্জিত বাংলাভাষায় কোন ভাব প্রকাশ করতে পারবেন না, কারণ তাঁরা অতি মাত্রায় বিদেশী ভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছেন।

৪. এই সমস্ত আলোচনা হতে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ভাল ক'রে ইংরেজি সাহিত্য শিক্ষা দিলে তাঁরাই ভবিষ্যতে শক্তিশালী বাংলাসাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ভবিষ্যতে জনশিক্ষক-রূপে প্রস্তুত করবার সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে, তাঁদের কি ধরণের শিক্ষা দিলে তাঁরা এই দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত হবেন সে সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র লিখলেন :

১. কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণ ও সাহিত্য উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে হবে এবং কাব্য, নাটক, গদ্য, সমস্তই শিক্ষণীয় বিষয় হবে। অলঙ্কারশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য 'কাব্যপ্রকাশ' এবং 'সাহিত্যদর্পণ' পড়া দরকার। সংস্কৃতে উত্তম জ্ঞান অর্জন করতে হলে ছাত্রদের ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং সাহিত্য পড়তে হবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান আয়ত্ত করবার জন্য ছাত্রদের মনুস্মৃতি, মিতাক্ষরা-দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দত্তচন্দ্রিকা, এই শাস্ত্রগুলি পড়া প্রয়োজন।

২. গণিতশাস্ত্রের পক্ষে লীলাবতী ও বীজগণিতকে কোন ক্রমেই পর্যাপ্ত বলা চলে না। বিষয়বস্তু প্রাঞ্জল না হওয়ার ফলে, প্রায় তিন-চার বছর ধরে শিক্ষা করলেও ছাত্রগণ এই পুস্তক-দু'খানি আয়ত্ত করতে পারে না। তারপর সংস্কৃতে গণিত শিক্ষা ক'রেও কোন লাভ নেই। এ ভাবে প্রচুর সময় এবং শ্রম নষ্ট না ক'রে ছাত্রদের অন্য বিষয় শিক্ষা করা কর্তব্য।

সংস্কৃতে গণিতশিক্ষার অযৌক্তিকতা প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, যে, তিনি গণিতশিক্ষার গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি ক'রেই সংস্কৃতভাষার পরিবর্তে ইংরেজি গণিত শিক্ষা-দানের কথা উত্থাপন করছেন।

৩. হিন্দুদর্শন পাঠ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র জানালেন যে, হিন্দুদর্শনের মতামত আধুনিক যুগের উপযোগী না হলেও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের এই দর্শন পাঠ করা

প্রয়োজন। তারপর দর্শনশ্রেণীর ছাত্রদের ইংরেজিতে যেটুকু অধিকার জন্মাবে তার সাহায্যে তাঁরা ইয়োরোপীয় দর্শনও পড়তে পারবেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয় দর্শনে জ্ঞান থাকলে ছাত্রগণ হিন্দুদর্শনের অসার বিষয়গুলি বুঝতে পারবেন। সমস্ত মতের দর্শন পড়লে ছাত্রদের একটি নিজস্ব মত গড়ে উঠবে এবং তখন তাঁরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য রয়েছে তা সহজেই বুঝতে পারবেন। এই ভাবে শিক্ষালাভ ক'রে পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য দর্শনের মত বাংলাভাষায় প্রকাশ করবার উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (Technical words) আয়ত্ত করতে পারবেন।

দর্শনশাস্ত্রে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করবার জন্য ন্যায়দর্শন—গৌতম সূত্র ও কুসুমাঞ্জলি, বৈশেষিক দর্শন—কণাদের সূত্র, সাংখ্যদর্শন—কপিলের সূত্র ও কৌমুদী, পাতঞ্জল দর্শন—পতঞ্জলের সূত্র, বেদান্তদর্শন—বেদান্তসার ও ব্যাসের সূত্র (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), মীমাংসা-দর্শন—জৈমিনির সূত্র এবং 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' পড়লেই যথেষ্ট হবে।

৪. ছাত্রদের ব্যাকরণ ও সাহিত্যশ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ইংরেজি শিক্ষার জন্য কিছু কম সময় দিলেও অলঙ্কার, স্মৃতি ও দর্শন-শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অধিক সময় দেওয়া প্রয়োজন। তা'হলে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ছাত্রগণ অধিক মনোযোগ দিতে পারবেন।

এ সময়ে সংস্কৃত কলেজে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার সময় সাহিত্য, অলঙ্কার, গণিত, স্মৃতি, দর্শন এবং সংস্কৃত গদ্য-রচনা, এই কয়টি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হত। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধেও ঈশ্বরচন্দ্র কিছু অদলবদল করতে চাইলেন। তিনি বললেন যে, সাহিত্য ও অলঙ্কার পরীক্ষায় থাকবে; কিন্তু সংস্কৃতে গণিত ও সংস্কৃত গদ্য-রচনার পরিবর্তে ইতিহাস, গণিত এবং প্রাকৃতিক দর্শন ইংরেজিতে পড়িয়ে সিনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দর্শনশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্রে এবং অর্থশাস্ত্র পরীক্ষার বিষয়ীভূত হবে, এবং প্রত্যেক বৎসরে একটি ক'রে বিষয় স্থির করা যাবে।

শিক্ষাবিষয়ে এই এই বিপুল পরিবর্তন ঘটাতে হলে পুরাতন শিক্ষক নিয়ে কাজ চলা অসম্ভব। সুতরাং অভিজ্ঞ শিক্ষক এনে তবেই বিভাগের পুনর্গঠন করা যেতে পারে। ঈশ্বরচন্দ্র এই জন্য মোটামুটি একটা ব্যয়ের হিসাব দেখিয়ে

জানালেন যে, চারজন শিক্ষককে যথাক্রমে ১০০৲ টাকা, ৯০৲ টাকা, ৬০৲ টাকা ও ৫০৲ টাকা বেতন দিলে ইংরেজি বিভাগের জন্য মাসিক সর্বমোট ৩০০৲ টাকা খরচ হবে।

এই খরচ সঙ্কুলানের উপায়ও ঈশ্বরচন্দ্র স্থির করলেন। তিনি বললেন যে, সংস্কৃত-গণিতের শ্রেণীটি বন্ধ ক'রে দিলে সেখান হতে ২৫০৲ টাকা পাওয়া যাবে এবং বাকী ৫০৲ টাকা কলেজের বাৎসরিক সাহায্য হতে নিলেই চলবে। অবশ্য সাহায্য হতে এই অতিরিক্ত ৫০৲ টাকা ব্যয় করা সম্ভব না হলে অন্য উপায় নির্ধারণ করতে হবে। এই অন্য উপায়ও ঈশ্বরচন্দ্র নির্দেশ করলেন। কলেজে বাংলা ও নাগরির জন্য দুজন রাইটার আছে কিন্তু তাদের বিশেষ প্রয়োজন নেই। সুতরাং এদের বিদায় দিয়ে, সেই বেতনের দরুণ যে ৩২৲ টাকা ব্যয় হয়, সে টাকা ইংরেজি বিভাগে আনা যায়। তারপর, ইংরেজি বিভাগের জন্য মাসিক ৮৲ টাকা হিসাবে একটি জুনিয়ার বৃত্তি আছে। ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় সিনিয়র পরীক্ষাব অন্তর্গত হলে, তখন আর ইংরেজি বিভাগের জন্য পৃথক বৃত্তির প্রয়োজন হবে না, সুতরাং এই ৮৲ টাকাও ইংরেজি বিভাগের জন্য ব্যয় হতে পারবে।

ঈশ্বরচন্দ্রের এই শিক্ষা-পরিকল্পনাটির প্রতি লক্ষ্য করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নিজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হলেও তিনি দেশের ভবিষ্যৎ ছাত্রদের জন্য ভারতবর্ষের সেই প্রাচীন শিক্ষা একমাত্র শিক্ষা হিসাবে আর ইচ্ছা করেন নি। সংস্কৃতশিক্ষার বিরোধিতা না ক'রেও প্রত্যেক সুযোগেই প্রাচ্য শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা জানিয়েছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের এই পরিকল্পনাটি বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্ণর জে, হ্যালিডে নিজের একটি মন্তব্য সহ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন শিক্ষাসংসদে পাঠিয়ে দেন। মন্তব্যে তিনি লিখেছিলেন :

"The accompanying paper has been drawn up by the Principal of the Sanskrit College at my request. It is the result of several consultations I have held with the Principal and, I lay it before the Council as deserving, in my humble judgment, of very careful consideration."

এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের ইংরেজি বিভাগকে বিস্তৃত এবং সুনিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছিলেন, তাঁকে কেবলমাত্র হ্যালিডেই শ্রদ্ধা করতেন না, অন্যান্য রাজকর্মচারিগণও বিদ্যাসাগরকে সম্মান করতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পরিবর্তে ১৮৫৪ সালে যখন সিবিলিয়ানদের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বোর্ড-অব-একজামিনার্স গঠিত হল তখন ঈশ্বরচন্দ্রকে সেই বোর্ডের কর্মী-সদস্য নির্বাচন করা হয়েছিল।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছিল এবং প্রাচ্য শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা-কল্পে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেছিল। কিন্তু শিক্ষা যখন রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে গৃহীত হয়নি সে সময়ে, ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানদের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। রাজ্যচ্যুত হয়ে মুসলমান-সম্প্রদায় ইংরেজদের প্রতি যে বিদ্বেষ পোষণ করত তারই একটা প্রতিবিধানকল্পে হয়ত এই মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। শিক্ষা পেলে মুসলমানদের রাজকার্যে নিযুক্ত করা যাবে। দেশীয়দের সাহায্যে রাজকার্য সম্পাদন করা সুবিধাজনক, এবং কর্ম পেলে মুসলমানগণও সন্তুষ্ট হবে, এই দুই কারণে প্রথমে নিজস্ব তহবিল হতে টাকা খরচ ক'রে হেষ্টিংস মাদ্রাসা স্থাপন করেন। অবশ্য পরে কোম্পানী ওয়ারেন হেষ্টিংসকে সমস্ত অর্থ ফিরিয়ে দেন এবং মাদ্রাসার ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন।

কর্ণ্‌ওয়ালিসের আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলা ও বারাণসীর ভূস্বামীদের যখন আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হল, বারাণসীর রেসিডেন্ট জোনাথান হিন্দুদের সন্তুষ্ট করবার জন্য সরকারী অনুমোদন নিয়ে বারাণসী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। এখানেও কলেজ স্থাপনের মূলে দু'টি উদ্দেশ্য ছিল, বিচার-ব্যবস্থার জন্য কর্মচারী লাভ এবং অসন্তুষ্ট প্রজার সন্তুষ্টিসাধন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান নীতি ছিল এদেশের মানুষের মন সন্তুষ্ট রাখা। এই কারণে তাঁরা প্রাচ্য শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতে আরম্ভ করল। এবং যাতে কোন-রূপে ধর্মবিশ্বাস আহত না হয় সে জন্যও চেষ্টা ছিল। এমনকি এদেশের দেবমন্দিরে কোম্পানী বিশেষ বিশেষ সময়ে পূজা প্রেরণ করত :

"Last week (1802) a deputation from the Government

went in procession to Kalighat and made a thank-offering to this goddess of the Hindus in the name of the Company for the success which the English obtained in this country. Five thousand rupees were offered." *

মুসলমান আক্রমণকারী এদেশে এসে প্রথমেই লুট করেছিল ধর্মমন্দির। তারপর দীর্ঘদিনব্যাপী মুসলমান শাসনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের কাহিনী। হিন্দুদের কত লাঞ্ছনা ঘটেছে মোঘল আমলে, কেবল হিন্দু বলে। ইংরেজ শাসনকর্তা হয়ে দেশে শৃঙ্খলা স্থাপন করল, প্রজাদের দিল শান্তি। সবচেয়ে বড় কথা, তাদের মস্ত মস্ত কামানের মুখ গোলন্দাজরা মন্দির-মসজিদের দিকে ফেরাল না বরং হিন্দু দেবতারা পেতে লাগলেন সম্মান-স্বীকৃতি। সুতরাং অরাজকতার অত্যাচারে পীড়িত বাঙালি যদি ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে ইংরেজ শাসনকে দেবতার আশীর্বাদ বলে মনে করে থাকে, তা'হলে তাদের দোষ দেওয়া চলে না।

দস্যু তস্করের ভয় নেই, ভয় নেই পীড়নের আতঙ্কে মুসলমান হবার। পেট-ভরা খাদ্য, নিশ্চিন্ত আরাম, এর বেশী আর চাইকি! কিন্তু আরো চাইল বাঙালি, চাইল তারা ইংরেজি শিখে বড়লোক হতে। টাকার লোভ দেখিয়েছে ইংরেজ, সে লোভ আরো বাড়তে লাগল। অন্যদিকে মিশনারী খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারকরাও এগিয়ে এলেন। তাঁদের ইচ্ছা ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম প্রসারিত করতে হবে। সুতরাং ভারতীয় প্রজার মন জয় করার জন্য তাদের উন্নতিমানসে মিশনারী সম্প্রদায় ইংলণ্ডে ভারতে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে মহা-আন্দোলন শুরু ক'রে দিলেন এবং এই আন্দোলনের ফলেই ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় প্রজার শিক্ষার জন্য বছরে এক লাখ টাকা খরচ করতে স্বীকার করল আর মিশনারীদের এদেশে এসে স্কুল স্থাপন করবার সব বাধা অপসারিত হল।

ইংরেজ ভারতবর্ষকে সব রকমে শোষণ ক'রে নিয়েছিল কিন্তু প্রতিদানেও কিছু দিয়েছিল। দিয়েছিল তারা ইংরেজি ভাষা—যে ভাষার প্রসাদে ভারতবাসী জ্ঞান-গরিমায় তার শাসকগোষ্ঠীর প্রায় সমতুল্য হয়ে উঠে

* হিন্দু জাতি ও শিক্ষা : উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছিলেন। ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলিত করবার মূলে রয়েছে একজনের অক্লান্ত চেষ্টা। তাঁর কথা খুব কম ক'রে আমরা জানি। তিনি ভারতপ্রেমিক ছিলেন না, এদেশের নিন্দায় তিনি মুখর হয়ে উঠেছিলেন। পুস্তিকা লিখে প্রমাণ করেছিলেন—হিন্দুজাতি নৈতিক-চরিত্রহীন কাপুরুষ মাত্র। তথাপি তিনিই ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টে বিরুদ্ধদলের সঙ্গে তর্কবিতর্ক ক'রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে শিক্ষাখাতে রাজস্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ ব্যয় করতে বাধ্য করেছিলেন।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস গ্রাণ্ট শিক্ষাসম্বন্ধে একটি পুস্তিকা রচনা ক'রে পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত করেন। পুস্তিকাটির নাম ছিল, 'Observations on the State of Society among the Asiatic Subjects of Great Britain, particularly with respect to Moral and on the means of improving it.'

হিন্দুদের অফুরন্ত দোষ বর্ণনা ক'রে গ্রাণ্ট সাহেব লিখলেন যে, তাদের মঙ্গলের জন্যই ইংরেজি শিক্ষা দিতে হবে এবং খ্রীষ্টধর্মও প্রচার করতে হবে। এই দু'টীর একটাতেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত ছিল না। অবশ্য তার কারণ শিক্ষাখাতে ব্যয় হলে রাজস্বের অর্থ হ্রাস পাবে এবং খ্রীষ্টান করতে চাইলে হিন্দুরা ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠবে। তা'ছাড়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কল্যাণে সংস্কৃত শিখে, ভারতবর্ষ যে কেবল অজ্ঞান-অন্ধকারের কূপ, এ ধারণাও রাজকর্মচারীদের দূর হয়েছিল।

যাহোক, নানা দিক থেকে চাপে পড়েই কোম্পানী শিক্ষাদায়িত্ব স্বীকার করল। তারপর ধীরে ধীরে ভারতশাসনে কিছুটা উদারতা দেখা গেল ও ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হল। ভারতবর্ষ অধিকার করবার প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে ইংরেজ ব্যবসায়ী হয়ে এদেশে এসেছিল এবং তাদের সম্পর্কে এসে বাঙালিই সর্বপ্রথম ইংরেজি ভাষা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হল। আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি কলিকাতাতেই প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি-সম্মত মহাবিদ্যালয় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এদেশীয় ব্যক্তিগণ।

বাঙালিরা কেবল হিন্দু কলেজ স্থাপন ক'রেই নিশ্চিন্ত রইলেন না। তাঁরা

নানা স্থানে ইংরেজি স্কুলও স্থাপন করতে লাগলেন। ভবিষ্যৎ বংশধরদের আর্থিক নিরাপত্তা-বিধানই অবশ্য ইংরেজি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু দলও ছিলেন। তাঁরা সংস্কৃতিবান জাতি ইংরেজের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন। সেখান হতে মণি-মাণিক্য আহরণ ক'রে উপহার দিতে লাগলেন দেশকে।

এইসব বাঙালিদের রাজপুরুষগণ শ্রদ্ধা এবং সম্মান করতেন, প্রশংসা করতেন অকুণ্ঠ ভাষায়। বিদ্যাসাগরের গুরুদায়িত্ববোধ এবং শিক্ষাবিষয়ে প্রগতিমূলক পরিকল্পনাও প্রত্যেকবার সমর্থিত হয়েছে এবং পরবর্তী জীবনে যে কোন শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রস্তাবে তাঁর আহ্বান এসেছে। সরকারী কর্মত্যাগ করবার পরও তিনি শিক্ষাবিভাগের বেসরকারী পরামর্শদাতা ছিলেন।

ছোট লাটসাহেব বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেও শিক্ষাপরিষদ্ সরকারী নীতিতে পরিচালিত হত এবং সে সরকার ছিল একটি বণিক্-কোম্পানী। বাধ্য হয়ে বণিক-বৃত্তি ত্যাগ করলেও বণিকের প্রবৃত্তি ত্যাগ করতে পারে নি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তার রাজত্বকালের মধ্যে কখনোই বোধহয় প্রসন্ন মনে শিক্ষার জন্য ব্যয় মঞ্জুর করতে পারে নি। দেশরক্ষা ও শাসনসংস্কারের জন্য অর্থব্যয়ে তাদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু শিক্ষাখাতে রাজস্ব ব্যয় ক'রে লভ্যাংশ হ্রাস ক'রে লাভ কি! ঈশ্বরচন্দ্রও নিশ্চয় এই সরকারী মনোভাব বুঝেছিলেন। সেইজন্যই সংস্কৃত কলেজের সংস্কার-পরিকল্পনার সঙ্গে তিনি অর্থব্যয়ের হিসাব পেশ ক'রে বুঝিয়ে ছিলেন, সংস্কার হলেও অর্থব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ অতি নগণ্য। সরকার সব দেখল, বুঝল ; কিন্তু, একটু অসন্তুষ্টির মেঘও বুঝি ঘনিয়ে এল।

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র যখন সমস্ত চিন্তাকে একাগ্র ক'রে কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সে সময়ে একটি বাধা এসে তাঁর সামনে উপস্থিত হল। ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কারগুলি নানাকারণে শিক্ষাপরিষদ্ সহ্য করতে পারছিলেন না। প্রথমত সংস্কৃত কলেজের সরকারী শিক্ষানীতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। দেশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা এই পরিবর্তন শিক্ষাপরিষদের পছন্দ না হওয়াই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় কারণ, এবং সেটাই বোধহয় প্রধান কারণ ছিল, সংস্কৃত কলেজের ব্যয় বৃদ্ধি। সুতরাং কলেজের কাজকর্ম প্রশংসনীয়রূপে উন্নতি লাভ

করলেও একবছরের মধ্যেই দেখা গেল শিক্ষাপরিষদ্ কাশীর ,সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ জে, আর ব্যালেণ্টাইনকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করবার জন্য আহ্বান করেছেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসে ডঃ ব্যালেণ্টাইন সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন ক'রে একটি দীর্ঘ রিপোর্ট দিলেন। এই রিপোর্টে ডঃ ব্যালেণ্টাইন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং কলেজের পাঠব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্টি জানালেন। ডাঃ ব্যালেণ্টাইন কাশী ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের আলোচনা ক'রে লিখলেন যে, কলিকাতার মত কাশীর ছাত্রগণ ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যগ্র নয়, স্নতরাং সেখানে ইংরেজিকে আবশ্যিক শিক্ষারূপে প্রবর্তিত করা সঙ্গত হবে না। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি এবং সংস্কৃত দুই-ই শিক্ষণীয় বিষয়, কিন্তু ছাত্ররা হয়তো দু'টি শিক্ষার মধ্যে ঠিক সামঞ্জস্য করে নিতে পারছে না। সংস্কৃত কলেজে কয়েকখানি নূতন পুস্তক প্রবর্তন করবার জন্য ডঃ ব্যালেণ্টাইন তাঁর রিপোর্টের মধ্যে স্নপারিশ করলেন।

শিক্ষাপরিষদ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট এই রিপোর্ট বিদ্যাসাগরের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ ব্যালেণ্টাইনের শিক্ষাবিদ্ বলে খ্যাতি ছিল কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর মত গ্রহণ করতে পারলেন না। কেউ কিছু বললেই, এমন কি বক্তা অতি সম্মানিত ব্যক্তি হলেও, অযৌক্তিক প্রস্তাব মেনে নেবার মানুষ ছিলেন না বিদ্যাসাগর। তিনি ব্যালেণ্টাইনের রিপোর্ট যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে সমালোচনা ক'রে, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষাপরিষদ্‌কে তাঁর উত্তর দিলেন। যে দৃঢ়তা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় ইতিপূর্বে সংস্কৃত কলেজ ছাড়বার সময় তিনি দিয়েছিলেন, তার অধিক দৃঢ়তার পরিচয় এই উত্তরে আছে। ঈশ্বরচন্দ্রের যুক্তির দৃঢ়তা এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়ে হিন্দু দর্শনের ভ্রান্তিপূর্ণ অংশ সম্বন্ধে দ্বিধাহীন ঘোষণা আমাদের মুগ্ধ করে। মনে হয় তিনিই সত্যব্রত ঋষিকুলের যোগ্য বংশধর।

ডঃ ব্যালেণ্টাইন সংস্কৃত কলেজে নূতন পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তনের স্নপারিশ করেছিলেন। তাঁর উত্তরে ঈশ্বরচন্দ্র জানালেন যে, দাম বেশী বলেই বোধ হয় ডাঃ ব্যালেনণ্টাইন সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য মিলের লজিকের পরিবর্তে, তৎপ্রণীত মিলের লজিকের সংক্ষিপ্তসার ছাত্রদের পাঠ্যরূপে নির্দেশ করতে চান। কিন্তু

দাম বেশী হলেও মূল বই-ই পড়ান উচিত। ডঃ ব্যালেণ্টাইন তাঁর সংক্ষিপ্তসার মিলের লজিকের ভূমিকা হিসাবে ব্যবহার করবার পক্ষপাতী, কিন্তু মিল নিজেই বলেছেন যে, আর্ক্‌বিশপ হোয়েট্‌লির গ্রন্থই তাঁর লজিকের সর্বোৎকৃষ্ট উপক্রমণিকা।

ইংরেজি অনুবাদ এবং ব্যাখ্যাসহ 'বেদান্ত', 'ন্যায়' ও 'সাংখ্যদর্শনের' তিনখানি পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র জানালেন যে, 'বেদান্তসার' কলেজের পাঠ্য। তার ইংরেজি অনুবাদও পড়াতে কিছু অসুবিধা নেই, কিন্তু ন্যায়-বিষয়ক 'তর্কসংগ্রহ' ও সাংখ্য-বিষয়ক 'তত্ত্বসমাস' পাঠ্যরূপে নির্বাচনের পক্ষে তিনি আপত্তি করলেন। সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যতালিকায় এগুলির চেয়ে ভাল পুস্তকের নাম আছে।

বিশপ বার্ক্‌লের 'Inquiry' পাঠ্যপুস্তক-রূপে প্রবর্তনের বিপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র যে কথা বললেন, তা শুনে মনে হয় বুঝি ডিরোজিও-অনুরাগী হিন্দু-কলেজের কোন ছাত্র কথা বলছেন। ঈশ্বরচন্দ্র জানালেন যে, বেদান্ত এবং সাংখ্য ভ্রান্তদর্শন। কিন্তু ভ্রান্ত হলেও এগুলি হিন্দুদের মনে এমন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্থান পেয়েছে যে, না পড়িয়ে উপায় নেই। ভ্রান্ত দর্শন পড়াবার প্রতিষেধকরূপে ছাত্রদের ইংরেজি দর্শনশাস্ত্রের কোন উপযুক্ত গ্রন্থ পড়ান কর্তব্য। বার্ক্‌লের পুস্তককে ইয়োরোপে খাঁটি দর্শন বলা হয় না। উপরন্তু, বেদান্ত ও সাংখ্যের মতও যখন এই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতের মতের ন্যায়, তখন দুই দর্শনের অভিন্নত্ব দেখে ছাত্রদের ভ্রান্তদর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা গভীরতর হবে।

ডঃ ব্যালেণ্টাইন তার রিপোর্টে বলেছিলেন যে, সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি এবং সংস্কৃত দুই প্রকার বিষয়ই সুন্দররূপে পড়ান হয়; কিন্তু দুইরূপ বিষয় পাঠ করবার ফলে, ছাত্রদের মনে ধারণা হতে পারে যে, সত্য দুইপ্রকার। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি বললেন যে, তাঁর এমন অনেক পণ্ডিতদের সঙ্গে পরিচয় আছে যাঁরা ইংরেজিতে অভিজ্ঞ এবং 'লজিক' ও 'ন্যায়' দু'য়ের মতকেই অভ্রান্ত বলে মনে করেন, কিন্তু এই দুই শাস্ত্রের মূলতত্ত্বের ঐক্য বুঝতে না পেরে এক ভাষায় অন্য ভাষার চিন্তাধারা প্রকাশ করতে পারেন না।

বিদ্যাসাগর উত্তরে জানালেন যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ সংস্কৃত এবং ইংরেজি ভাষার সাহিত্য, বিজ্ঞান বুদ্ধিমানের মত প'ড়ে গ্রহণ করতে চেষ্টা

করেছেন। সুতরাং তাঁরা সত্য দ্বিবিধ ভাববেন, এ ভয় অমূলক। শিক্ষা অসম্পূর্ণ হলেই সত্য দুইরূপ বলে ধারণা হতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অনুসৃত শিক্ষাপ্রণালী এই ভয়ের সম্ভাবনা দূর ক'রে দিয়েছে। যদি লজিক ও দর্শন-বিজ্ঞানের যে কোন বিভাগে ইংরেজি ও সংস্কৃতে অধ্যয়ন ক'রে কোন কোন ছাত্র বলেন যে, লজিকের পাশ্চাত্য মত এবং হিন্দু মত দুই-ই সত্য, অথচ তাঁরা উভয়ের মধ্যে ঐক্য দেখতে পান না এবং এক ভাষার সত্য অন্য ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম হন, তাহলে বোঝা যাবে যে, হয় শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয়ে ভাল ক'রে ধারণা হয়নি, নতুবা ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবেই নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারছেন না। এই সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র স্বীকার করলেন যে, হিন্দু দর্শনের অসার অংশগুলি ইংরেজিতে সহজবোধ্য করে লিখবার উপায় নেই।

ডঃ ব্যালেণ্টাইন পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় শাস্ত্রে অভিজ্ঞ একদল পণ্ডিত প্রস্তুত করবার প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁরা দুই দেশের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে দ্বিভাষী ব্যাখ্যাকার হবেন, এবং উভয় শাস্ত্রের ঐক্য ও অনৈক্য বুঝিয়ে কুসংস্কার অপনোদন করবেন। এর উত্তরে বিদ্যাসাগর যা বললেন তা কেবল রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের একজন পণ্ডিতের নির্ভীক উত্তর নয়, তাঁর চরিত্রের বিশেষত্বও এর মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে। তিনি জানালেন যে, সর্বত্র হিন্দুশাস্ত্র এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঐক্য দেখানো সম্ভব নয় এবং তা দেখানো গেলেও কুসংস্কারাবদ্ধ ভারতীয় পণ্ডিতদের নিকট পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তথ্যসমূহ গ্রহণযোগ্য ক'রে তোলা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর একটি প্রাচীন কাহিনীর উল্লেখ করেছিলেন :

আরব সেনাপতি আমরু আলেকজান্দ্রিয়া জয় সমাপ্ত ক'রে, খালিফ ওমরের নিকট জানতে চেয়েছিলেন যে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থশালার কিরূপ ব্যবস্থা হবে। উত্তরে খালিফ বলেছিলেন, 'গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি কোরাণের অনুযায়ী হলে এক কোরাণই যথেষ্ট, অন্য পুস্তকের প্রয়োজন নেই। আর কোরাণের বিরুদ্ধে হলে তা তো অনিষ্টজনক, সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই গ্রন্থগুলি ধ্বংস করা প্রয়োজন।'

বাঙালি পণ্ডিতদের গোঁড়ামীর কথা বলতে গিয়ে বিদ্যাসাগর এই গল্পটি বললেন। কলিকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পণ্ডিতদের কার্যাবলী দেখেই

মায়ের সঙ্গে, সেই ভাষার সাহায্য পেলে তবেই তো জনসাধারণ শিক্ষালাভে সমর্থ হবে। সরকার কিন্তু এই নিত্য-স্বীকৃত সত্যটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না। বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও অর্থকরী ইংরেজি ভাষা শিখবার জন্যই উৎসুক ছিলেন। সুতরাং মাতৃভাষা, বাংলাভাষার প্রতি বাংলাদেশে আর অনাদরের সীমা রইল না।

জনসাধারণের শিক্ষার দুরবস্থা প্রথম উপলব্ধি করলেন গভর্ণর জেনারেল সার হেনরী হার্ডিঞ্জ। শিক্ষাসমিতির অপেক্ষা না রেখে তিনি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে ১০১টি পাঠশালা স্থাপন ক'রে সেগুলির ব্যয় বাবদ মাসিক ১৮৬৫৲ টাকা মঞ্জুর করলেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান আরম্ভ হল। 'বোর্ড অব রেভিনিউ'র কর্মচারীগণ এই সব পাঠশালার তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন এবং শিক্ষক নির্বাচনের ভার পড়ল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারী মার্শেলের উপর। তাঁকে সাহায্য করলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

লর্ড হার্ডিঞ্জের চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু, উপযুক্ত শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের অভাবে এই সুন্দর উদ্যমটি নষ্ট হতে বসল। শিক্ষাসমিতি সাধারণের শিক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না, সুতরাং লর্ড হার্ডিঞ্জের ভারতবর্ষ-ত্যাগের কিছুদিনেব মধ্যেই তাঁব নামাঙ্কিত হার্ডিঞ্জ-পাঠশালা বা বঙ্গ-বিদ্যালয়ের বেশীর ভাগই উঠে গেল। সরকার তাঁর পূর্বের উদাসীন নীতিতে ফিরে গেলেন; বললেন, এত বড় বিরাট দেশের বিপুল জনসংখ্যার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হতে হলে অসম্ভব পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন।

বাংলাদেশের শিক্ষাসমিতি যাকে অসম্ভব ব্যাপার বলে সরিয়ে রাখলেন, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেফটেনাণ্ট্ গভর্ণর টমাসন সেই প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ সফল হয়ে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। মেজর টমাসন কিন্তু নূতন কিছু করেন নি। ইতিপূর্বে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আমলে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে উইলিয়ম অ্যাডাম বলে একজন মিশনারী সুপরিকল্পিত প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে অ্যাডাম সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলে নিলে ভাল হয়। বাংলাদেশের শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

উইলিয়ম অ্যাডাম ছিলেন একজন খ্রীষ্টীয় মিশনারী। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল। রামমোহন রায় যখন খ্রীষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে ধর্মসম্বন্ধীয় প্রবল বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেই সময়ে আলোচনা-সম্পর্কে অ্যাডাম রামমোহনের সংস্পর্শে আসেন এবং ক্রমে তাঁর মতানুবর্তী হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে এই দু'জনের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। উইলিয়ম অ্যাডাম বাংলাদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে সরকারের নিকট তিনটি রিপোর্ট এবং প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য কতকগুলি সুচিন্তিত পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। অ্যাডামের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সরকার প্রশংসাসূচক মন্তব্য করলেন কিন্তু বহু অর্থব্যয়সাপেক্ষ বলে শিক্ষাসমিতি সেই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করলেন না। মেজর টমাসন কিন্তু অ্যাডামের নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন ক'রেই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিতে আশ্চর্যরূপ সফলতা দেখালেন।

এইবার বাংলাদেশের শিক্ষাসমিতি কিছু সচেতন হলেন। সমিতির সেক্রেটারী ডঃ ময়েট নিজে গিয়ে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত 'তহশীলদারী' স্কুলগুলি দেখে এলেন। শিক্ষাসমিতি স্বীকার করলেন যে, প্রাচীন পাঠশালার অনুকরণে অবশ্য কিছু কিছু পরিবর্তন ক'রে, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে নূতন পাঠশালা স্থাপন করা কর্তব্য। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাবটিই বিশেষভাবে অ্যাডামের পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছিল।

মেজর টমাসনের প্রবর্তিত দেশী ভাষার সাহায্যে অনুসৃত শিক্ষাপ্রণালীর রিপোর্ট তৎকালীন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসীকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। তিনি ১৮৫০ সালের ৪ঠা নভেম্বর বাংলাভাষায় শিক্ষা দেবার জন্য একটি সুষ্ঠু শিক্ষাপ্রণালী রচনা করতে বাংলা সরকারকে অনুরোধ জানালেন। এই সময়ে বাংলাদেশে লেফটেনাণ্ট্ গভর্ণরের পদ সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৫৪ সালের ১লা মে হতে ফ্রেডারিক জে হ্যালিডে ছোটলাটের পদে নিযুক্ত হলেন। নূতন পদে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে হ্যালিডে শিক্ষাসমিতির সদস্য ছিলেন। বড়লাটের চিঠি আসবার পূর্বেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহায্যে বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে একটি মন্তব্য রচনা করেছিলেন। লর্ড ডালহৌসীর পত্র পেয়ে হ্যালিডে সেই মন্তব্যের নির্ধারিত শিক্ষা-পরিকল্পনা গভর্ণর-জেনারেলের নিকট

পাঠিয়ে দিলেন। এই মন্তব্যটি অতি সুচিন্তিত এবং উৎকৃষ্ট ছিল। হ্যালিডে মন্তব্যের মধ্যে জানালেন, বাংলাদেশের পাঠশালাগুলির দুরবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে তিনি জেনেছেন যে, যোগ্য শিক্ষকের অভাবে তাদের অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটেছে। মেজর টমাসনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে পাঠশালাগুলির আদর্শ-স্বরূপ কয়েকটি মডেল স্কুল সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই বিদ্যালয়গুলির দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে গুরুমহাশয়গণ তাঁদের পাঠশালার সংস্কারে অবহিত হবেন।

নিজের মন্তব্যের সঙ্গে হ্যালিডে ঈশ্বরচন্দ্রের রচিত পরিকল্পনাটি পাঠিয়ে দিলেন এবং পণ্ডিতমহাশয়ের আগ্রহ ও যত্নে সংস্কৃত কলেজে যে বহু যোগ্য শিক্ষক গড়ে উঠেছে এ কথাও বড়লাটকে জানিয়ে দিলেন। জনসাধারণের শিক্ষার জন্য যে মাতৃভাষা একান্ত প্রয়োজন এ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র দৃঢ়মত পোষণ করতেন। সুতরাং নিজ পরিকল্পনার প্রথমেই তিনি বাংলা শিক্ষার সুব্যবস্থা সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন। বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনাটির মর্ম ছিল যে, জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতি করতে হলে বাংলা শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন। লিখতে ও পড়তে শিখে এবং সামান্য গণিতজ্ঞানের মধ্যে শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে চলবে না। ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শারীরবিজ্ঞান পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হবে।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি'ক ঈশ্বরচন্দ্র প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার পক্ষে উপযোগী বলে উল্লেখ করলেন :

১ শিশুশিক্ষা—পাঁচ ভাগ (বর্ণপরিচয়, বানান, পঠন, জ্ঞানলাভের জন্য একখানি পুস্তিকা, এবং চেম্বার্স এডুকেশনাল্ কোর্সের অন্তর্গত নীতিপাঠের মর্মানুবাদ)।

২. পশ্বাবলী (জীব-জন্তুর প্রাকৃতিক বিবরণ)।

৩. বাংলার ইতিহাস (মার্শম্যান প্রণীত পুস্তকের ভাবানুবাদ)।

৪. চারুপাঠ কিংবা ঐরূপ পাঠমালা।

৫. জীবনচরিত—'চেম্বার্স এক্সেম্প্ল্যারি বায়োগ্রাফি'র অন্তর্গত কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, সার উইলিয়ম হর্শেল, গ্রোশ্যস, লিনিয়স, ডুবাল, সার উইলিয়ম জোন্স এবং টমাস জেন্কিন্সের জীবনীর অনুবাদ।

পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর জানালেন যে, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা ও নীতিবিজ্ঞান বিষয়ক অনেক পুস্তক রচনা আরম্ভ হয়েছে। ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, শারীরতত্ব, ইতিহাস এবং জীবনচরিত রচনা করা প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস পেলেই কাজ চলে যাবে।

স্কুলগুলিতে সম্ভবতঃ তিনটি হতে পাঁচটি পর্যন্ত শ্রেণী রাখতে হবে। সুতরাং, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে দু'জন ক'রে শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। গুণ-অনুসারে শিক্ষকদের বেতন কমপক্ষে ৩০৲, ২৫৲, কিংবা ২০৲ টাকা ক'রে দিতে হবে এবং উল্লিখিত পুস্তকগুলি লেখা হয়ে গেলে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে একজন ক'রে হেডপণ্ডিত নিযুক্ত করা দরকার হবে। বেতন সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা করতে হবে, যেন শিক্ষকগণ নিজের নিজের স্থানে থেকেই নিয়মিতভাবে বেতন পেতে পারেন।

প্রথমে হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান এবং মেদিনীপুর জেলাকে কার্যক্ষেত্ররূপে নির্বাচন ক'রে, পঁচিশটি বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হবে। বিদ্যালয়গুলিকে প্রয়োজন অনুযায়ী চারটি জেলার মধ্যে ভাগ ক'রে শহর এবং গ্রামের এমন সমস্ত স্থানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে কোন ইংরেজি স্কুল নেই। কারণ ইংরেজি স্কুলের কাছে বাংলা স্কুল থাকলে সেগুলি অবহেলিত হয়ে থাকবে।

বাংলা শিক্ষাকে সফল করতে হলে, কেবল সুশৃঙ্খল তত্ত্বাবধান করলেই সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। কেবলমাত্র জ্ঞানলাভের জন্য সাধারণ ব্যক্তিগণ শিক্ষালাভ করতে চায় না। ছাত্রদের উৎসাহ দিতে হলে, লর্ড হার্ডিঞ্জ চাকুরী দেবার যে প্রস্তাব করেছিলেন তাকে কাজে পরিণত করতে হবে।

বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র লিখলেন—যাতায়াতের ব্যয়সহ ১৫০৲ টাকা বেতনে একজন তত্ত্বাবধায়ক মেদিনীপুর ও হুগলী এবং আর একজন নদীয়া ও বর্ধমানের জন্য নিযুক্ত করা প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়কদ্বয় স্কুল-পরিদর্শন, শ্রেণীর পরীক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কার করবেন।

কেবলমাত্র যাতায়াতের জন্য অর্থ বরাদ্দ ক'রে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হবে। তিনি বছরে একবার ক'রে স্কুলগুলি পরিদর্শন ক'রে কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দেবেন এবং সরকার এই স্কুলগুলির

পরিচালনার ভার গ্রহণ করবেন। প্রধান তত্ত্বাবধায়কের যাতায়াতের জন্ত বৎসরে ৩০০৲ টাকার বেশী ব্যয় হবে না।

পুস্তকরচনা এবং পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক-নির্বাচনের দায়িত্ব প্রধান তত্ত্বাবধায়কের উপর ন্যস্ত থাকবে। সংস্কৃত কলেজ সাধারণ শিক্ষার কেন্দ্র এবং বাংলা শিক্ষক প্রস্তুতের জন্ম নর্মাল স্কুল রূপে গণ্য হবে।

একশ টাকা মাসিক বেতনে প্রধান তত্ত্বাবধায়কের একজন সহকারী নিযুক্ত করা হবে। তিনি সমস্ত বিষয়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে সাহায্য করবেন এবং অধ্যক্ষের স্কুল পরিদর্শনে ব্যাপৃত থাকা-সময়ে অস্থায়ীভাবে সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষের কর্ম করবেন। অযোগ্য শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালনার ফলে বর্তমান পাঠশালাগুলির অত্যন্ত অবনতি ঘটেছে। তত্ত্বাবধায়কগণ এই সব পাঠশালা পরিদর্শন ক'রে যাতে এগুলি আধুনিক প্রগতিমুখী বিদ্যালয়রূপে গড়ে ওঠে, তার জন্ম চেষ্টা করবেন। দেশীয় ব্যক্তি কিংবা মিশনারীদের স্থাপিত পাঠশালাও পরিদর্শন ক'রে, তাদের উৎসাহ এবং সাহায্য করবার উপায় স্থির করবার ভার তত্ত্বাবধায়কদের উপর থাকবে।

জনগণকে স্ব-স্ব গ্রামে ও শহরে সরকারী স্কুলের আদর্শ-অনুযায়ী স্কুল-স্থাপনে উৎসাহ দান তত্ত্বাবধায়কদের কর্তব্যের অন্তর্গত হবে।

ঈশ্বরচন্দ্রের এই পরিকল্পনাটির সঙ্গে হ্যালিডে তাঁর মন্তব্যে লিখেছিলেন যে, যদিও ইয়োরোপীয় তত্ত্বাবধায়ক না থাকলে দেশীয়দের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করা যায় না, তথাপি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অতি উপযুক্ত ব্যক্তি এবং এই দায়িত্ববহনের সম্পূর্ণ যোগ্য। *

হ্যালিডে ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করতে সুপারিশ করলেন। কিন্তু শিক্ষাপরিষদের সভ্যদের হ্যালিডের সঙ্গে একমত হতে দেখা গেল না। স্যার জেমস কোলভিল, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি সভ্যগণ যদিও পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক-নির্বাচন, বিদ্যালয়-স্থাপনের স্থান নির্দেশ এবং শিক্ষাপ্রণালী-পরিকল্পনা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের উপদেশ অতি মূল্যবান বলে বোধ করতেন, তবু সংস্কৃত কলেজের গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজের উপর তাঁরা আবার মডেল স্কুলগুলির ভার বিদ্যাসাগরের উপর অর্পণ করতে সম্মত হলেন না। গভর্ণর-জেনারেলও

* Selections from the Records of the Bengal Govt. No XXII

এই বিষয়ে তাঁর মতামত জানিয়ে লিখলেন যে, সংস্কৃত কলেজের কাজের ক্ষতি না হলে ঈশ্বরচন্দ্র মাঝে মাঝে বাংলা স্কুলগুলিও পরিদর্শন করতে পারেন, কিন্তু ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ-অনুসারে তত্ত্বাবধানের কাজ শিক্ষা-অধিকর্তার অধীনস্থ পরিদর্শক দ্বারা পরিচালিত হবে। হ্যালিডে কিন্তু সংস্কৃত কলেজের কর্তব্য সম্পাদন ক'রেও বিদ্যাসাগর যাতে বাংলা শিক্ষাবিস্তারে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারেন সেজন্য বার বার শিক্ষা-অধিকর্তাকে অনুরোধ জানাতে লাগলেন। শিক্ষা-অধিকর্তা প্রস্তাব করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত স্থায়ী-পরিদর্শক প্র্যাট্ সাহেব কাজে যোগ না দেন, ততদিনের জন্য বিদ্যাসাগর অস্থায়ীভাবে পরিদর্শকের কাজ করুন।

হ্যালিডে বুঝলেন যে এই প্রস্তাবের কোন সার্থকতা নেই। দু দিন পর মিঃ প্র্যাট্ এলে বিদ্যাসাগর পরিদর্শকের পদ হতে অপসৃত হবেন। কিন্তু বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর একটি সুনির্দিষ্ট পবকল্পনা আছে, এবং সেগুলি সফল কবতে হলে, ঈশ্বরচন্দ্রকে স্থায়ীভাবে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখা দরকার। সুতরাং ছোট লাট প্রস্তাব করলেন, বাংলা শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট জেলাগুলিতে ঈশ্বরচন্দ্রকে সহকারী পরিদর্শক-রূপে নিযুক্ত করা হ'ক। এতে বিদ্যাসাগব তাঁর কাজ করতে পারবেন এবং মিঃ প্র্যাট্ বিদ্যাসাগরের কাজ পরিদর্শন করেও তাঁর এলাকার স্কুল-কলেজের কাজ দেখবার জন্য যথেষ্ট সময় পাবেন। হ্যালিডে দৃঢ়ভাবে জানালেন যে, বাংলাশিক্ষা-বিস্তারের প্রধান উদ্যোক্তাকে সেই কাজ হতে সরিয়ে রাখলে, তার চেয়ে অধিক দুঃখের বিষয় আর কিছু হতে পারে না।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল বাংলা-সরকার শিক্ষা-অধিকর্তাকে এই মর্মে চিঠি দিলেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, কলিকাতার নিকটবর্তী কয়েকটি জেলা কর্মক্ষেত্র-রূপে নির্বাচন করা হ'ক এবং মাসিক দু'শ টাকা বেতন ও যাতায়াতের ব্যয় পেয়ে তিনি সহকারী-পরিদর্শকের কাজ করবেন।

পত্র পেয়ে শিক্ষা-অধিকর্তা ঈশ্বরচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন। ঈশ্বরচন্দ্র ইতিপূর্বে, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১মে হতে ১১জুন পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের ছুটির সময়ে হুগলী জেলায় শিয়াখোলা, রাধানগর, কৃষ্ণনগর, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোনা, শ্রীপুর, কামারপুকুর, রামজীবনপুর, মায়াপুর, মলয়পুর, কেশবপুর, পাঁতিহাল

প্রভৃতি গ্রাম পরিদর্শন ক'রে এবং নদীয়া, বর্ধমান ও চব্বিশ পরগণার গ্রাম সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছিলেন যে, গ্রামবাসীগণ স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত এবং তারা স্কুলের জন্য বাড়ী নির্মাণ করে দিতেও ইচ্ছুক। সুতরাং স্কুলস্থাপন-বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের পরামর্শ খুবই প্রয়োজনীয় হল।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে সহকারী-পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হয়ে বিদ্যাসাগরের প্রথম কাজ হল তাঁর সহকারী নির্বাচন ক'রে নেওয়া। এই কাজের জন্য হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র গোস্বামী, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে নিযুক্ত করা হল এবং তাঁরা মডেল স্কুল স্থাপনের স্থান নির্বাচনের জন্য প্রেরিত হলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র জানতেন শিক্ষকদের যোগ্যতার উপরই সরকারের শিক্ষা-পরিকল্পনার সফলতা নির্ভর করছে। এই জন্য ১৮৫৫ সালের মে মাসে তিনি শিক্ষক-নির্বাচনের পরীক্ষা নেবার জন্য একটি বিজ্ঞাপন দিলেন। শিক্ষক-পদপ্রার্থী দুইশতাধিক ব্যক্তি পরীক্ষা দিলেন সত্য, কিন্তু তার ফলে বোঝা গেল যে, কিছু কিছু শিক্ষণ-শিক্ষা না দিলে খুব অল্প প্রার্থীই শিক্ষা দানে সমর্থ হবেন। যদিও সংস্কৃত কলেজ যোগ্য শিক্ষক প্রস্তুত করবার দায়িত্ব নিয়েছিল তথাপি শিক্ষক-শিক্ষণ-বিদ্যালয় স্থাপনের অত্যাবশ্যকতা দেখা গেল। সংস্কৃত কলেজের সংলগ্ন একটি বাংলা পাঠশালা ছিল। এ সময়ে সেটি বিশেষ কাজে লাগল। বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব-অনুসারে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হল এবং পাঠশালাটী সংস্কৃত কলেজের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এসে নর্মাল স্কুলের সাহায্যকারী মডেল স্কুল হয়ে উঠল।

নর্মাল স্কুলের প্রধান-শিক্ষক হলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক, বিশিষ্ট বাংলা লেখক, সুপণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত এবং দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতিকে নির্বাচন করা হল।

ইংরেজি শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষক পাওয়া আর দুরূহ ব্যাপার ছিল না। মিশনারীদের নিজস্ব নর্মাল স্কুলেও শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়া হত। বাংলা শিক্ষকই তখন পাওয়া যাচ্ছিল না। অতএব মাসিক পাঁচশ টাকা ব্যয় ক'রে ছয় মাস অন্তর ৬০ জন ক'রে যোগ্যশিক্ষক পাওয়া গেলে তার তুলনায় এই ব্যয় বিশেষ কিছুই নয়।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখে বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন করা হল। পৃথক বাড়ীর অভাবে সংস্কৃত কলেজ-ভবনে সকাল বেলা নর্মাল স্কুল হতে লাগল; প্রথমে ৭১টি ছাত্র নিয়ে স্কুল আরম্ভ হয়। এদের মধ্যে ৬০জনকে মাসিক ৫৲ টাকা ক'রে বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষার্থীর বয়সের নিম্নসীমা ১৭ এবং উর্ধ্বে ৪৫ বৎসর নির্দিষ্ট ছিল। দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত নর্মাল স্কুলের প্রথম শ্রেণী অক্ষয়কুমার দত্ত এবং দ্বিতীয় শ্রেণী পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি পরিচালনা করতেন। পাঠ্যতালিকার মধ্যে বোধোদয়, নীতিবোধ, শকুন্তলা, কাদম্বরী, চারুপাঠ এবং বাহ্যবস্তুর নাম ছিল। ভূগোল, পদার্থবিদ্যা ও প্রাণীবিজ্ঞান পড়ান হত। মাসিক পরীক্ষা গ্রহণেরও ব্যবস্থা ছিল।

বিদ্যাসাগরের নূতন পদের নাম হল দক্ষিণ বাংলার স্পেশাল ইন্‌স্পেক্টর। নিজের এলাকার প্রত্যেক জেলায় তিনি ৫টি ক'রে স্কুল স্থাপন করলেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা ক'রে ব্যয় হ'ত। স্কুলের বাড়ী অবশ্য পূর্ব-চুক্তিমত গ্রামবাসীদের ব্যয়েই নির্মিত হয়েছিল। প্রথম ছয়মাস অবৈতনিক ছাত্র হিসাবে পড়বার পর, ছাত্রদের কিছু কিছু বেতন দিতে হ'ত।

নানা কারণে বাংলাভাষা প্রসারের প্রথম চেষ্টা—স্যার হেনরী হার্ডিঞ্জের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবিদ্যালয়গুলি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মডেল স্কুল স্থাপন সার্থক হল।

এই সার্থকতার মূলে ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রম। মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর পরে তাঁর রিপোর্টে আমরা দেখতে পাই, মডেল স্কুলের ছাত্রদের বাংলাভাষার সম্বন্ধে সুন্দর জ্ঞান হয়েছে এবং তারা অন্য নানা বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছে।

দেশবাসীগণ মডেল স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন এবং মডেল স্কুলের ছাত্রসংখ্যা এই স্কুলগুলির জনপ্রিয়তার প্রধান প্রমাণ ছিল। বর্তমান সময়েও প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য সরকারী চেষ্টার অন্ত নেই, কিন্তু এই চেষ্টা সফল করবার জন্য বিদ্যাসাগরের ন্যায় অক্লান্ত কর্মী, দেশসেবক কোথায়!

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, কেবল মডেল স্কুল নয়, ঈশ্বরচন্দ্রের চেষ্টায় আরো বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। মেদিনীপুরের ঘাটালে তিনি স্কুলের গৃহনির্মাণে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজের গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র একটি স্কুল স্থাপন করেন এবং ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তাঁর তত্ত্বাবধানে পাইকপাড়ার রাজাদের দ্বারা কাঁদির ইংরেজী-সংস্কৃত স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে ঈশ্বরচন্দ্র কার্মাটারে সাঁওতাল-পল্লীর নিভৃত নিলয়ে বিশ্রাম নিতেন। সেখানেও সাঁওতালদের জন্য নিজে মাসিক কুড়ি টাকা ব্যয় ক'রে একটি পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন।

শিক্ষাবিস্তারকে ঈশ্বরচন্দ্র ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্রতচ্যুত হন নি। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক ইয়োরোপীয় মিশনারীদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করলে আমরা যেমন দেখি অজ্ঞাত গণ্ডগ্রামে, অনুন্নত শ্রেণী, আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে তাঁরা বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নি, ঠিক তেমনি ভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তে শিক্ষাবিস্তারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। মিশনারীদের প্রধানতম লক্ষ্য ছিল খ্রীষ্টধর্ম প্রচার আর বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা ছিল জনসাধারণকে শিক্ষিত করা।

প্রাচীন ভারতের ঋষি বলেছেন, মেয়েরা 'পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ'। এ দেশের মেয়েরা কিন্তু তা বলে কেবল গৃহের শোভাবর্ধন ক'রে কোনদিন একটি দামী আসবাবে পরিণত হন নি। তাঁরা বেদের সূক্ত রচনা করেছেন, বিচারসভায় পরাস্ত করেছেন ব্রহ্মর্ষিকে ; বলেছেন, তাঁরা সম্পদের নয়, অমৃতের অধিকার চান। আবার স্বামীর সহচারিণী হয়েছেন অরণ্যে, পর্বতে, রাজসূয়-যজ্ঞে। বাংলার রূপকথায় আছে, কন্যা পণ করত যে তাকে বিদ্যায় পরাস্ত করবে, তাকেই দেবে বরণমালা।

মুঘল আমলে জাতিনাশের ভয় দেখা দিল। বাহুবলে সুন্দরী নারী কেড়ে নিত মুসলমানদের মধ্যে দুষ্কৃতিকারীরা। ভয়ে, তাই, কঠিন অবরোধের অন্তরালে হিন্দু গোপনে রাখল তার নারী-রত্নকে। মেয়েরা জাতির উৎস। 'শ্রী' এবং 'হ্রী'র মূর্ত প্রতিমা নারী। অতএব তাকে লুকিয়ে রাখতেই হবে বিধর্মী

অত্যাচারীর কামনা-পিচ্ছিল লোলুপ দৃষ্টি হতে। অবগুণ্ঠনের শাসন নামল নারীর মুখের উপর, বন্ধ হল অবাধ বিচরণ। তার পরের ইতিহাস তো দীর্ঘ দিনের পর-শাসন এবং অত্যাচারের কাহিনী। ক্লিন্ন হয়ে গেল সমস্ত জীবন। সর্ব-সম্ভাবনাচ্যুত হিন্দু নানা নিষেধের বাঁধনে নিজেদের নির্মম হাতে বাঁধল। সুন্দর, উদার, বিশ্বধর্মে পরিণত হবার যোগ্য বৈদিক ধর্মের অবনতি ঘটল। তা পরিণত হল কুসংস্কার আর যুক্তিহীন আচার-অনুষ্ঠানে। শিক্ষার স্বচ্ছ-সুন্দর ধারাটিও গেল বন্ধ হয়ে। সবচেয়ে অবনতি ঘটল মেয়েদের অবস্থার। গৃহ-কোণে বন্দী দেশের ভবিষ্যৎ জননীদের শিক্ষা দেবার কথা ভুলেই গেল দেশের মানুষ।

অনেকদিন ধরেই মেয়েদের কথা ভুলে ছিল বাঙালি; প্রথম তরঙ্গ তুললেন রামমোহন। মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত নারী পুড়ে ম'রে 'সতী হ'ত। এই নিষ্ঠুর প্রথা মহাগর্বের বিষয় বলে মনে করত হিন্দু জাতি। পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণ আর শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে শ্মশান উৎসবমণ্ডপে পরিণত হ'ত। চিতাশয্যাকে করা হ'ত পুষ্পশয্যা। চতুর্দিকে ধন্য ধন্য রব। রক্তাম্বরা নারী ঝাঁপ দিত জ্বলন্ত আগুনে। সে আর তখন সদ্য-বিধবা, অকল্যাণী নয়, অরুন্ধতীর সমগোত্রীয়া মহাসতী সে। শ্মশানের উৎসব-বাদ্য, ঘৃত আর চন্দনকাষ্ঠভুক আগুন কিন্তু রামমোহনের কানকে বধির, চক্ষুকে অন্ধ ক'রে দিতে পারেনি। তিনি শুনেছিলেন অসহায় নারীকণ্ঠের আর্ত-চীৎকার, প্রত্যক্ষ করেছিলেন অগ্নিদাহ হতে পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা।

রামমোহন সতীদাহ বন্ধ করবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করলেন। তাঁর নিন্দাবাদে দেশ ভরে গেল সত্য, কিন্তু তিনি সতীদাহের বিপক্ষে যে শাস্ত্রানুমোদিত তর্কজাল বিস্তার করলেন তাও বাঙালি সাগ্রহে পড়তে লাগল। সতীদাহ-প্রসঙ্গে রামমোহন প্রাচীন শাস্ত্রের তথ্য পরিবেশন করতে লাগলেন, তার সঙ্গে প্রাচীন যুগের মেয়েদের সামাজিক অবস্থা, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথাও পরিবেশিত হল। দেশের লোক জানতে পারল—সেই সত্যযুগেও মেয়েরা লেখাপড়া শিখত, তর্ক করত, তর্কযুদ্ধে হারিয়ে দিত মহা-মহাঋষিদের।

সে সময়ে দেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের খ্রীষ্ট-ধর্মপ্রচারকল্পে শিক্ষাবিস্তার-চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। কোম্পানী স্ত্রীশিক্ষার কোন ব্যবস্থা না করলেও মিশনারীগণ

স্ত্রীশিক্ষার জন্য চেষ্টা করছিলেন এবং তাতে যোগ দিয়েছিলেন রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কয়েকজন গণ্যমান্য বাঙালি।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কলিকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। ডেভিড হেয়ারের ন্যায় এই বিদেশী ভারতবন্ধু সর্বান্তঃকরণে এ দেশের মঙ্গল চেয়েছেন। শিক্ষাপরিষদের সভাপতি বেথুন ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধু এবং তিনি এই তেজস্বী বাঙালি ব্রাহ্মণের কর্মদক্ষতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, জানতেন তাঁর শিক্ষাব্রতে সমর্পিত প্রাণের সংবাদ। অবৈতনিক সম্পাদকরূপে স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য বেথুন বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করলেন এবং বিদ্যাসাগরও সাগ্রহে বেথুনের কাজে যোগ দিলেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের গাড়ীর দুই পাশে 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ মনুসংহিতার এই শ্লোকাংশ উদ্ধৃত ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র দেশবাসীকে মনে করিয়ে দিলেন যে, কন্যাকেও অতিযত্নে শিক্ষাদান করা কর্তব্য। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট বেথুন পরলোক গমন করলেন। তাঁর উইলে দেখা গেল বাংলার মেয়েদের শিক্ষার জন্য তিনি যথাসর্বস্ব দিয়ে গিয়েছেন।

বেথুনের পরলোকগমনে কিন্তু তাঁর আরব্ধ কাজের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হল না। গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসী বিদ্যালয়-পরিচালনার সমস্ত ব্যয় বহন করতে লাগলেন। তিনি ভারতবর্ষ হতে চলে যাওয়ার পর, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হতে বেথুন স্কুল সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হল। এই বৎসরের ১২ই আগস্ট একটি পত্রে স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক সিসিল বিডন বেথুন স্কুলের উদ্দেশ্য উল্লেখ ক'রে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ যাতে স্কুলে কন্যাদের পাঠাতে উৎসাহী হন, সেই জন্য বাংলা সরকারকে একটি প্রস্তাব দিলেন। এই সময়েই স্কুলের পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠনের কথা হল এবং তার সভ্যরূপে রমাপ্রসাদ রায়, কালীপ্রসাদ ঘোষ, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী এবং ধনী বাঙালিদের নাম উল্লেখ করা হয়। বিডন ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, তিনি বাংলার ছোটলাটকে বিদ্যাসাগরের কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে জানিয়ে তাঁকে স্কুলের সম্পাদক নিযুক্ত করতে অনুরোধ জানালেন। সরকারী অনুমোদনক্রমে সিসিল বিডন বেথুন স্কুলের সভাপতি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদক নির্বাচিত হলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র জানতেন দেশে শিক্ষাবিস্তার করতে হলে বালকদের শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হবে না, বালিকাদেরও শিক্ষিতা করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমেই জাতীয় কল্যাণ সাধিত হয়। মাত্র বেথুন স্কুলটি তাঁর কর্মক্ষমতা ও আগ্রহের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না, তিনি অধিকতর বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রসারিত ক'রে দিলেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শিক্ষা-দায়িত্ব স্বীকার করলেও ভারতীয়দের স্ত্রী-শিক্ষাবিরোধী বলে ধারণা ক'রে, এত দিন পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করে নি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে শাসকের মনে নিরাপত্তাবোধের সঞ্চার হওয়ায়, তাদের মতামত বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের নিয়ন্ত্রণ-সভার সভাপতি চার্লস উডের নামে একটি শিক্ষাপত্র রচিত হয়ে ভারতবর্ষে এল। এই পত্রটি সরকারী শিক্ষানীতিতে এমন পরিবর্তন ঘটিয়েছিল যে, একে শিক্ষাক্ষেত্রের মহাসনন্দ বলে অভিহিত করা হয়। শিক্ষা-পত্রে কর্তৃপক্ষ ভারতীয় বালিকাদের জন্য প্রচুর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের বিদ্যোৎসাহী লেফটেনাণ্ট্ গভর্ণর জে. হ্যালিডে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করলেন। হিন্দুসমাজ তখন পর্যন্ত সাধারণ বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যাদের পাঠাবার মত প্রগতিশীল হয়ে ওঠে নি। বেশীর ভাগ হিন্দুদের ধারণা ছিল যে, স্কুলে মেয়েদের পাঠালে পারিবারিক মর্যাদার হানি ঘটবে। অদম্য ঈশ্বরচন্দ্র সমস্ত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে কাজে অগ্রসর হলেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে তিনি বর্ধমানের জৌগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে সে সংবাদ জানালেন এবং ডিরেক্টর নব-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টিকে মাসিক ৩২৲ টাকা সাহায্য অনুমোদন ক'রে সরকারকে পত্র দিলেন।

জৌগ্রামের স্কুল ব্যতীত আরো কয়েকটি স্কুলের জন্য সাহায্যের আবেদন এসেছিল, ছোটলাট সব প্রস্তাবই মঞ্জুর করলেন। সুতরাং স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারে বাংলা-সরকারের অনুকূল মনোভাব বুঝতে পেরে ঈশ্বরচন্দ্র নিজের এলাকায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে লাগলেন। গ্রামবাসীগণও সানন্দে স্কুলের

গৃহনির্মাণ ক'রে দিতে স্বীকৃত হল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর হতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে ফেললেন। বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসিক ৮৪৫৲ টাকা ব্যয় হ'ত এবং ছাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০।

স্ত্রী শিক্ষাবিস্তারের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি থাকলেও বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহের জন্য ছোটলাটকে ভারতসরকারের অনুমোদনের অপেক্ষা করতে হ'ত। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল বাংলার ছোটলাট ভারতসরকারকে জানালেন যে, সরকারী সাহায্যদানের নিয়মগুলি বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষে কিছু শিথিল না করলে সাহায্য দেওয়া চলবে না ভারতসরকার কিন্তু নিয়ম শিথিল করতে অসম্মত হলেন। বিদ্যাসাগরের সব পরিশ্রম ব্যর্থ হতে বসল। কেবল স্কুলগুলি তুলে দেওয়াই নয়, শিক্ষকদের বেতন (৩৪৩৯৶৫) দেবার দায়িত্ব পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের উপর পড়ল।

ছোটলাট এবং ডিরেক্টর অনেক লেখালেখি ক'রে ঈশ্বরচন্দ্রকে স্কুলের ব্যয় বাবদ টাকাগুলি আদায় ক'রে দিলেন; কিন্তু ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ কোনমতেই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অর্থসাহায্য করতে স্বীকৃত হলেন না।

তাঁদের এই প্রকার দৃঢ়তা অবলম্বনের প্রধান কারণ ছিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ। ভারতের এই প্রথম জনজাগরণে ব্রিটিশ সরকার এত ভীত হয়েছিলেন যে, যে কোন তুচ্ছ বিষয়কেই তাঁরা বিদ্রোহের কারণ বলে ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন। ভারতশাসনের প্রথম দিন হতেই ইংরেজ প্রজার অসন্তুষ্টি পরিহার করতে চাইত। ইতিপূর্বে বিধবাবিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল এবং তাতে বহু হিন্দু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষায় ভারতীয়দের সম্মতি নেই ভেবে, সরকার এ বিষয়ে ঔদাসীনতা অবলম্বন ক'রে থাকলে, তাও অসম্ভব ব্যাপার নয়।

যা হোক, আর্থিক অসুবিধা, সরকারী অসহযোগ, কিছুই পুরুষসিংহকে কর্তব্যপরাঙ্মুখ ক'রে তুলতে পারল না। বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে পরিচালনা করবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র একটি 'নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান'-ভাণ্ডার গঠন করলেন। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি বদান্য ধনীদের অকুণ্ঠ দানে

...র সম্বন্ধ হতে লাগল, বিদ্যাসাগরের বালিকা বিদ্যালয় বন্ধ হল না। মাঝে মাঝে নূতন বিদ্যালয়ও খোলা হতে লাগল। ছোটলাট বিডন নিজে মাসিক ৫৫৲ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ইতিপূর্বে আমরা বেথুন স্কুলের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছি; এই বিদ্যালয়টি ক্রমশ উন্নতির দিকে চলছিল। স্কুলের সেক্রেটারী ঈশ্বরচন্দ্র স্কুলটির উন্নতির প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি রাখতেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি বাংলা-সরকারকে স্কুল সম্পর্কে যে রিপোর্ট পাঠান, তাতে আমরা দেখতে পাই অঙ্ক, জীবনী, ইতিহাস, ভূগোল, সূচীকার্য প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয় ছিল এবং বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হ'ত। প্রধানা শিক্ষিকা, দুইজন সহশিক্ষিকা এবং দুইজন পণ্ডিতের সাহায্যে বালিকাদের শিক্ষাদান করতেন।

স্কুলের ক্রমবর্ধমান ছাত্রীসংখ্যার কথাও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল।

এই সময়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রধান অন্তরায় ছিল উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাব। মিশনারীদের স্থাপিত বিদ্যালয়ে হিন্দু বালিকাদের না পাঠাবার প্রধান কারণ, সেখানে সাধারণত অনুন্নত বৈষ্ণব প্রভৃতি শ্রেণীর শিক্ষিকা নিযুক্ত হ'ত। কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দুই তাদের তত্ত্বাবধানে নিজ কন্যাদের শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। শিক্ষিকার অভাব দূর করতে অগ্রণী হলেন এক ইয়োরোপীয় ভদ্রমহিলা, কুমারী মেরী কার্পেন্টার। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে ভারতীয় নারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে মেরী কার্পেন্টার কলিকাতায় আসেন। শিক্ষাবিদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত ছিলেন, এখন প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মিঃ অ্যাটকিন্‌সন তখন শিক্ষা-অধিকর্তা। তিনি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর একটি বেসরকারী চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে মেরী কার্পেন্টারের অভিপ্রায় জানালেন। সম-মনোবৃত্তিসম্পন্ন দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হতে বিলম্ব হল না।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একত্র হয়ে মেরী কার্পেন্টার কলিকাতার নিকটস্থ বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করতে লাগলেন। উৎসাহ এবং আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে নানা পরিকল্পনা গঠিত হতে লাগল।

মেরী কার্পেন্টারও অনুভব করলেন যে, শিক্ষাবিস্তারের প্রধান অন্তরায়

শিক্ষিকার অভাব। বেথুন স্কুলে তিনি মেয়েদের জন্য একটি নর্মাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করলেন। ব্রাহ্মসমাজে তখন কেশবচন্দ্রের যুগ। প্রত্যেকটি প্রগতি-চিন্তায় তাঁদের সক্রিয় অংশ ছিল। কুমারী কার্পেণ্টারের প্রস্তাব সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ একটি সভা আহ্বান কবলেন। বাংলাদেশে তখন এমন কোন সংস্কৃতিমূলক আন্দোলন ঘটে নি যাতে ঈশ্বরচন্দ্র উপস্থিত নেই। যথাসময়ে তিনি সভায় আহূত হলেন এবং শিক্ষিকা-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটিতে তাঁকে সভ্য নির্বাচন করা হল। ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু নানা কারণে কমিটি হতে নিজ নাম প্রত্যাহার ক'রে নিলেন এবং বাংলার ছোটলাট উইলিয়াম গ্রে বিদ্যাসাগরের মতামত জিজ্ঞাসা করলে তিনি শিক্ষিকা-শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন করা সম্বন্ধে সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কথা স্মরণ ক'রে, কার্পেণ্টারের প্রস্তাব সমর্থন করতে পারলেন না। এ সম্বন্ধে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর ঈশ্বরচন্দ্র ছোটলাটকে যা লিখলেন তার মর্ম আলোচনা করলে বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টির সূক্ষ্মতা অনুভূত হয়। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পত্রখানি রচিত হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র জানিয়েছিলেন যে, হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ এবং অবরোধপ্রথা বর্তমান থাকবার ফলে, অতি অল্পবয়স্কা বালিকাদের পক্ষেও গৃহাঙ্গন ব্যতীত পৃথিবীর যে কোন অংশ নিষিদ্ধ স্থান। বয়স্কা মেয়েদের সম্বন্ধে তো কোন কথাই উঠতে পারে না। বাকী থাকে অনাথা বিধবা। একেই স্বামীহীনাদের পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন সম্মান নেই, তারপর বাইরে এসে বৃত্তিমূলক কাজে যোগ দিলে সামাজিক নির্যাতনও তাদের লাভ হবে। সুতরাং মেয়েদের জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপন-বিষয়ে তিনি সরকারকে উদ্যোগী হতে বলতে পারলেন না।

বেথুন স্কুলটিতে অর্থব্যয়ের অনুপাতে আশানুরূপ ফললাভ না হলেও বিদ্যালয়টি বন্ধ করবার সপক্ষে কোন যুক্তি দেখালেন না, বরং মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত এবং শহরের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত বেথুন বালিকা বিদ্যালয় হিন্দু সমাজের উপর একটি নৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছে বলে ঈশ্বরচন্দ্র মন্তব্য প্রকাশ করলেন। অবশ্য সেই সঙ্গে জানালেন যে, কিছুটা ব্যয়সঙ্কোচ ক'রেও বেথুন স্কুলের যথেষ্ট উন্নতি করবার উপায় আছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতামত অপেক্ষা মেরী কার্পেণ্টারের পরিকল্পনা বাংলা-সরকারের নিকট অনেক বেশী পরিমাণে গ্রহণীয়। সুতরাং বেথুন স্কুলকে ছোট ক'রে, তার সঙ্গে একটি নর্মাল স্কুল যুক্ত ক'রে দেওয়া হল এবং বেথুন স্কুল ও নর্মাল স্কুলের জন্য মাসিক তিনশ টাকা বেতনে তিন বছরের জন্য মিসেস্ ব্রিটুশে নামে একজন ইয়োরোপীয় ভদ্রমহিলা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হলেন।

নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল, কিন্তু তার কাজ আর আরম্ভ হয় না। হিন্দুদের অবরোধপ্রথা সম্বন্ধে ইন্স্পেক্টর উড্রোর এমন আতঙ্ক ছিল যে, তিনি ভাবলেন বিদ্যালয়ের পরিবহনের পুরুষ গাড়োয়ান ও সহিস হয়ত হিন্দুদের বিরক্তি উৎপাদন করবে। উড্রোর এই আতঙ্ক নিয়ে তখনকার কোন কোন পত্র-পত্রিকা কৌতুকও করেছে।

১২৭৩ সালের আশ্বিন সংখ্যার 'বামাবোধিনী' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন :

"বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ের বাটীর এক পার্শ্বে ঐ বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিবার জন্য আবশ্যক বিষয়গুলিও প্রস্তুত হইয়াছে, এবং শুনাও যাইতেছে, ঐ ভাবী স্ত্রী-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকার জন্য প্রতি মাসে টাকাও গৃহীত হইতেছে। এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, তবে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে না কেন? উত্তরটি কৌতুককর—'স্ত্রীলোক শকটচালক (গাড়োয়ান) এবং স্ত্রীলোক সয়িস' যতদিন পাওয়া না যাইবে ততদিন বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইবে না, এইটী সাহেবের উত্তর। এখন দেখা যাউক কি হয়।

"এদেশে স্ত্রীলোকেরাও এখনও এতদূর বিদ্যাবতী হয় নাই, এবং এত স্বাধীনতাও পায় নাই যে শকট চালনা কার্য্য করিতে সক্ষমা হইবে। সাহেব এবার বিলাতে গিয়াছেন, এই সুযোগে যদি তিনি স্বদেশ হইতে দুই-তিনটি স্ত্রী-গাড়োয়ান এবং স্ত্রী-সহিস আনেন তাহা হইলে স্ত্রী-বিদ্যালয়ের সংস্থাপন আশা হইতে পারে। বিলাতীয় স্ত্রীলোক ভিন্ন এ মহৎ কার্য্যে ব্রতী হওয়া কাহারও সাধ্য নহে। আমরা সাহেবকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি তিনি যেন এদেশে প্রত্যাবর্তন সময়ে ২।৩টি বিবি-সয়িস ও বিবি-গাড়োয়ান লইয়া আসেন।"

বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্রের অভিমত সত্য বলে প্রমাণিত হল। শিক্ষিকা-শিক্ষণ কেন্দ্রের এমন অবস্থা দেখা গেল যে, তিন বছরের মধ্যেই ছোটলাট সার্ জর্জ ক্যাম্পবেল ঐ নর্মাল স্কুল বন্ধ ক'রে দিতে আদেশ করলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারীর পর 'ফিমেল নর্মাল স্কুল' বন্ধ হয়ে গেল। বেথুন স্কুল সম্বন্ধে কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নি। এই বালিকা বিদ্যালয়টি দিনে দিনে জনপ্রিয়তা অর্জন করছিল এবং বেথুন স্কুলের দৃষ্টান্তে আরো কিছু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হতে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনে এক মহা পরিবর্তন ঘটবার সূচনা দেখা গেল। স্বাধীনতা হারিয়ে কে কাজ করতে চায়? আর যে কেউ ইচ্ছুক হলেও পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর তাঁর ব্যক্তিত্বকে খর্ব ক'রে সরকারের সেবা করবার মত মানুষ ছিলেন না।

অন্যদিকে তাঁর মত স্বাধীন-প্রকৃতির ব্যক্তিকে সরকারের বিশেষ পছন্দ না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ডঃ ময়েট, জে. হ্যালিডে প্রভৃতি বিশিষ্ট রাজকর্মচারীগণ তাঁকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন এবং ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে বহু রাজকর্মচারীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল।

সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনে ডঃ ব্যালেণ্টাইনকে আহ্বান করা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কারো শিক্ষানীতির মিল হচ্ছিল না। তারপর মডেল স্কুল, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি ব্যাপারেও সরকারী প্রতিবন্ধকতা ক্রমেই ঈশ্বরচন্দ্রকে উত্ত্যক্ত ক'রে তুলেছিল। শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা ইয়ং গর্ডনের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রকাশ্য মতবিরোধ না হলেও মনোমালিন্য আরম্ভ হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত নিয়োগ নিয়েই এই মতদ্বৈধের সূত্রপাত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ ইয়ং গর্ডন নানাভাবে ঈশ্বরচন্দ্রের কাজে বাধা দিতেন, তথাপি বিদ্যাসাগরের কর্মদক্ষতায় কর্তৃপক্ষ বার বার এমন সন্তোষজনক মন্তব্য করছিলেন যে, ইন্‌স্পেক্টর প্র্যাট্ ছুটী নিয়ে ইয়োরোপে চলে গেলে অন্যান্য সকলের মত ঈশ্বরচন্দ্রেরও ধারণা হয়েছিল যে, এবার তিনি দক্ষিণ বাংলার ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হবেন। এই সম্বন্ধে ছোটলাট হ্যালিডের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবে কিছু আলোচনাও হয়েছিল।

প্র্যাটের শূন্যপদে কিন্তু ইয়োরোপীয়ান লজ্ সাহেবই নিযুক্ত হলেন। পদোন্নতির ন্যায্য দাবী উপেক্ষিত হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্রের ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। তিনি বুঝলেন জীবনপণ ক'রে কাজ করলেও সরকারী কাজে তিনি বর্তমান অপেক্ষা উচ্চতর পদের অধিকারী হতে পারবেন না। স্বাস্থ্যহীনতা, আশাভঙ্গ সর্বোপরি শিক্ষা-অধিকর্তার সঙ্গে মতবিরোধ ঈশ্বরচন্দ্রকে সরকারী কর্মত্যাগে প্রবৃত্তি দিল। জে. হ্যালিডে তখনো বাংলাদেশের ছোটলাট। তিনি শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে বিদ্যাসাগরকে অপরিহার্য বলে মনে করতেন। তাঁর অনুরোধে কিছুদিন কাজ করলেও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষা-অধিকর্তার নিকট পদত্যাগপত্র প্রেরণ করলেন।

সামান্য দুঃখ প্রকাশ ক'রে বাংলা-সরকার বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন। দীর্ঘ নয় বৎসর কাল সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের নূতন অধ্যক্ষ ই বি. কাওয়েলকে কলেজের সমস্ত কাজ বুঝিয়ে দিলেন। দীর্ঘদিন তিনি যে পরিশ্রম করেছিলেন, তার জন্য শুষ্ক ধন্যবাদ ব্যতীত ঈশ্বরচন্দ্রের আর কিছুই লাভ হল না।

॥ পাঁচ ॥

সরকারী কর্ম ত্যাগ করলেও বেসরকারী পরামর্শদাতারূপে বিদ্যাসাগর সর্বদা সরকারকে সাহায্য করেছেন। তাঁর অবসর-গ্রহণের অব্যবহিত পরে কাওয়েল সাহেব সংস্কৃত কলেজের পাঠব্যবস্থার কিছু সংস্কার করতে ইচ্ছুক হলে ছোটলাট ঈশ্বরচন্দ্রের মত জানতে চাইলেন। কাওয়েল কলেজে স্মৃতি ও বেদান্তের পাঠ বন্ধ ক'রে দিতে বলাতে বিদ্যাসাগর তার উত্তরে যুক্তি প্রদর্শন ক'রে বলেছিলেন যে, স্মৃতিশাস্ত্র পণ্ডিতদের পাঠ করা প্রয়োজন; কারণ এই শাস্ত্রের সাহায্যে উত্তরাধিকার, পোষ্যপুত্র নেওয়া প্রভৃতি হিন্দু-আইন শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বেদান্ত প্রাচ্যদর্শন-শাস্ত্রের অন্যতম। সুতরাং এ সকল বিষয়ের অধ্যাপনা বন্ধ করা উচিত নয়।

এসময়ে জনশিক্ষার জন্য ভারতসরকার ধীরে ধীরে চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন। অবশ্য তাদের এ চেষ্টা ইংলণ্ডের পরিবর্তিত শিক্ষানীতির ফল। অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে জনশিক্ষা প্রসারের এবং বাংলাশিক্ষা-বিস্তারের উপায় সম্বন্ধে ভারত-সরকার বাংলার ছোটলাট গ্র্যান্টের মত জিজ্ঞাসা করায়, নিজের মত দেবার পূর্বে গ্র্যান্ট্ এ বিষয়ে যাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর মতামত ব্যক্ত ক'রে ছোটলাটকে একখানি চিঠি লেখেন। এই চিঠিখানির মর্ম অবগত হলে দেখা যায় যে, শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ ক'রে তিনি যে কঠিন অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে পত্রটি রচিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র জানিয়েছিলেন—সরকারী মহলের ধারণা যে, উচ্চশিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন জনশিক্ষা-বিস্তারে প্রবৃত্ত হওয়াই সরকারী কর্তব্য। একথা সত্য যে, প্রত্যেক দেশের উন্নতির জন্যই জনশিক্ষা অপরিহার্য। কিন্তু সরকার যে স্কুল-প্রতি মাসিক মাত্র ৫।৭ টাকা ব্যয় ক'রে জনশিক্ষার বিপুল আয়োজন করতে চাইছেন, তাতে সফল হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। প্রথম কথা, শিক্ষক পাওয়া যাবে না। এত অল্প বেতনে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিই শিক্ষকতা

করতে চাইবেন না। তারপর শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে তারা অর্থব্যয় ক'রে সন্তানদের শিক্ষা দেবে। সামান্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীর বালকগণ অর্থকরী কাজে নিযুক্ত হয়। সামান্য লেখা-পড়া শিখে যে তাদের অবস্থার কিছু তারতম্য হবে না একথা শ্রমিকশ্রেণী ভালই বোঝে। তবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হলে, স্কুলশিক্ষায় সরকার কিছুটা সফল হতে পারেন।

এই চিঠিতেই বিদ্যাসাগর অভিসেচন-পদ্ধতি সমর্থন ক'রে বলেছিলেন যে, বহু শিশুকে সামান্য শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা অপেক্ষা একটি শিশুকে প্রকৃত শিক্ষা দিলে সরকারী শিক্ষাবিস্তার-নীতি সফল হতে পারে। সুতরাং উচ্চশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার-নীতি সীমাবদ্ধ রাখাই সরকারী নীতি হওয়া কর্তব্য।

ঈশ্বরচন্দ্র যদিও বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন তবু এসব শুনে প্রথমেই মনে হয় যে, দেশের চিরবঞ্চিত অনুন্নত, দরিদ্রের জন্য বুঝি এই মহামানবের হৃদয়ের অমৃতক্ষরণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। না হলে শিক্ষা যাদের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন, তাদের শিক্ষার প্রশ্নে তিনি এমন উদাসীন ভাব অবলম্বন করলেন কেন? একটু চিন্তা করলেই কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের অভিপ্রায় বোঝা যায়। কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে তিনি দেখেছেন যে, দেশের বিপুল জনসংখ্যার পক্ষে শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যয় করা প্রয়োজন, সরকার কখনও তাতে সম্মত হবেন না এবং কেবলমাত্র এই কারণেই ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থাও ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক উন্নত ছিল না।

ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েও ঈশ্বরচন্দ্র সরকারী কাজে সাহায্য করেছিলেন। আট হতে চোদ্দ বৎসর বয়সের নাবালক জমিদারদের প্রত্যক্ষভাবে সরকারী তত্ত্বাবধানে রেখে শিক্ষা দেবার জন্য ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন স্থাপিত হয়। তিনশ টাকা মাসিক বেতনে ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন। চারজন পরিদর্শকের বছরে তিন মাস ক'রে পরিদর্শনের ব্যবস্থা ছিল এবং ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন এই পরিদর্শকদের অন্যতম।

ঈশ্বরচন্দ্র দৈহিক শাস্তিদানের একান্ত বিরোধী ছিলেন। ছাত্রদের প্রতি

সামান্য দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা তিনি সহ্য করতে পারতেন না এবং তাঁর রিপোর্টে স্পষ্টই লিখেছিলেন যে এরূপ শাস্তি বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত। এই শাস্তির ফলে শিশুদের সংশোধন হয় না ববং তাদের একেবারে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ইনস্টিটিউশনের শিক্ষা যে অতি নিম্নস্তরের এ সম্বন্ধেও তিনি দৃঢ়মত প্রকাশ করেছিলেন।

সবকারী পুস্তকনির্বাচন-কমিটিতে কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র থাকেন নি। এ সম্বন্ধে সরকাবী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবা তাঁরই উপযুক্ত কাজ হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে এসময়ে বহু পাঠ্যগ্রন্থ রচনা কবেছিলেন। পুস্তক নির্বাচনকালে তিনি যে নিজের পুস্তক সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত প্রকাশে কুণ্ঠিত হবেন এই কথা তিনি শিক্ষা-অধিকর্তাকে জানিয়েছিলেন।

সবকারী কর্ম হতে অবসব গ্রহণের ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের মাসিক ৫৫০৲ টাকা আয় কমে গিয়েছিল, কিন্তু সেজন্য তাঁর অর্থাভাবে পতিত হবার কোন কারণ ঘটে নি। তাঁর সংস্কৃত প্রেস এই বিপদ হতে তাঁকে রক্ষা করেছিল। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত প্রেস সম্বন্ধে দু'একটি কথা বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার একত্র হয়ে এই প্রেস স্থাপন করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি নিজে জানিয়েছেন:

"যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত ছিলাম, তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে সংস্কৃত-যন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায় তিনি ও আমি সমাংশভাগী ছিলাম।" *

ঈশ্বরচন্দ্র এবং মদনমোহন দু'জনেই সামান্য বেতনে চাকুরী করতেন, অথচ তাঁদের পোষ্যসংখ্যা ছিল বিপুল। প্রেস করতে অর্থের প্রয়োজন হয়, এ অর্থ তাঁরা কোথা হতে পেলেন এই প্রশ্নটির উত্তর পাই আমবা বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের নিকট হতে। তিনি বিদ্যাসাগর-জীবনচরিতে লিখেছেন:

"এই সময়ে অগ্রজ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া, সংস্কৃত-যন্ত্র নাম দিয়া একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ৬০০৲ টাকায় একটি

* নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস—ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

প্রেস ক্রয় করিতে হইবে; টাকা না থাকাতে তাঁহার পরম বন্ধু বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট ঐ টাকা ঋণ করিয়া তর্কালঙ্কারের হস্তে দিলে, তর্কালঙ্কার প্রেস ক্রয় করেন। ঐ টাকা ত্বরায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে প্রত্যর্পণ করিবার কথা ছিল। এক দিবস কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজ মার্শেল সাহেবকে বলেন, 'আমরা একটি ছাপাখানা করিয়াছি, যদি কিছু ছাপাইবার আবশ্যক হয়, বলিবেন।' ইহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন, 'বিদ্যার্থী সিবিলিয়ানগণকে যে ভারতচন্দ্রকৃত অন্নদামঙ্গল পড়াইতে হয়, তাহা অত্যন্ত জঘন্য কাগজে ও জঘন্য অক্ষরে মুদ্রিত; বিশেষত অনেক বর্ণাশুদ্ধি আছে। অতএব যদি কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে আদি অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া শুদ্ধ করিয়া ত্বরায় ছাপাইতে পার, তাহা হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য আমি একশত পুস্তক লইব এবং ঐ একশতের মূল্য ৬০০৲ শত টাকা দিব। অবশিষ্ট যত পুস্তক বিক্রয় করিবে, তাহাতে তুমি যথেষ্ট লাভ করিতে পারিবে, তাহা হইলে যে টাকা ঋণ করিয়া ছাপাখানা করিয়াছ, তৎসমস্তই পরিশোধ হইবে।' সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। একশত পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দিয়া ৬০০৲ ছয় শত টাকা প্রাপ্ত হন; ঐ টাকায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের ঋণ পরিশোধ হয়। ইহার পর যে সকল সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন-পুস্তক মুদ্রিত ছিল না, তৎসমস্ত গ্রন্থ ক্রমশ মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও 'সংস্কৃত কলেজ উহাদের লাইব্রেরীর জন্য যে পরিমাণে নূতন নূতন পুস্তক লইতে লাগিল, তদ্দ্বারা ছাপানর ব্যয় নির্বাহ হইয়াছিল। অন্যান্য লোকে যাহা ক্রয় করিতে লাগিলেন, তাহা লাভ হইতে লাগিল। ঐ টাকায় ক্রমশ ছাপাখানার ইষ্টেট বা কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।"

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিদ্যাসাগরও তর্কালঙ্কারের বন্ধুত্ব অতি নিবিড় ছিল কিন্তু উত্তরকালে এই প্রেসই বন্ধুবিচ্ছেদের কারণ হয়ে উঠেছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ও একবার সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটারীর অংশ দাবী ক'রে মোকদ্দমা করেছিলেন।

পূর্বেই আমরা জেনেছি ১৮৪৭ সালে সংস্কৃত কলেজের কর্মত্যাগ করলে

কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটারী রসময় দত্ত বলেছিলেন—'বিদ্যাসাগর যে চাকরীটা ছেড়ে দিলে, এখন খাবে কি?' বন্ধুর মুখে একথা শুনে তেজস্বী ব্রাহ্মণ বলেছিলেন তিনি আলু পটল বিক্রী ক'রে খাবেন। বিদ্যাসাগরের আলু পটল বিক্রী করতে হয়নি, সংস্কৃত প্রেস তাঁকে অর্থকষ্ট হতে মুক্তি দিয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত প্রেসটির নিকট বাংলাদেশের ঋণ আছে। বাংলাদেশে শ্রীরামপুরের মিশনারীরাই প্রথম প্রেস স্থাপন করেছিলেন। কাশীরামের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল শ্রীরামপুরের প্রেসে। তারপর ক্রমে ক্রমে বাঙালিদের স্থাপিত প্রেসের সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করেছিল। অবশ্য সমস্ত প্রেসের ছাপা ও কাগজ ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কৃত প্রেসের মত উচ্চস্তরের ছিল না। তখন পাঠ্যপুস্তকই বা ছিল ক'খানা!

এই প্রেস হতেই ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি প্রচুর গ্রন্থের সম্পাদন এবং সঙ্কলন করেছিলেন। নিজস্ব প্রেস না থাকলে বিদ্যাসাগরের বহু আকাঙ্ক্ষা হয়ত কল্পনাতেই থেকে যেত, মুদ্রিত অক্ষরের পক্ষপুট আশ্রয় ক'রে তাঁর সমস্ত রচনা প্রকাশিত হ'ত কিনা সন্দেহ এবং অর্থক্লিষ্ট বিদ্যাসাগরকেও দাতাশ্রেষ্ঠ, শিক্ষাবিদ, সমাজ-সংস্কারকরূপে দেখতে পাওয়া যেত না। যে বলিষ্ঠ দক্ষিণ হস্তের দাক্ষিণ্যে সেদিন সমস্ত বাংলাদেশ ধন্য হয়েছিল, তাতে সবলতা সঞ্চার করেছিল সংস্কৃত প্রেস।

একদিন ছিল, যখন সেলাইকরা জামা পরা পণ্ডিতসমাজে নিষিদ্ধ ছিল, মুদ্রিত হলে জাতিনাশ হ'ত শাস্ত্রগ্রন্থের আর লেখা-পড়া শিখলে হিন্দুকন্যার বৈধব্য অনিবার্য বলে ঘোষিত হত। কুসংস্কারের বদ্ধকূপে আপনাকে নিমজ্জিত ক'রে বসেছিল হিন্দু, কুসংস্কারের বিষাক্তবাষ্পে জাতির সংজ্ঞা প্রায় লুপ্ত হয়েছিল। রামমোহনের প্রতিভা ও কর্মনিষ্ঠার বিদ্যুৎ-স্পর্শে দেশে নবচেতনার জোয়ার এসেছিল সত্য, কিন্তু তবু ছিল সূর্যকরস্পর্শহীন কত অন্ধকার মহাপ্রান্তর তার অজ্ঞানের বিভীষিকা নিয়ে। জ্ঞানের বাহন গ্রন্থ ছিল তখন চন্দন-বিল্বপত্রের আবরণে অদৃশ্য হয়ে। তাতে অধিকার কেবল ব্রাহ্মণের। ব্রাহ্মণেরও অধঃপতন ঘটেছে। সে আর জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে সমাজের মঙ্গলকামনায় মগ্ন নয়। ব্রাহ্মণ ধনীর ইচ্ছামত শাস্ত্রব্যাখ্যা করত, শাস্ত্রের বিধান দিত।

শাস্ত্রকে অবরোধ হতে মুক্তি দিয়েছিলেন রামমোহন। 'বেদান্তসার' মুদ্রিত হয়ে বিতরিত হয়েছিল আদ্বিজচণ্ডালের নিকট। রামমোহনের অসমাপ্ত সমাজসংস্কারের ভার ঈশ্বরচন্দ্র যে ভাবে নিয়েছিলেন, তেমনি ভাবেই গ্রহণ করলেন পুস্তক মুদ্রিত ক'রে বাংলার শিশুদের বোধোদয় করবার দায়িত্ব, তাদের মনে জ্ঞানের দীপ জ্বালবার ভার।

সংস্কৃত প্রেসের হাতিয়ার শাসন করেছিল দারিদ্র্যের ভ্রূকুটি, বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছিল রাশি রাশি গ্রন্থ। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগার বহু দুর্লভ প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথির মুদ্রিত সংস্করণে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

সংস্কৃত প্রেসে মুদ্রিত গ্রন্থগুলি বিক্রয়ের জন্য সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী স্থাপিত হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের দ্বিতীয়-প্রাণ এই সংস্কৃত প্রেসের অংশও তাঁকে পরোপকারের ঋণ শোধ করবার জন্য বিক্রী ক'রে দিতে হয়েছিল। কবি মাইকেল মধুসূদনকে সাহায্য করবার জন্য তিনি বিপুল ঋণ করেছিলেন। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র তখন বড় অসুস্থ। মাইকেল যদিও তাঁকে দেবতার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু এই ঋণ শোধ করবার সাধ্য কবির তখন ছিল না। সুতরাং বাধ্য হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত প্রেসের কিছু অংশ বিক্রী ক'রে ঋণ শোধ করলেন। অবশ্য মাইকেল পরে ঈশ্বরচন্দ্রের আর্থিক ঋণ সমস্তই শোধ ক'রে দিয়েছিলেন।

বইয়ের দোকান ডিপোজিটারী'টিও হস্তান্তরিত হয়ে যায়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র ডিপোজিটারী পর্যবেক্ষণে অসমর্থ হয়ে পড়েছিলেন। সকলের বন্ধু বিদ্যাসাগরের এমন কোন বন্ধু ছিল না, যিনি এ সময়ে তাঁকে সাহায্য করবেন। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ডিপোজিটারীতেও অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা চলছে। বিরক্ত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র পুস্তকালয়টি সম্বন্ধে নানা উক্তি করছিলেন, তাঁর সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগরের ব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিদ্যাসাগরের নিকট পুস্তকালয়টি চাইলেন। মনের সেই চঞ্চল অবস্থায়, ঈশ্বরচন্দ্র এক কথায় ডিপোজিটারী ব্রজনাথকে দান ক'রে দিলেন।

এই ডিপোজিটারী তখন একটি লাভজনক সম্পত্তি। অনেক লোকই প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ডিপোজিটারী'টি ক্রয় করতে প্রস্তুত ছিল এবং

সেটি হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছে সংবাদ পেয়ে ক্রেতাও এসেছিল। কিন্তু দান করা জিনিষ কি দ্বিজোত্তম আবার গ্রহণ করবেন! ব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই ডিপোজিটারীর মালিক হয়ে গেলেন।

বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, সাংসারিক ব্যয় সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রায় কৃপণের পর্যায়েই ফেলা যায়, সামান্য দড়িগাছা, একটু হলুদগোলা জল নিয়েও তাঁর সতর্কতার অন্ত ছিল না। কিন্তু দান করবার সময়ে, কোন বিপন্নকে অর্থসাহায্য করবার সময়ে তিনি মুক্তহস্ত। বার বার নিজের সম্মান বিসর্জন দিয়ে, ঋণ ক'রেও তিনি দান করেছেন। এই অপরিমিত দানশীলতার জন্যই ঈশ্বরচন্দ্রকে শেষ জীবনে অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছে। সুতরাং ডিপোজিটারীও যে দান ক'রে দিলেন এ আর বেশী কথা কি!

যা হোক, সরকারী দাসত্ব-শৃঙ্খল হতে মুক্তি লাভ ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র বৃহৎ জনসমষ্টির কল্যাণে আত্মনিবেদন করলেন। শিক্ষাব্রতী ঈশ্বরচন্দ্র সরকারী শিক্ষাবিভাগ হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলেও দেশবাসীর নিকট হতে তাঁর আহ্বান এল এবং সে আহ্বান তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র সরকারী কর্মত্যাগ ক'রে স্বাধীন জীবনে প্রবেশ করলেন বটে কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কার তাঁর আজীবনের সঙ্গী হয়ে রইল। বিদ্যালয়-পরিচালনা এবং গ্রন্থরচনা তাঁর প্রধান কর্মসূচী হল। যদি অপর্যাপ্ত দানে ভাণ্ডার শূন্য না হ'ত এবং বহু প্রকারের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি যদি ঈশ্বরচন্দ্রের আর্থিক অবস্থাকে ভারাক্রান্ত ক'রে না রাখত, তা'হলে সরকারী কর্মত্যাগ করলেও যে তাঁর অর্থকষ্টের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা ছিল না একথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তিনি এসময়ে সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটারীর মালিক। স্বরচিত পুস্তকের মাসিক আয়ও প্রায় তিন-চার হাজার টাকা। সুতরাং সরকারী কর্ম হতে অবসর গ্রহণের ফলে, আয় হতে একটি বৃহৎ অঙ্ক হ্রাস পেলেও তিনি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তেই জনকল্যাণে মন দিতে পারতেন। এখনো মানসিক স্বস্তি না থাকলেও ঈশ্বরচন্দ্রের অনলস সেবায় দেশ উপকৃত হতে লাগল এবং সরকারী কর্মে ব্যাপৃত না থাকবার ফলে, তিনি নানাবিধ বিষয়ে অধিকতর মন দিতে সমর্থ হলেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। বাঙালি ইংরেজি শিক্ষার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সরকার তখন পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত হয়ে উঠতে পারে নি। হিন্দু কলেজ যদিও ইংরেজি শিক্ষাদানে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিল, তবু সেখানে পুত্রকে পাঠাতে বহু হিন্দুর আপত্তি ছিল। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও হিন্দু ছাত্রদের এরূপভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলেন যে তাঁরা প্রকাশ্যেই হিন্দু ধর্মকে ঘৃণা প্রদর্শন করতেন। ধর্মত্যাগও করছিলেন কোন কোন ছাত্র। মিশনারী ডাফের শিক্ষাপ্রণালী অপূর্ব,, কিন্তু সেখানেও আছে খ্রীষ্টধর্মের ভয়। বালকদের জন্য নিরাপদ ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, মাধচন্দ্র ধর, পতিতপাবন সেন, গঙ্গাচরণ সেন, যাদবচন্দ্র পালিত, বৈষ্ণবচরণ আঢ্য প্রভৃতি কলিকাতায় গণ্যমান্য কয়েকজন নাগরিক একত্র হয়ে সিমলার শঙ্কর ঘোষ লেনে 'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সরকারী কর্ম ত্যাগ করেছেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে অন্য বিদালয় পরিচালনায় বিশেষ অসুবিধা নেই। ট্রেনিং স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাগণ বিদ্যাসাগর ও তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্কুল পরিচালনার জন্য আহ্বান করলেন। কর্মশক্তি কখনো বন্ধ্যা থাকতে পারে না, ঈশ্বরচন্দ্র সাগ্রহে এই বিদ্যালয়ে যোগ দিলেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে কিন্তু কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হল এবং বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে দুই জন—তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও মাধবচন্দ্র ধর 'ট্রেনিং একাডেমী' নামে আর একটী বিদ্যালয় স্থাপন করলেন।

বিদ্যাসাগরেরও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতাবর্গ বাধা দিলেন। তাঁরা বিদ্যাসাগর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, রমানাথ ঠাকুর এবং হীরালাল শীলের হাতে বিদ্যালয়ের ভার সমর্পণ ক'রে বিদায় গ্রহণ করলেন। নূতন স্কুল-কমিটির সেক্রেটারী হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভ হতে বিদ্যালয়টির পুরাতন নাম পরিবর্তিত হয়ে "হিন্দু মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন নামকরণ হল। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের

শিক্ষাদানের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র প্রভূত পরিশ্রম করতে লাগলেন। তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত ক'রে দেওয়া বিদ্যাসাগরের প্রধান উদ্দেশ্য হল এবং তার ফলে ছাত্রগণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হল এবং অন্য তিনজন সভ্য পদত্যাগ করলেন। সুতরাং বিদ্যালয়ের সমস্ত দায়িত্ব ঈশ্বরচন্দ্রের উপর পড়ল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দ্বারকানাথ মিত্র ও কৃষ্ণদাস পালকে নিয়ে তিনি একটি কমিটি গঠন ক'রে বিদ্যালয়ে বি, এ, পর্যন্ত পডাবার অনুমতি চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আবেদন করলেন। বিশ্ববিদ্যালয় বি, এ, পড়াবার অনুমতি দিলেন না, কিন্তু ফার্ষ্ট আর্ট্‌স পডাবার অনুমতি পাওয়া গেল। এ সম্বন্ধে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দেব ২৮শে ফেব্রুয়ারী অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়:

"এতদিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনটি কলেজে পরিণত হইল। আপাতত উহাতে এল এ কোর্স পর্যন্ত পডান হইবে। গবর্ণমেণ্ট উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করিয়া লইতে স্বীকার করিয়াছেন। পাঁচ বৎসর হইল, এইরূপ একখানি আবেদন করা হয় কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তখন তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। দেশীয়দিগের দ্বারা স্বাধীনভাবে প্রথম এই কলেজ স্থাপিত হইল।...আগামী জানুয়ারীর প্রথমেই কলেজটি খোলা হইবে। এল. এ ক্লাশে আপাতত পাঁচ টাকা বেতন লওয়া হইবে। কলিকাতার মধ্যে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনটি একটি প্রধান স্কুল, সুতরাং কলেজ হইলে যে উহা উত্তমরূপে চলিবে তাহা বিলক্ষণরূপে আশা করা যাইতে পারে।"

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের এফ, এ, পরীক্ষায় মেট্রোপলিটানের ছাত্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল। বাঙালি-পরিচালিত কলেজের এই সাফল্য দেখে কেবল দেশীয়গণই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণও ঈশ্বরচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ও প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ বললেন— "পণ্ডিত অবাক করে দিয়েছেন" (Pandit has done wonders) বিদ্যাসাগর তখন স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কলিকাতার বাইরে ছিলেন, সংবাদ

পাওয়ামাত্র কলিকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। স্কটের গ্রন্থাবলী উপহার দিলেন কৃতী ছাত্র যোগীন্দ্রচন্দ্র বসুকে। উপহারের মধ্যে নিজের হাতে লিখলেন—

Awarded

To Jogindra Chandra Bose at the close of his brilliant career as a student in the Metropolitan Institution.

(Sd.) Iswar Chandra Sarma

8th January, 1875

এইরূপে মেট্রোপলিটান কলেজ শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিল। ইয়োরোপীয় শিক্ষক ব্যতীত, ভারতীয় শিক্ষকদের দ্বারা যে কত উৎকৃষ্ট অধ্যাপনা হতে পারে বিদ্যাসাগর তা প্রমাণ ক'রে দিলেন। অন্যান্য কলেজ হতে ছাত্রগণ মেট্রোপলিটানে ভিড় ক'রে আসতে লাগল। বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রবর্তন ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় মেট্রোপলিটানকে স্নাতক শ্রেণী খুলবার অনুমতি দিলেন এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় ১৬টি ছাত্র উত্তীর্ণ হল। বাঙালি-পরিচালিত বেসরকারী কলেজের প্রথম স্নাতক-ছাত্রদের নাম উল্লেখ করবার প্রলোভন সম্বরণ করা কঠিন।

অন্নদা বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, যদুনাথ চক্রবর্তী, কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ দত্ত, নবীনচন্দ্র দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল, হেমচন্দ্র মৈত্র, যজ্ঞেশ্বর রায় এবং আশুতোষ রায় চৌধুরী প্রথম বার মেট্রোপলিটান কলেজ হতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

পূর্বেই আমরা লক্ষ্য করেছি, শারীরিক শাসন বিদ্যাসাগর একেবারেই অনুমোদন করতেন না। একবার এই কারণে মেট্রোপলিটান স্কুলের শ্যামবাজার শাখার একটি শিক্ষককে তিনি বরখাস্ত করেছিলেন। সদুপদেশ ও সদয় ব্যবহারের দ্বারা ছাত্রদের দোষ সংশোধনই তাঁর অভিপ্রেত ছিল। কোনও

কারণেই তাদের উপর দৈহিক শাস্তিবিধান চলবে না, এই ছিল তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ। অবশ্য ছাত্রদের অন্যায়কেও তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। বেশী অপরাধ করলে তাদের স্কুল হতে বহিষ্কৃত ক'রে দেওয়া হ'ত।

দারিদ্র্য মেট্রোপলিটানের ছাত্রদের শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারত না। স্কুলের মাসিক বেতন ছিল মাত্র ৩৲ টাকা। তা ছাড়া বহু ছাত্র ফ্রি পড়ত। অর্থসঙ্গতিহীন কত ছাত্র যে বিদ্যাসাগরের নিকট হতে মাসিক সাহায্য পেত তার ঠিক নেই। অনেক চতুর ব্যক্তি তাঁর এই উদার চরিত্রের সুযোগ নিয়ে প্রতারণা করত। প্রতারিত হওয়া ঈশ্বরচন্দ্রের একরূপ বিধিলিপিই ছিল বলা যায়। কিন্তু একথাও সত্য যে, বহু দুঃস্থ পরিবার তাঁর দানে অবধারিত মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পেয়েছে, বহু কৃতজ্ঞ হৃদয় হতে ঈশ্বরচন্দ্রের উদ্দেশে প্রত্যহ শ্রদ্ধাঞ্জলি বর্ষিত হ'ত।

মেট্রোপলিটান কলেজের জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের প্রচুর ঋণ হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হয়। তখন ঈশ্বরচন্দ্রের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপর বিদ্যালয় পরিচালনার ভার ন্যস্ত করেন এবং কলেজের বাবদ তাঁহাকে চিরজীবনের জন্য ১০০৲ টাকা বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা হয়।

ঈশ্বরচন্দ্রের মেট্রোপলিটান কলেজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আনন্দমোহন বসু সিটি কলেজ স্থাপন করেন। ক্রমে রিপন, আলবার্ট, বঙ্গবাসী, সেণ্ট্রাল ইনষ্টিটিউশন প্রভৃতি বহু বেসরকারী কলেজ কলিকাতায় স্থাপিত হয়। কলিকাতার বাহিরেও বহরমপুর কলেজ, কুচবিহারে ভিক্টোরিয়া কলেজ, বর্ধমানে রাজ কলেজ, ঢাকাতে জগন্নাথ কলেজ, বরিশালে ব্রজমোহন কলেজ এবং কুমিল্লাতে ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপিত হয়েছিল।

মেট্রোপলিটান কলেজ সম্বন্ধে বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেব তাঁর পুস্তকে উচ্চ প্রশংসা ক'রে লিখেছেন—এই কলেজের স্কুলবিভাগে আটশ ছাত্র ছিল এবং বিদ্যালয়ের চার-পাঁচটি শাখা দেখা যায়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে নিজ ভবন নির্মাণ ক'রে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হতে সেখানে বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে কলেজটি বিদ্যাসাগরের নামে পরিচিত হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"সংস্কৃত কলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশান। বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন; যিনি লোকাচার-রক্ষক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন, এবং সংস্কৃত-বিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরাজি বিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।

"মেট্রোপলিটান-বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন, ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোকহিতৈষা ও অধ্যবসায় নহে, তাঁহার সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিই যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি, এই বুদ্ধি সুদূর-সম্ভবপর কাল্পনিক বাধাবিঘ্ন ও ফলাফলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না। এই বুদ্ধি, কেবল সূক্ষ্মভাবে নহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে সমগ্রভাবে কর্ম ও কর্মক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জন দিয়া মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মত কাজ করিয়া যায়। এই সবল কর্মবুদ্ধি বাঙালির মধ্যে বিরল।"

হিন্দু বিধবার দুঃখে ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় মথিত হয়ে গিয়েছিল। নির্মম সামাজিক প্রথার সংস্কারের জন্য তিনি সর্বস্ব পণ করেছিলেন। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করবো। কিন্তু বিধবাদের আর্থিক অসহায়ত্ব যে ঈশ্বরচন্দ্রকে কতটা চিন্তিত করেছিল এবং এ বিষয়ে তিনি কি ক'রে গিয়েছেন তাও স্মরণযোগ্য বিষয়।

দরিদ্র বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহকর্তা কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে যান, কিন্তু যখন পরলোকের আহ্বান আসে, তখন বুঝি ভগবানের চিন্তার পরিবর্তে অসহায় পরিবারের চিন্তাই শেষ-পথযাত্রীর বিদায় মুহূর্তটিকে কণ্টকিত ক'রে রাখে।

দুস্থ পরিবারের কিছুটা নিরাপত্তাবিধানের সংকল্প নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র প্রধান উদ্যোগী হয়ে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্যুইটি ফণ্ড প্রতিষ্ঠা করলেন। যে ব্যক্তি মাসিক কিছু চাঁদা দেবেন, তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রী কিংবা সন্তান অথবা অন্য আশ্রিত কেউ প্রদত্ত টাকার দ্বিগুণের কিছু অধিক পরিমাণ অর্থ আজীবন মাসিক সাহায্যরূপে পাবেন।

পাইকপাড়ার রাজারা এই ভাণ্ডারে একত্রে ২৫০০৲ টাকা সাহায্য করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ব্যতীত জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রমেশচন্দ্র মিত্র, শ্যামাচরণ মিত্র, মুরলীধর সেন, দীনবন্ধু মিত্র, গোবিন্দ চন্দ্র ধর, নবীনচন্দ্র সেন, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, নন্দলাল মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, পঞ্চানন রায়চৌধুরী, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি বিশিষ্ট নাগরিকগণ নানা ভাবে, বিভিন্ন সময়ে ফণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্যুইটি ফণ্ডের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বৎসর তিনেক যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তারপর এই সংস্থার কাজে নানা বিশৃঙ্খলার পরিচয় পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই সম্পর্ক-ত্যাগের কারণ হিসাবে তিনি অ্যান্যুইটি ফণ্ডের পরিচালকবর্গের নিকট এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি ফণ্ডের হিসাব-নিকাশে গরমিল, নিয়মকানুন-রক্ষায় বিশৃঙ্খলা, সভার রিপোর্ট নিয়মিত না রাখা, এমন কি পরিচালকবর্গের মধ্যে কর্তৃত্ব নিয়ে দলাদলির ফলে সংস্থার উন্নতিমূলক চিন্তা বা কাজে তাদের মতি কম থাকে ইত্যাদি বহু অভিযোগের উল্লেখ করেন। অ্যান্যুইটি ফণ্ডের ডিরেকটরবর্গের শত অনুরোধ-উপরোধ প্রত্যাখ্যান ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র শেষ পর্যন্ত এই সংস্থার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি সংবাদ দেখা গেল—

"ক্যালকাটা হিন্দু ক্যামাল অ্যান্যুইটি ফণ্ড নামক যে একটি আফিস খোলা হইয়াছিল উহা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও হাইকোর্টের জজ বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র এবং অন্যান্য কয়েকজন প্রধান লোক ইহার সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন।"

অ্যান্যুইটির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের এক বিশিষ্ট দিক। তা হল আপন চিন্তা ও বিশ্বাসমত অন্যায় এবং নীতিহীনতার বিরুদ্ধে আপসহীন মনোভাব। এজন্য তাঁকে জীবনে কম দুঃখ পেতে হয় নি! এমন কি, সাংসারিক ক্ষেত্রেও তাঁকে এজন্য অনেক অশান্তি ভোগ করতে হয়েছে। অথচ অনেক সময় নমনীয় মনোভাব প্রকাশ করলেই তাঁর জীবনে—সংসারে ও তার বাইরে, অনেক দুঃখ ও অনেক অশান্তি তিনি এড়াতে পারতেন। ঈশ্বরচন্দ্র চিরদিনই নিজ সত্য-বিশ্বাসের পথের বাইরে অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ানোর চেয়ে দুঃখবরণ, তা যত কঠোরই হুক না কেন, শ্রেয়ঃ মনে করেছেন। পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে বসে অনেকেই বিস্মিত হয়ে ভেবেছেন, বাংলাদেশের নরম মাটিতে কোথা থেকে এই অপূর্ব মানুষটি আবির্ভূত হল!

সরকারী কর্ম ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র বিরাট কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। পূর্ব হতেই কেবলমাত্র শিক্ষা নয়, সমাজসংস্কারও তাঁর কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল; এইবার সমস্ত বাংলাদেশ যেন বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র ক'রেই আবর্তিত হতে লাগল। এই সময়কে বাংলাদেশের বিদ্যাসাগর-যুগ বলে অনায়াসেই চিহ্নিত করা যায়।

১৮৫৬ হতে ৫৮ খ্রীষ্টাব্দ যেমন ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মব্যস্ত কাল, তেমনি বাংলা—ভারতবর্ষেরও এক বিচিত্র সময়।

এসময়ে ঈশ্বরচন্দ্র একদিকে প্রাথমিক শিক্ষা, কেবলমাত্র বালকদের জন্য নয়, বালিকাদের শিক্ষার জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে বিধবা-বিবাহকে আইনানুমোদিত করবার জন্য লেখনী ধারণ করেছেন। শিক্ষা-সংস্কারের

জন্ম বিদ্যাসাগর দেশবাসীর অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করলেন, আবার সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরকে হত্যা করবার জন্য ষড়যন্ত্রকারীও দেশে দুর্লভ ছিল না। সমাজ-সংস্কারকদের সর্বাপেক্ষা অসুবিধার বিষয় হল, সমাজ নিজেই সংস্কারকামীর বিরুদ্ধপক্ষ হয়ে তীব্র প্রতিরোধ গঠন করে। বিদ্যাসাগরকে সেই প্রতিরোধ চূর্ণ করবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল। তিনি জয়লাভ করেছিলেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসনের এক সঙ্কটময় মুহূর্ত। সাম্রাজ্য-বিস্তারের জন্য ডালহৌসী প্রভৃতি গভর্ণর জেনারেলগণ যে পথ অবলম্বন করেছিলেন, তার ফলে সমস্ত উত্তরভারতে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। এই বিদ্রোহ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। কারণ, সিপাহী বিদ্রোহের ফলেই ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট ভারতকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নির্লজ্জ সীমাহীন লাভ ও লোভের শাসন থেকে মুক্ত ক'রে নিজের প্রত্যক্ষ শাসনে নিয়ে যায়। বিচার-বিশ্লেষণ করে সিপাহী বিদ্রোহের কারণকে সাধারণত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয়—এই চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এই চারটি কারণের মধ্যে আবার ইংরেজরা ধর্মীয় কারণকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল। তাই আমরা দেখি, কোম্পানীর হাত থেকে ভারতকে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ অধিকারে নেবার সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তদানীন্তন সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর শাসনে ভারতে ধর্মীয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করা হবে, একথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন।

মনে হয়, সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্যও কিছুটা জড়িয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় প্রজাদের অসন্তুষ্টির (যার ফলেই সিপাহী বিদ্রোহ) কারণ নির্ণয়-প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেছিলেন যে, বিধবাবিবাহকে আইনসঙ্গত করাও উক্ত অসন্তুষ্টির অন্যতম কারণ। রাজ্যরক্ষার তাগিদে তখন ইংরেজের কোনও বিচার-বিশ্লেষণ করার সময় ছিল না। অসম্ভব নয়, তারা এই সব যুক্তিদাতাদের কথা গ্রহণ ক'রেই বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রাণ ও প্রধান ঈশ্বরচন্দ্রকেও দেশে অশান্তি সৃষ্টির অন্যতম কর্তা বলে মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছিল। দেশের শিক্ষাবিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্রের অমানুষিক ও আন্তরিক

শ্রম চাক্ষুষ ক'রেও তাঁরা যে মাত্র মৌখিক দুঃখ জানিয়েই তাঁকে সরকারী কর্ম থেকে বিদায় দিয়েছিল তা ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিরাগদৃষ্টি ভিন্ন অন্য কোন কারণ বলে অনুমান করা সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গেই স্মরণ করা যেতে পারে, সিপাহী বিদ্রোহ-কালে ঈশ্বরচন্দ্র একবার ইংরেজ শাসন-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রায় সংঘর্ষের অবস্থায় এসেছিলেন। বিদ্রোহ-দমনকল্পে সরকার সৈন্য সমাবেশের জন্য কলিকাতার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গৃহ অধিকার করেন। সংস্কৃত কলেজের গৃহও এতদুদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানান হয়। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট এ-ব্যবস্থা মোটেই মনঃপূত হয় নি। ন্যূনতম এক অংশের অশান্ত অবস্থার অজুহাতে শিক্ষাব্যবস্থার স্বচ্ছন্দ-গতিপথে কোনও বাধা সৃষ্টি তিনি অসঙ্গত মনে করেছিলেন। তাই তিনি সংস্কৃত কলেজের গৃহ সেনানিবাসরূপে ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানালেন। অবশ্য এ বিষয়ে তাঁর এই সৎ ও সঙ্গত ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে নি; সংস্কৃত কলেজের গৃহ তাঁকে সেনানিবাসের জন্য ছেড়ে দিতে হল। অনন্যোপায় হয়ে তিনি দুটি বাড়ী ভাড়া ক'রে সাময়িক ভাবে সংস্কৃত কলেজের কাজ চালাতে থাকেন।

ইতিপূর্বে আমরা মিঃ উডের শিক্ষাপত্রের উল্লেখ করেছি। এ সম্বন্ধে সামান্য আলোকপাত বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ একটি শিক্ষাসনন্দ রচনা করেন। ভারতবর্ষে সকল শ্রেণীর উপযোগী এই শিক্ষা-পরিকল্পনাটির রচনাতে মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফ্ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শিক্ষাপত্রে ইংরেজিকে উচ্চশিক্ষার বাহন রাখা স্থির হলেও মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষার বিস্তার এবং মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন সম্বন্ধে পরিষ্কাররূপে বলা হল। এই শিক্ষাপত্রেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি পাওয়া গেল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্বে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করেন নি। এখন তাঁরা জানালেন, যে সমস্ত প্রদেশে অনেক বিদ্যালয় থাকবে, সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে।

শিক্ষাপত্রে নির্দেশ দেওয়া হল যে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন পর্যায়ের বিদ্যালয়

স্থাপিত হবে। সর্বনিম্নে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শীর্ষে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চশিক্ষা ধীরে ধীরে নিম্নস্তরে প্রবেশ করবে। এইরূপ অভিসেচন-পদ্ধতির ত্রুটি অনেক। সুতরাং স্থির হল যে, উচ্চশিক্ষায় কেবল কয়েক জনের জন্য সুযোগ না রেখে জনসাধারণের শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে অবহিত হওয়াই সরকারী নীতি হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই শিক্ষাপত্রের নির্দেশক্রমে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল এবং সাহায্যদান প্রথা প্রবর্তন করবার ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য উৎসাহ দেখা দিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিন্তু মিঃ উডের শিক্ষাপত্রকে পরিপূর্ণভাবে কাজে পরিণত করতে পারল না। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতবর্ষ কোম্পানীর হস্তচ্যুত হয়ে গেল এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন। ধর্মসম্বন্ধীয় নিরপেক্ষ নীতি দৃঢ়রূপে অনুসরণ ক'রে ব্রিটিশ সরকার মিশনারীদের শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ অনুকূল ভাব দেখানো ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাপত্রের নির্দেশ প্রতিপালন করল। সুতরাং মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফ্ ক্রীশ্চান মিশনের পক্ষে যে সকল সুবিধা আশা করেছিলেন তা আর পাওয়া গেল না। বরং সরকারী শিক্ষাবিভাগ মিশনারীদের স্কুলগুলিতে সাহায্য দেবার পরিবর্তে সরকারী বিদ্যালয় স্থাপনেই অধিক তৎপর হলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পর কিন্তু ভারতবর্ষে একটি নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি হল। এতদিন বহু ভারতবাসী ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। সুতরাং ইংরেজি শিক্ষা সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। বিদ্রোহের পর যখন দিল্লীর শেষ শিখাটিও নির্বাপিত হয়ে গেল এবং ইংরেজের শক্তি-সামর্থ্যের সম্যক পরিচয় লাভ হল তখন ইংরেজ রাজত্বকে সকলেই স্থায়ী ব্যবস্থা বলে মেনে নিলেন। এই সঙ্গে একথাও বোঝা গেল যে, ইংরেজি শিক্ষা অপরিহার্য। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয়গণ অগ্রসর হয়ে এলেন এবং সরকারী ও মিশনারী শিক্ষাবিস্তার-প্রচেষ্টার তুলনায় ভারতবাসীদের চেষ্টা বহুগুণে অধিক হয়ে উঠল।

বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্যদান-প্রথা সম্বন্ধে মিশনারীগণই অধিকতর উৎসাহী ছিলেন, কারণ তাঁরা ভালই জানতেন যে, সাহায্য নিতে হলে যে-সমস্ত নিয়ম মানতে হয়, দেশীয় ব্যক্তিগণ সেগুলি ঠিক বুঝে নিয়মানুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালনা করতে পারবেন না, ফলে মিশনারী বিদ্যালয়গুলিই সরকারী সাহায্যে লাভবান হবে। কিন্তু সরকারী নীতি পরিবর্তনের ফলে মিশনারীগণ উচ্চশিক্ষায় অবাঞ্ছিত বলে বিবেচিত হলেন। শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে দেশীয়দের প্রচেষ্টাই সরকারের নিকট অধিকতর কাম্য হয়ে উঠল এবং নূতন বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধেও কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিবিশেষকে উৎসাহ দিয়ে সরকারী সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।

॥ ছয় ॥

(রামমোহন রায়কে যদি বাংলা গদ্যের জনক বলা যায়, তা'হলে ঈশ্বরচন্দ্র নিশ্চয়ই তার পালক।) ভাষাকে কোনমতে চিন্তাপ্রকাশের উপযুক্ত রূপ দিয়ে, তাব সাহায্যে রামমোহন সমাজ-সংস্কারের কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ভাষাকে প্রসাধনমণ্ডিত করবার মত অবকাশ তাঁর হয় নি। ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা ভাষাকে নবযৌবনে উত্তীর্ণ ক'রে দিলেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্ম দেশে তখন প্রচুর পাঠ্যপুস্তক বচনার প্রয়োজন ছিল। বিদ্যাসাগর প্রধানতঃ পাঠ্য-পুস্তক রচনার জন্যই তাঁর লেখনী ধারণ করলেন, কিন্তু সেই পাঠ্যপুস্তকগুলি অপূর্ব সুষমামণ্ডিত হয়ে, প্রায় সাহিত্যপর্যায়ে এসে পৌছল। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যাসাগর চরিতে' যে কথা বলেছেন, তা উল্লেখযোগ্য :

"বিদ্যাসাগর বাঙ্গলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাঙ্গালায় গদ্যসাহিত্যেব সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলি বক্তব্য-বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব। কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে; জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন— এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত

করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনার রচনাকর্তা, যুদ্ধ জয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।"

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, লর্ড ওয়েলেসলির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজই বাংলা গদ্যের জন্মভূমি। নবাগত সিবিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপন ক'রে ওয়েলেসলি সেখানে শিক্ষণীয় প্রতিটি বিষয়ের জন্য সুব্যবস্থা করলেন, কিন্তু বাংলা নিয়েই মুশকিল হল। বাংলা ভাষায় পাঠ্য-পুস্তকই তখন পর্যন্ত সৃষ্টি হয় নি। মৃত্যুঞ্জয় প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কলেজে যোগদান ক'রে যে গদ্য সৃষ্টি করলেন তাতে বিদেশী ছাত্রদের জ্ঞান বৃদ্ধি হ'লেও ভাষা শৈশবেই আবদ্ধ রইল। রামমোহন রায় ও বাংলা গদ্য-সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন:

"তিনি একদিকে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহকে ভাষায় প্রকাশ করিয়া যেমন ভাষার ভাব ও শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনই অন্য দিকে তর্ক ও বিচারমূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া ভাষায় প্রকাশভঙ্গির দৃঢ়তা ও মননশীলতা সঞ্চার করিয়া ইহাকে ঋজু, সতেজ ও পুষ্ট করিয়াছিলেন।"*

বাংলা গদ্যের ত্রুটি সম্বন্ধে রামমোহন যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং তাঁর বেদান্ত-গ্রন্থের ভূমিকায় এই ত্রুটীর উল্লেখও করেছেন:

"প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলিন শব্দ আছে এ ভাষা সংস্কৃতে জে রূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না।"

রামমোহন বাংলা গদ্যের অসম্পূর্ণতা অনুভব করলেন কিন্তু তাকে সংস্কার করবার সময় তাঁর ছিল না। অবশ্য তিনি যে কথা বলতে চাইতেন তা সহজেই বোঝা যেত এবং এই সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন:

"দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও

* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: রামমোহন রায় (সাহিত্যসাধক-চরিতমালা)

বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এ জন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।'

ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলা ভাষা কিছুটা অগ্রসর হয়ে এসেছিল। বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, সংবাদপত্র প্রভৃতি নানারূপে বাংলা ভাষার চর্চা হত। কিন্তু তাতে বাংলা ভাষা যে বিবিধ বিষয়ে আলোচনার যোগ্য এই তথ্যটি স্বীকৃত হয়েছিল; তার রীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্মে প্রবিষ্ট হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র কর্তৃপক্ষদের দ্বারা সিবিলিয়ানদের জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা করবার জন্য অনুরুদ্ধ হলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ অবলম্বনে রচিত হল বাসুদেব চরিত'। অজ্ঞাত কোন কারণে পুস্তকখানি মুদ্রিত হয় নি, সুতরাং তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। ১৮৪৭ সালে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের সামান্য স্থান উদ্ধৃত ক'রে আমরা তাঁর রচনার নিদর্শন পেতে পারি :

"একে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা; তাহাতে আবার, ঘনঘটা দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল; আর, ভূতপ্রেতগণ চতুর্দ্দিকে ভয়ানক কোলাহল করিতেছিল। এইরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয় সঞ্চার হয়। কিন্তু রাজার তাহাতে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশ মাত্র উপস্থিত হইল না। পরিশেষে, নানা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, রাজা নির্দ্দিষ্ট প্রেতভূমিতে উপনীত হইলেন; দেখিলেন, কোনও স্থলে অতি বিকটমূর্তি ভূত-প্রেতগণ, জীবিত মনুষ্য ধরিয়া, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতেছে; কোনও স্থলে ডাকিনীগণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক ধরিয়া, তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চর্ব্বণ করিতেছে। রাজা, ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে শিরীষবৃক্ষের নিকটে গিয়া দেখিলেন, উহার মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত, প্রত্যেক বিটপ ও পল্লব ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে; আর চারিদিকে অনবরত কেবল মার্ মার্ কাট্ কাট্ ইত্যাদি ভয়ানক শব্দ হইতেছে।"

ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্যাসাগর চরিতে লিখেছেন :

"বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা লেখায় সর্বপ্রথমে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি ছেদচিহ্নগুলি প্রচলিত করেন। ...বাস্তবিক একাকার সমভূম বাঙ্গলা রচনার মধ্যে

এই ছেদ আনয়ন একটা নবযুগের প্রবর্তন। এতদ্বারা যাহা জড় ছিল তাহা গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি লক্ষণীয়—"বিদ্যাসাগর বাঙ্গালাগদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্ব্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।"

বিদ্যাসাগরের পূর্বের বাংলা সম্বন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত যে, "প্রথমটায় উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে যে গদ্য ভাষা দাঁড়াইল তাহা কঠিন সংস্কৃত শব্দের ভারে চলিতে অক্ষম এবং বাক্য-রীতিতে আড়ষ্ট" এবং "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্গালাদেশের নবীন যুগের একজন প্রবর্তক"।

ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য, তিনি গদ্যের ছন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং প্রয়োজন অনুসারে ভাষার পরিবর্তন ও সংস্কার করতেন। তাঁর পুস্তকের প্রত্যেক পরবর্তী সংস্করণ এই প্রগতিশীলতার প্রমাণ।

প্রাক্-বিদ্যাসাগর যুগের ভাষার সহিত বিদ্যাসাগরীয় ভাষার তুলনাত্মক আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"প্রবাদ আছে যে রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্যলেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধু ভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই।"

সুতরাং বাংলাভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিদ্যাসাগরের দান বিদগ্ধসমাজে অকুণ্ঠিত ভাবে সমর্থিত হয়েছে; এবং একথাও সত্য যে, তাঁর অধিকাংশ রচনা অনুবাদ, কিন্তু তা'হলেও সেগুলি কোনমতেই সাহিত্যিক প্রসাদগুণ হতে

বঞ্চিত হয় নি। যাঁরা মূল 'শকুন্তলা' কিংবা 'উত্তররামচরিত' পড়েছেন তাঁরাও বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা এবং 'সীতার বনবাসের' রস আস্বাদন ক'রে তৃপ্ত হয়েছেন। সীতার বনবাস পড়ে রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছিলেন:

"বিদ্যাসাগর-রচিত সীতার বনবাসকে অনেকে কান্নার জোলাপ বলেন। ঐ পুস্তকের প্রথমাংশ ভবভূতি-প্রণীত উত্তররামচরিতের প্রায় অবিকল অনুবাদ, কিন্তু অপর সমুদয় ভাগ কেবল নূতন রূপে রচনাই নহে, উহাতে যে কি মধুর, কি চমৎকারজনক ও কি অলৌকিক কাজ সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনীয় নহে। বোধ হয় উহাতে এমত একটি পৃষ্ঠাও নাই, যাহা পাঠ করিতে পাষাণেরও হৃদয় দ্রব না হয়। করুণ রসের উদ্দীপনে বিদ্যাসাগরের যে কি অদ্ভুত শক্তি আছে তাহা এক সীতার বনবাসেই পর্য্যাপ্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় মূলগ্রন্থ নিশ্চয় বারে বারে পড়েছেন, তবু সীতার বনবাস তাঁকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছে। এই মুগ্ধ ও অভিভূত করবার ক্ষমতা ঈশ্বরচন্দ্রের নিজস্ব এবং এই শক্তি দিয়েই তিনি তাঁর অনুবাদগুলিকে মৌলিক সাহিত্যের পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের মৌলিক রচনা—সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব,' 'বিধবাবিবাহ', 'বহুবিবাহ', 'আত্মচরিত', এবং বেনামীতে রচিত ব্যঙ্গরসাত্মক 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজ বিলাস', 'রত্ন পরীক্ষা,' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির মধ্যে তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা এবং একটি তীক্ষ্ণ রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভীষিকা হতে শিক্ষার্থীর মনকে মুক্তি দেবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র 'উপক্রমণিকা', 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা এবং 'ঋজুপাঠ' সঙ্কলন করেছিলেন এবং সেজন্য আজও তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের 'বর্ণ পরিচয়', 'বোধোদয়', 'কথামালা', 'আখ্যানমঞ্জরী' যে একদিন বাংলার শিশুদের মাতৃভাষা শিখিয়েছে তার সম্যক মূল্যমান কি নির্ণীত হয়েছে? আজ আর আমাদের ঘরের শিশু মাটিতে বসে দুলে দুলে বিদ্যাসাগরের 'কর', 'খল', এবং 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' পড়ে না। তাদের জন্য প্রতিদিন নানাবর্ণে চিত্রিত, লোভনীয় রাশি রাশি 'প্রথম পাঠ' প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু সেই বহু বৎসর পূর্বে,

শিক্ষার সমস্যাসঙ্কুল কঠিন দিনে ঈশ্বরচন্দ্রের 'বর্ণ পরিচয়' বাংলার শিশুকে অক্ষরের অজ্ঞাত সমুদ্র অনায়াসে পার ক'রে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন প্রথম কবিতা—'জল পড়ে, পাতা নড়ে'। গদ্যের মধ্যে এই কবিতা, এই ছন্দ-স্রোত ঈশ্বরচন্দ্র বরাবর রক্ষা ক'রে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষার সাবলীলতা এবং নমনীয়তা লক্ষ্য করেই বলেছেন :

"বাঙ্গালা ভাষাকে পুর্ব্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর-ভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাঙ্গালা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি-সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দ-স্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দ-গুলি নির্ব্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।"

সে সময়ে বাংলাদেশে সংবাদপত্র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। সমাজনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য—সমস্ত বিষয়ের সংবাদ বিদ্যাসাগরের যুগের সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র নিজেও কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ সময়ে একটি বিশেষ পত্রিকা সম্বন্ধে দু'একটি কথা বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে তখন বাংলার কৃষককুল ধনেপ্রাণে ধ্বংস হতে চলেছিল। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর ইংরাজী 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় এই অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনীগুলি দিনের পর দিন প্রকাশ করতে এবং জলন্ত ও আবেগময়ী ভাষায় সম্পাদকীয় লিখে নীলকরদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। প্রধানতঃ এই 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর মারফত এই দেশের ও ইংলণ্ডের শিক্ষিতসমাজ নীলকরদের অমানুষিক কৃষকপীড়নের খবর জানতে পেরে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তাঁরাও নিশ্চুপ না থেকে ক্রমশই নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-মুখর হন এবং এই ভাবে বাংলাদেশে 'নীল আন্দোলন' গড়ে

ওঠে আর অল্পকাল মধ্যেই তা দুর্বার শক্তি লাভ করে। ফলে, ইংরেজ গবর্ণমেন্ট নিজে বিব্রত বোধ করতে থাকল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'ই বাস্তবিক পক্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে অত্যাচরিত নীলচাষীদের মুখপত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তথা হরিশচন্দ্রেব এই কাজে ঈশ্বরচন্দ্রের আন্তরিক ও পূর্ণ সমর্থন ছিল।

প্রতিশোধ গ্রহণেব ইচ্ছায় নীলকরেরা হরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনে। আদালতে হবিশচন্দ্র তাঁর স্বদেশবাৎসল্যেব নির্ভীক পবিচয দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। এই মোকদ্দমা চলার কালেই অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত বোগে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হরিশচন্দ্রের অকালমৃত্যু ঘটে।

হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর নিঃসহায় পরিবাবেব জন্য চিন্তিত হয়ে পডলেন ঈশ্ববচন্দ্র। শেষ পর্যন্ত তিনিই স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়কে দিয়ে পাঁচ হাজাব টাকা মূল্যে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজ ও ছাপাখানা ক্রয় করান। টাকাটা হরিশচন্দ্রের পরিবারেব বিষম দুর্দিনে অনেকখানি সাহায্য করেছিল, সন্দেহ নেই। যা' হোক, কালীপ্রসন্ন সিংহেব ইচ্ছাক্রমে ঈশ্বরচন্দ্রেরই উপর ন্যস্ত হল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পরিচালনার দায়িত্ব।

এরপর ঈশ্বরচন্দ্র কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়কে দিয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পাবেন যে, কৃষ্ণদাস দেশের জমিদারগোষ্ঠীব মুখপত্রহিসাবে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' চালাতে ইচ্ছুক তখন তিনি নীরব প্রতিবাদ স্বরূপ ঐ পত্রিকাব কর্তৃত্বভাব ত্যাগ করেন। হরিশচন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-কে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির মুখপত্র-রূপে পরিচালনা করতেন। হরিশচন্দ্রের এই প্রগতিশীল ভাবধাবাকেই হিন্দু পেট্রিযটে'-এর মাধ্যমে অক্ষুন্ন বাখতে চেয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। কৃষ্ণদাসের রক্ষণশীল মনোবৃত্তি তাঁর স্বভাবের সঙ্গে মেলেনি বলেই তিনি সরে এসেছিলেন।

বাংলা সংবাদপত্র সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই আমাদেব প্রথমেই মনে পডবে শ্রীরামপুরের ত্রয়ীকে—কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যান। এদের আগে দু-একজন, এবং পরে বহু মিশনারী এদেশে এসেছেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের আনুষঙ্গিক অঙ্গরূপে তাঁরা শিক্ষাবিস্তারকে কর্তব্যের মধ্যে ধরে নিয়েছিলেন কিন্তু শ্রীরামপুরের

মিশনারী বিশেষ ক'রে উইলিয়ম কেরীর কথা বাদ পড়লে, এদেশের আধুনিক শিক্ষাবিস্তার-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন কেবলমাত্র ভারতবর্ষে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেছে। নবার্জিত রাজ্য রক্ষার জন্ম তারা যে কোন গোল-যোগের সম্ভাবনাকে সাবধানে এড়িয়ে চলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মিশনারীদের ভারতে প্রবেশ করতে হলে তখন রীতিমত লাইসেন্সের দরকার হত, আর সে লাইসেন্স যোগাড় করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার ছিল। সেই দিনে—১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর, কোনমতে উইলিয়ম কেরী কলিকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপরের ইতিহাস বহু দুঃখ ও দুঃখজয়ের কাহিনী। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী কেরী, ওয়ার্ড ও মার্শম্যানকে কেন্দ্র ক'রে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের কাজ আরম্ভ হয়। প্রেস স্থাপন ক'রে, বাংলাভাষায় বাইবেলের অনুবাদ ক'রে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিয়ে দিল শ্রীরামপুর মিশন। কত বাংলা বই, কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত পর্যন্ত প্রথম ছাপা হল শ্রীরামপুর প্রেসে।

কেরীর অনেক পুস্তকের মধ্যে 'কথোপকথন' পুস্তকখানি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। 'কথোপকথনের' ভাষা পরবর্তীকালের টেকচাঁদ ঠাকুরের 'হুতোম প্যাঁচা এবং দীনবন্ধু মিত্রের ভাষার অনুরূপ। নমুনা-স্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হল:

"কথোপকথন (Dialogues / intended / to facilitate the acquiring / of / The Bengalee Language./ Serampore,/ Printed at the Mission Press / 1801)

স্ত্রীলোকের হাট করা

আয়টে সকাল করে চল সুতা না বিকোলে তো নুন তেল বেসাতি পাতি হবে না।

ওটে বুন সে দিন কলাঘাটার হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি সুতার কপালে আগুন লাগিয়াছে। পোড়া কপালে তাঁতি বলে কি আটপণ করে সুতাখান। সে সকল সুতা আমি এক কাহন বেচেচি টে।

সে দিন দেখে আর হাটপানে হুয়াতে ইচ্ছা করে না। চল দিকি যাই না গেলে তো হবে না ঘরে বেসাতি পাতি কিছু নাই ছেলেয়া ভাত খাবে কি দিয়া আর আধসেরটাইক কাপাইস আনিতে হবে।

ওগো দিদি সূতা আছে। বাহির কর দিকি দেখি। নারে তোরে আর সূতা দিব না আর দিন তুই যে সূতা হাঁটকিয়াছিলি তাহাতে আমার সূতা নষ্ট হইয়াছে।

ওটে পাগল বুন। দেতো দেখি গোবের হয়তো নিব

প্রেসের হাতিয়ার নিয়ে, পুস্তক এবং পত্রিকার সাহায্যে শ্রীরামপুর মিশন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করছিল, প্রতিবাদে অগ্রসর হলেন রামমোহন রায়। তিনিও পুস্তক এবং পত্রিকার সাহায্যে মিশনারী আক্রমণের উত্তর দিলেন। সমস্ত দেশেকে নিজের কথা শোনাবার জন্য প্রকাশ করলেন 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন'—'ব্রাহ্মণ সেবধি', 'সম্বাদ কৌমুদী' এবং 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার'। সমস্ত দেশ আশ্চর্য হয়ে এই নূতন অস্ত্র দেখল, অনুকরণ করল।

সুতরাং রামমোহনের সময় হতেই বাঙালি সংবাদপত্রের মাধ্যমে কথা বলছিল, কিন্তু সাংবাদিকতা বহুদিন পর্যন্ত তার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। শিক্ষিত সমাজে বিশেষ ক'রে ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজে তাই বাংলা সংবাদপত্রের আদর ছিল না। অবশ্য এই অবহেলার প্রধান কারণ অধিকাংশ সংবাদপত্রই তখন কোন না কোন দলের মুখপত্র ছিল এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপই তাদের প্রধান কর্তব্য বলে পরিগণিত হত।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' অক্ষয়চন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল। তত্ত্ববোধিনী সাহিত্য, সমাজসংস্কার, রাষ্ট্রচেতনা এবং সাংবাদিকতা প্রভৃতি বিষয়ে সংবাদপত্রের একটি উচ্চমান নির্ণয় ক'রে দিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন :

"তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্ব্বে বঙ্গ সাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্রসকলের কি অবস্থা ছিল, এবং অক্ষয় কুমার দত্ত সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে,

তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না। 'রসরাজ', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রভৃতি অশ্লীলভাষী কাগজগুলি ছাড়িয়া দিলেও 'প্রভাকর' ও 'ভাস্করের' ন্যায় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্রসকলেও এমন সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত, যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্বাবোধিনী যখন দেখা দিল, তখন তাঁহারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। রামগোপাল ঘোষ একদিন লাহিড়ী মহাশয়কে বলিলেন— 'রামতনু! রামতনু! বাঙ্গালা ভাষাব গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ" —বলিয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতে দিলেন।"

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-সম্পাদনায় অক্ষয়কুমার দত্তের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় সহযোগী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেব উদ্দেশ্য ছিল 'তত্ত্ববোধিনী' দেশে ধর্মান্দোলনের একটি বিশেষ ধর্ম মানসিকতা প্রসারের উত্তম মুখপত্র হবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্যকে একমাত্র উপজীব্য না ক'রে এতে সুস্থ ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন গঠনের সহায়ক দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও অনুশীলনই বেশি হত। অক্ষয়কুমার দত্তের এই ধরনের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী' সে সময়ে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা-রূপে গণ্য হল এবং এ-কথাও নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, এই খ্যাতির মূলে ঈশ্বরচন্দ্রের দান ছিল অপরিসীম। তিনি ছিলেন 'তত্ত্ববোধিনীর' অন্যতম প্রবন্ধ-সংশোধক ও নির্বাচক। অক্ষয়কুমারের অনেক লেখাই তিনি প্রথম প্রথম সংশোধন ক'বে দিতেন। অক্ষয়কুমারের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গিরও মিল ছিল। কিন্তু মিল ছিল না 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে। মহর্ষিব কথায়, "আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর তিনি খুঁজিতেছেন, ব্যাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ; আকাশ-পাতাল প্রভেদ।" প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গির এই বিষম অনৈক্য-ক্ষেত্রে নিয়ত পাশে থেকে সহানুভূতি সমর্থন ও উদ্দীপনা জুগিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রই অক্ষয়কুমারকে পত্রিকার হাল ধরে এগিয়ে নিতে সমর্থ করেছিলেন।

সম্পাদকরূপে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হলেও সে সময়ের পত্রিকা 'সর্বশুভকরী' এবং 'সোমপ্রকাশের' সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। "সর্বশুভকরী" মাসিক পত্রিকা ঠনঠনে অঞ্চলের 'সর্বশুভকরী সভার' মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। পত্রিকাখানির লক্ষ্য ছিল কুরীতি ও কদাচার দূরীভূত করা। সমাজ-সংস্কারের আদর্শ সামনে রেখে এই পত্রিকা প্রকাশের উৎসাহ যেমন এসেছিল ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট থেকে, তেমনি এর পরিচালনাতেও তিনিই ছিলেন বন্ধু মদনমোহনের সঙ্গে মিলে, এর প্রধান প্রেরণা-স্বরূপ। 'সর্বশুভকরী' স্বল্পায়ু হয়েছিল। তবু তৎকালীন প্রগতিশীল পত্রিকাগুলির মধ্যে এর নাম উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'তত্ত্ববোধিনীর' পরেই সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে "সোমপ্রকাশ" একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তক হিসাবে স্মরণীয়। এই 'সোমপ্রকাশের' উদ্যোক্তা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। তিনি তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে দিয়ে এই পত্রিকা প্রকাশ করান। 'সোমপ্রকাশে' দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করা হ'ত। এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী ও নির্ভীক। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন:

"প্রথম কয়েক বৎসর ইহা কলিকাতার চাঁপাতলার এক গলি হইতে বাহির হইত। তখন সেই ভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বদা পদার্পণ কবিতেন এবং পবামর্শাদি দ্বারা সোমপ্রকাশ সম্পাদন-বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করিতেন।"

ঈশ্বরচন্দ্রকে হয়ত বর্তমানে আমরা সাংবাদিক বলতে যা বুঝি ঠিক সেই অর্থে সাংবাদিক বলা চলে না। কিন্তু আমবা দেখেছি তাঁর কালেব শ্রেষ্ঠ সকল প্রগতিশীল পত্রিকাব সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগ ছিল। এই পত্রিকাগুলিকে বাদ দিয়ে বাংলাব সাংবাদিকতাব ইতিহাস রচিত হতে পারে না। এজন্য, আমরা অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারি, ঈশ্বরচন্দ্রের দানও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য।

ঈশ্বরচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী বলেছেন। অন্য গ্রন্থ না পড়ে, কেবল 'সীতার বনবাস' ও 'শকুন্তলা' পড়লেই আমরা রবীন্দ্রনাথের উক্তির মর্ম বুঝতে পারি। বেনামীতে প্রচারিত ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলিও

সমসাময়িক পণ্ডিতদের প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছিল। আচার্য কৃষ্ণকমলের মতে :

"'ব্রজ বিলাস', 'রত্ন পরীক্ষা', 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' এই সকল গ্রন্থে যে সকল হাসি-তামাসার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা অতীব কৌতুকাবহ। এই রসিকতা সে কালের ঈশ্বর গুপ্ত বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের মত গ্রাম্যতাদোষে দূষিত নহে, ইহা ভদ্রলোকের সুসভ্য সমাজের যোগ্য ; এবং পিতাপুত্রের একত্র উপভোগ্য। এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে, এবং ইহার গুণগ্রাহী পাঠকও বেশী নাই।"

শিক্ষাবিস্তারে, সমাজ-সংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্রের যে দান অবিস্মরণীয়, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তা সমভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম বাংলা গদ্যকে জড়তা মুক্ত ক'রে যে সহজ গতি দিয়েছিলেন তাতেই বাংলা ভাষা হয়ে উঠেছিল ব্যক্তি-মানসের সুখ-দুঃখানুভূতি প্রকাশের উপযুক্ত বাহন, সাহিত্যের ভাষা। এজন্য অনেকে তাঁকে বাংলা ভাষার 'জনক', এই আখ্যাও দিয়ে থাকেন। বাংলা ভাষার 'জনক' কিনা এ নিয়ে মতদ্বৈধ থাকলেও একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাসাহিত্যেব ইতিহাসে একটি বৃহৎ পরিচ্ছেদ অধিকার ক'রে আছে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয়।

॥ সাত ॥

অনেকদিন আগের কথা। খ্রীষ্টধর্ম কলিকাতার উচ্চবর্ণের মধ্যে আতঙ্ক সঞ্চার করতে আরম্ভ করেছে। এতদিন খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের প্রভাব ও কার্যকলাপ সমাজের নিম্নস্তরে আবদ্ধ ছিল। সেখানে তাঁরা কেবল বিদ্যা নয়, ধর্মও বিতরণ করতেন। সমাজের অবহেলিত অজ্ঞ মানুষগুলির জন্য হিন্দুসমাজের কিছুমাত্র চিন্তা ছিল না, সুতরাং তারা ধর্মান্তরিত হলে সমাজে বিশেষ কোন আলোড়ন উঠত না। এবার কিন্তু চিন্তিত হবার সময় হল।

নবজাগরণ যখন তার সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলাদেশে এসে পৌছল, প্রাচীন হিন্দুসমাজ তখন মধ্যযুগের সমস্ত সংস্কারকে সযত্নে আশ্রয় করেছিল। হিন্দু যুবক প্রতিভা ও কর্মক্ষমতায় পৃথিবীর সমস্ত অগ্রসর জাতির সমকক্ষ কিন্তু তাদের অগ্রগতির পথ সামাজিক বাধা-নিষেধে রুদ্ধ। প্রাচীন সমাজ আপনার কঠিন বিধির বন্ধন শিথিল করল না এবং যুগের উপযুক্ত কোন পথও দেখাল না। হিন্দু কলেজের মুক্ত বাতায়ন-পথে পশ্চিমের অগ্রগতির বার্তা এসে দেশে পৌছচ্ছিল; তরুণ শিক্ষক ডিরোজিও সেই নূতন কথা ছাত্রদের জানাতে গিয়ে কলঙ্ক-চিহ্ন নিয়ে কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। ছাত্রেরা ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হল। এমনি সময়ে দেশে এসে পৌছলেন মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফ্। বাংলাদেশকে খ্রীষ্টভূমিতে পরিণত করবার সঙ্কল্প নিয়ে এসেছিলেন তিনি। শিক্ষার মাধ্যমে আলেকজাণ্ডার হিন্দু যুবকদের আহ্বান করলেন। পণ্ডিত ডাফের বর্ণনায় খ্রীষ্টধর্ম মহিমময়রূপে দেখা দিল, কিছুসংখ্যক যুবক খ্রীষ্টের বেদীমূলে আত্মনিবেদন করলেন। দত্তকুলোদ্ভব কবি মধুসূদন ছিলেন এদের অন্যতম।

কবিতাকে যে কবি যতি ও মিলের বন্ধন হতে মুক্তি দিলেন, তাঁর মনও কোন সংযমের বন্ধন সহ্য করতে পারত না। নবীন বাংলাদেশ

পুরাতনের হাত হতে মুক্তি পাবার জন্য যে সংগ্রাম ঘোষণা করেছিল, মধুসূদন তার মূর্ত প্রতীক আর বিদ্যাসাগর ছিলেন ভারতের সেই ব্রাহ্মণ যিনি নিজের অস্থি দিয়েও আশ্রিতকে রক্ষা করেন। এই দুই অসম-প্রকৃতির মহামানবের মধ্যে কেবল পরিচয়ই ঘটে নি, যেন অস্থি দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র কবিকে রক্ষা করেছেন বহুবার।

দয়ার সাগরের অকৃত্রিম দয়ার স্পর্শ পেয়ে মধুসূদনের হৃদয়ও এতটা বিগলিত হয়েছিল যে তিনি ছন্দোবদ্ধ বাক্যে তাঁর প্রতি হৃদয়নিংড়ান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে গিয়েছেন :

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণে!
কিন্তু ভাগ্য-বলে সে মহা পর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ।"

সংযমহীন মধুসূদনের ভবিষ্যৎ জীবন দিব্য চক্ষে দেখতে পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে রক্ষা করবার জন্য প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হয় নি। অমিতব্যয়িতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করতে না পেরে চরম দুর্দশার মধ্যে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মধুসূদনের মৃত্যুর বহু বৎসর পর যখন যশোহর-খুলনা সম্মিলনী কবির স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের সঙ্কল্প ক'রে ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট অর্থসাহায্যের জন্য উপস্থিত হল তখন তিনি সম্মিলনীকে কোনরূপ সাহায্য করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। বলেছিলেন :

"দেখ, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যাহার জীবন রাখিতে পারি নাই, তাহার হাড় রাখিবার জন্য আমি ব্যস্ত নই।" *

* চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর।

এই মন্তব্যটিতে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। তিনি মানুষের জীবন রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করতেন কিন্তু মৃতদেহ সংকারের উদ্দেশ্যে চন্দনকাষ্ঠ আহরণের বিলাসিতা তাঁহার চরিত্রে ছিল না। মধু-প্রতিভা ঈশ্বরচন্দ্রের আশ্রয় না পেলে হয়ত আরো অকালে নষ্ট হয়ে যেত। তিনি কবিকে সাহায্য করবার জন্য প্রচুর ঋণও স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু যেখানে দেশবাসীর সহানুভূতির অভাবে বাংলার যুগসৃষ্টিকারী কবির জীবন দারিদ্র্যের পেষণে শেষ হয়ে গেল, সেখানে মৃতকে সম্মান দেখাবার জন্য স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের আয়োজনে মিলিত হতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবৃত্তি হয় নি।

সেদিন বাংলাদেশের বহু পরিবার ও ছাত্র-সমাজ বিদ্যাসাগরের নিকট হতে অর্থসাহায্য পেয়েছে। প্রকৃত পাত্রের মতই অপাত্রও প্রচুর সংখ্যায় ঈশ্বরচন্দ্রেব দাক্ষিণ্যের সুযোগ নিয়েছে। ব্যক্তিগত সাহায্যের কথা বাদ দিয়েও সমস্ত দেশ যে তাঁর নিকট হতে কত সাহায্য পেয়েছে, সে সম্বন্ধে দু' একটি কথা বোধ হয় এ স্থানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। দুটি ভাতের জন্য বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার হাহাকারে দেশ পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, তখন বিদ্যাসাগর আবির্ভূত হলেন মাতৃমূর্তিতে। একদা মধুসূদন বলেছিলেন —'আপনার হৃদয় বাঙ্গালী মায়ের মত'। কবির উক্তি এবার যথার্থরূপে দেখা দিল।

ঈশ্বরচন্দ্র জানতেন দেশভরা এই অন্নাভাবে সাহায্য করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু বাংলাদেশে সে কুবেরের ভাণ্ডার কার আছে? আর থাকলেও ক্ষুধিতের আর্তনাদ সে ভাণ্ডারকে কখনো মুক্ত করতে পারে না। তিনি চাইলেন শাসকের দিকে। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় রাজ-পুরুষগণ সক্রিয় হয়ে উঠলেন। অবস্থার অনুসন্ধান ক'রে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার বহু স্থানে সরকারী অন্নছত্র খোলা হল। দলে দলে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারী ক্ষুধার অন্ন পেতে লাগল।

কেবলমাত্র সরকারকে কর্তব্য-কর্মে অবহিত ক'রেই ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যাকুল হৃদয় শান্ত হল না। নিজ ব্যয়ে তিনি বহু লোককে আহার দেবার ব্যবস্থা করলেন। অন্নবিনা অস্থিচর্মসার দেহ, তেলহীন রুক্ষ কেশ।

এই করুণ দৃশ্য দেখে ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় বেদনায় ভরে গেল। কেবল ক্ষুধার অন্ন নয়, মাথায় একটু তেল দেবার ব্যবস্থাও তিনি ক'রে দিলেন। কিন্তু যাদের উপর তেল বিতরণের ভার পড়ল, তাদের কাজটি বিশেষ মনঃপূত হল না। সমাজের অবহেলার পাত্র, নীচ জাতি—হাড়ি, ডোম, মুচি-শ্রেণীর মেয়েদেব হাতে কোন মতে নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে তেল ফেলে দেওয়া হতে লাগল। এই অবহেলার দৃশ্য ঈশ্বরচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। দুর্গতদেব সেবায় তিনি নিজে অগ্রসর হয়ে এলেন, পরম মমতায় নীচ, অন্ত্যজ জাতির মেয়েদের রুক্ষ কর্কশ চুলকে স্বহস্তে তেলসিক্ত ক'রে দিতে লাগলেন। এই তেল বিতরণের কাহিনী বাংলাদেশে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ও স্পর্শ করেছিল। তিনি সমস্ত বাঙালির হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেছেন :

"এই ঘটনা শ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহা বিদ্যাসাগবেব দয়া অনুভব করিয়া নহে, কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে একটি নিঃসঙ্কোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচজাতিব প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানবধর্মবশতঃ ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

"তাঁহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদেব দেশে আমরা যাঁহাদিগকে ভালোমানুষ, অমায়িক-প্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণতঃ তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বেশী। অর্থাৎ, কর্তব্যস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পাবেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না।"

অন্ত্যজ নারীদের চুলে নিজের হাতে তেল মাখানোর ব্যাপারে কেউ যদি বিদ্রূপেব দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'বে থাকে ঈশ্বরচন্দ্র তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নি। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, একটি অদম্য বলিষ্ঠতা তাঁর করুণার মধ্যেও বীর্যের সঞ্চার করেছিল।

দুর্ভিক্ষের সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের অকাতর দান সরকারের অভিনন্দন লাভ করেছিল। বর্ধমান বিভাগের কমিশনার তাঁকে এই পত্রখানি লিখেছিলেন :

To

Pandit Iswar Chandra Vidyasagar,

Beersingha.

Sir,

I have been instructed by the Secretary of the Government of Bengal, under order of the 20th instant, to express to you the warm acknowledgement of the Government for your generous exertions in relieving the poor during the recent scarcity in the Hooghly District.

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant,

(Sd.) C. T. Montrisor

Commissioner, Burdwan District.

একবার সংক্রামক জ্বরে বর্ধমান আক্রান্ত হল। ঘরে ঘরে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে, আর তারই মাঝে দেখছে ওষুধ-পথ্য হাতে সেবারূপী ঈশ্বরচন্দ্র পীড়িতের শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছেন। জ্বরক্লিষ্ট-মুখে জলসিঞ্চন করছেন, পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তাপদগ্ধ দেহে।

কার্মাটারের সরল সাঁওতালদেরও হৃদয় অধিকার করেছিলেন দরিদ্রের বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র। দরিদ্রদের সাহায্য করতে গিয়ে তিনি এমনভাবে নিজের জীবন জড়িয়ে ফেলেছিলেন তাদের সঙ্গে যে, বিশ্রামের অবকাশ তাঁর পক্ষে দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। একবার অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রকে কার্মাটারে গিয়ে কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার অনুরোধ করা হল। অনুরোধের উত্তরে তিনি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে যা বলেছিলেন, আমরা বিদ্যাসাগর-চরিতকার চণ্ডীচরণের পুস্তক হতে তা উদ্ধৃত করছি :

"আমার কি যাবার পথ রেখেছি? এই এক কাজে আমি আপনাকে এমন জড়িয়ে ফেলেছি যে কোথাও যাইবার উপায় নাই। এই কথা বলিয়া অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া হস্তস্থিত একখানি তালিকা-পুস্তক

আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। তাহাতে মাসিক দানের হিসাব থাকে। ঐরূপে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে তালিকার শেষ পত্রে দেখিলাম, মাসিক দান ৮০০৲ আট শত টাকারও কিঞ্চিৎ অধিক। এগুলি সমস্তই গরীবদুঃখীদের মাসিক বৃত্তির হিসাব। এতদ্ভিন্ন সাময়িক ও এককালীন দান স্বতন্ত্র ছিল।"

কেবল জীবিতাবস্থায় নয়, মৃত্যুর পরও যেন আশ্রিতদের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র চিন্তা করতেন। এই পোষ্যগুলি যাতে অর্থাভাবে একেবারে নিরুপায় না হয়ে পড়ে সেজন্য তিনি তাঁর উইলে বিধিমত ব্যবস্থা করেছিলেন।

"আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব এবং মৃত আত্মীয় ও বন্ধুদিগের পরিবারবর্গের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার উইলে যে মাসিক দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার মোট সমষ্টি ৫৬১ টাকা আর বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ৪৫।" *

এমন ক'রে অসহায় পরিবারের কথা কেবল পিতৃহৃদয়ই চিন্তা ক'রে থাকে; ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পোষ্যদের পিতৃস্বরূপই ছিলেন। কিন্তু এই পিতৃহৃদয় বার বার আহত হয়েছে। পরদুঃখকাতর, সেবাব্রতী ঈশ্বরচন্দ্র কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছেন। যে উদার বক্ষপটে সমস্ত পৃথিবীর জন্য মমতা ছিল, মানুষের অকৃতজ্ঞতা সেখানে বিদ্বেষের সঞ্চার করেছিল। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে অনেক দুঃখে তিনি বলেছিলেন—

"তোমাদের মত ভদ্রবেশধারী আর্য্যসন্তান অপেক্ষা আমার অসভ্য সাঁওতাল লোক ভাল।"

এমনিই হয়। অযাচিত অফুরন্ত করুণাধারায় স্নান ক'রে, আমরা হীনতা দিয়ে উৎসকে আবিল ক'রে তুলি, আঘাতে আঘাতে সেই উৎসমুখের মমতাক্ষরণ-ক্ষমতা নষ্ট ক'রে দিই।

ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' উপাধি অর্জন করেছিলেন, কিন্তু জন্মেছিলেন দয়ার সাগর হয়ে। সে সাগরের মহিমা বাঙালি সঙ্কুচিত ক'রে দিয়েছিল।

যে বিরাট মানুষটির কথা আমরা বলছি, সমস্ত বাঙালি তাঁর আত্মীয় এবং বাংলাদেশ তাঁর গৃহাঙ্গন ছিল সত্য, তবু তো বীরসিংহের এক দরিদ্র

* চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর।

কুটীরে, একটি কিশোরী মায়ের কোলে তিনি জন্মেছিলেন। তাঁরও একটি গৃহ, একটি একান্ত নিজস্ব পরিবার ছিল। অনন্ত আকাশে মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ে যায় মহা ঈগল, কিন্তু তারও মনটি লগ্ন হয়ে থাকে গুহানীড়ে।

বীর্যবান, বিপুল কর্মভারে সমাচ্ছন্ন ঈশ্বরচন্দ্র একটি দিনের জন্যও মায়ের বক্ষ-নীড়, পিতার স্নেহ-শাসনপাশ হতে বিচ্যুত হন নি। সমস্ত দেশ, এমন কি রাজপুরুষ পর্যন্ত যাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের নিকট শ্রদ্ধানত, মায়ের কাছে তিনি স্নেহানুরক্ত ও পরম অনুগত ঈশ্বর। পিতার কাশীবাসের সঙ্কল্পে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত।

যে শৈশব যৌবনবয়সেও ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে লগ্ন হয়েছিল, তার একটি পরিচয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

চাকুরী করছেন ঈশ্বরচন্দ্র। দায়িত্বপূর্ণ চাকুরী। বীরসিংহ গ্রামে ঠাকুরদাসের ভবনে একবার উৎসব শুরু হয়েছে। ছেলের বিয়ে। ভাইয়ের বিয়ে, কিন্তু ঈশ্বর যে আসেনি। আনন্দের বাঁশীটি বুঝি তেমন ক'রে মায়ের বুকে বাজতে পারছে না। একটি কান আর চোখ পাতা আছে পথের পানে। বারে বারে জননী এসে দাঁড়াচ্ছেন গৃহদ্বারে, কখন আসবে ঈশ্বর—তাঁর প্রথম, তাঁর সর্বোত্তম।

এদিকে ছুটী মঞ্জুর করতে চাইছেন না লাটসাহেব। ছুটী পাওয়া যাবে না? যেতে পারবেন না ঈশ্বরচন্দ্র ভাইয়ের বিয়েতে? পাগল! মা যেতে বলেছেন। তাঁর আদেশ, তারপর কি আর কারোর আদেশ বলবৎ হবে? হার মানতে হল সাহেবকে। ঈশ্বরচন্দ্র প্রস্তুত হলেন যাবার জন্য, কিন্তু দেরী হয়ে গিয়েছে। খেয়া বন্ধ। ওদিকে উত্তাল দামোদরের পরপারে গৃহকোণে দীপটি জ্বালিয়ে অপেক্ষা করছেন মা। দামোদর দুর্দান্ত, কিন্তু সাধ্য কি তার বাধা হবে মা আর ছেলের মাঝখানে! নদে ঝাঁপ দিলেন ঈশ্বরচন্দ্র, দুর্গমকে জয় ক'রে পৌছলেন এসে মায়ের কাছে। দুঃসাহসীর সিক্তদেহে মায়ের স্নেহস্পর্শ লাগল।

জননী ভগবতী দেবী ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে প্রত্যক্ষ দেবতা ছিলেন। মায়ের দৃঢ়চরিত্র, সংস্কারমুক্ত মন বিদ্যাসাগরের সমস্ত জীবনকে প্রভাবিত ক'রে

রেখেছিল। ধর্ম সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের মনোভাব বুঝতে হলে আমাদের ভগবতী দেবীর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। একদা তিনি বলেছিলেন :

"যে দেবতা আমি নিজ হাতে গড়িলাম, সে আমাকে উদ্ধার করবে কেমন করে? বাঁশ, খড়, দড়ি, মাটিতে ঠাকুর গড়ে পূজো করে কি ধর্ম্ম হয়?" *

ভগবতী দেবীর এই কথাগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই বিতর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু সেদিনের গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঘরের কন্যা ও বধূর এই উক্তি সকলের মনেই বিস্ময়ের সঞ্চার করে। যেখানে মানুষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে নানা আচার নিয়মের গণ্ডির মধ্যে দেবতা অতি সন্তর্পণে তাঁর দেবত্ব বাঁচিয়ে চলেন, সেই হিন্দু পরিবারের গৃহিণী বলছেন শিবলিঙ্গ কিম্বা দুর্গাপ্রতিমা তাঁকে উদ্ধার করবার মত শক্তি ধরে না। ভগবতী দেবীর কথা শুনেই আমরা বুঝতে পারছি কেন ঈশ্বরচন্দ্র ধর্ম সম্বন্ধে বরাবর নিরুত্তর ছিলেন। নিজের গড়া ভগবানের পায়ে আপনাকে নিবেদন করতে, মায়ের মত তাঁরও প্রবৃত্তি হয় নি। ধর্ম সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের মনোভাব বুঝতে হলে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে শম্ভুচন্দ্রের লিখিত একটি কাহিনীর উল্লেখ করা কর্তব্য। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন :

"এক দিবস দাদা সুখাসীন হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে দুইজন ধর্ম্মপ্রচারক ও কয়েকজন কৃতবিদ্য ভদ্রলোক আসিয়া উপবেশনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়! ধর্ম্ম লইয়া বঙ্গদেশে বড় হুলস্থুল পড়িয়াছে, যাহার যা ইচ্ছা সে তাহাই বলিতেছে, এ বিষয়ের কিছুই ঠিকানা নাই; আপনি ভিন্ন এ বিষয়ের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই।' এই কথায় দাদা বলিলেন, ধর্ম্ম যে কি, তাহা মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই। ইহা শুনিয়া তাঁহারা আরও পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি বলিলেন, 'আমি পরের জন্য বেত খাইতে পারিব না।' এই বলিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন।" †

সে সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝতে পারছিলেন যে, আচারসর্বস্ব দেশজ প্রথাগুলি কখনই হিন্দুধর্ম নয়, আবার সদ্য-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মের প্রতিও সকলে আকৃষ্ট হতে পারছিলেন না. পিতৃপিতামহের

* চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর।

† শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর জীবনচরিত।

বিশ্বাস পশ্চাৎ হতে সবলে আকর্ষণ করছিল। এ সময়ে স্বতঃই বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্বন্ধে সাধারণের কৌতূহল জাগ্রত হতে পারে। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র কখনই কোন উত্তর দেন নি। রহস্য করে তিনি যে গল্পটি বলেছিলেন তার মধ্যেই বিদ্যাসাগরের নিরুত্তর থাকবার কারণ রয়েছে। বেত খাওয়া নিয়ে তিনি যে গল্পটি বলেছেন তার মর্ম ছিল এই :

একবার যমরাজ বিভিন্ন মতের উপাসকদের জিজ্ঞেস করেছিলেন. কেন তাঁরা অমুক দেবতার পূজা না ক'রে অন্য দেবতার পূজা করেছেন। উত্তরে উপাসকগণ জানালেন যে, ধর্মপ্রচারকদের নির্দেশানুসারেই তাঁরা দেবতা নির্বাচন করেছেন। শুনে যমরাজ তাঁদের, ধর্মপ্রচারকদের এবং ধর্মপ্রচারকদের উপদেষ্টা বিদ্যাসাগরকে বেত্রদণ্ডের আদেশ করলেন। অবশ্য মূল কারণ বলে বিদ্যাসাগরই অধিকতর দণ্ড ভোগ করলেন।

ধর্মতত্ত্ব অতি নিগূঢ় এবং তাকে উদ্ঘাটন করবার প্রয়াস করতে ঈশ্বরচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না। মানুষকে ভালবেসে, তাদের সেবায় তিনি নিজেকে সমর্পণ করেছেন। বিধবার অশ্রুমোচনে, শিক্ষাবিস্তারে, দুস্থের দুঃখ নিবারণে সর্বত্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ছিলেন, প্রেরণা দান করেছেন তাঁর জননী—স্বর্গাদপি গরীয়সী।

পিতার প্রভাবও ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়। অর্থ এবং খ্যাতি—সৌভাগ্যলক্ষ্মীর দুই সেবিকা যখন তাঁর সেবা করছেন তখনও বেশবাসে তিনি বীরসিংহ গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। অতি সাধারণ খাদ্য, ততোধিক সাধারণ জীবনযাত্রা, কিন্তু পরের দুঃখমোচনে অগ্রসর হলে মনে হয় তিনি সম্রাটের মত সম্পদের অধিকারী।

ঈশ্বরচন্দ্র পিতামাতার অনুরক্ত পুত্র। তাঁদের আশীর্বাদপূত হয়ে তিনি জীবন আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু মনে হয়, পারিবারিক জীবনে তিনি সম্পূর্ণ সুখী ছিলেন না। যে সহোদরদের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব এবং কৈশোরের সমস্ত আনন্দকে কঠোর সংযমে প্রশমিত করেছেন, যৌবনের আরম্ভ হতেই পারিবারিক দায়িত্ব অকাতরে বহন করেছেন, তারা তাঁকে সুখী করতে পারেন নি। এমন কি সহোদরের কোন অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে ঈশ্বরচন্দ্র প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামও ত্যাগ করেছিলেন।

একমাত্র পুত্র এবং আত্মীয়স্বজনদের ব্যবহারে তিনি যে কতদূর মর্মাহত হয়েছিলেন, কি নিদারুণভাবে যে সংসারী জীবনের প্রতি সমস্ত আসক্তি হারিয়েছিলেন সে বিষয় জননীর নিকট লিখিত তাঁর পত্রের উদ্ধৃতাংশটি লক্ষ্য করলেই হৃদয়ঙ্গম হয় :

"পূজ্যপাদ শ্রীমন্মাতৃদেবী শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনমিদম্—

নানাকারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে পূর্ব্বের মত নানা বিষয়ে সংসৃষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। এজন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃতভাবে অতিবাহিত করিব।"

যিনি শৈশব হইতে সংসারের বহু ঝঞ্ঝাট অকাতরে বহন ক'রে আসছিলেন, তাঁর এই সংসাব-বৈবাগ্য সবার মনেই বেদনার সঞ্চার করে। স্বতঃই মনে হয় যে, এ বৈরাগ্যের কাবণ স্বজনদেব প্রতি নিদারুণ অভিমান। এ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র যে পত্রখানি লিখেছিলেন তাতেই তাঁর মনঃকষ্টের কারণ বোঝা যায়। অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি লিখেছিলেন :

"......সাংসারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি সে বিষয়ে কোন অংশে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। ... সংসারী লোকে যে সকল ব্যক্তির কাছে দয়া ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহাদের একজনেরও অন্তঃকরণে যে, আমার উপর দয়া ও স্নেহের লেশমাত্র নাই সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই।"

উদ্ধৃত চিঠি দুটিতে ঈশ্বরচন্দ্রের মানসিক ভাবের পরিচয় পেয়ে বহুদিনের ওপার হতে আমাদের হৃদয়েও বেদনার বিদ্যুৎ এসে স্পর্শ দিয়ে যায়। যাঁর স্নেহ-মমতায় সেদিন বাঙালি জীবনের সমস্ত দিকগুলি আশ্রয় লাভ ক'রে বিকশিত হয়েছিল, তিনি নিজে মমতাবঞ্চিত হয়ে বলছেন—'আমার মত

হস্তভাগ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।' বিদ্যাসাগরের স্থায় বলিষ্ঠ পুরুষের এই কাতর বিলাপ মনকে আকুল ক'রে তোলে।

ঈশ্বরচন্দ্রের অসুখী পারিবারিক জীবন লক্ষ্য ক'রে আমাদের মনে প্রশ্ন উদিত হয়—তাঁর এই দুঃখের কারণ কি? দয়া শব্দ যাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যোগ্য মর্যাদা লাভ করেছে, আর্তের রোগশয্যায় যিনি জননীর মত, দীনের কুটীরে যিনি সৌভাগ্যের ন্যায় বিচরণ করতেন, তাঁর প্রতি স্বজন বিমুখ হতে পারে এও কি বিশ্বাসযোগ্য কথা! ঈশ্বরচন্দ্রের স্থায় অগ্রজ, পিতা, স্বামী এবং স্বজন মানুষ বহু জন্মের সুকৃতির ফলেই লাভ করতে পারে। এই পরম-আকাঙ্ক্ষিত বান্ধবকে দুঃখে জর্জরিত করে তাঁর স্বজনগণও যে চরম দুঃখকে আহ্বান ক'বে এনেছিলেন তাতে তো বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই। তারপর আর একটা কথা। সমস্ত বাংলাদেশের দুর্গতজনের যিনি পরমনির্ভর ছিলেন, তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনে অসুখী হবার মত এমন কি কারণ থাকতে পারে? তবে কি যে প্রদীপ আলো বিকিরণ ক'রে ঘরের আঁধাব সরিয়ে দেয়, কিন্তু নিজের পদপ্রান্তের অন্ধকারটুকু দূর করতে পারে না তারই মত ঈশ্বরচন্দ্রেরও ক্ষমতা ছিল না স্বজনদের সুখী করবার এবং সেই জন্যই সুখী হলেন না তিনি নিজেও?

ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্রেব যে পত্র তাঁর জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পুস্তকে স্থান দিয়েছেন তাতে আমবা দেখি অনুতপ্ত সন্তান কৃতকার্যের জন্য পবম বেদনায় দেবতাব মত পিতার পদতলে বারবার আত্মসমর্পণ করছেন। যে পুত্র এমন কাতর হ'য়ে মার্জনা চাইতে পারে তাকে ক্ষমা করবার জন্য কোন্ পিতৃহৃদয় না উন্মুখ হয়ে ওঠে, সমস্ত বিরুদ্ধভাবও বিরূপ মনোবৃত্তিকে পরাজিত ক'বে সন্তানকে বক্ষে না টেনে নেয়। তারপর, অগ্রজকে দুঃখ দিয়ে অনুজদের অনুশোচনাও লক্ষ্য করা যায়। অনুতপ্তকে ক্ষমা না করবার যে দুঃখ হয়ত ঈশ্বরচন্দ্রকে তাও বিশেষভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে। মনে হয় বিশেষ ক'রে এই জন্যই তিনি সুখী হতে পারেন নি, বেদনা পেয়েছেন।

আমাদের মনে হয় বিদ্যাসাগরের অতিরিক্ত দৃঢ় চরিত্রই এই বেদনা আমন্ত্রণ করে এনেছিল। প্রিয়জনের জন্য আমাদের বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং এই জন্য হয়ত মাঝে মাঝে নিজ আদর্শকেও কিছুটা খর্ব না ক'রে উপায়

থাকে না। অবশ্য যাঁরা আদর্শকে স্নেহের, প্রেমের জন্য খর্ব করেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে দুর্বলতার স্থান ছিল না, সুতরাং আদর্শকে খর্ব করবার কথাই ওঠে না। কিন্তু অবস্থা ও পরিস্থিতির সঙ্গে একটা আপোস কোন কোন ক্ষেত্রে চলতে পারে, এবং এইখানেই গণ্ডগোল ছিল। ইংরেজী Compromise শব্দটির ব্যবহারিক অর্থের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের নিদারুণ অবহেলা ছিল। কোন পরিস্থিতির সঙ্গেই তিনি আপোস ক'রে চলতে পারতেন না। এই ক্ষেত্রে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগরের চরিত্র সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তার উল্লেখ বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতসভা স্থাপিত হলে ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রথম সভাপতির পদ গ্রহণ করবার প্রস্তাব নিয়ে শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাসাগরের নিকট গিয়েছিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

"যখন একটা সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহন বাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বলিলেন, 'এতদ্দ্বারা দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে।' আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। কে কে এই উদ্‌যোগের মধ্যে আছেন জিজ্ঞাসা করাতে আমরা যখন অপরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে ····· দলের নাম করিলাম, তখন বিদ্যাসাগর বলিয়া উঠিলেন, "যাঃ! তবে তোমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। ওদের এর মধ্যে নিলে কেন?"

আনন্দমোহন বাবু ও আমি বলাবলি করিতে করিতে ফিরিলাম যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতি তো জানাই আছে, তাঁহার কাছে স্বর্গ ও নরক ভিন্ন মাঝামাঝি স্থান নাই। যাকে ভাল জানিবেন তাকে স্বর্গে দিবেন, যাকে মন্দ জানিবেন তাকে একেবারে নরকে দিবেন। ······প্রতি বোধ হয় কোন কারণে বিরক্ত হইয়াছেন, আর ওদের নামও সহিতে পারেন না।"*

---

* আত্মচরিত : শিবনাথ শাস্ত্রী।

অবশ্য লেখক পরে দুঃখের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন যে, বিদ্যাসাগরের উক্তি যথার্থ বলেই প্রমাণিত হয়েছিল।

যাহা হোক, পারিবারিক জীবনে এই অনমনীয়তাই ঈশ্বরচন্দ্রকে সুখী হতে দেয় নি। যে-অন্যায় একটি মৃদু তিরস্কারে, স্নেহসজল দৃষ্টিপাতে নিমেষে দূর হয়ে যেতে পারত, অনমনীয় চরিত্রের বশবর্তী হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র তাকে অনেক বড ক'রে তুলেছেন এবং ফলে প্রচুর দুঃখও পেয়েছেন।

দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পরিজনদের দয়া হতে বঞ্চিত করেন নি। নানাভাবে তাঁদের সর্বদা সাহায্য করেছেন। কিন্তু দয়া তো কেবল এক পক্ষের দান, দাতার তাতে আত্মতৃপ্তি ঘটতে পারে। মমতা যেমন আদান-প্রদানে উভয় পক্ষকেই মাধুর্যমণ্ডিত ক'রে জীবনকে সরস ও লোভনীয় ক'রে তুলতে সক্ষম, দয়ার সে সম্পদ নেই। দাতা তাঁর সিংহাসনে বসে নতজানু কৃপাপ্রার্থীর অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে দিয়ে কেবল তাব প্রণিপাত লাভ করেন। আর মমতা দু'জনকে এক পর্যায়ে এনে হৃদয় বিনিময় করিয়ে দেয়। সেই জন্যই বুঝি বৃন্দাবনে গোপাল সেজে ভগবান একদিন রাখাল বালকদের উচ্ছিষ্টে অমৃতের অধিক স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন। মমতা অপরাধীকে ক্ষমা করতে শেখায়, ক্ষুরধার যুক্তিকে স্নেহের প্রলেপে কমনীয় ক'রে, তার তীক্ষ্ণত্বেব হ্রাস করে।

মনে হয় আত্মীয়দের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের মমতার আকুলতা ছিল না, তাইতো মহাপ্রান্তরে একক বটবৃক্ষের মত ঈশ্বরচন্দ্রের দোসর কেউ নেই। আপোস করে চলবার মত মনোবৃত্তির অভাবে ঈশ্বরচন্দ্র কেবল যে পারিবারিক জীবনে অসুখী হয়েছেন তা নয়, তাঁর কর্মজীবনেও বহু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। যেখানে অনেক ব্যক্তি একত্র হয়ে কোন কাজে হাত দেয়, সেখানে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটবে এবং তাকে ক্ষমা ক'রে কাজ চালিয়ে যেতে হবে এই হচ্ছে যৌথ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কথা। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সহকর্মীদের বিচ্যুতি সহ্য করতে পারতেন না এবং সেইজন্য অনেক বিষয়ে অগ্রসর হতে গিয়েও থেমে গেছেন। মনে হয় যদি এই বিরাট পুরুষের মধ্যে আপোস ক'রে চলবার মত সহগুণ থাকত তাহলে তিনি আরও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গঠন করতে পারতেন।

একথা সত্য যে, যতই প্রচণ্ড মনোবল থাকুক, কঠিন আদর্শের ধ্রুবতারা যাত্রাপথ নির্দেশ করুক, তবু নানা ভুলে ভরা ছোট গৃহকোণের শয্যাটিই পরিশ্রান্তের জন্য বিশ্রামের অবকাশ রচনা ক'রে রাখে, কর্মে নব উদ্যম এনে দেয়। ঈশ্বরচন্দ্রের গৃহ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং আমরা অনুমান করতে পারি, তাতে পরিজনদের মত ঈশ্বরচন্দ্রের নিজেরও অংশ ছিল।

॥ আট ॥

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা আলোচনা করতে গেলেই আমাদের স্মরণ-পথে কাঞ্চনবিগ্রহসম এক পুরুষ এসে উপস্থিত হন। বাংলাদেশে তিনি এমন আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন যে বাঙালির জড়তা ঘুচে গিয়েছিল। আঘাতে-প্রতিঘাতে, সংস্কারে প্রগতি-চিন্তায় তিনি সমস্ত দেশকে এমন ব্যস্ত ক'রে তুলেছিলেন যে বাঙালির আর আলস্য করবার সময় ছিল না। ইংরেজ শাসনের সতর্ক ছায়ায় একটি দীর্ঘ নিদ্রা দেবার বড় সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু রামমোহন ঘরের দ্বারগুলি সম্পূর্ণ উন্মোচন ক'রে আলোক-বন্যায় সমস্ত অন্ধকারকে হটাবার আয়োজন করলেন। বাঙালির আর চোখ বন্ধ ক'রে থাকবার উপায় ছিল না। সে বড় কঠিন সময়। পথ নাই, নাই সম্মুখে নিশ্চিত পোতাশ্রয়ের সঙ্কেত, তবু যাত্রা করতে হবে। রামমোহন একহাতে আকর্ষণ করলেন নিদ্রিত দেশবাসীকে, অন্যহাতে পাথর ভাঙলেন পথ বানাতে। কত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। প্রতিকূলতা প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে। রাজশক্তি প্রতিকূল, দেশবাসী বিমুখ, তবুও শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন যুগপুরুষ নবযুগকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য জীবনবলি নিয়ে যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর একটি স্মরণীয় দিন। প্রধানত রামমোহনের চেষ্টা ও আন্দোলনের ফলে এবং লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আদেশে ঐদিন সমস্ত ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে সতীদাহ নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হ'ল। বন্ধ হ'ল নারীমেধ। জলন্ত আগুনে মেয়েকে পুড়িয়ে মারা বন্ধ হ'ল বটে, কিন্তু বিধবা মেয়ের দুঃখ দূর করবে কে? বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহের ফলে বাংলার ঘরে ঘরে কত বালিকা, কিশোরী, উদ্ভিন্নযৌবনা বিধবা! রামমোহন যে এদের কথা চিন্তা করেন নি এমন নয়। ভবিষ্যৎ ভারতের ভূমিকাভূমি তাঁর প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভায় অন্যান্য সামাজিক সংস্কার-আলোচনার সময়ে বাল্য বিবাহ, অকালবৈধব্য ও বহু বিবাহ সম্বন্ধেও আলোচনা

হ'ত। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে আত্মীয়সভার একটি বিবরণীতে আমরা লেখা দেখতে পাই :

"At the meeting in question......the necessity of an infant widow passing her life in a state of celibacy, the practice of polygamy and of suffering widows to burn with the corpse of their husbands, were condemned."

কিন্তু কেবল ধিক্কার দিলেই কোন সামাজিক কুপ্রথা বন্ধ হয় না, বিশেষ ক'রে ধর্মের অনুশাসনে যার ভিত্তি সুদৃঢ় করে গাঁথা হয়েছে। বহু বিবাহ এবং অকালবৈধব্যও নিবারিত হয় নি। অবশ্য সতীদাহ রোধ করবার জন্য রামমোহন যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, অন্যগুলির ক্ষেত্রে তা করতে পারেন নি, করবার সময়ও তিনি পান নি।

রামমোহনের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরে নবজাগ্রত নবীন বাংলা এর বিরুদ্ধে কিছু চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হতে পারে নি। রাজশক্তিই প্রতিকূলতা করেছে। ভারত অধিকার ক'রে ইংরেজ এদেশের সর্বক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করেছিল, কেবল ধর্মে হাত দেয় নি। হয়ত তারা বুঝেছিল যে, এ দেশের প্রাণ ধর্মে। ধন-মান হরণ করলে সহ্য হবে, কিন্তু ধর্মে আঘাত লাগলে সমস্ত জাতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। সুতরাং ইংরেজ বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য কোন আইন পাশ করল না।

রামমোহনের অসমাপ্ত কর্তব্যভার গ্রহণ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। তিনি দেখলেন বালিকা, কিশোরী এমন কি শিশু পর্যন্ত এই কঠোর সামাজিক প্রথার পায়ে আত্মবলিদান করছে। তাদের অশ্রুসিক্ত করুণ মুখগুলি ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়কে বেদনায় মথিত ক'রে দিল। তিনি দেখলেন অকল্যাণচিহ্ন-লাঞ্ছিত কিশোর ললাট, সর্বসম্ভাবনাহীন উদ্ভিন্নজীবন বাংলা দেশকে বাঙালি জাতিকে অহরহ চরম অবনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যে নারীকে বাঙালি দুর্গা, লক্ষ্মীর মহিমায় প্রতিষ্ঠা ক'রে আদর্শ হিসাবে পূজা করে, বাস্তব জীবনে তার লাঞ্ছনার শেষ নেই। রিক্তাভরণা শুভ্রবেশা ভগ্নী, কন্যা অর্ধাহারে, উপবাসে গৃহকোণে মুখ লুকিয়ে রাখে। কোন শুভকাজে, আনন্দ-উৎসবে এই সব অমঙ্গলাদের স্থান নেই। তাদের স্পর্শে অকল্যাণ, দর্শনে যাত্রা অশুভ। এই

অকরুণ বাল-নির্যাতন, শিশুর হাহাকার তখন দেশের নব্য সমাজের প্রাণ চঞ্চল ক'রে তুলেছিল, নানা তর্ক, সমালোচনাও চলছিল। কৃষ্ণনগররাজ শ্রীশচন্দ্র বিধবাবিবাহ প্রচলন সম্বন্ধে কিছু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সামাজিক প্রতিকূলতায় অধিকদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। পণ্ডিতসমাজে যাঁরা বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে মনে করতেন, তাঁরাও সমাজের ভয়ে সে কথা স্বীকার করতেন না। বিধাতার কঠিন নির্দেশের উপর সমাজ নির্মম হাতে তার অনুশাসনের শৃঙ্খল রচনা করেছে। তেজস্বী ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর ভাবলেন তিনি ছিন্ন ক'রে দেবেন এই বন্ধন। অতঃপর তিনি বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। রামমোহনের ন্যায় বিদ্যাসাগরও অকুতোভয় ছিলেন। একবার তিনি যে বিষয় কর্তব্যকর্ম বলে গ্রহণ করতেন, তাঁর হৃদয় যেখানে যুক্তির সঙ্গে মিলিত হ'ত, সেই কাজ হ'তে ঈশ্বরচন্দ্র সহজে নিবৃত্ত হতেন না। রামমোহনের কাজে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ বাধা দিত, বিরূপ সমালোচনা করত কিন্তু যখন বিদ্যাসাগর ঘোষণা করলেন—বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত তখন সমস্ত হিন্দু সমাজ একযোগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারল না।

বাংলাদেশে তখন 'তত্ত্ববোধিনী'র যুগ। তত্ত্ববোধিনীকে কেন্দ্র ক'রে দেবেন্দ্রনাথ একটি সারস্বত সমাজের সৃষ্টি করেছেন। রাজনীতি, সমাজকল্যাণ, শিক্ষা, ধর্ম—মানুষের প্রত্যেকটি কল্যাণকর বিষয় নিয়ে তত্ত্ববোধিনীতে আলোচনা হ'ত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিধবাবিবাহ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' এই নামে প্রবন্ধটি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হ'ল।

রামমোহনের ন্যায় ঈশ্বরচন্দ্রও জানতেন শৃঙ্খলে যে আবদ্ধ করে, শৃঙ্খল মোচনের মন্ত্রও তার জানা আছে। শাস্ত্রীয় অনুশাসনে হিন্দু বিধবা যে জীবন যাপনে বাধ্য, শাস্ত্রের অনুমোদন না পেলে হিন্দু কখনই সেই প্রচলিত রীতির সংস্কারে অগ্রসর হবে না। জীবন্ত নারীকে জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়ে মারতে দেখেও রামমোহন অসীম ধৈর্যে শাস্ত্রের পাতার পর পাতা অনুসন্ধান ক'রে, যুক্তি সংগ্রহ ক'রে হিন্দুর শাস্ত্রশাসিত মনকে অনুকূল করতে চেয়েছেন। যদি তিনি কেবল হৃদয়াবেগের উপর আবেদন ক'রে সতীদাহ আন্দোলন আরম্ভ করতেন, তাহলে মুহূর্তে পরম প্রগতিপন্থী হিন্দুও মুখ ফিরিয়ে নিত এবং সেই

বিরুদ্ধতা দেখে রাজশক্তিও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকত। রামমোহন তাই শাস্ত্রীয় যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন সতীদাহ প্রথা বন্ধ হলে হিন্দুর ধর্মহানি ঘটবার বিন্দুমাত্রও ভয় নেই। বহু হিন্দু অগ্রসর হয়ে রামমোহনের সঙ্গে যোগ দিল, স্বাক্ষর দিল রামমোহনের সঙ্গে আবেদনে। প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রাচীন সমাজ আর তার বর্বর প্রথাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারল না। তার উচ্ছেদের পরোয়ানা জারি করল রাজশক্তি।

বিদ্যাসাগরও এই পথই গ্রহণ করলেন। বিধবাবিবাহ ধর্মসঙ্গত কিনা এ বিষয়ে আলোচনার প্রথমেই তিনি লিখলেন—

"বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বাগ্রে এই বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক যে, এদেশে বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত নাই সুতরাং বিধবার বিবাহ দিতে হইলে এক নূতন প্রথা প্রচলিত করিতে হইবেক। কিন্তু বিধবাবিবাহ যদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম না হয়, তাহা হইলে কোনক্রমেই প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। কারণ কোন্ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন? অতএব অগ্রে ইহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা অতি আবশ্যক। কিন্তু যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরা কখনই ইহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই এতদ্দেশীয় লোকেরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ এবং শাস্ত্রসম্মত কর্ম্মই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম এই বিষয়ের মীমাংসা করাই অগ্রে আবশ্যক।"

প্রাচীন সমাজের মুখ বন্ধ করবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র প্রথমেই শাস্ত্রীয় নির্দেশের প্রতি আনুগত্য জানালেন, অবশ্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় একথাও জানাতে ভুললেন না যে শাস্ত্রের অনুশাসনের নিকট এদেশে তর্ক, যুক্তি কিংবা বিচারের সিদ্ধান্ত তুচ্ছ। যা হোক, ঈশ্বরচন্দ্রের পুস্তকখানি প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু সমাজের প্রাচীন এবং নবীন দুই দলের মধ্যেই এমন আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেল যে রামমোহনের সতীদাহ আন্দোলন যেন তার কাছে তুচ্ছ বলে

মনে হতে লাগল। সতীদাহের নিষ্ঠুরতা স্বার্থান্ধ আত্মীয় এবং ধর্মান্ধ পুরোহিত ব্যতীত সকলেরই বোধ হয় হৃদয় স্পর্শ করত। সুতরাং, প্রকাশ্যে না হলেও অন্তরে বহু ব্যক্তিই তখন এই প্রথার বিলোপ কামনা করতেন। কিন্তু বিধবার পুনর্বিবাহ! কি ভয়ানক কথা! যে ভদ্রলোক পরলোকে প্রস্থান করেছেন, কৃচ্ছ্রসাধনায় ক্ষীণতনু বিধবাই একদিন তার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়ে, স্থগিত গৃহস্থালী পুনরায় আরম্ভ করবে, এই ত শাস্ত্রের চমৎকার বিধান। এর মধ্যে আবার বিয়ের কথা ওঠে কোথা হতে? আবার বিয়ে? তার মানে স্বামী, সন্তান, সংসার-সুখ? সর্বনাশ! যে ধর্ম কলিযুগের নানা অনাচার সহ্য করেও কোনমতে নারীজাতির পবিত্র সংযম-তপস্যার মধ্যে বেঁচে আছে তাকে নষ্ট করবার জন্য এ কি ষড়যন্ত্র! পাষণ্ড বিদ্যাসাগরের উপর সমাজ ক্ষেপে উঠল। পত্র-পত্রিকায় ব্যঙ্গাত্মক আলোচনা, কবির গানে বিদ্রূপ। শান্তিপুরের তাঁতীরা শাড়িতে পাড় বুনে দিল:

"বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,
সদরে করেছে রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে।"

কিন্তু বিধবাবিবাহ-বিরোধী আন্দোলন বিপুল হলেও সমাজের যে-স্তরে নূতন চেতনার সঞ্চার হয়েছিল সেই পাশ্চাত্যশিক্ষিত নব্যদল ঈশ্বরচন্দ্রকে অভিনন্দিত করলেন, অগ্রসর হয়ে এলেন তাঁকে সাহায্য করতে।

বিদ্যাসাগরের এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হবার পর দেশের সর্বত্র যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল, সে সম্বন্ধে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন:

"বিধবাবিবাহ পুস্তক প্রচারিত হইবামাত্র, লোকে এরূপ আগ্রহ প্রদর্শন-পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, এক সপ্তাহের অনধিক কাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে উৎসাহান্বিত হইয়া অগ্রজ মহাশয়, আবার তিন সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাও অনতি-বিলম্বে শেষ হইতে দেখিয়া, পুনর্ব্বার দশ সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করেন। ঐ পুস্তক এরূপ আগ্রহ সহকারে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইতেছে দেখিয়া তিনি পরম আহ্লাদিত হইলেন। কি বিষয়ী, কি শাস্ত্রব্যবসায়ী, অনেকেই উক্ত প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে প্রচার করিয়াছিলেন। যে বিষয়ে সকলে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন বলিয়া অগ্রজের স্থির

সিদ্ধান্ত ছিল, সেই বিষয়ে অনেক শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া, উত্তর-পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া, তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। অগ্রজ মহাশয়, ঐ উত্তর-পুস্তকগুলি দেখিয়া, শাস্ত্রজলধি-মন্থন-পূর্ব্বক প্রত্যেকের হিসাবে প্রত্যেক প্রত্যুত্তর পরিচ্ছেদগুলি লিখিয়া একত্র সংগ্রহ করিয়া, দ্বিতীয় পুস্তক মুদ্রিত করেন।"*

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভেও দেখা গেল এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে :

"কয়েক বৎসরেব মধ্যে বিধবাগণের পুনঃসংস্কার প্রচলিত হইবাব বিষয় এতদ্দেশে বারম্বার উত্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এ বৎসর এই বিষয় লইয়া যাদৃশ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাদৃশ আন্দোলন অন্য কোন বৎসর হয় নাই। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব প্রণীত বিধবাবিবাহ বিষয়ক যে পুস্তক পূর্ব্বমাসেব পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই ঐ আন্দোলনের মূলীভূত। অপর সাধারণ সকল লোকেই ঐ পুস্তক অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত বিষম ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে, ইদানীং ঐ বিষয়ই সর্ব্বত্র সকল লোকের কথোপকথনের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশযেরা শঙ্কিত ও চমকিত হইয়া বিধবাবিবাহেব নিষেধক বচনের অন্বেষণার্থ অতি বিবর্ণ, কীট নিস্কুশিত পুরাতন জীর্ণ পুস্তক প্রভৃতি অশেষ গ্রন্থ উদ্‌ঘাটন ও পর্য্যালোচন করিতেছেন; কুসংস্কাব-পরতন্ত্র প্রাচীন সম্প্রদায়ী ধনাঢ্য মহাশযেবা আপনাদিগেব ··পণ্ডিত বর্গকে পাবিতোষিক প্রদানেব আশ্বাস দিয়া বিদ্যাসাগব প্রণীত পূর্ব্বোক্ত পুস্তক নিরাকরণার্থ নিয়োজন করিতেছেন, কি ইংরেজী কি বাঙ্গলা, এতদ্দেশীয় সমুদায় সংবাদপত্রই ঐ বিষয়েব কল্পনায়, ঐ বিষয়ের আলোচনায়, ও ঐ বিষয়ের বিচারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে ঐ বিষয়ের অনুকূল ও প্রতিকূল দ্বিবিধ সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়া ঘোবতর বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ ঐ বিষয়ে সপক্ষ হইয়া উহার সংসাধনার্থ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ কবিতেছে। কেহ কেহ শাস্ত্র ও যুক্তি এই উভয়ের কিছুই অবলম্বন না করিয়া চিরাবলম্বিত কুসংস্কারবশতঃ বিষম বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছে। কেহ কেহ ঐ বিষয় প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছেন,

* শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ; বিদ্যাসাগর জীবনচরিত

কিন্তু দলপতির ক্রোধাশঙ্কায় অথবা লোকানুরাগের ব্যতিক্রম ভয়ে বাক্যস্ফুট করিতে সমর্থ হন না।

…উল্লিখিত পুস্তকে বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার বিষয়ে যেরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত বিষয় শাস্ত্রানুসারে বৈধ বলিয়া এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসেই বিশ্বাস হইতে পারে। আজ যাঁহারা নিরপেক্ষ যুক্তিপথ অবলম্বন করিয়া বিবেচনা কবিবেন, বিধবাবিবাহ এই দণ্ডেই প্রচলিত করা আবশ্যক বলিয়া তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে।”

বিধবাবিবাহ প্রচলন নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক চলতে লাগল কিন্তু এই বাদানুবাদের ফল কি হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। দেশে শাস্ত্র ও ধর্মের অভিভাবক হলেন পণ্ডিতসমাজ। কঠিন দেবভাষার অবরোধ ভেদ ক'রে শাস্ত্রের মর্মোদ্ধার করবার মত শক্তি ও প্রবৃত্তি দেশের সাধারণ লোকের নেই। সুতবাং তাঁরা একবার ঈশ্বরচন্দ্রেব অন্য বার বিরুদ্ধপক্ষীয়দের মতের মধ্যে আন্দোলিত হতে লাগলেন। তারপর ঈশ্ববচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বর্ষিত ব্যঙ্গ এবং কটূক্তিও বিরুদ্ধপক্ষের সমালোচনাগুলিকে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছিল। বিদ্যাসাগরেব নিন্দা পডবাব জন্য অনেক লোক আগ্রহে নূতন পুস্তিকার জন্য অপেক্ষা করে থাকত। অনেক দুঃখে ঈশ্বরচন্দ্র তাই লিখেছিলেন:

“এদেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্ম্মশাস্ত্র বিচারের এক প্রধান অঙ্গ, ইহাব পূর্ব্বে আমি অবগত ছিলাম না।”

বিরুদ্ধপক্ষের যুক্তিকে শাস্ত্রের সাহায্যেই ঈশ্বরচন্দ্র খণ্ডিত করতে লাগলেন, তারপর মানুষেব হৃদয়ের নিকট আবেদন কবলেন। বাঙালিকে ডেকে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন:

“হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচাব দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে।…অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিসকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নিরস হৃদয়ে কারুণ্য-রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচার দোষে ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল

স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমার প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ,··· কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক, তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধান দোষে সংসাবতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতিব দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।"

প্রবন্ধের শেষে মর্মচ্ছেদী হাহাকারে বিদ্যাসাগর বললেন:

"হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।"

দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যখন ঈশ্বরচন্দ্র প্রাণপাত করছিলেন, দেশ ভবে তাঁর নাম পুণ্যশ্লোক রূপে উচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু বিধবাবিবাহ প্রচলন-প্রয়াসী ঈশ্বরচন্দ্রের বিরুদ্ধে সমাজ কটু বিষ উদ্‌গিরণ কবতে লাগল। রামমোহন যেদিন সতীদাহ নিবারণেব জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, দেশ তার চেয়ে এসময়ে আধুনিকতর হয়ে উঠেছিল, কিন্তু বিধবাবিবাহ মেনে নেবার মত মনোভাব আসতে তখন পর্যন্ত বহু বিলম্ব ছিল। কেবল কুৎসা ও অপপ্রচার করেই প্রাচীনপন্থিগণ নিবস্ত রইলেন না, বিদ্যাসাগরের প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্রও হতে লাগল।

রামমোহনের ন্যায় ঈশ্বরচন্দ্রও জানতেন যে, নবীন বাংলা তাঁকে সমর্থন করলেও সংস্কার-মোচনের জন্য রাষ্ট্র অগ্রসর হয়ে না এলে, যতক্ষণ বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত বলে বিধিবদ্ধ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই আন্দোলনের কোন

সার্থকতা নেই। রাজ্যশাসনের প্রথম পর্যায়ে ইংরেজ ভারতীয়দের কোন প্রথার উপরেই হস্তক্ষেপ করতে চাইত না। সতীদাহ-নিবারণ সম্বন্ধেও তাদের অনেকেরই আপত্তি ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিনের অধিকার ইংরেজশাসনকে ক্রমেই দৃঢ় ভিত্তি দান করছিল, সুতরাং কুসংস্কারগুলি বন্ধ করবার জন্য আইন প্রণয়নে কুণ্ঠাও তাদের কিছুটা দূর হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বুঝেছিলেন বাদানুবাদ, আলোচনা মানুষের মনকে নূতন জিনিষ গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত ক'রে দিতে পারে, কিন্তু তাকে স্বীকৃতি দেবাব জন্য প্রয়োজন রাজার আইনের। সুতরাং তিনি বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত বলে বিধিবদ্ধ করাব জন্য চেষ্টা আবম্ভ করলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত বলে বিধিবদ্ধ করবার জন্য ৯৮৭ জন ব্যক্তিব স্বাক্ষরসহ একটি আবেদন সরকারসমীপে প্রেরণ করলেন।

আবেদনের সঙ্গে তিনি এই পত্রখানি দিয়েছিলেন:

To

W. Morgan, Esquire,

Clerk to the Honourable the Legislative

Council of India.

Sir,

On behalf of the petitioners, I have the honour to forward herewith the petition of certain Hindoo inhabitants of the province of Bengal, which I beg to request you will do me the favour to lay before the honourable Council at their next sitting.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient Servant
Sd/- Eshwar Chandra Sharma.

Calcutta
Sanskrit College
The 4th October, 1855.

আবেদনপত্রের মর্ম ছিল যদিও বহু প্রচলিত দেশাচার মতে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ বস্তু বলে সর্বজনস্বীকৃত বিষয় তথাপি, আবেদনকারিগণের বিশ্বাস যে, এই নিষ্ঠুর প্রথা কেবল অশাস্ত্রীয় নয়, এতে সামাজিক বহু অকল্যাণেরও সৃষ্টি হয়। যদিও তাঁরা সামাজিক বাধা অগ্রাহ্য ক'রে বিধবা-বিবাহ প্রচলনে প্রস্তুত হয়েছেন কিন্তু বিধবাবিবাহ আইন অনুসারে সিদ্ধ বলে বিধান না হলে এই বিবাহজাত সন্তান অবৈধ বলে গণ্য হবে। সুতরাং বিধবা-বিবাহের সমস্ত বাধা দূর করবার জন্য এই বিবাহকে বৈধ বলে স্বীকার ক'রে আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয়েছে।

১৮৫৫ সালের ১৭ই নভেম্বর ব্যবস্থাপক সভার সভ্য গ্রাণ্ট সাহেব বিধবা-বিবাহ আইনসঙ্গত বলে পাণ্ডুলিপি রচনা করলেন। তাতে লেখা হ'ল :

১। হিন্দু বাগদত্তা কন্যা ভাবী স্বামীর মৃত্যু হলে কিম্বা বিধবা নারী পুনরায় বিবাহ করলে সে বিবাহ এবং বিবাহজাত সন্তান আইন অনুসারে বৈধ বলে গণ্য হবে।

২। মৃত স্বামীর বিষয়ে পুনর্বিবাহিতা নারীর অধিকার থাকবে না কিন্তু তা ব্যতীত অন্যসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি এবং স্ত্রীধনের প্রতি তার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে।

গ্রাণ্ট সাহেব বিধবাবিবাহ-আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করলেন। এ সময়ে আন্দোলন সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। নানা স্থান হতে বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করে সরকারের কাছে আবেদন আসতে লাগল। বাংলা দেশে যাঁরা সতীদাহের বিরোধিতা করে ধর্মসভা স্থাপন ক'রে প্রতিবাদ-পত্র পাঠিয়েছিলেন তাঁরা তখনো হিন্দু সমাজের কর্ণধার। রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে একটি তীব্র বিরুদ্ধপক্ষ গঠিত হ'ল এবং তাঁরা ৩৬,৭৬৩টি স্বাক্ষর-সম্বলিত এক আবেদনপত্র সরকারসমীপে প্রেরণ করলেন।

কিছু বৎসর পূর্বে এই ঘটনা হলে, দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর এক অংশের তীব্র বিরোধিতা ভারতসরকার হয়ত উপেক্ষা করতে পারতেন না, হয়ত ঈশ্বরচন্দ্র পরাজিতই হতেন। কিন্তু রাজত্ব স্থিতিস্থাপকতা লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে নিরাপত্তাবোধের সঞ্চার হয়েছিল। তাছাড়া, যে-দেশকে উন্নত করা শ্বেতজাতির কর্তব্যকর্ম বলে তারা পৃথিবীতে

প্রচার করছিল, সে দেশ একটা কুসংস্কারের কূপ হয়ে থাকুক এও তাদের কাম্য ছিল না। সুতরাং বহু তর্কবিতর্ক-আলোচনার পর ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা-বিবাহ আইনসঙ্গত বলে বিধিবদ্ধ হ'ল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই এই আইন পাশ হয়। আইনের প্রথম ও ষষ্ঠ ধারাটি উদ্ধৃত হ'ল :

ACT XV OF 1856, DATED 26 JULY 1856

1. No marriage contracted between Hindoos shall be invalid and the issue of no such marriage shall be illegitimate by the reason of the woman having been previously married or betrothed to another person, who was dead at the time of such marriage. Any custom and any interpretation of Hindoo law to the contrary notwithstanding.

VI. Whatever words spoken, ceremonies performed or engagements made on the marriage of a Hindoo female, who has not been previously married, are sufficient to constitute a valid marriage, shall have the same effect, if spoken, performed or made on the marriage of a Hindoo widow; and no marriage shall be declared invalid on the ground that such words, ceremonies or engagements are inapplicable to the case of a widow.

বহু বিরোধ অতিক্রম ক'রে জয়ী হলেন বিদ্যাসাগর। বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত বলে বিধিবদ্ধ হ'ল, কিন্তু প্রকৃত কাজের তখন পর্যন্ত অনেক বিলম্ব। দেশের লোক বিধবাবিবাহ সমর্থন করতে পারে, সভাসমিতি, আবেদন প্রভৃতি প্রত্যেক কাজে ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহায্য করতে এগিয়েও এসেছিল অনেকে। কিন্তু বিধবাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত ছিল কয় জন? কে ভাগ্যবঞ্চিতার রিক্ত সীমন্ত নূতন সৌভাগ্যরেখায় রক্তিম ক'রে দেবার মত মনোবল ধারণ করে? এই সত্য জানতেন বলেই 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত বিদ্রূপ ক'রে লিখলেন :

'শ্রীমান ধীমান, নীতিনির্মাণকারক।
যাঁরা সবে হতে চান, বিধবাতারক॥

নতভাবে নিবেদন, প্রতিজনে জনে।
আইন বৃক্ষের ফল, ফলিবে কেমনে?
গোলে-মালে হরিবোল, গণ্ডগোল সার।
নাহি হয় ফলোদয় মিছে হাহাকার॥
বাক্যের অভাব নাই, বদন ভাণ্ডারে।
যত আসে তত বলে, কে দূষিবে কারে?
সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায়?
কিছুই না হতে পারে, মুখের কথায়॥
মিছামিছি অনুষ্ঠানে, মিছে কাল হরা।
মুখে বলা বলা নয়, কাজে কাজ করা॥

ঈশ্বর গুপ্ত বোধ হয় তখন পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের কার্যক্ষমতা ভাল ক'রে বুঝতে পারেন নি, তাই এই কথা বলেছিলেন। কিন্তু কেবল মুখের কথা নয়, কাজেও অগ্রসর হয়ে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র। বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তাঁর একান্ত চেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত বলে ঘোষিত হবার ছ'মাসের মধ্যেই প্রথম বিধবাবিয়ে হ'ল। পাত্র খাটুয়া গ্রামের বিখ্যাত কথকতা-বিশারদ রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং পাত্রী বর্ধমানের পলাশডাঙ্গা গ্রামের ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতী। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ১২ নম্বরের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হল। বহুলোক সমাগমে মুখোপাধ্যায়-ভবন উৎসবের রূপ ধারণ করেছিল।

এই বিবাহ সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকরে' জনৈক ব্যক্তি একটি পত্রে লিখেছিলেন :

"সভায় দুই সহস্র লোক উপস্থিত ছিল যথার্থ বটে কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশ অনিমন্ত্রিত রঙ্গ-দর্শক। ইহারা কেহই তথায় ভোজন করেন নাই এবং বিধবা-বিবাহ বৈধ বলিয়া নাম স্বাক্ষরও করেন নাই; সুতরাং ইঁহাদিগকে তন্মতা-বলম্বী বলা যাইতে পরে না। ইংরাজগণের বিধবা অথবা সমাধিদর্শনে অনেক ক্রিয়াকলাপ-বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত হিন্দু গমন করিয়া থাকেন, অনেকে অগত্যা কসাই-টোলার গোহত্যাও দর্শন করিয়া থাকেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের কোন দোষ আইসে না।"

বিরুদ্ধপক্ষের প্রতিবাদের তীব্রতা এই পত্রটিতে অনুভব করা যায়। অবশ্য 'তত্ত্ববোধিনী', 'সংবাদ ভাস্কর' প্রভৃতি পত্রিকা যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ ক'রে উৎসাহ দান করেছিল।

বিধবাবিবাহের সমর্থক ও উদ্যোক্তাদের যে কি পরিমাণ সামাজিক নির্যাতন সহ্য করতে হ'ত তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের নিকট সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় ছিল তাঁর বন্ধুদেব ব্যবহাব। তাঁবা অনেকেই বিধবা-বিবাহ সমর্থন করতেন এবং বিবাহেব ব্যয়েব জন্য বিদ্যাসাগরকে অর্থসাহায্য করতে অঙ্গীকারও কবেছিলেন কিন্তু কার্যকালে সকলেই বিপরীত আচরণ আরম্ভ করলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিধবাবিবাহ নিবাহেব জন্য প্রচুব ঋণ কবতে বাধ্য হয়েছিলেন, বন্ধুদের পশ্চাদপসরণে সে ঋণ শোধ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। বন্ধু ডাক্তাব দুর্গাচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে বিদ্যাসাগর তাঁব তিক্ত অভিজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন :

"আমি ক্রমাগত কয়েকদিনই চেষ্টা কবিয়া দেখিলাম কিন্তু তোমাব কাগজ খোলাসা করিয়া দিবার উপায় করিতে পারিলাম না। সুতরাং সত্বর তোমার কাগজ তোমাকে দিতে পারি এমন পথ দেখিতেছি না। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবা-বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে লইয়াছিলাম, কেবল তোমার নিকট নহে অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এসকল কাগজ এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবাবিবাহ পক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্যদান অঙ্গীকার করিয়াছেন তদ্দ্বারা অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন।

উত্তরোত্তর এবিষয়ের ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু আয় ক্রমে খর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। সেই সকল ব্যক্তি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলে আমাকে এরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইত না। কেহ মাসিক কেহ এককালীন কেহ বা উভয় এইরূপ নিয়মে অনেকে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কোন হেতু দেখাইয়া কেহ বা তাহা না করিয়াও দিতেছেন না। অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহায্যদান স্বাক্ষর কর। এককালীনের অর্দ্ধমাত্র দিয়াছ অবশিষ্টার্দ্ধ এপর্য্যন্ত

দাও নাই এবং কিছুদিন হইল মাসিক দান রহিত করিয়াছ। এইরূপে আয়ের অনেক খর্বতা হইয়া আসিয়াছে কিন্তু ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং এই বিষয় উপলক্ষে যে ঋণ হইয়াছে তাহার সহসা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমি এই ঋণ পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ কবিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে তোমার প্রয়োজনের সময়ে তোমাকে তোমার কাগজ দিতে পারিলাম না এজন্য অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্ম্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনেপ্রাণে মারা পডিলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক কেহ ভুলিয়াও এবিষয়ের সংবাদ লয়েন না।" *

কেবল বন্ধুদেব সহানুভূতিহীনতা এবং অসহযোগ নয়, বিদ্যাসাগরের নিকট হতে অর্থ পেয়ে যারা বিধবাবিবাহ কবল, দেখা গেল তাদের মধ্যে অনেকেই অর্থলোভে বিধবাবিবাহের নামে বহুবিবাহ করেছে। প্রবঞ্চনা ও অকৃতজ্ঞতার মাত্রাহীনতা বিদ্যাসাগরের হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিল, তবু একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে লিখলেন:

"ইতিপূর্ব্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম, সে বিধবাবিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কর্ম্ম হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক; আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না

* চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বিদ্যাসাগর

করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবা-বিবাহ-প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নবাধম আর কেহ হইত না। অধিক আব কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে, আমি আপনাকে চবিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলেব নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা কবিব, লোকের বা কুটুম্বেব ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না। অবশেষে আমাব বক্তব্য এই যে, সমাজের ভযে বা অন্য কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহার-ব্যবহাব করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সে জন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবে এরূপ বোধ হয় না, এবং আমিও তজ্জন্য বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না।”

পত্রটি পাঠ করলে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের বীর্যবান হৃদয়ের একটি পরিষ্কার চিত্র দেখতে পাই। বিধবাবিবাহের জন্য সত্যই তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখ ও প্রবঞ্চনা যতই লাভ হোক না কেন, বঞ্চিত নারী-হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধাও ঈশ্বরচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়েছিল। শম্ভুচন্দ্র এই সম্বন্ধে লিখেছেন:

“যখন তিনি পদব্রজে পথে যাইতেন, অনেক স্ত্রীলোক একদৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করিত। কারণ, এতাবৎ দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষে অনেক ধনী ও গুণীলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু হতভাগিনী বিধবা স্ত্রীলোকদের প্রতি কেহ কখন বিদ্যাসাগরের মত দয়া প্রকাশ করেন নাই।”

কথাটি অতি সত্য। শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে, সামাজিক নির্যাতন হতে রক্ষা করবার ব্যবস্থা ক'রে, ঈশ্বরচন্দ্র চিরদিনের জন্য নারীসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

সমাজ-সংস্কার করবাব কাজে অগ্রসর হ'লে, সমস্ত দেশেই দেখা যায় যে নূতন কোন সম্ভাবনাব স্থচনায় মানুষ দলবদ্ধ হযে বাধা দেয়। রামমোহনের সময় তাই হয়েছিল, বিদ্যাসাগরকেও সমাজেব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হ'ল।

রামমোহনের ন্যায় ঈশ্বরচন্দ্রও বহুবিবাহপ্রথাকে অত্যন্ত দূষণীয় বলে মনে করতেন। বাংলা দেশে বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্যপ্রথাই বহুবিবাহকে সযত্নে লালন করছিল। এই প্রসঙ্গে বঙ্গদেশে সেনবংশীয় বাজা বল্লাল সেনের প্রবর্তিত কৌলীন্যপ্রথার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কথিত আছে, একদা বাংলার ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় নাকি বেদ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হারিয়েছিলেন এবং বৈদিক ক্রিয়াতে এই সব আচারভ্রষ্টদের অভিজ্ঞতা আর ছিল না। তাই রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন। পাঁচজনের ৫৬ টি পুত্রসন্তানকে ৫৬ খানা গ্রামে বাস করতে দিয়ে, তাঁদের সেই সমস্ত গ্রামের নামে ৫৬ টি গাঁইয়ে ভাগ করা হয়। কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণদের আগমনের পূর্বে বাংলা দেশে যে সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁরা সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বলে সমাজের নীচুস্তরে পরিণত হলেন। তাঁদের ব্রাহ্মণ বলে বিশেষ কোন সামাজিক সম্মান আর রইল না। এদিকে আদিশূরের বংশের পর বাংলার সিংহাসনে বসলেন সেনবংশ। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণসন্তানদের মধ্যেও ক্রমবর্ধিত আচারভ্রষ্টতা দেখে তাঁদেব অবনতি বন্ধ করবার জন্য, রাজা বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করলেন। তিনি বললেন—

আচারোবিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠাতীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

অর্থাৎ, আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা

ও দান কৌলীন্যের লক্ষণ এই নয়টি গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে উচ্চ সামাজিক মর্যাদা দেবার জন্য রাজ-অঙ্গীকার প্রচারিত হ'ল। এর পর হতে বাঙালি ব্রাহ্মণগণ পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে গেলেন—কুলীন, শ্রোত্রিয়, বংশজ, গৌণকুলীন ও সপ্তশতী।

যে গুণেব উপর নির্ভর ক'রে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল, কিছুদিনের মধ্যে সেগুলি প্রায় নষ্ট হবার উপক্রম দেখে দেবীবর ঘটক ব্রাহ্মণদের দোষ-গুণানুসাবে পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ে বিভক্ত ক'বে দিলেন এবং তার নাম দিলেন মেল। কুলীনদের এইরূপে ছত্রিশটি মেলে বদ্ধ কবা হ'ল। দেবীবর ঘটকের এই মেলবন্ধনই বাংলার কন্যাদেব সর্বনাশ ডেকে আনল। ঘরে ঘরে আজীবন কুমারী কুলীন-কন্যা কিম্বা বহুপত্নীক ব্রাহ্মণের নামেমাত্র স্ত্রীপরিচয়-প্রাপ্তা নারীর অশ্রুবন্যা বয়ে যেতে লাগল।

বল্লাল সেনের কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তনের ফলে কুলীনদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। এই 'সর্বদ্বারী' বিবাহের নিয়ম থাকাতে এক ব্যক্তির বহু পত্নী গ্রহণ করবার কারণ ঘটত না, কিম্বা স্বঘরের অভাবে কোন কন্যা আজীবন কুমারীও থাকত না। কিন্তু দেবীবর সীমাবদ্ধ ঘর করাতে, এক পাত্রে বহু কন্যা দান করা হতে লাগল এবং পাত্রের অভাবে বহু কন্যা আজীবন কুমারী থাকল। সুতবাং কৌলীন্য-মর্যাদা স্থাপন ক'রে বল্লাল সেন ব্রাহ্মণগৌরব বৃদ্ধি করবাব জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন; তাকে মেলবন্ধনে শৃঙ্খলিত করেই দেবীবর ঘটক বহুবিবাহ প্রথার উদ্ভব ঘটালেন।

বহুবিবাহ ক্রমে ক্রমে কুলীন ব্রাহ্মণদের জীবিকা-অর্জনের প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়াল। শতপত্নীক কুলীন বৃদ্ধকেও কিশোরী বালিকার পাণিগ্রহণ করতে দেখা যেত। কুলরক্ষার জন্য কুলীনগণ গাছের সঙ্গে ভগ্নী ও কন্যার বিবাহ দেবার প্রহসন করেছেন, এমন কথাও শোনা গেছে। বহুবিবাহের পথ ধরে কত অন্যায় ও অনাচার যে সমাজে বাসা বেঁধেছিল তার ইয়ত্তা নেই।

কৌলীন্যের নয়টি গুণের মধ্যে একটি গুণ ছিল আবৃত্তি, যার অর্থ পরিবর্ত। পরিবর্ত আবার চার রকমের—আদান, প্রদান, কুশত্যাগ এবং ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা। এই কথাগুলি প্রথম শুনলে অর্থহীন শব্দ বলে মনে হবে, কিন্তু

বিস্তারিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হবার পর আজ অনেকেই ভাববেন যে, মেয়েদের জীবন নিয়ে যে-সমাজ এমন ছিনিমিনি খেলেছে তাকে, অর্থাৎ তার নিরূপিত বিধিকে সম্মান করলে মনুষ্যত্বের চরম অবমাননাই ঘটবার সম্ভাবনা। কুলীনের কন্যাগত কুল। সৎকুলে কন্যাদান এবং সৎকুল হতে কন্যা গ্রহণ না করলে তার কুলমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত। সুতরাং কন্যাহীন কুলীনের জন্য দু'টি বিকল্প ব্যবস্থা স্থির হ'ল। কুশ দিয়ে কন্যা প্রস্তুত ক'রে তাকে দান করলে কিম্বা ঘটকের সামনে কন্যাদানের প্রতিজ্ঞা করলেও কুলীনের কুল থাকবে। জীবন নিয়ে কি ভয়ানক প্রহসন!

বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ-প্রথা নিবারণ করবার জন্য ইতিপূর্বেই কিছু কিছু আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। ইংরেজী-শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে সকল সমাজ-কল্যাণমূলক সংস্থা স্থাপন করেছিলেন, সেখান হতে বহুবিবাহ-প্রথা বন্ধ করবার জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদনও করা হয়েছিল। বিধবাবিবাহ আইনসম্মত করবার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বহুবিবাহ নিবারণ করবার জন্যও চেষ্টা আরম্ভ করলেন। তিনি জনসাধারণের নিকট নিজের যুক্তি বুঝিয়ে দেবার জন্য "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার" নামে দুইখানি গ্রন্থ লিখলেন। তারপর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ভারতসরকারের নিকট বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইন-প্রণয়ন প্রার্থনা ক'রে বিদ্যাসাগর একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করলেন। সতীদাহ নিবারণ ও বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টার সময়ে দেশে যেরূপ প্রতিকূল জনমত গঠিত হয়েছিল, বহুবিবাহ-নিবারণ সম্বন্ধে সেরূপ বিরুদ্ধতা দেখা গেল না। একথা সত্য যে, হৃদয়ের অনুশাসনের অপেক্ষা আর কোনও অনুশাসন বড় হতে পারে না। প্রবৃত্তি যতই প্ররোচনা দিক না কেন, অনুরক্ত বধূকে আর একটি সপত্নী এনে দিতে অতি বড় পাষণ্ডও কুণ্ঠিত না হয়ে পারে না। কুলরক্ষার দায়ে কন্যাকে শতপত্নীক বৃদ্ধের পায়ে বিসর্জন করবার সময় পিতার হৃদয়ও বেদনায় ভরে যায়। সুতরাং বহুবিবাহের বিপক্ষে একটি নীরব প্রতিবাদ ধীরে ধীরে জন্ম লাভ করছিল। বিদ্যাসাগর যখন আইন করে এই প্রথা বন্ধ করতে চাইলেন, নানাস্থান হতে বহুবিবাহরোধ-নীতি সমর্থন ক'রে বহু আবেদনপত্র ভারতসরকারের সমীপে পৌছতে লাগল। কিন্তু বহুবিবাহ-প্রথা লুপ্ত হোক

এটা চাইলেও সামাজিক সমস্ত বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত বলে বহু ব্যক্তি সরকারী আইন প্রণয়নে প্রতিবাদ জানালেন।

বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করবার সময় ভারতসরকার যে দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন, বহুবিবাহের সময়ে কিন্তু তা দেখা গেল না। সরকার যেন আবার তাঁর ভারতশাসনের প্রথম দিনের ধর্মনিরপেক্ষতামূলক শাসন-নীতিতে ফিরে গেলেন। সরকারী নীতির এই পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হতে ভারত-শাসনভার চিরদিনের জন্য স্খলিত হয়ে গেল। ভারতবর্ষের অধিশ্বরী হলেন ভিক্টোরিয়া এবং ধর্ম-সম্বন্ধীয় নিরপেক্ষতামূলক নীতি পুনরায় দৃঢ়ভাবে ঘোষিত হ'ল।

নানা কাবণে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছিল। কিন্তু একদল বলতে লাগলেন—বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করবাব ফলে হিন্দুর চিরাচরিত ধর্মে আঘাত লেগেছে এবং যে সব কারণে বিদ্রোহ ঘটেছে তার একটি হ'ল বিধবা-বিবাহ আইন।

ইংবেজ কতদূব একথা বিশ্বাস করল তা বোঝা গেল না সত্য, কিন্তু বহু-বিবাহ আইন ক'রে, নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হ'ল না। তাঁরা জানালেন যে বহুবিবাহ কুপ্রথা হলেও ভারতবাসী যখন আইনের দ্বারা এই প্রথা বন্ধ হওয়া সমর্থন করে না, তখন ভারতসরকার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চান না। তা'ছাড়া, বহুবিবাহ একটি ধর্মসংশ্লিষ্ট সামাজিক প্রথা। সরকার বললেন :

"It must be remembered that polygamy as it exists in India, is a social and religious institution...and Governor-General-in Council doubts whether the great difficulty of dealing with the subject in India, or even in Bengal, has been fully considered. As regards the latter Province, there is nothing in the papers before Government which, in the opinion of the Governor-General in Council, would lead a calm and unbiased enquirer to the conclusion that a large majority of even the more enlightened people of the

Province will be found to be heartily against polygamy, apart from the special abuses practised by the *Coolin Brahmins.*"

বিধবাবিবাহ-আন্দোলন অপেক্ষা বহুবিবাহনিরোধ-আন্দোলন অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করেছিল। কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয় কৌলীন্যপ্রথা-পীড়িত পূর্ববঙ্গেও তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যায়। পুস্তিকা, গ্রাম্য কবির গান, কবিতা প্রভৃতির হাতিয়ার নিয়ে বহুব্যক্তি এই কুৎসিত প্রথার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন। এই আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিক্রমপুরনিবাসী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তিনি নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ হ'য়েও বহুবিবাহ বন্ধ করবার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। লোকসঙ্গীত রচনায়ও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পটুত্ব ছিল। তাঁর একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল। এতে বহুবিবাহের চিত্র অতি পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হয়েছে :—

"কোন পাপে মোর জন্ম হল কুলীন কুলে।
দিলেম যৌবনরতন, কাকের মতন,
বুড়মামার গলে তুলে।
বাতাসে হেলে পড়ে, কথাতে দন্ত নড়ে,
করেতে যষ্টি নিয়ে চলে ধীরে।
এমন অস্থিসারা আধামরা,
দেখে আমার অঙ্গ জ্বলে।
যে আমায় বাছা বলে, স্নেহে নিয়েছে কোলে,
তার কোলে প্রেমের ডালি দেই কি বলে।
এমন মেল বেন্ধেছে যে দেবীবর
খ্যাঙ্গরা মারি তার কপালে।"

বিবাহব্যবসায়ী কুলীনদের সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর 'বহুবিবাহ' পুস্তকে লিখেছেন :

"এদেশের ভঙ্গকুলীনদের মত পাষণ্ড ও পাতকী ভূমণ্ডলে নাই। তাঁহারা দয়া, ধর্ম, চক্ষুলজ্জা ও লোকলজ্জায় একেবারে বর্জিত। তাঁহাদের চরিত্র অতি বিচিত্র। চরিত্র বিষয়ে তাঁহাদের উপমা দিবার স্থল নাই। তাঁহারাই তাঁহাদের একমাত্র উপমাস্থল। কোনও অতিপ্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ঠাকুরদাদা মহাশয়! আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া হয় কি?" তিনি অম্লানমুখে উত্তর করিলেন, 'যেখানে ভিজিট পাই, সেইখানে যাই'। গত দুর্ভিক্ষের সময়, একজন ভঙ্গকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন। তিনি লোকের নিকট আস্ফালন করিয়াছিলেন, এই দুভিক্ষে কত লোক অন্নাভাবে মারা পড়িয়াছে, কিন্তু আমি কিছুই টের পাই নাই; বিবাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছি। গ্রামে বারোয়ারী পূজার উদ্যোগ হইতেছে। পূজার উদ্যোগীরা ঐ বিষয়ে চাঁদা দিবার জন্য কোন ভঙ্গকুলীনকে পীড়াপীড়ি করাতে তিনি চাঁদার টাকা সংগ্রহের জন্য একটি বিবাহ করিলেন। বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থ লইয়া গেলে, কোন ভঙ্গকুলীন দয়া করিয়া তাঁহাকে আপন আবাসে অবস্থিতি করিতে অনুমতি প্রদান করেন, কিন্তু সেই অর্থ নিঃশেষ হইলেই, তাঁহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।"

উদ্ধৃত বর্ণনাটি কল্পনা মাত্র হলেও এতে আজ আমাদের দেহ-মনে শিহরণ জাগে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের বর্ণনা কল্পনা নয়, রূঢ় বাস্তব। বিবাহের নামে, সামাজিক সম্মান রক্ষার জন্য মেয়েদের প্রতি এমন বীভৎস অত্যাচার বুঝি বাংলাদেশ ব্যতীত আর কোথাও ছিল না।

বহুবিবাহ অবশ্য সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত একটি সামাজিক প্রথা। কিন্তু কৌলীন্য-মর্যাদার সঙ্গে জড়িত হয়ে বাংলা দেশে এর ফল অতি ভয়ানক হয়ে উঠেছিল। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ শুধু বিবাহ করাকেই জীবিকা অর্জনের উপায় বলে গ্রহণ করে একের পর এক বিবাহ করে যেতেন। বিবাহের সংখ্যা বহু ক্ষেত্রে তিন অঙ্কেও পর্যবসিত হ'ত। কুলীনদের কুল হয়ত রক্ষা পেত কিন্তু পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকত কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। উচ্চ আদর্শের কথা বলে, কঠিন সামাজিক শাসনে বেঁধে, জীবনকে সর্বক্ষেত্রে প্রস্তরে পরিণত করা যায় না, সুতরাং স্খলন-পতনকে বহুক্ষেত্রে সমাজপতিরা দেখেও দেখতেন না।

বহুবিবাহ আইন ক'রে বন্ধ করা গেল না; কিন্তু বিদ্যাসাগর আন্দোলন হতে বিরত হলেন না। অসুস্থ দুর্বল দেহ নিয়েও তিনি এই সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে লাগলেন। তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হল না। নূতন শিক্ষা

এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রভাবে সর্বত্র বহুবিবাহ নিন্দিত হয়ে উঠতে লাগল। রাজার নিকট আবেদন সেদিন ব্যর্থ হলেও মানুষের হৃদয়ের কাছে বিদ্যাসাগরের আবেদন সফল হয়েছিল।

সমাজ-সংস্কার করতে গিয়ে রামমোহন যে প্রবল সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়েছিলেন, প্রবলতা কিছু কম হলেও বিদ্যাসাগরকেও তীব্র প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হল। শিক্ষাব্রতী, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি রক্ষণশীল দল যে কত অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং তিনি চরিত্রের দৃঢ়তায় তাদের কিরূপে প্রতিহত করেছিলেন সে সম্বন্ধে ১২৯৮ সালের ২০শে ভাদ্রের হিতবাদী পত্রিকায় ডঃ অমূল্যচরণ বসুর লিখিত বিবরণ উল্লেখযোগ্য :

"বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইলে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিত; কেহ পরিহাস করিত, কেহ গালি দিত। কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার করিবার এমন কি মারিয়া ফেলিবারও ভয় দেখাইত। বিদ্যাসাগর এ সকলে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। একদিন শুনিলেন, মারিবার চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতায় কোন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে মারিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। দুর্বৃত্তেরা প্রভুর আজ্ঞা পালনের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। বিদ্যাসাগর কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। যেখানে বড় মানুষ মহোদয়, মন্ত্রিবর্গ ও পারিষদগণে পরিবৃত হইয়া প্রহরীরক্ষিত অট্টালিকায় বিদ্যাসাগরের ভবিষ্যৎ প্রহারের কাল্পনিক সুখ উপভোগ করিতেছিলেন, বিদ্যাসাগর একবারে সেইখানে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলেই অপ্রস্তুত ও নির্বাক হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ গত হইলে একজন পারিষদ বিদ্যাসাগরের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, লোক-পরম্পরায় শুনিলাম, আমাকে মারিবার জন্য আপনাদের নিযুক্ত লোকেরা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমার সন্ধানে ফিরিতেছে ও খুঁজিতেছে। তাই আমি ভাবিলাম, তাহাদিগকে কষ্ট দিবার আবশ্যক কি, আমি নিজেই যাই। এখন আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। ইহা অপেক্ষা উত্তম অবসর আর পাইবেন না। লজ্জায় সকলে মস্তক অবনত করিলেন।"

কেবল ঈশ্বরচন্দ্রই একা নন, তাঁর বন্ধু এবং অনুগামী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সামাজিক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল।

॥ নয় ॥

উনিশ শতক একটি আশ্চর্য যুগ। বারে বারে সে আমাদের অভাবনীয়ের উপহারে চমৎকৃত করেছে, দেশকে উপস্থিত ক'রে দিয়েছে আধুনিকতার দেহলীতে। তখন একটি বিরাট কর্মযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছিল, তাতে আত্মোৎসর্গ করলেন কত মনীষী। সমস্ত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রচনা হ'ল তাঁদের বিপুল কর্মের মধ্যে।

কর্মমুখর উনিশ শতক! কথাটা মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। বাংলা তো দীর্ঘদিন ধরে তার নিরুপদ্রব জীবনযাত্রার মধ্যে নিশ্চিন্তে বসে ছিল। কত রাজপরিবর্তন হয়েছে, বিপ্লব এসেছে। নাদির শাহ, আহম্মদ শাহের দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে দিল্লীকে লক্ষ্য করে। ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে রাজ্য এবং মানুষ। কিন্তু তাতে সুদূর বাংলার নিস্তরঙ্গ জীবনে সামান্য বিক্ষোভ জেগেছে মাত্র। প্রশ্ন জাগে উনিশ শতকে এ দেশ হঠাৎ এমন করে জেগে উঠল কেন? কেমন ক'রে এক অপূর্ব তারুণ্যে চঞ্চল হয়ে বাঙালি আধুনিক গতিবেগের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নিল!

অতীতের দিকে ফিরে চাইলে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হন কাঞ্চন-বিগ্রহসম এক পুরুষ --রাজা রামমোহন রায়। এক হাতে তিনি সুপ্ত জাতির ঘুম ভাঙ্গাচ্ছেন. অন্য হাতে একে একে খুলে দিচ্ছেন দৃঢ়বদ্ধ বাতায়ন। অরুণালোকে গৃহ প্লাবিত—বাংলাদেশে শুরু হয়ে গিয়েছে নবজাগরণ।

নবজাগরণ শব্দটি কেবল শ্রুতিমধুর নয়, তার মধ্যে একটি প্রতিশ্রুতিও আছে। ক্লান্তি কর্মক্ষমতা হরণ করলে নিদ্রা আসে তার সর্বশ্রান্তিহরা বিশ্রাম নিয়ে। শ্রান্তি-ক্লান্তির অবসানে জাগরণ কি অপূর্ব! দেহে নূতন কর্মশক্তির সঞ্চার, নূতন সম্ভাবনা সম্মুখে। অবসাদ এবং নবজাগরণ প্রত্যেক সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী ফল। একটি জাতি তার সভ্যতার শিখরপ্রান্তে পৌঁছে একদিন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তার সমস্ত গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। আর কিছু করবার নেই ভেবে তখন সে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেয়। মনে হয় বুঝি সে অতীতে চলে গেল,

কেবল পুরানো ইতিহাসেই তার সভ্যতার কাহিনী গুটি-দুই পাতা অধিকার ক'রে থাকবে। কিন্তু সহসা দেখা যায়, সুপ্ত জাতি আবার নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তার অবলুপ্ত-প্রায় অবসন্ন জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার করছে, তার নব জাগরণ ঘটেছে। কিন্তু নবজাগরণের অর্থ কি কেবল একটি জাতির পুরাতন ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন, না সে নূতন আদর্শেরও সৃষ্টি করে? জাগরণ তো নূতনের সম্ভাবনা নিয়েই আসে। যে আলোড়নের ফলে জাতির তামসমুক্তি ঘটে, তাই আবার নূতন শক্তিকেও প্রকাশ করে দেয়। যা সঞ্চিত ছিল জাতির মগ্নচৈতন্যে, সংবৃত ছিল ব্যক্তিমানসে তার বৈদ্যুতিক বিস্ফোরণ ঘটে এবং সেই নবজাগ্রত সৃজনীশক্তি ধর্ম, সাহিত্য, কলা, রাষ্ট্র ও মানবের কল্যাণচিন্তায় নব আদর্শের সৃষ্টি করে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি নূতন যুগের সংযোজন ক'রে দেয়।

একদা অন্তর্বিপ্লবে সমস্ত ইয়োরোপ বিপর্যস্ত, আলোড়িত হয়ে উঠেছিল, এবং তারি ফলে ঘটল তার নবজাগরণ। নবজাগরণের কি সহস্রমুখী রূপ! নূতন তথ্যের উদ্ঘাটন হল, পুনরুদ্ধার হ'ল প্রাচীন গ্রন্থরাজীর। দুঃসাহসীর দল নূতন দেশের সন্ধানে সমুদ্রাভিযান করল; অবিস্মরণীয় সাহিত্য, কাব্য ও চিত্রকলায় মহা ঐশ্বর্যবতী হয়ে উঠল ইয়োরোপ।

নবজাগরণ কেবল নূতন তথ্য এবং দেশ আবিষ্কারের প্রেরণাই দিল না, মানুষের জীবনরহস্যকেও উদ্ঘাটন করে দেখাল সে। নবজাগরণের একটি প্রধান লক্ষণ দেখা গেল, ধর্মের সার্বভৌম অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। যে অতীন্দ্রিয় শক্তির পায়ে মানুষ নিজেকে সমর্পণ করে বসেছিল, কার্য-কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হবার পর, তার মুষ্টি শিথিল হয়ে গেল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে শাস্ত্রীয় অনুশাসনকে মানুষ যুক্তির আলো ফেলে বিচার করতে চাইল।

ইয়োরোপের নবজাগরণের সংবাদ পেল বাঙালি। উনিশ শতকে ভারতবর্ষে যে নবজাগরণ ঘটল তার ভিত্তিভূমি বাংলাদেশ, আর উদ্বোধক রামমোহন রায়। ইংরেজী শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ক'রে তিনি ইয়োরোপের সংবাদ জানালেন বাঙালিকে। সেই অভিনবত্বের সম্মুখীন হয়ে সমস্ত জাতি চকিত হল। দেখল সে যখন তার মধ্যযুগের শিক্ষা, ধর্ম ও ধারণা নিয়ে বসে আছে,

পৃথিবীতে তখন যুগান্তর ঘটে গেছে। নূতন চিন্তা, নব-নব আবিষ্কারে সমস্ত সভ্য জাতি এক মহান কর্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত আর বাঙালি নিজের গঠিত শৃঙ্খলে নিজেকে আরো দৃঢ় ক'রে বাঁধছে। রামমোহন জাতিকে তার অতীতাশ্রয় হতে মুক্ত করবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন, তাঁকে অনুসরণ করলেন মুষ্টিমেয় বাঙালি।

ইংরেজ এদেশে বাণিজ্য করতে এসে তার ভেদনীতির সাহায্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল, অধিকার করেছিল দেশ। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে তারা এদেশে একদল জমিদার সৃষ্টি করল। মধ্যযুগের ইয়োরোপের সামন্তদের মত এই অভিজাত সম্প্রদায় ভারতে ইংরেজশাসনকে দৃঢ়ভিত্তি দেবে, তাদের সাহায্যে অবদমিত হবে গণশক্তি এই হয়ত ব্রিটিশ শাসকদের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু এই সঙ্গে অভ্যুদিত হ'ল একদল বুদ্ধিজীবী মানুষ। তাঁরা ইংরেজী শিখে, রাজসরকারের চাকুরী ক'রে দ্রুত একটি বিত্তবান ও বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে ফেললেন। এঁরা কর্মব্যপদেশে ইংরেজী শিখেছিলেন কিন্তু ইয়োরোপের নবজাগরণের সংবাদ তাঁদের অনুপ্রাণিত করল। তাঁরা ইতিহাসে পড়লেন স্বাধীনতার জন্য অপূর্ব সংগ্রাম—সর্বস্বার্থ ত্যাগ। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, সাহিত্যের উদার আকাশ তাঁদের এক নূতন জগতের সন্ধান দিল। বাঙালিকে, বাংলাদেশকে তাঁরা জাগাতে চাইলেন; বললেন নূতন যুগের আবির্ভাবের কথা। এই নবোদ্ভূত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হতেই উদ্ভব হয়েছিল রামমোহনের।

নবজাগরণের বাহন শিক্ষা এবং সংস্কার হল তাঁর প্রথম কাজ। যা জীর্ণ, যা জীবনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে, তার নবরূপায়ণ হল সংস্কার। সংস্কারের উদ্দেশ্য পুরাতনের ধ্বংস নয়, তাকে যুগোপযোগী রূপ দান করা। রামমোহন শিক্ষা এবং সমাজ-সংস্কারের জন্য সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর অনুগামীদের রামমোহনের ন্যায় তীব্র গতিবেগ না থাকলেও, তাঁরাও স্কুল-কলেজ, সভা-সমিতি স্থাপন এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে জনগণকে যুগ-সচেতন করতে চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের চেষ্টা একেবারে বিফল হল এ কথা বলা চলে না, কিন্তু মুষ্টিমেয় বাঙালি এই নূতন শিক্ষার কথা, সংস্কারের কথা বুঝলেন এবং তাকে জীবনে গ্রহণ করলেন। জনসাধারণ

কিন্তু রয়ে গেল মধ্যযুগের জীবনের মধ্যে। ইংরেজী শিখলে সন্তানের কর্মসংস্থান হবে এটা তারা বুঝত, কিন্তু আধুনিক শিক্ষা কিম্বা তার পতাকাবাহী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে জনগণ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারত না। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইংরেজী শিখে সরকারী কর্ম ক'রে, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছিলেন। তাঁদের তুলনায় এবং ইংরেজের ভূমি-সংক্রান্ত আইনের কবলে পড়ে, প্রাচীন জমিদার শ্রেণী ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। অনেকক্ষেত্রে জমিদারদের জমিদারীও তাই এদের হাতে চলে যেতে লাগল। এইরূপে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় দেশের অর্থনৈতিক নেতৃত্ব লাভ করছিলেন। কিন্তু সামাজিক নেতৃত্ব ছিল রক্ষণশীলদের আয়ত্তে। জনসাধারণ নব্যদলের শিক্ষা, বিচারবুদ্ধি আশ্চর্য হয়ে দেখত, কিছু শ্রদ্ধাও করত কিন্তু নিজেদের সযত্নে তাদেব কাছ হতে দূরে সবিয়ে রাখত। সুতরাং স্কুলকলেজে দেশ ভরে গেলেও হিন্দুর শাস্ত্রশাসিত মন পুরাতনের বন্ধন হতে মুক্তি কামনা করল না। আধুনিক শিক্ষা আবদ্ধ রইল ক্ষুদ্র একটি দলের মধ্যে।

রামমোহন জাতির ঘুম ভাঙ্গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই নবজাগ্রত চেতনায় যুগের দীপ্তি অতি প্রখর বলে মনে হ'ল। মানুষেব মনে দেখা দিল একটা ভয়। সর্বস্ব হারাবার, গোত্রচ্যুত হবার ভয়। অতি আধুনিক প্রগতিবাদী মনও যে একটা আধ্যাত্মিক আশ্রয় চায়, একথা বুঝেই যেন রামমোহন উপনিষদের 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' ব্রহ্মকে তাঁদেব সামনে এনে দিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন আবির্ভূত হলেন তখনো জনসাধারণের মন সংশয়ে দোদুল্যমান। আধুনিক যুগকে তারা নিজের বলে, এই যুগের পথিকৃৎদের আপন বলে চিনতে পারছে না। হয়ত ভাবছে—নব্যদল দেহে বাঙালি, হিন্দু; কিন্তু তাদের মধ্যে বসে আছে বিধর্মী বিদেশী মন। হিন্দু যুবকদের খ্রীষ্টধর্ম-গ্রহণ তাদের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আরো বিদ্বিষ্ট ক'রে দিল। তারা দেখছিল শিক্ষিত হলে ছেলে হয় ব্রাহ্ম, নয়ত খ্রীষ্টান হবে। সুতরাং ইংরেজী শিক্ষার প্রতি ধিক্কার-উচ্চারণ স্বাভাবিক ছিল। অবশ্য, হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতাই এর জন্য বহু পরিমাণে দায়ী। তখনকার পত্র-পত্রিকাতেও এই সম্বন্ধে বহু অভিযোগ প্রকাশিত হত। 'সমাচার চন্দ্রিকা'তে

(১৮৩১, ২৬শে এপ্রিল) একটি সংবাদে দেখা যায় যে হিন্দু কলেজ হতে বহু পিতা সন্তানদের নাম কাটিয়েছেন :

"আমরা শুনিয়াছি ৪৫০ কিম্বা ৪৬০ জন বালক ঐ কলেজে পাঠার্থে আসিত। এক্ষণে প্রায় দুইশত বালক কলেজ ত্যাগ করিয়াছে। অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই সকলই জানিতে পারিবেন। পরিত্যাগী দুইশত বালকের মধ্যে প্রধান লোকের সন্তান অনেক। আমরা সে সকল নামের বিশেষ তত্ত্ব করি নাই কিন্তু জনরব হইয়াছে যে শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব, শ্রীযুত হরিমোহন ঠাকুর, শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহ এবং শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব প্রভৃতি অনেক প্রধান লোক বালকদিগকে কলেজে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।"

রক্ষণশীল দল যা বলতেন জনসাধারণ তাই গ্রহণ করত, কারণ বহুদিনের ব্যবহৃত কার্যকলাপের ব্যতিক্রম ঘটাবার মত মানসিক শক্তি লাভ করতে তাদের তখনো বহু বিলম্ব ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রকে কিন্তু মানুষের চিনতে বিলম্ব হ'ল না। তাঁর ধনের আভিজাত্য নেই, নেই ইংরেজী-শিক্ষার দীপ্তি। জনগণ দেখল বাংলার নিজস্ব ধন পল্লীব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরকে। চতুষ্পাঠীর দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন দারিদ্র্যভূষণ সমাজের গুরু।

ঈশ্বরচন্দ্র রক্ষণশীল দল হতে বেরিয়ে এসে নূতন দল বা মত গঠন করলেন না। প্রাচীন পন্থীদের মতই শাস্ত্র আলোচনা করলেন, কিন্তু তাঁর আলোচনায় শাস্ত্রীয় বিধান নূতন রূপে প্রকাশিত হ'ল। বিদ্যাসাগরের ব্যাখ্যায় শাস্ত্র তার জীর্ণ রূপ পরিত্যাগ ক'রে যুগোপযোগী হয়ে উঠল। মানুষের মন ধর্মের অবলম্বন বাদ দিয়েও কর্মের পথে চলবার মত যে বলিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে, জাতীয় জীবনে সেই বলিষ্ঠতার সঞ্চার করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। শিক্ষার দীপ জ্বলে উঠল বাংলার দূর গ্রামে, বাংলা ভাষাকে তিনি পৌছে দিলেন নবযৌবনে আর করলেন সমাজ-সংস্কার। বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত বলে ঘোষিত হ'ল, নিন্দিত হ'ল বহুবিবাহ। যে চিন্তা কেবল আবদ্ধ ছিল সমাজের উচ্চস্তরে, যে শিক্ষা লাভ করত কেবল শিক্ষিত পিতার সন্তান, সে শিক্ষা ছড়িয়ে দিলেন সবার মধ্যে। সমাপ্ত করলেন রামমোহনের আরব্ধ কাজ।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনান্ত-

কাল পর্যন্ত সময়কে আমরা অনায়াসে বাংলাদেশে বিদ্যাসাগর-যুগ বলে চিহ্নিত করতে পারি। চল্লিশ বৎসর বয়সে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে, শিক্ষা এবং বিত্ত সঙ্গে নিয়ে রামমোহন এসেছিলেন কলিকাতায়। কলিকাতা তখন সমস্ত বাংলার হৃদয়—ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের রাজধানী। নিজেকে তিনি অভিজাত সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে সংস্কারকার্য আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর কাজে বাধা দিতে অগ্রসর হয়েছিল প্রাচীন সমাজ, কটু সমালোচনাও করেছিল, কিন্তু নগণ্য বলে ভাবতে পারেনি রামমোহনকে। তিনি যে বিদ্বান, বিত্তবান। কলিকাতায় তখন অর্থকৌলীন্যের প্রাধান্য, তাই তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। ধন ও মানের পটভূমিকায় তাঁর প্রকাশ হ'ল।

আর ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলিকাতায় এলেন তখন হর্ম্যে-বর্ত্মে, বিলাস-ব্যসনে রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে পরিণত হবার পথে চলেছে। এখানে পরিচয়হীন দরিদ্র বালক পিতার করাঙ্গুলী ধারণ ক'রে চোখ মেলে দেখছে কত বড় শহর, কত তার জাঁকজমক। তারপর সংস্কৃত কলেজে প্রাচীন শিক্ষাগ্রহণের জন্যই ব্যাকরণ শ্রেণীতে প্রবেশ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। কিন্তু দেশে তখন চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে যে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তার চমকে ঈশ্বরচন্দ্রের মন হতে সমস্ত প্রাচীনত্ব স্খলিত হয়ে গেল। পাঠ সাঙ্গ ক'রে কর্মজীবনের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন তরুণ যুবক। দেখলেন নবজাগরণ ব্যর্থ হতে বসেছে বাঙালির জীবনে। স্কুল-কলেজ স্থাপিত হচ্ছে, সভা-সমিতির ছড়াছড়ি রাজধানী ও তার উপকণ্ঠে, কিন্তু বাংলার গ্রামে গ্রামে শিক্ষাহীনতা ও কুসংস্কারের রাজত্ব। সেখানে তামস মধ্যযুগ বসে আছে তার আচার-বিচার ও কুসংস্কার নিয়ে। পুরুষ অজ্ঞ, নারী নির্যাতিত।

ঈশ্বরচন্দ্র তখন আর বীরসিংহের দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার নন। তিনি বিদ্যার সাগর। যে জ্ঞান তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বুদ্ধি দিয়ে, গ্রহণ করেছিলেন হৃদয় দিয়ে, তাকে সম্বল করে আলোর মশাল তুলে নিলেন নিজের হাতে। বিভ্রান্ত জনমানস পথ দেখল, চিনল তার লক্ষ্য। রাজসরণী উন্মুক্ত ক'রে যুগপুরুষ একাই রথের রশি আকর্ষণ করেছিলেন, সঙ্গী হয়েছিল মাত্র কয়েকজন। এবার জনগণেশ চলিষ্ণু হয়ে উঠল, তার হাতও লাগল রথ-রজ্জুতে।

যে নবজাগরণ ইয়োরোপে চতুর্দশ শতাব্দীতে আরম্ভ হ'য়ে অষ্টাদশ শতকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে, বাংলাদেশে তাব তড়িৎ-গতি আমাদের বিস্মিত করে দেয়। প্রায় একটি শতকের মধ্যে নবজাগরণ এখানে অভ্যুত্থিত হয়ে তার সমগ্রত্বে প্রকাশিত হল। রামমোহনেব আরব্ধ কর্মে ঈশ্বরচন্দ্র যে বেগ সঞ্চাব কবলেন তাতে বাঙালি বৎসরে শতক অতিক্রম ক'রে গেল।

বিদ্যাসাগব যদি বাংলার গ্রাম্য কুটীবে দারিদ্র্যেব মধ্যে জন্মগ্রহণ না কবতেন, যদি রামমোহন, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির মত অভিজাত বংশে তাঁর আবির্ভাব হ'ত, তাহলে তিনি এমন ক'রে সফল হতেন কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। জনগণ সেক্ষেত্রে হয়ত তাঁকে গ্রহণই করত না, এমন কি বিদ্যাসাগর ইংরেজীনবিস হলেও সাধারণ মানুষ তাঁকে অবিশ্বাসের চোখে দেখত। এর প্রমাণ আমরা দেখতে পাই ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে। সে সময়ে কেশবচন্দ্রেব ন্যায় আর কোন ভারতবাসী সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত ব্যক্তিদের জন্য কেবল সহানুভূতি প্রদর্শন নয়, ব্যবহারিক কার্যসূচী রচনা কবেছেন বলে আমবা জানি না। তিনি মিশনারীর সঙ্গে লড়েছেন, স্কুল-কলেজ স্থাপন ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, মেহনতী মানুষের প্রতি তাঁর দরদের সীমা ছিল না। কিন্তু কেশবচন্দ্র ছিলেন অভিজাত বংশ-সম্ভূত, ইংরেজীশিক্ষিত ব্রাহ্মধর্ম-প্রচাবক।

ব্রাহ্মধর্ম সাধারণ মানুষের কাছে খ্রীষ্টধর্মেব নামান্তর মাত্র ছিল। সুতরাং তারা কেশবেব চেষ্টার সঙ্গে নিজেদের ইচ্ছাকে যুক্ত ক'রে দিতে পারে নি।

একথা সত্য যে, নূতন যুগে ধর্মাচার্যের অপেক্ষা রাজার আদেশ বড়, হৃদয়ের আবেগ অপেক্ষা যুক্তিই প্রধান। তথাপি জনসাধারণ ভয়ে রাজার আদেশ মানতে পারে, কিন্তু যে-যুক্তি তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতামঞ্চ হতে বর্ষিত হয় তা তাদের বুদ্ধির দুয়াবে প্রবেশপথ পায় না। দরিদ্রবংশ-জাত পল্লী-সন্তান, নিতান্ত সাধাবণ জীবনযাত্রায় প্রতিপালিত ও অভ্যস্ত বলেই জনগণের মধ্যে তাদেরই একজন হয়ে দাঁড়ালেন ঈশ্বরচন্দ্র। তাঁকে বাঙালি বুঝল, গ্রহণ করল এবং ধন্য হ'ল।

যে দিনে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছিলেন তার সঙ্গে তাঁর কর্মজীবনের দিনের বিশেষ সম্পর্ক আছে। শৈশবে তিনি অনুভব করেছেন রামমোহনের সংস্কার-আন্দোলনের বেগ, প্রত্যক্ষ করেছেন নবীন ও প্রাচীনের দ্বন্দ্ব। সেদিন রাজশক্তি দেশের রক্ষণশীলদের সমর্থন জানাত। প্রাচ্যবিদ্যা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণই তার নীতি ছিল। সতীদাহ অমন ক্রূর, অমানুষিক প্রথা না হলে বোধ হয় তাকেও স্পর্শ করত না।

তারপর ইংরেজী শিক্ষা রাজকীয় সনন্দলাভ ক'রে আপন অধিকার বিস্তার করল। দেশের মধ্যে যেন দুটি গ্রহের সৃষ্টি হল। কারোর সঙ্গে কারোর মিল নেই, সম্পর্ক নেই। একদল চাইছেন দেশকে যুগের উপযুক্ত রূপ দিতে, অন্য দলের বীভৎস অমিতাচারে কলঙ্কিত হচ্ছে রাজধানী কলিকাতা।

এ সম্বন্ধে ১৭৬৭ শকাব্দের আশ্বিন মাসের 'তত্ত্ববোধিনী'র উক্তি প্রণিধান-যোগ্য :

"এই কলিকাতা নগরেব প্রতি পল্লীতে এ প্রকার সমূহ ব্যক্তির অধিষ্ঠান আছে, যাহারা ক্রমাগত দলবদ্ধ হইয়া বিবিধ কুকর্ম্মসূচক আমোদেই অজস্র লিপ্ত থাকে। ...বিশেষতঃ বালকেরা যখন শাসনকর্ত্তা পিতা-ভ্রাতা প্রভৃতিকে অহরহ দুষ্কর্মপঙ্কে পতিত হইতে দেখে, তখন আপনারা তৎপথ অবলম্বন করিতে কেন শঙ্কা করিবে? ইহা কি শত স্থানে প্রত্যক্ষ হয় নাই যে, পিতার রক্ষিতা গণিকার গৃহে অতি বালক পুত্রাদি সম্বন্ধে গমনাগমন করিতেছে? তথায় তাহারা পরিপাটীরূপে লম্পট ব্যবহার শিক্ষা করিয়া বয়স্ক হইলে কণ্টকস্বরূপ যে তাহাদিগের পরিবারের পীড়াদায়ক হইবেক তাহাতে সন্দেহ কি?

"অধুনা লম্পটবিদ্যা শিক্ষার পাঠশালাস্বরূপ কলিকাতা হইয়াছে। পল্লীগ্রামস্থ ভদ্র অথচ ধনহীন নবীন যুবারা অনেকে বিষয়কার্যের জন্য কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক অনেক কৌশলে কোন এক স্ববয়স্ক ধনীর আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগের ভাগ্যবশতঃ যদি সেই বাবু কুচরিত্র এবং লম্পট হয়েন, তবে বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, বীর্য্য একেবাবে তাহাদিগের নষ্ট হয়। তাহারা সেই বাবুর তুষ্টির জন্য তাঁহার প্রিয় কুকর্ম্ম সকলের উৎসাহ প্রদান করিতে থাকে, বরঞ্চ তাহার সম্পাদন জন্য উদ্যোগী এবং নিপুণ হয়, এবং যে সকল ঘৃণিত ও

সহিত আমোদের আস্বাদন পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল, তাহাতেও ঐ বাবুর নিকটে সুন্দররূপে শিক্ষিত হয়।"

কেবল অমিতাচার নয় সামাজিক নির্যাতনের ভয়েও মানুষ অনেক অমানুষিক আচরণ করত। রামমোহন রায়ের অনুকরণে রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে হিন্দুগণ ধর্মসভা স্থাপন করেছিল এবং তার মধ্যে আশুতোষ দেব ও রাধাকান্ত দেবের পৃথক দল সৃষ্টি হয়। ধর্মসভার দলভুক্ত জনৈক জয়চন্দ্র মিত্রের লিখিত চিঠিখানি দেখলেই এই দলাদলির বিষয় অবগত হওয়া যায়:

" ......শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মৎপ্রতিপালকেষু। পোষ্য শ্রীজয়চন্দ্র মিত্রস্য—সবিনয় নিবেদনমিদং। আমি কিয়ৎকাল শ্রীযুত আশুতোষ দে সরকার বাবুজীর দলেতে ছিলাম। এক্ষণে সে দলের নানাপ্রকার গোলযোগ দেখিয়া সে দল পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মভয়ে মহারাজার দলস্থ হইলাম কিমধিকমিতি ১২৫০ সাল তারিখ ২৪ কার্তিক—শ্রীজয়চন্দ্র মিত্রস্য।"

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের 'সমাচার-চন্দ্রিকা'য় পত্রখানি ৪ঠা জানুয়ারী প্রকাশিত হয়। আবার 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' একখানি পত্র উদ্ধৃত ক'রে তার সম্বন্ধেও সমালোচনা করেছিলেন। চিঠিখানি দেখলে বেঙ্গল স্পেক্‌টেটরের মত আমাদেরও মনে হবে যে সামাজিক শাসন তখন পারিবারিক সম্বন্ধের মধ্যেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ক'রে মানুষকে নিষ্ঠুর করে তুলছিল।

সিমুলিয়া হতে মধুসূদন মিত্র আশুতোষ দেবকে লিখছেন:

পরম পোষ্টৃবর শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব দলপতি মহাশয় পোষ্টৃবরেষু।

পোষ্য শ্রীমধুসূদন মিত্রস্য বিনয়পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। আমি বহু কালাবধি মহাশয়ের দলস্থ থাকিয়া সামাজিকতা ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলাম, গত বৎসর আমার অজ্ঞাতসারে শ্রীযুত ঘটক সুধাকরের চাতুরীতে শ্যামবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র সরকারের কন্যার সহিত আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র বাবাজীর দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ হয় তজ্জন্য মহাশয় আমাকে দোষী করিয়া স্বীয় দলে স্থগিত রাখিয়াছেন এক্ষণে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উক্ত পুত্রবধূকে আমার অনুমতিক্রমে আমার পুত্র পরিত্যাগ করিলেন, পরে যদ্যপি ঐ পুত্র আমার আজ্ঞানুরূপ না করেন তবে তাহাকে আমি পরিত্যাগ

করিব ইহা ধর্মতঃ স্বীকার করিলাম এক্ষণে মহাশয় পূর্ব্ববৎ স্বীয় দলে গ্রহণ করিয়া বিহিত আজ্ঞা করিবেন নিবেদনমিতি ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৪৯ সাল।

শ্রীমধুসূদন মিত্র। সাং সিমুলিযা।

একদিকে ধর্মসভা—রক্ষণশীল দল, অন্যদিকে প্রগতিপন্থী আধুনিক বাঙালি। তাঁরা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে, সভা-সমিতির মারফত দেশের উন্নয়নমূলক চিন্তা ও কাজে নিযুক্ত ছিলেন সত্য, কিন্তু সমাজেব কর্ণধার হতে পারেন নি। ব্রাহ্মধর্ম ধীরে ধীরে একটি সমাজ সৃষ্টি কবছিল, কিছু কিছু উচ্চবর্ণের হিন্দু যুবক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করছিল। দেবেন্দ্রনাথেব 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার বহুমুখী কার্যধাবার একটি ছিল মিশনারী প্রতিরোধ। উমেশচন্দ্র সরকার সস্ত্রীক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলে, 'তত্ত্ববোধিনী' মিশনারী প্রচেষ্টা ও হিন্দুসমাজের নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে লিখলেন:

"নির্লজ্জ মিশনাবিরা শতবৎসরাবধি হিন্দুধর্মের উচ্ছেদ চেষ্টা করিতেছে, শতবৎসরাবধি খৃষ্টধর্মে এ দেশকে অভিষিক্ত করিবাব যত্ন কবিতেছে, মধ্যে মধ্যে মাতাপিতার ক্রোড হইতে স্নেহের সন্তানকেও হরণ করিতেছে, তথাপি এদেশীয় লোকের চৈতন্য হয় না—তথাপি মিশনাবিদিগের দুশ্চেষ্টা নিবারণের কোন সদুপায় ধার্য্য হয় না। সত্যেব পথে যখন তাহারা কণ্টক বিস্তার করিতেছে, তখন সত্যের সাধকেরা কি প্রকারে নীরব রহিয়াছেন?"

'তত্ত্ববোধিনী' প্রধানতঃ নবোদ্ভূত ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা। অবশ্য এর সঙ্গে বহু হিন্দু বিদগ্ধজনও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রক্ষণশীল দল 'তত্ত্ববোধিনী'কে বিশেষ সুচক্ষে দেখতে পারতেন না। ব্রাহ্ম অথবা ব্রাহ্ম না হয়েও যাঁরা প্রগতিপন্থী তাঁদের সঙ্গে বক্ষণশীলদের বিরোধ ছিল। মিশনারিগণ যখন হিন্দুদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করছিল, হিন্দুসমাজ কটুকাটব্য নিক্ষেপ ব্যতীত প্রতিকাবেব আব কোন চেষ্টাই কবে নাই। অবশ্য এটা চিরাচবিত রীতি। মুসলমান যখন হিন্দুদের ধর্মান্তরিত কবত, তখনো হিন্দু সমাজ নিজের চারদিকে কঠিন আবরণ রচনা করে বসেছিল। যারা গোত্রচ্যুত, দলচ্যুত হল, তাদের ফিরিয়ে আনবাব কিম্বা ধর্মান্তরণে বাধা দেবার জন্য কিছুমাত্র প্রয়াস করে নি। হিন্দু সমাজের দৃঢ় বন্ধন ভেঙ্গে দিয়েছিল ব্রাহ্ম দল। হিন্দুরা স্বীকার না করলেও তাঁরা বলছিলেন, তাঁরা বৃহত্তর হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মে তাঁরা হিন্দু।

ব্রাহ্মগণ প্রগতিপন্থী। কোন স্পর্শ তাঁদের জাতিচ্যুত করতে পারে না। রক্ষণশীল পিতা ব্রাহ্ম পুত্রকে গৃহ হতে বহিষ্কৃত ক'রে দিলেও খ্রীষ্টান অথবা মুসলমানের মত তিনি একেবারে পর হয়ে যান না। সামাজিক ব্যবহার থাকে না, কিন্তু দুঃখে বিপদে পরস্পর পরস্পরের অবলম্বন। আবার আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ না করেও, রক্ষণশীল হিন্দুগৃহে বহু আধুনিক শিক্ষিত যুবক সমস্ত সংস্কার বর্জন ক'রে অতি উগ্ররূপে প্রগতিপন্থী হয়ে উঠেছিলেন। ব্রাহ্মগণ যে-ব্রহ্মের উপাসনা করতেন, তিনিই তাঁদের কর্মকে সংযমে নিয়ন্ত্রিত করতেন। আধুনিক হিন্দু যুবক ব্রাহ্ম হত না সত্য, কিন্তু হিন্দুসমাজের প্রচলিত আচারগুলিকেই হিন্দুধর্ম বলে ধারণা ক'রে পিতৃ-পিতামহের ধর্মের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করত। ধর্মহীন শিক্ষা ও রাজধানীর বিলাসময় জীবনযাত্রা এদের উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছিল। অবশ্য নানারূপে এরা যে শিক্ষাবিস্তার এবং সমাজসংস্কারে অবহিত হয়েছিলেন সে কথা সকলেই স্বীকার করবেন।

বাংলাদেশে ইতিপূর্বে মিশনারিগণ গ্রামাঞ্চলে নিম্নবর্ণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করছিলেন। নিম্নজাতি চিরদিন অবহেলার পাত্র। উচ্চবর্ণের হিন্দু তাঁদের স্পর্শ করেন না, তাদের দেওয়া তৃষ্ণার জল অস্পৃশ্য। এমনিতেই যারা অন্ত্যজ, তারা খ্রীষ্টান হয়ে গেলে হিন্দুসমাজ উদাসীন অবহেলায় সে ব্যাপার লক্ষ্য করছিল মাত্র। ১৮৩০ সালে কলিকাতায় এলেন মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফ। তিনি এসেই কর্মক্ষেত্র এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের নীতি পরিবর্তন করলেন। ডাফ জানতেন একটি উচ্চবর্ণের হিন্দু যুবককে খ্রীষ্ট-ধর্মান্তরিত করবার মূল্য অনেক। উচ্চবর্ণ খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করলে, নিম্নবর্ণ বিনা চেষ্টায় ধর্মান্তরিত হবে।

ডাফের অপূর্ব বাগ্মিতা এবং শিক্ষাদানের পটুত্ব হিন্দু যুবকদের আকর্ষণ করে নিল। কিছুসংখ্যক উচ্চবর্ণের যুবক খ্রীষ্টের বেদীমূলে আত্মনিবেদন করলেন। হিন্দুসমাজে ঝড় বয়ে গেল। ঝড় বয়ে গেল বটে, কিন্তু প্রতিকারের বিশেষ কোন চেষ্টা দেখা গেল না। কয়েক বছর পর মিশনারী প্রতিরোধে অগ্রসর হলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিভূ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইতিপূর্বে আমরা যে উমেশচন্দ্র সরকারের উল্লেখ করেছি তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের কর্মচারীর

কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি দেখছিলেন মিশনারী-পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিই বালকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করছে। এখানে তারা ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে হিন্দুধর্মকে ঘৃণা করতে শেখে, মিশনারী শিক্ষকদের প্রভাবে ধর্মত্যাগ করে। তখন সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে বহু পিতামাতা ইংরেজী শিক্ষার জন্য পুত্রদের মিশনারী স্কুলে পাঠাতেন। কারণ একথা সত্য যে, তাঁদের পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিই উৎকৃষ্ট ইংরেজী স্কুল ছিল। বিশেষতঃ আলেকজাণ্ডার ডাফের অতি অপূর্ব শিক্ষাদান-প্রণালী এবং পাণ্ডিত্য হিন্দু যুবকদের প্রায় মন্ত্রমুগ্ধ করে তুলেছিল। দেবেন্দ্রনাথ মিশনারী-প্রভাব প্রতিহত করবার প্রধান সোপান—একটি হিন্দু-পরিচালিত ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লাগলেন। হিন্দু নেতাগণ দেবেন্দ্রনাথের প্রস্তাব আগ্রহের সঙ্গে সমর্থন করলেন। চাঁদার সাহায্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হ'ল। স্থাপিত হ'ল অবৈতনিক হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রথম প্রধান শিক্ষকরূপে নির্বাচিত হলেন।

হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপন মিশনারী-প্রতিরোধের জন্য একটি মহৎ প্রচেষ্টা এবং ইতিপূর্বে এরূপ ব্যবস্থা হিন্দুদের দ্বারা অবলম্বিত হয় নি। কিন্তু সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এই উপলক্ষ্যে সমাজের প্রাচীন ও নবীন দলের সঙ্গে ব্রাহ্মদলের মিলন ঘটল। রক্ষণশীল সমাজের প্রতিভূ রাধাকান্ত দেব, নব্যদলের রামগোপাল ঘোষ এবং ব্রাহ্মসমাজের দেবেন্দ্রনাথ একত্র হয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপন প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ স্বরচিত জীবনচরিতে লিখেছেন:

"সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারি-দিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।"

হিন্দুকলেজ স্থাপনের সূচনা রামমোহন করেছিলেন, কিন্তু কলেজ কমিটিতে তিনি স্থান পান নাই। দিনের পরিবর্তনে হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথ সেক্রেটারী মনোনীত হলেন।

আমেরিকার দাস-ব্যবসায়ের ইতিহাস পড়ে ভারতীয় কিশোর-কিশোরী চোখ বিস্ফারিত করে, কিন্তু তারা কি জানে ভারতবর্ষেও দাসত্বপ্রথা বর্তমান

ছিল! বাংলাদেশের নানা স্থান হতে আগত পণ্যের ন্যায় মানুষপণ্যও রাজধানী কলিকাতায় প্রকাশ্য বাজারে বিক্রীত হত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ও সংবাদপত্রে মানুষ বিক্রীর সংবাদ পাওয়া যেত। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আইন করে সরকার দাসত্বপ্রথা বে-আইনী বলে ঘোষণা করে।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ড হতে প্রত্যাবর্তনকালে ইয়োরোপে দাসত্ব আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত সমাজসংস্কারক জর্জ টমসনকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। দেশে সভা-সমিতি ও বক্তৃতার বন্যা বয়ে গেল, স্থাপিত হল 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'।

সুতরাং কলিকাতা কেবল মাত্র 'লম্পটবিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা' হয়েছিল এরূপ মনে করা অত্যন্ত ভুল হবে। এখানে মানুষও গড়ে উঠছিল, তারা সবসংস্কারমুক্ত, আধুনিক যুগের পতাকাবাহী বাঙালি। ঈশ্বরচন্দ্র যদিও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন না, তাঁর জন্ম যেমন প্রাচীন সমাজে, শিক্ষাও তেমনি প্রাচ্য মহাবিদ্যালয়ে। কিন্তু মানুষ কেবলমাত্র পুথির সাহায্যেই জীবনের শিক্ষা সম্পূর্ণ করে না। কয়েকটি বৎসরের কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কিম্বা গণিত, বিজ্ঞান আলোচনা কখনো শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করতে পারে না। শিক্ষায়তন জীবনের ভিত্তিভূমি রচনা করে দেয়, তারপর শিক্ষক হয় সমাজ। তার গতিতে, তার চিন্তায় ব্যক্তি পরিবর্তিত হ'তে থাকে। বিদ্যাসাগরের জীবনেও আমরা এই চিরন্তন সত্যের প্রতিফলন দেখতে পাই। বাংলার প্রগতিশীল সমাজ তখন সর্বরূপ সংস্কার এবং অজ্ঞতার দাসত্ব হ'তে মুক্তি-কামনায় দুর্বার হয়ে উঠেছিল। রক্ষণশীল দল প্রতিবাদ করছিলেন সত্য, কিন্তু পরিচ্ছন্ন যুক্তির আলোয় তাঁদের পরিবেশিত তথ্য ক্রমেই অসার বলে প্রতিপন্ন হচ্ছিল। সাধারণ মানুষ ভয় পাচ্ছিল, কিন্তু গতির স্রোতও তাদের স্পর্শ দিয়েছিল। যুগের যে মহাযাত্রায় বুদ্ধিজীবী বাঙালি তখন অগ্রসর হয়েছিল, তাতে যোগ দেবার জন্য জনসাধারণ নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রস্তুত হচ্ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র কেবল সাধারণের নন, রক্ষণশীল সমাজের একজন প্রতিভূরূপেও নিজেকে যুগচিন্তার মধ্যে মিলিত করে নিলেন।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, নবজাগরণের একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল ধর্মের ওপর বিজ্ঞানের এবং সংস্কারের উপর যুক্তির অধিকার। কিন্তু বাংলা-

দেশে রামমোহন যে আন্দোলনের উদ্বোধন করেছিলেন, তা ধর্মকেন্দ্রিক। নানা কর্মের স্রোত বয়ে চলছিল সত্য কিন্তু সকলের উপরে বসেছিল ধর্ম,— হিন্দুধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম। 'ইয়ং বেঙ্গল' দল অবশ্য ধর্মের কথা বলতেন না, কিন্তু তাঁদের চিন্তায় সমাজ যতটা লাভবান হয়েছিল, ততোধিক পীড়িত হয়েছিল তাঁদের অমিতাচারে।

ঈশ্বরচন্দ্র চিন্তায় এবং কর্মে আধুনিকপন্থী, সংস্কারকামী, আবার সামাজিক আচার-আচরণে রক্ষণশীল। বিচিত্র কর্মপথে প্রবৃত্ত হবার জন্য তিনি ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলেন না। শালগ্রামশিলায়-বদ্ধ নারায়ণকে পূজা করবার অবসরই পেলেন না বিদ্যাসাগর। প্রত্যক্ষ-দেবতা মানুষের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করলেন। কর্মবীর মানবপ্রেমিক ঈশ্বরচন্দ্রকে হিন্দু কলেজে কিম্বা সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা প্রভাবান্বিত করে নি। তিনি উদ্ভূত হয়েছিলেন সমাজ-মন্থনের ফলে। বিচিত্র চিন্তা ও কর্মভারে সমাজ তখন তীব্রভাবে আলোড়িত হচ্ছিল, সে উপহার দিল বাংলাদেশকে একটি মানুষ—যুগচিন্তার প্রতীক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে।

॥ দশ ॥

চরিত্র কথাটির অর্থ তার প্রতিশব্দে প্রকাশ করা অসম্ভব। চরিত্র শব্দটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তার পরিচয় ব্যাপক। একটি মানুষের সমগ্র পরিচয় বহন করে তার চরিত্র। দৈনন্দিন জীবনের কথা, চিন্তাধারা, কর্মপদ্ধতি, অর্থাৎ একটি জীবনের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে চাইলেই তার চরিত্রের বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়ে ওঠে। চরিত্র গড়ে ওঠে পরিবেশ এবং পরিবারের প্রভাবে। সুতরাং মানুষের স্থিতি, গতি ও পরিণতি নির্ণয় করতে হলে তার পরিবার ও পরিবেশের কথা ভাবতে হবে। পরিবেশ মানুষ সৃষ্টি করে, নিজের প্রয়োজন মত তাকে পরিবর্তন কিম্বা পরিবর্জনও করে, কিন্তু পরিবার কারো আয়ত্তের মধ্যে নয়। দৈব মানুষকে যে পরিবারে নিক্ষেপ করে, তার আদর্শ ও নীতি শিশুর বাল্য ও কৈশোরকে গড়তে থাকে। তারপর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিরেশের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ভাগ্যক্রমে অনুকূল পরিবেশ পেলে, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত পরিবারের কদর্য প্রভাব কাটিয়ে নিজেকে মানুষ ঊর্ধ্বে তুলতে পারে, আর তখনি পঙ্ক ও পঙ্কজের তুলনা সার্থক হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছিলেন প্রাচীনপন্থী পরিবারে। তাঁর পরিবেশের চতুর্দিকে ছিল রক্ষণশীলতার সুদৃঢ় প্রাচীর। সেদিন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরের ছেলে যজন-যাজন নিয়ে থাকতেন। টোল খুলে অধ্যাপনা এবং নব্যদলকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করতেন অনেক পণ্ডিত। অধিক দূর অগ্রসর হলে, রাজধানীর ধর্মসভার নেতৃবৃন্দের বক্তব্যের পোষকতা করবার জন্য শাস্ত্রবিচার এবং কোন কোন বিচার সভায় শাস্ত্রীয় অনুশাসনের ব্যাখ্যাও করতেন পণ্ডিতসমাজ। যে অচল শিলাখণ্ড তখন সমস্ত প্রগতির পথকে রুদ্ধ করেছিল তার প্রধান রক্ষক ছিলেন এঁরা।

এইরূপ পরিবেশ ও পরিবারে জন্মগ্রহণ ক'রেও ঈশ্বরচন্দ্র যে হয়েছিলেন বাংলাদেশের নবজাগরণের একজন বিশিষ্ট ধারক ও বাহক, তা পরমাশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু তাঁর পারিবারিক ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই সকল

বিস্ময়ের অবসান হয়। তিনি রক্ষণশীল পরিবারে জন্মেছিলেন বটে, কিন্তু সেখানে একটি দুর্বার গতিস্রোত বর্তমান ছিল। নিজের ঘরে, গতানুগতিক জীবনের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, পিতামহ কেউ স্থির থাকতে পারেন নি। পিতামহ রামজয় পরিণত যৌবনে ঘরের বন্ধন ছিন্ন ক'রে বেরিয়েছিলেন পথে। উদার আকাশ, সামাজিক অনুশাসনমুক্ত পরিবেশ পর্যটকের মনকেও বোধহয় বহু সংস্কার হ'তে মুক্তি দিয়েছিল।

তারপর পিতা ঠাকুরদাস ঘর ছেড়ে পথে বের হলেন অনতিক্রান্ত কৈশোরে। দারিদ্র্য তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল সত্য, কিন্তু সেদিন বাংলার পল্লীতে তেমন দারিদ্র্যক্লিষ্ট বহু বালকই ছিল। তারা দারিদ্র্য নিবারণের জন্য, অর্থ উপার্জনের আশায় ঘর ছেড়ে অজ্ঞাত পথে বের হবার স্বপ্নও দেখে নি। ঠাকুরদাস যে রামজয়ের পুত্র। পিতার ন্যায় পুত্রকেও ডাক দিয়েছিল পথ। প্রাচীনত্বের ধারক ঠাকুরদাস, কিন্তু গতিশীল পথিক। গতিবেগ তাঁকে প্রাচীনত্বের স্থবিরত্ব হ'তে মুক্তি এনে দিল।

এই পরিবারের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মালেন ঈশ্বরচন্দ্র। তিনিও কৈশোরে এলেন কলিকাতায় শিক্ষাগ্রহণের জন্য। রাজধানীতে তখন প্রতীচ্যের সঙ্গে প্রাচ্যের সংঘাত চলেছে। প্রাচীন সব কিছু ভাঙবার উত্তেজনায় পাগল 'ইয়ং বেঙ্গল,' আর কঠিন অবরোধ রচনা করেছে প্রাচীন সমাজ। একটা মহাপ্লাবনের বেগে কাঁপছে বাংলাদেশ, কাঁপছে বাঙালি। আবার নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রস্তুত হচ্ছে নবযুগের জন্য। ঈশ্বরচন্দ্র অনুভব করলেন এই বেগ এবং স্পন্দন।

জন্মসূত্রে তিনি যে তেজ এবং গতি-তৃষ্ণার অধিকারী হয়েছিলেন তাই তাঁর চরিত্রকে সুদৃঢ় কিন্তু প্রগতিশীল ক'রে দিল, আর পরিবেশ আনল সংস্কারমুক্তির চেতনা। প্রাচীন ও নবীন ভাবধারার প্রভাবে গঠিত বিদ্যাসাগর-চরিত্র মাঝে মাঝে রহস্যময় বলে মনে হয়। একদিকে 'দয়া' শব্দ তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধন্য হয়েছে, অন্যদিকে আপসহীন অনমনীয় মনোবৃত্তি এই মহাপুরুষকে অতিরিক্ত কঠিন ক'রে তুলেছে। মাঝে মাঝে আমাদের মনে হয়, বিদ্যাসাগর কেবল নীতি এবং সত্য দিয়ে গঠিত একটি কঠিন মানুষ! কিন্তু, আবার তখনই দেখি দীন অন্ত্যজ রমণীর রুক্ষকেশে তৈলসিঞ্চন করছেন মায়ের মমতায় দয়ার

সাগর। এই মহান চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যাসাগরচরিতে' বলেছেন :

"বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙালি হৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালি-জনসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে বাঙালিদুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির ক্ষণিক উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচলকর্তৃত্ব সর্বদাই বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্টলাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না। ·পরের উপকারকার্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাহার আজন্মকালের একটা জিদ প্রকাশ পাইত। সাধারণত আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ না থাকাতে তাহা সংকীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষমহত্ত্ব লাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢবীর্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক সময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়, তাহা কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসনিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভারলাঘব করা নহে; তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্যসিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।"

দয়া যদি নারী হয়, তবে বলিষ্ঠ পৌরুষের আশ্রয় ব্যতীত সে তো কখনই স্বমহিমায় প্রকাশিত হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন যে, ক্ষণিকের উচ্ছ্বাসনিবৃত্তির সঙ্গে দয়ার সম্পর্ক নেই। দীর্ঘদিনের আত্মত্যাগ এবং আত্ম-নিপীড়নের দাবী নিয়ে দয়া এসে প্রকৃত পুরুষের নিকট উপস্থিত হয়।

কেবল রবীন্দ্রনাথ নন, তাঁর পূর্বে বাংলার দু'জন কবি বিদ্যাসাগরের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। মধুসূদন বলেছেন :

"the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an English man, and the heart of a Bengalee mother"

কবি হেমচন্দ্রের ভাষায় :

'উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দার্ঢ্যে শালকড়ি' এবং 'স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুল কাঁটা, পারিজাত ঘ্রাণে'।

হেমচন্দ্রের 'স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুল কাঁটা' কথাটি আমাদের মনে একটু আপত্তি এনে দেয় আবার যখন প্রান্তরে বহু গুল্মের মধ্যে 'শিঁয়াকুল কাঁটা' গাছটিকে নিজের কণ্টক-আবেষ্টনীতে অন্যগুলির নিকট হতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে দেখি, তখন মনে হয় হয়তো কবির উক্তি যথার্থ। কিন্তু একথা ভুলতে পারি না যে, যে মহিমার পরিমণ্ডল ঈশ্বরচন্দ্রকে সাধারণ মানুষ হতে পৃথক ক'রে দিয়েছিল তা কণ্টক নয়, একটা বিরাট বলিষ্ঠতা।

বিদ্যাসাগর স্বতন্ত্র ছিলেন কেবল মানসিক গঠনে নয় ; বেশ-বাস, আচার-আচরণও তার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করত। উত্তরীয় আর চটি তাঁকে নব্যদল হতে পৃথক করেছিল। রাজপুরুষদের নিকটেও তিনি এই বেশেই উপস্থিত হতেন। প্রতিবাদ ক'রে বিফলকাম হ'য়ে ইংরেজ বিদ্যাসাগরের বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক বেশকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ বর্ধমানের মহারাজা তাঁকে বীরসিংহ গ্রাম তালুকরূপে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র তা গ্রহণ করেন নি। রামমোহনের পুত্র, ঈশ্বরচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রমাপ্রসাদ রায় বিধবাবিবাহ-প্রচলন চেষ্টার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেও কোন বিবাহস্থলে উপস্থিত হ'তে সঙ্কোচ বোধ করায় ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে কঠিন ধিক্কার দিয়েছিলেন।

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের মধ্যে স্নেহের অফুরন্ত নির্ঝর ছিল। বন্ধুগৃহের ক্ষুদ্র বালিকা প্রভাবতীর অকাল মৃত্যু হ'লে তিনি যে রচনাটি 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' নামে বৈশাখ সংখ্যার (১২৯৯) 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশ করেছিলেন সেটি লক্ষ্য করলেও আমরা তাঁর অন্তরের অপূর্ব বাৎসল্যরসের পরিচয় পাই। তিনি লিখেছিলেন :

"বৎসে প্রভাবতী! তুমি দয়া, মমতা ও বিবেচনায় বিসর্জ্জন দিয়া এ জন্মের মত সহসা, সকলের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছ। কিন্তু আমি, অনন্যচিত্ত হইয়া, অবিচলিত স্নেহভরে তোমার চিন্তায় নিরন্তর এরূপ নিবিষ্ট থাকি যে, তুমি, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতে পার নাই। ...

"…তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি চিরদিনের নিমিত্ত, আমার চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবেক। কালক্রমে পাছে তোমায় বিস্মৃত হই, এই আশঙ্কায়, তোমার যারপর নাই চিত্তহারিণী ও চমৎকারিণী লীলা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।…

"বৎসে। তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না, একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই– যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্ম্মের এইটি করিও, যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে, আমাদের মত, অবিরত, দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনা ভোগ করিতে না হয়।"

যবনদেশে মধুসূদন দত্ত যখন অপরিসীম অর্থাভাবের সম্মুখীন হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে পত্র লেখেন, তাতেও তিনি লিখেছিলেন 'বাঙালি মায়ের মত যাঁর কোমল হৃদয়' তাঁর কাছে মধুসূদন সাহায্য প্রার্থনা করছেন।

মমতার মত ঈশ্বরচন্দ্রের তেজের কথাও তো সর্বজনবিদিত। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন :

"মানব-চরিত্রের প্রভাব যে কি জিনিস, উগ্র উৎকট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তেজীয়ান পুরুষগণ ধনবলে হীন হইয়াও যে সমাজমধ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, তাহা আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া জানিয়াছি। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, যাঁহার পিতার দশ বার টাকার অধিক আয় ছিল না, যিনি বাল্যকালে অধিকাংশ সময় অর্ধাশনে থাকিতেন, তিনি এক সময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গসমাজকে কিরূপ কাঁপাইয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে মন বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়। তিনি এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন—'ভারত-বর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতা-শুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি'। আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য। তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনি ছিল যে, তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজারাও নগণ্য ব্যক্তির মধ্যে।"

আমরা দেখেছি এই তেজের জন্যই বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র সরকারী কর্ম ত্যাগ করেছিলেন। ইন্স্পেক্টর গ্র্যাট বিদায় নেবার পর যখন

তাঁকে স্কুল পরিদর্শকের কাজ না দিয়ে তৎস্থলে একজন ইয়োরোপীয়কে নেওয়া হ'ল তখন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর হ্যালিডের সমস্ত অনুরোধ তুচ্ছ ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র পদত্যাগ করলেন। সংস্কৃত কলেজ নিয়েও তিনি ডঃ ব্যালেণ্টাইনের পত্রের নির্ভীক সমালোচনা করেছিলেন। সরকারী অসন্তুষ্টির কথা চিন্তাও করেন নি। কেবল সরকার নয়, বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন প্রসঙ্গে তিনি অনুজ শম্ভুচন্দ্রকে লিখেছিলেন :

" .....আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক তাহা করিব ; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"

এই কথা ক'টির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের আদর্শ নিহিত আছে। তিনি নিজের বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে যাকে সমাজ বা ব্যক্তির মঙ্গল বলে ধারনা করতেন, তার সিদ্ধির জন্য নিজের সমস্ত শুভাশুভ সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্য হয়ে কর্মপথে প্রবৃত্ত হতেন। এই জন্যই ঈশ্বরচন্দ্র প্রচুর অসুবিধার সৃষ্টি হবে জেনেও সরকারী অনুমোদনের অপেক্ষা না করেই গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মঙ্গল চিন্তা ক'রে তিনি তাদের জন্য আধুনিক শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন এবং শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণবংশের প্রতিভূ হয়েও বেদান্তকে 'ভ্রান্ত দর্শন' বলতে কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু যখন বিদ্যাসাগরের আদর্শের সঙ্গে অন্যের চিন্তার কিম্বা কর্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হ'ত, তিনি যদি মনে করতেন তাঁর সহকর্মিগণ ন্যায় পথে চলছেন না, বিনা দ্বিধায় তখন আরব্ধ কর্ম হতে সরে আসতেন।

হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফণ্ডের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পর্ক ত্যাগ, এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য ঈশ্বরচন্দ্র যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন, কিন্তু যখন দেখলেন কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রকৃত কর্মের অপেক্ষা কর্তৃত্ব-ইচ্ছাই অধিক তখন আদর্শবাদী পুরুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'য়ে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। ডিরেক্টরদের কাছে লিখিত পত্রের শেষাংশে তিনি লিখলেন :

"......এই ফণ্ডের সংস্থাপন ও উন্নতি সম্পাদন বিষয় আমি যথাসাধ্য চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি। উত্তরকালে আপনাদের ফলভোগের প্রত্যাশা আছে ; আমি সে প্রত্যাশা রাখি না। যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন,

সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া, তাঁহার পরম ধর্ম্ম ও তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম; কেবল এই বিবেচনায় আমি তাদৃশী চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি, এতদ্ভিন্ন এ বিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র স্বার্থসম্বন্ধ ছিল না। বলিলে আপনারা বিশ্বাস করিবেন কিনা জানি না; কিন্তু না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না, এই ফণ্ডের উপর, আপনাদিগের সকলকার অপেক্ষা আমার অধিক মায়া। আমায়, সেই মায়া কাটাইয়া, ফণ্ডের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে, সেইজন্য আমার অন্তঃকরণে কত কষ্ট হইতেছে, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। যাহাদের হস্তে আপনারা কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহারা সরল পথে চলেন না। এমনস্থলে, এ বিষয়ে লিপ্ত থাকিলে, উত্তরকালে কলঙ্কভোগী হইতে ও ধর্ম্মদ্বারে অপরাধী হইতে হইবে; কেবল এই ভয়ে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, নিতান্ত দুঃখিত মনে, নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক, আমায় এ সংস্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে।"

এই চিঠিখানি দেখলে বোঝা যায় ঈশ্বরচন্দ্র নিজের গঠিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপস করতে না পেরে দূরে সরে আসতেন সত্য, কিন্তু তাঁর হৃদয় বেদনায় ভরে যেত।

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন যে, বিদ্যাসাগর-চরিত্র সম্যক প্রণিধান করবার জন্য কোন সদাজাগ্রত চক্ষু ছিল না। তিনি লিখেছেন:

"আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বসওয়েল্ কেহ ছিল না; তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সবলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বসওয়েল্ না থাকিলে জন্‌সনের মনুষ্যত্ব লোকসমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না।"

ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র ছিল সমাজ। রাজনীতি হতে তিনি দূরে ছিলেন, শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসংস্কারের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন এবং জন্মসূত্রে-প্রাপ্ত তাঁর প্রবল একনিষ্ঠা, যা সময়ে সময়ে জেদ বলে মনে হয়েছে, তার সাহায্যে সফলতা অর্জন করেছেন। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব কর্মক্ষেত্রে অপ্রতিহত হলে তবেই তিনি অগ্রসর হতে পারতেন, না হলে নিজেকে সেক্ষেত্র হতে সংবরণ করে নিতেন। তাঁর এই অনমনীয়তার মধ্যে

যে একটি আদর্শ আছে, তা উপলব্ধি করাবার জন্যই একজন বসওয়েলের প্রয়োজন ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর দয়া, মাতৃবক্ষ-সঞ্জাত মমতা-ধারার ন্যায় যা একদা বাঙালিকে অভিষিক্ত করেছিল এবং তাঁর তেজস্বিতা, যে তেজ বাংলাদেশে দুর্লভ সে সব সম্বন্ধে কত ঘটনার প্রমাণ সামনে এসে উপস্থিত হয়। একটি কথা কিন্তু জানবার জন্য জিজ্ঞাসা-উদ্যত হলেও ভাল করে জানা যায় না। কথাটি হ'ল ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্ম কি ছিল। নিঃসন্দেহ যে তিনি হিন্দু, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। কিন্তু সেই ধর্ম কোন্ রূপে তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েছিল? আমরা কর্মবীর ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখলাম বাংলার গ্রামে গ্রামে শিক্ষাবিস্তার করতে। সমাজসংস্কারক হ'য়ে লড়লেন তিনি সমাজের সঙ্গে। তাঁর মমতার কোলে আশ্রয় পেল আদ্বিজচণ্ডাল। কিন্তু কোনও দেবদ্বারে প্রণত ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখতে পেলাম না তো। অবশ্য না দেখবার কারণ, তিনি মানুষকে ভালবেসে তার পূজাতেই নিজেকে অর্পণ করেছিলেন। ধর্মসম্বন্ধে তাঁর যে কিরূপ নিরপেক্ষ মনোভাব ছিল সে বিষয় রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানি পত্র পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। তখন ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুত্থানের সময়। রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু প্রাচীন সংস্কার ত্যাগ করা বড় দায়, সে-যে বাসা বেঁধে থাকে মর্মমূলে, সঞ্চরণ করে রক্তধারায়। তাই কন্যার বিবাহ সময় উপস্থিত হলে রাজনারায়ণ বিব্রত বোধ করলেন। মনে সমস্যা দেখা দিল, কোন্ পদ্ধতিতে কন্যার বিবাহ দেবেন তিনি—ব্রাহ্ম না হিন্দু পদ্ধতিতে? বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট পরামর্শ চাইলেন রাজনারায়ণ। বিদ্যাসাগর জানালেন:

"আপনার কন্যার বিবাহ-বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছি, কিন্তু আপনাকে কি পরামর্শ দিব, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। ফল কথা এই যে, এরূপ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া কোনক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ আপনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। ব্রাহ্মধর্মে আপনার যেরূপ শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে দেবেন্দ্রবাবু যে প্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, যদি তাহা ব্রাহ্মধর্মের অনুযায়িনী বলিয়া আপনার বোধ থাকে, তাহা হইলে এ প্রণালী অনুসারেই আপনার কন্যার বিবাহ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ

যদি আপনি দেবেন্দ্রবাবুর অবলম্বিত প্রণালী পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাচীন প্রণালী অনুসারে কন্যার বিবাহ দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্ম-বিবাহ প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবেক। তৃতীয়তঃ ব্রাহ্ম প্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিলে ঐ বিবাহ সর্বাংশে সিদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক কি না, তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না। এই সমস্ত কারণে আমি এ বিষয়ে সহসা আপনাকে কোন পরামর্শ দিতে উৎসুক বা সমর্থ নহি। এইমাত্র পরামর্শ দিতে পারি যে, আপনি সহসা কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না।

উপস্থিত বিষয়ে আমার প্রকৃত বক্তব্য এই যে, এরূপ বিষয়ে অন্যের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে। ঈদৃশ স্থলে নিজের অন্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া যে রূপ বোধ হয়, তদনুসারে কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। কারণ যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সে ব্যক্তি নিজের যেরূপ মত ও অভিপ্রায়, তদনুসারেই পরামর্শ দিবেন, আপনার হিতাহিত বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে তত দৃষ্টি রাখিবেন না।"

বিদ্যাসাগরের নিজের অন্তরে যে সত্য প্রকটিত হ'ত তার উর্ধ্বে যে কোন ধর্ম্মমতকে স্থান দিতেন না একথাই পত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কালী, শিব, নারায়ণ কিম্বা নিরাকার পরমব্রহ্ম, ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্ট—কেহই ঈশ্বরচন্দ্রের মনকে আবদ্ধ ক'রে রাখতে পারেন নি। তিনি পূজা করেছেন মানুষকে। মানুষকে ভালবাসতেন বলেই ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। যাকে ভালবাসেন তাকেই মুক্তি দেবেন। মুক্তি দেবেন শিক্ষাহীনতার তামস ও দারিদ্র্যের দুঃখ হ'তে ; তাই ইংরেজী শিক্ষার জন্য এত আকিঞ্চন. মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য উদ্যম। নারীকে স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তাই তো স্ত্রীশিক্ষার জন্য এত প্রচেষ্টা, আত্মক্ষয়কারী সংগ্রাম।

ঈশ্বরচন্দ্রের সমস্ত প্রেরণার মূলে ছিল এক অত্যুগ্র মানবপ্রেম তাই তিনি সমাজের হিতকারী 'তত্ত্ববোধিনী'র পরিচালকদের ধর্ম্মমত কিম্বা আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত না ক'রে, 'তত্ত্ববোধিনী'কে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রবল চেষ্টা করেছেন।

বাঙালির মনকে শিক্ষিত করবার জন্য তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা করলেন,

সাহিত্যের উপযুক্ত ভাষাও সৃষ্টি করলেন। প্রসাদগুণ, ওজস্বিতা এবং গাঢ়বদ্ধতা লাভ ক'রে বাংলাভাষা সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। এই সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের নিকট বাঙালির জাতীয় ঋণ স্মরণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"ভাষার একটা প্রকাশ মননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্য সংগ্রহের দিকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞানে ইতিহাসে ; আর একটা প্রকাশ ভাবের বাহনরূপে রসসৃষ্টিতে ; এই শেষোক্ত ভাষাকেই বিশেষ করে বলা যায় সাহিত্যের ভাষা। বাংলায় এই ভাষাই দ্বিধাবিহীন মূর্তিতে প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে বিদ্যাসাগরের লেখনীতে।......

......সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলা ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়।"

জনশিক্ষা, সমাজসংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র পঞ্চাশ খানিরও অধিক পুস্তক রচনা করেছিলেন। সরল, সাবলীল, ওজোগুণ-সমন্বিত, আবার রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক—সকল প্রকার রচনাতেই বিদ্যাসাগরের সমান অধিকার ছিল। যেমন অফুরন্ত কর্মশক্তি, তেমনি তার প্রকাশ। নিজেকে নিঃস্ব ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র সমাজসেবায় ও শিক্ষাবিস্তারে উপার্জিত অর্থ দান করেছেন আর প্রতিভার ভাণ্ডার উজাড় করে সেবা করেছেন বাংলা ভাষার।

ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে নিঃস্ব বিশেষণটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। যে দানবীর কৌপীনসম্বল হয়ে আপনার দাক্ষিণ্যে অপরকে সমৃদ্ধ করেন, তাঁরও দানের বিনিময়ে কিছু প্রাপ্তি আছে। একেবারে দেউলে হয়ে যান না তিনি। গ্রহীতার কৃতজ্ঞতায় দাতার অন্তর পূর্ণ হয়ে যায়। তাঁব কর্মশক্তি অফুরন্ত হয়ে ওঠে।

সমস্ত জীবন ভরে বিদ্যাসাগর দেশবাসীর জন্য যত কাজ করেছেন তার জন্য বাঙালি বিদ্যাসাগর-প্রয়াণে পিতৃবিয়োগ ব্যথা অনুভব করেছিল সত্য, কিন্তু রাশি রাশি কৃতঘ্নতা ও অকৃতজ্ঞতার আঘাত তাঁর মনকে শেষজীবনে বিষাক্ত করে দিয়েছিল। যে মানুষকে তিনি বড় ভালবাসতেন, তাদের অনেকেরই প্রতি বিদ্বিষ্ট হ'য়ে তথাকথিত শিক্ষিত লোকসমাজের অন্তরালে আশ্রয় খুঁজেছিলেন।

মানুষকে ভালবাসার পরিবর্তে কিছুটা আঘাত যে সহ্য করতেই হয়, প্রেমের প্রতিদানে মৃত্যু-উপহার পেয়ে যীশুখ্রীষ্ট এই সত্য আমাদের শিখিয়ে গেছেন। কিন্তু মানুষের শত অকৃতজ্ঞতা, অবিচার সহ্য করলেও মহাপুরুষদের হৃদয়ের মধুক্ষরণ কখনো বন্ধ হয়ে যায় না। সকল কর্মের শেষে একটি পরম-আশ্রয় তাঁদের জন্য শান্তির নীড় রচনা করে রাখে, যোগান দেয় জীবনস্রোতের।)

ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মময় জীবনে দেখতে পাই অফুরন্ত এক শক্তির স্রোত তাঁকে কর্মে প্রবৃত্তি দান করছে। মানুষের প্রতি তাঁর যে গভীর প্রীতি তা হতেই এই শক্তির উদ্ভব হয়েছে। জীবনকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি, জীবনের পশ্চাতে কি আছে, সে-রহস্যের সন্ধান আবশ্যক মনে করেন নি। তাঁর উদ্দেশও বোধ হয় তিনি পান নি।

পূর্বেই আমরা দেখেছি যে, কোন আপস কিম্বা মধ্যপন্থা গ্রহণ ঈশ্বরচন্দ্রের নীতিবিরোধী ছিল। অবশ্য যুক্তিবাদের কঠিন পথে চলেও তিনি হৃদয়কে শুষ্ক, উপবাসী রাখেন নি। মানুষের প্রতি ভালবাসায়, তাদের দুঃখে ঈশ্বরচন্দ্রের অশ্রু ঝরেছে। আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত হয়েও তিনি দান করেছেন। কিন্তু এই অতুল প্রেমের পরিবর্তে মানুষ যখন তাঁকে অকৃতজ্ঞতার নিষ্ঠুর আঘাত করল, তখন মর্মকোষ শুষ্ক হ'য়ে ঈশ্বরচন্দ্র যেন নিঃসম্বল, দেউলিয়া হয়ে পড়লেন।

এই দুর্দিনে তাঁকে রক্ষা করতে পারতেন তাঁর স্রষ্টা। আপনাকে সংহত ক'রে যদি ক্ষণিকের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হতে পারতেন, তবে দেখতেন মানুষের মধ্য দিয়ে তিনি অনন্তরূপী ভগবানকেই ভালবেসেছেন। সেই অভাবনীয়ের একটি রূপ রুদ্র, অপরটি করুণাঘন দাক্ষিণ্য-মূর্তি। একটি নয়ন কৃতঘ্নতা বর্ষণ করলেও অপর নেত্রে পরমাপ্রীতি। তখন ঈশ্বরচন্দ্র উপলব্ধি করতে পারতেন যে, তাঁর কোন কর্ম নিষ্ফল হয়নি, সমস্ত দানই প্রতিদানে মনকে পূর্ণ করে দিয়েছে। কিন্তু এই অনুভূতি সম্ভব হয় নি বলেই মানুষকে ভালবেসে ঈশ্বরচন্দ্র জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে যেন প্রায়-মানববিদ্বেষী হ'য়ে উঠলেন। একটি মহাপরিণাম, একটি সুখময় সমাপ্তিতে তাঁর জীবন-উৎসর্গ বিলীন হতে পারল না।

মানব-হৃদয়ের এই রহস্য, সকল দিয়ে ও সকলি ফিরে পাবার আকাঙ্খার কথা রামমোহন জেনেছিলেন। তাই হৃদয়ের সমস্ত প্রকোষ্ঠগুলি যুক্তি দিয়ে পূর্ণ করে, তবেই তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন আর তাঁর আশ্রয় ছিল নির্বিকার ব্রহ্ম। দেশবাসীর অকৃতজ্ঞতা, স্বজনের বিরূপতা ঈশ্বরচন্দ্র হতে রামমোহনকে শতগুণে বিদ্ধ করেছিল, কিন্তু তিনি আশুত কিম্বা মানববিদ্বেষী হয়ে ওঠেন নি। কার সাধ্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও প্রতিকূলতার আঘাতে রামমোহনকে মানববিদ্বেষী করে তুলবে! তিনি পরব্রহ্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন, যে-ব্রহ্ম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়ে রামমোহনের পূজা গ্রহণ করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের যদি এরূপ কোন আশ্রয় থাকত তাহলে মানুষের আঘাত তাঁকেও মোটেই স্পর্শ করতে পারত না। (জীবনের শেষবেলায় পৌঁছে ক্রমাগত অকৃতজ্ঞতার আঘাতে ক্লান্ত মানবপ্রেমিক ঈশ্বরচন্দ্রকে কখনই বলতে হ'ত না: "সে আমার নিন্দে করলে কেন, আমি ত তার কোন উপকার করিনি।") •

(ঈশ্বরচন্দ্রের ঘাতপ্রতিঘাত-সঙ্কুল জীবন ধীরে ধীরে সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হয়ে আসছিল। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের পুণ্য নাম প্রত্যেক বাঙালি,—কেবল বন্ধু ও সহযোগী নন, তাঁর বিরুদ্ধপক্ষও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করলেন। বাঙালির হৃদয়ের স্বতউৎসারিত শ্রদ্ধা তাঁকে সম্মানিত করেছিল।

ইতিপূর্বে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ঈশ্বরচন্দ্রকে ইংলণ্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অনারারি মেম্বাররূপে নির্বাচিত ক'রে বাঙালি-দুর্লভ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। এবার ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে, রাজকার্য হতে অবসর গ্রহণ করবার কুড়ি বৎসর পর, ভারতসরকার ঈশ্বরচন্দ্রকে সি, আই, ই, উপাধি দ্বারা ভূষিত করলেন।

অবশ্য বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্ণর সার রিচার্ড টেম্পলের সময়েও (১লা জানুয়ারী ১৮৭৭) ঈশ্বরচন্দ্রকে একটি সম্মানলিপি প্রদান করা হয়েছিল। লিপিটির মর্ম ছিল:

"বিধবাবিবাহ আন্দোলনের নেতা এবং ভারতীয় প্রগতিশীল সমাজের

মুখপাত্ররূপে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে এই মানপত্রটি প্রদান করা হ'ল ”

শারীরিক অসুস্থতাকে, সরকারী কর্ম হতে অবসর গ্রহণের সময়, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পদত্যাগের কারণ বলে প্রকাশ করেছেন। অবশ্য আধা-সরকারী পত্রে লর্ড হ্যালিডেকে একথাও তিনি বলেছেন যে, অসুস্থতা পদত্যাগেব একটি কাবণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। কিন্তু তাঁর শরীর যথার্থই অসুস্থ হয়েছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দেব ১৪ই ডিসেম্বব তারিখে ডিরেক্টর অব ইনস্ট্রাকসন শ্রীঅ্যাটকিন্সন ভারতবন্ধু মেরী কার্পেণ্টার ও ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে যখন উত্তরপাড়া বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শনে যান তখন ফিরবার পথে গাড়ী উল্টিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র পড়ে গিয়েছিলেন এবং যকৃতে গুরুতর আঘাত লাগে। ফলে ঈশ্বরচন্দ্রেব স্বাস্থ্য একেবাবে ভেঙে পড়ে, এবং যে ভয়ানক ব্যাধি ঈশ্বরচন্দ্রকে মৃত্যুপথে নিয়ে গিযেছিল, এই ভয়ানক আঘাতই তার প্রধান কারণ।

পীড়িত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র শারীরিক অসুবিধার কথা একবারও চিন্তা করেন নি, অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশেব সেবা করেছেন। তারপর যখন শরীর একেবারে বিকল হয়ে পড়ল, দেহ কঙ্কালসার হয়ে গেল, তখন শ্রমসাধ্য কাজ বাধ্য হয়েই ত্যাগ করতে লাগলেন। মধুপুরের নিকট কার্মাটারে নির্জন সাঁওতাল পল্লীতে ঈশ্বরচন্দ্র একখানি বাংলো-বাড়ী নির্মাণ কবেছিলেন, এই স্থানটিই তাঁর বিশ্রাম-নিকেতন হয়ে উঠল। দেহ রোগ-জর্জর, মন আধুনিক সভ্যতাপুষ্ট মানুষেব অকৃতজ্ঞতায় আহত; কেবল, আধুনিক সভ্যতা-বর্জিত দরিদ্র সাঁওতালদের ভালবাসাই তাঁকে সঞ্জীবিত করে তুলত। সাঁওতালদের অন্নদান, বস্ত্রদান আর শিক্ষাদান ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র যে তৃপ্তি পেয়েছিলেন, আমাদের তথাকথিত সুসভ্য বাঙালি সমাজ তাঁকে সে তৃপ্তি দিতে পারে নি।

আমরা পূর্বেই দেখেছি কার্মাটারে সাঁওতাল বালকদের শিক্ষার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র নিজব্যয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, তাদের অন্যান্য ব্যবস্থার প্রতিও ঈশ্বরচন্দ্রের সতর্ক দৃষ্টি ছিল এবং শেষ ইচ্ছা-পত্রে কার্মাটারের গৃহরক্ষকের জন্যও তিনি অর্থ দিয়ে গিয়েছেন।

১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই বাংলাদেশের বড় দুর্দিন। দয়ার সাগর পৃথিবীকে দীনা ক'রে বিদায় নিলেন। শ্রাবণ মাস। বর্ষার মধ্যে সেদিন কি কেউ শ্যামসমারোহ লক্ষ্য করেছিল! সেদিন তো সমস্ত আকাশ বেদনাবিহ্বল ধরণীর দুঃখে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, বর্ষণে ছিল প্রকৃতির অশ্রু।

ক'দিন হতেই অবস্থা খারাপ হ'য়ে আসছিল। পঁচিশ বৎসর পূর্বে যার প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছিল দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে, সে এতদিনে বিদ্যাসাগরের উপর পূর্ণ অধিকার স্থাপন করল। রাত্রি আড়াইটার সময় সত্তর বৎসর বয়সে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান ইহলোক ত্যাগ করলেন।

এই বৎসরের ২৭শে আগস্ট বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্নর সার চার্লস এলিয়টের সভাপতিত্বে কলকাতার টাউনহলে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হল। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের স্মৃতি চিরস্থায়ী করবার জন্য সমস্ত বাংলাদেশ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। সুতরাং সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল কি উপায়ে ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখা যেতে পারে।

সভায় বহু আলোচনা হ'ল এবং তার ফলেই সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ—যিনি শিক্ষায়তনটিকে অচল মধ্যযুগ হতে আধুনিকত্বে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছিলেন, তাঁর একটি প্রস্তরমূর্তি কলেজ-ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রিয়তমা এবং প্রেমকে চিরস্থায়িত্ব দান করবার উদ্দেশ্যে সম্রাট সাজাহান তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন। স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন তাজমহল। দর্শক দেখে—নিষ্প্রাণ প্রস্তর সৌন্দর্যকে কালজয়ী করেছে। বহুপত্নীক বিলাসী সম্রাটের প্রেমের নিদর্শন বলে তাজমহলকে হয়ত দু'একজন অনুভব করে; অন্যথা, সৌন্দর্যরসিকের তীর্থভূমি তাজমহল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্য যদি একটি মর্মরপ্রস্তরখচিত স্মৃতিসৌধ রচিত হ'ত তাহলে দেশ-দেশান্তর হতে বুঝি জ্ঞানভিক্ষুর দল বাংলার পণ্ডিতের স্মৃতিসৌধ দর্শনের জন্য তীর্থযাত্রায় আসতেন! তাজমহলে আছে শিল্পীর অপূর্ব নৈপুণ্যের প্রকাশ, বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দিরে থাকত বাংলার অখ্যাত একটি গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালকের দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরে পরিণত হবার, দেশকে, মানুষকে সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসার ইতিহাস।

বিদ্যাসাগরের উপযুক্ত স্মৃতিসৌধ রচিত হয় নি, হয় নি জাতির জনক

রামমোহনেরও কোন স্মৃতিমন্দির। গোলদীঘির পাড়ে দেখতে পাই আমরা, অনাদৃত প্রস্তরমূর্তি বিদ্যাসাগর বসে আছেন। দেখছেন নির্নিমেষ প্রস্তরচক্ষু দিয়ে তাঁর বাংলার ছাত্রদলকে, যাদের জন্য একদিন নিঃস্ব, দরিদ্র হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বৎসরে এক দিন, স্মরণোৎসব উপলক্ষ্যে এই প্রস্তরমূর্তিকে নির্মল ক'রে কেউ পুষ্পমাল্যে অর্চনা করে এসে। পদপ্রান্তে জ্বলে ওঠে একটি ধূপশিখা—বিশ্রব্ধ হৃদয়ের উপহার। কিন্তু এ-দেবতার মন্দির নেই।

আধুনিক চিন্তাবিদগণ বলবেন, অতীত দিনের কর্মবীরদের স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করতে হলে, সমস্ত দেশ ভরে যাবে সমাধিমন্দিরে। কিন্তু কোনও দেশে, কোনও যুগে কি জন্মায় রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মত লক্ষ লক্ষ সন্তান—যাঁদের স্মৃতিসৌধ রচিত হলে, জীবিতদের আর পা ফেলবার স্থান থাকবে না? এসব মানুষ ক্ষণজন্মা। এদের জন্য দু'একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়ে থাক না দেশের কিছু স্থান জুড়ে। মানুষ সেখানে আসবে, কিছু দেবে, ফিরে যাবে কিছু নিয়ে।

ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে শেষ কথাটি বলেছেন রবীন্দ্রনাথ:

" বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন; কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝংকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত পীড়িত অনাথ অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালিজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল সবল অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি; এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গমবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য বীর্য মহত্ত্বের সহিত

যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিত ভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয়-জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।"

এমন ক'রে ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র আর কেউ বিশ্লেষণ করেছেন বলে আমরা জানি না। দয়া নয়, শিক্ষা নয়, এক বলিষ্ঠ পৌরুষ দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বাঙালির জাতীয়চরিত্রের ভীরু অপবাদ ক্ষালন করেছেন। তাঁর সমস্ত কর্ম এবং চিন্তার মধ্যে আছে এই বীর্যের পরিচয়। মায়ের মত মমতায় ঈশ্বরচন্দ্র বাঙালিকে লালন করেছেন, কিন্তু পালন করেছেন পিতার কাঠিন্য দিয়ে। কোন দিন কোন্ দুর্বলতাকে তিনি ক্ষমা করেন নি, প্রশ্রয়ও দেন নি। নিজের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র সম্বন্ধেও আমরা এই কাঠিন্য লক্ষ্য করেছি। অনুতপ্ত পুত্র বারবার পিতার পদে প্রণত হয়েছেন; স্নেহ-করুণায় সমস্ত মন সিক্ত হয়ে গেলেও ঈশ্বরচন্দ্র কখনো দুর্বল হন নি। এই সবলতাই বিদ্যাসাগর চরিত্রের প্রধান গৌরব।

ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাবের উপর বহু বৎসরের পলিমাটি পড়েছে। কত চিন্তানায়ক, কর্মবীর বাংলাদেশের ইতিহাসে নিজেদের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন, কিন্তু বীরসিংহের সিংহ-শিশু বিদ্যাসাগরের স্মৃতি কারো প্রকাশেই ছায়াচ্ছন্ন হয় নি। অমৃত-উৎস হতে সমুদ্ভূত যে-জীবন কখনো অবসন্ন হতে জানে না, ঈশ্বরচন্দ্র সেই জীবন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। কর্মযজ্ঞ আরম্ভ ক'রে যজ্ঞেশ্বর তাতে জীবন-সমিধ আহুতি দিয়ে গেছেন। বাঙালি অনির্বাণ জীবনাগ্নির উত্তরাধিকারী হয়েছে, সেই শিখা সঞ্চারিত হয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনে। বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকারী বাঙালির জীবনযুদ্ধে শ্রান্তির অবকাশ, বিশ্রামের আয়োজন নেই।

পরিশিষ্ট

সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

শ্রীবীরেন্দ্র নিয়োগী কর্তৃক সংকলিত

১৮২০, ২৬ সেপ্টেম্বর	হুগলী (বর্তমানে মেদিনীপুর) জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে জন্ম।
১৮২৪, ১ জানুয়ারি	সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা: বহুবাজারের ভাড়া বাড়ীতে পাঠ আরম্ভ।
১৮২৬, ১ মে	গোলদীঘির সন্নিহিত নিজস্ব ভবনে সংস্কৃত কলেজের গৃহপ্রবেশ।
১৮২৮, নভেম্বর	বিদ্যার্জনের জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের কলিকাতা শহরে আগমন।
১৮২৯, জুন	কলিকাতা গবর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন।
১৮৩১, মার্চ	বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য মাসিক ৫ টাকা হারে বৃত্তি এবং আউট-স্টুডেন্ট রূপে একখানি ব্যাকরণ ও নগদ ৮ টাকা পারিতোষিক পান।
১৮৩২, ·	বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য অমরকোষ, উত্তর-রামচরিত ও মুদ্রারাক্ষস পুস্তকাবলী পারিতোষিক পান
১৮৩৩, ...	পে-স্টুডেন্ট হিসাবে নগদ ২ টাকা পান।
১৮৩৪, ·	ইংরেজির ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররূপে বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য পুস্তক পারিতোষিক পান।
..	ক্ষীরপাই-নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যা দিনময়ীর সহিত বিবাহ হয়।
১৮৩৬. ..	অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠশেষে বার্ষিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার জন্য রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ,

		কাব্যপ্রকাশ, রত্নাবলী, মালতীমাধব, উত্তররাম-চরিত, মুদ্রারাক্ষস, বিক্রমোর্বশী ও মৃচ্ছকটিক পুস্তকাবলী পারিতোষিক পান।
১৮৩৮,	...	বেদান্তশাস্ত্র পাঠশেষে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করিয়া মনুসংহিতা, প্রবোধচন্দ্রোদয়, অষ্টবিংশতত্ত্ব, দত্তকচন্দ্রিকা ও দত্তকমীমাংসা পুস্তকাবলী পুরস্কার পান। স্মৃতি শ্রেণীতে প্রবেশ।
১৮৩৮,		সংস্কৃত কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষার সময়ে গদ্যে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত রচনার জন্য ১০০ টাকা পুরস্কার পান।
১৮৩৯,	এপ্রিল	হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ ল কমিটির নিকট হইতে যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন (মে, ১৮৩৯), তাহাতেই ঈশ্বরচন্দ্রের নামের সহিত 'বিদ্যাসাগর' উপাধির ব্যবহার প্রথম লক্ষ্য করা যায়। স্মৃতি শ্রেণীর পরীক্ষাশেষে ন্যায় শ্রেণীতে প্রবেশ করেন।
১৮৩৯,	...	বার্ষিক পরীক্ষায় 'বিদ্যা' সম্বন্ধে সংস্কৃতে পদ্য রচনার জন্য ১০০ টাকা পুরস্কার পান।
১৮৪১,	ডিসেম্বর	সংস্কৃত কলেজে ১২ বৎসর ৫ মাস অধ্যয়নের পর কলেজের এবং অধ্যাপকবর্গের নিকট হইতে ২খানি প্রশংসাপত্র লাভ করেন।
১৮৪১,	...	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার-পদে নিযুক্ত হন।
১৮৪৩,	আগস্ট	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথমাবধি ঈশ্বরচন্দ্র এই পত্রিকার সক্রিয় সহায়ক, অন্যতম পরামর্শদাতা ও প্রেরণা-স্বরূপ ছিলেন।
১৮৪৬,	এপ্রিল	সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন।

১৮৪৭,	এপ্রিল	স্বরচিত গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক 'বৈতাল পচ্চীসী' অবলম্বনে) প্রকাশ করেন। ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।
১৮৪৭,	...	'সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী' নামে একটি পুস্তক-বিক্রয়ের দোকান খোলেন।
	...	বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সমাংশভাগী হইয়া 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন।
	...	"কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূল পুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত" কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায়-কৃত 'অন্নদামঙ্গল' সম্পাদনা করিয়া ২ খণ্ডে প্রকাশ করেন।
	জুলাই	সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন।
১৮৪৮	...	মার্শম্যানের *History of Bengal* অবলম্বনে রচিত পুস্তক 'বাঙ্গালার ইতিহাস', ২য় ভাগ প্রকাশ করেন।
১৮৪৯,	মার্চ	ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড্ রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।
১৮৪৯,	...	সুহৃদ্‌বর্গের সহযোগিতায় সামাজিক আন্দোলনের প্রবর্তনার্থ 'সর্ব্বশুভকরী' সভা স্থাপন করেন।
১৮৪৯,	সেপ্টেম্বর	উইলিয়াম ও রবার্ট চেম্বার্সের গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত 'জীবনচরিত' প্রকাশ করেন।
১৮৫০,	আগস্ট	ঈশ্বরচন্দ্রের প্রেরণায় 'সর্ব্বশুভকরী' সভার মুখপত্র-রূপে 'সর্ব্বশুভকরী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
১৮৫০,	...	ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের অন্যতম সহযোগীরূপে প্রথম বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন। অবৈতনিক সম্পাদক হিসাবে বেথুন নারী-শিক্ষালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৮৫০	ডিসেম্বর	সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অল্পকালের মধ্যেই সংস্কৃত কলেজে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী ও বিধিব্যবস্থা সংস্কারের জন্য শিক্ষা-সংসদে রিপোর্ট দাখিল করেন।
১৮৫১,	জানুয়ারি	সাহিত্যের অধ্যাপক-পদ ছাড়া সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সম্পাদকের দায়িত্বও গ্রহণ করেন।
১৮৫১,	...	সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে কলেজের সম্পাদকের পদ উঠাইয়া দেওয়া হয়।
	এপ্রিল	*Rudiments of Knowledge* অবলম্বনে রচিত পুস্তক 'বোধোদয়' প্রকাশ করেন।
	জুলাই	পূর্বতন রীতির ব্যতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া কায়স্থবংশীয় শিক্ষার্থীকেও সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ দেন।
		পূর্বরীতি অষ্টমী ও প্রতিপদ তিথির পরিবর্তে প্রত্যেক সপ্তাহে রবিবার কলেজ বন্ধ রাখিবার নিয়ম প্রবর্তন করেন।
	.	বংশমর্যাদা-যুক্ত যে কোনও হিন্দু শিক্ষার্থীকেই
	..	সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের অধিকার দান করেন।
	নভেম্বর	স্বরচিত 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' প্রকাশ করেন।
	...	'ঋজুপাঠ', ১ম ভাগ প্রকাশ করেন।
	ডিসেম্বর	'ঋজুপাঠ', ৩য় ভাগ প্রকাশ করেন।
১৮৫২,	জানুয়ারি	'বৈতাল পচ্চীসী' নামক হিন্দী পুস্তক সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন।
১৮৫২,	এপ্রিল	২৬ অনুচ্ছেদ-সংবলিত 'Notes on the Sanskrit College' প্রস্তুত করেন।

১৮৫২,	আগস্ট	পূর্বতন রীতির ব্যতিক্রম করিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশার্থী শিক্ষার্থীদের ২ টাকা প্রবেশ-দক্ষিণা দিবার নিয়ম প্রবর্তন করেন।
১৮৫৩,	...	জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।
		ঈশ্বরচন্দ্রের, সম্পাদনায় কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে মাধবাচার্য রচিত 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। খণ্ডশ প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে।
	মার্চ	স্বরচিত 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশ করেন।
	জুন	কালিদাসের 'রঘুবংশম্' সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন।
		ভারবির 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম' সম্পাদনান্তে প্রকাশ করেন।
	সেপ্টেম্বর	বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মি ব্যালান্টাইনের সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন-রিপোর্টের মতামত সমালোচনা করিয়া শিক্ষা সংসদে রিপোর্ট প্রেরণ। বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এই রিপোর্টটি এক যুগান্তকারী দলিল।
		স্বরচিত পুস্তক 'ব্যাকরণ কৌমুদী', ১ম ও ২য় ভাগ প্রকাশ করেন।
১৮৫৪,	জানুয়ারি	পরীক্ষক-সংসদের অন্যতম সদস্য মনোনীত হন।
		সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে মাসিক ১ টাকা বেতন লইবার নিয়ম প্রবর্তন করেন।
		স্বরচিত পুস্তক 'ব্যাকরণ-কৌমুদী', ৩য় ভাগ ও কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' অবলম্বনে রচিত 'শকুন্তলা' প্রকাশ করেন।

১৮৫৪	...	'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।
১৮৫৫,	জানুয়ারি	'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' প্রথম পুস্তক প্রকাশ করেন।
	এপ্রিল	'বর্ণপরিচয়', ১ম ভাগ প্রকাশ করেন।
	মে	সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ ছাড়া মাসিক ২০০ টাকা বেতনে দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয়-পরিদর্শকের পদ গ্রহণ করেন।
	জুন	'বর্ণপরিচয়', ২য় ভাগ প্রকাশ করেন।
	জুলাই	নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং বন্ধু অক্ষয়কুমার দত্তকে উহার প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন।
	আগস্ট-ডিসেম্বর	দক্ষিণ বাংলার নদীয়া, বর্ধমান ও হুগলী জেলায় ৫টি করিয়া এবং মেদিনীপুর জেলায় ৪টি মডেল স্কুল স্থাপন করেন।
	অক্টোবর	বিধবাবিবাহ বিরোধীদের মত খণ্ডনের জন্য পর্যাপ্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ, 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (দ্বিতীয় পুস্তক) প্রকাশ করেন।
		বিধবাবিবাহ আইনসম্মত করার জন্য ভারত সরকারের নিকট বহু-স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্র প্রেরণ করেন।
	ডিসেম্বর	বহুবিবাহ রহিতকরণের জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করেন।
১৮৫৬,	জানুয়ারি	মেদিনীপুরে পঞ্চম মডেল স্কুল স্থাপন করেন।
	ফেব্রুয়ারি	ঈসপের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'কথামালা' প্রকাশ করেন।
	জুলাই	'বিধবাবিবাহ' আইনসম্মত হয়।
		স্বরচিত 'চরিতাবলী' প্রকাশিত হয়।

১৮৫৬,	...	বিধবাবিবাহ সম্পর্কে পূর্বরচিত পুস্তক দুইখানির ইংরেজি অনুবাদ *Marriage of Hindu Widows* প্রকাশ করেন।
১৮৫৬,	ডিসেম্বর	কলিকাতা শহরে ভারতের প্রথম আইনসম্মত বিধবাবিবাহ দেন।
	...	সিসিল বিডনের সভাপতিত্বে গঠিত বেথুন নারী-শিক্ষালয়ের নূতন ম্যানেজিং কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন।
১৮৫৭,	.	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ইহার পরিচালক সমিতির অন্যতম সভ্য মনোনীত হন।
১৮৫৭,	নভেম্বর-ডিসেম্বর	হুগলী জেলায় ৭টি ও বর্ধমান জেলায় ১টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন।
	...	মাঘ রচিত 'শিশুপালবধম্' সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন।
১৮৫৮,	জানুয়ারী-মে	হুগলী জেলায় আরো ১৩টি, বর্ধমান জেলায় ১০টি, মেদিনীপুর জেলায় ৩টি এবং নদীয়ায় ১টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন।
		'তত্ত্ববোধিনী' সভার সম্পাদক নির্বাচিত হন।
	নভেম্বর	সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন।
	...	ঈশ্বরচন্দ্রের প্রেরণায় 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
১৮৫৯,	এপ্রিল	মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দীতে ইংরেজি বাংলা স্কুল স্থাপন করেন।
		রামগোপাল মল্লিকের বাটীতে 'বিধবাবিবাহ,' নাটকের অভিনয় দর্শন করেন।
	মে	'তত্ত্ববোধিনী সভা' রহিত হওয়ায় উহার সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন।

১৮৬০,	এপ্রিল	ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' অবলম্বনে রচিত 'সীতার বনবাস' পুস্তক প্রকাশিত হয়।
		'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ক্রমশ প্রকাশিত মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশের অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।
১৮৬১,	এপ্রিল	কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের সম্পাদক নির্বাচিত হন।
		ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদনায় কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্' প্রকাশিত হয়।
	ডিসেম্বর	'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করেন।
১৮৬২,		ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদনায় বাণভট্টের 'কাদম্বরী' প্রকাশিত হয়।
		'ব্যাকরণ-কৌমুদী', ৪র্থ ভাগ প্রকাশিত হয়।
১৮৬৩,	নভেম্বর	ওয়াডস্ ইনষ্টিট্যুশনের পরিদর্শক মনোনীত হন।
১৮৬৩,		'আখ্যানমঞ্জরী' ১ম ভাগ প্রকাশ করেন।
১৮৬৪,		'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' নাম পরিবর্তন করিয়া 'মেট্রোপলিটান ইনষ্টিট্যুশন' নামকরণ হয়।
	জুলাই	বিলাতের 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি'র সম্মানিত সভ্য নির্বাচিত হন।
১৮৬৪,	জানুয়ারি	জার্মানির লিপজিগ শহরের বিদ্বজ্জন কর্তৃক সম্মানিত হন।
		বাংলা অভিধান 'শব্দমঞ্জরী' প্রকাশ করেন।
১৮৬৬,	ফেব্রুয়ারি	বহুবিবাহ রহিত করার জন্য দ্বিতীয় বার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করেন।
১৮৬৬,		'আখ্যানমঞ্জরী' পুস্তকের পরিমার্জিত ১ম ভাগ এবং ৩য় ভাগ প্রকাশ করেন।

ও নিষ্ঠায় সম্পূর্ণ বৈষ্ণব হয়ে উঠেছিলেন। এ নিয়ে তাঁর পিতৃকুলের সঙ্গে কিছু মনান্তরও নাকি হয়েছিল। কিংবদন্তী আছে, একবার পিতা শ্যামা ভট্টাচার্য নাকি কন্যার কার্যে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে অভিসম্পাত দিয়েছিলেন, "তোব এক পুত্র বিধর্মী হবে"। এই ঘটনা কতদূর সত্য বলা কঠিন। রামমোহনকে যখন বিধর্মী ব'লে প্রচার করা হচ্ছিল, সেই সময় এ ধরনের কাহিনী-কিংবদন্তীর উদ্ভব অসম্ভব নয়। যাই হ'ক, তারিণী দেবী ছিলেন সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, ধর্মপরায়ণা ও তেজস্বিনী নারী। তাঁর দেহসৌষ্ঠব, বুদ্ধি, ধর্মপ্রাণতা ও তেজস্বিতা, সকলই তাঁব কনিষ্ঠ পুত্রের মধ্যে বহুগুণিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি বায়-পবিবারে ও প্রতিবেশীদের কাছে 'ফুলঠাকুরানী' নামে পরিচিতা ছিলেন। কথিত আছে, তারিণী দেবীই গৃহকর্ত্রী ছিলেন। স্বামীর উপরও তাঁর প্রভাব ছিল অসামান্য। এই তারিণী দেবীব কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন বামমোহন।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দেব ২২ মে তারিখে রাধানগরে বামমোহন জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য, রামমোহনেব জন্ম-তারিখ নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। বর্তমানে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মে তারিখকে বামমোহনেব জন্মকাল ব'লে ধরা হ'লেও, একথা স্বীকার কবতে হয় যে, এ বিষয়ে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা আছে। ব্রিস্টলে রামমোহনের সমাধিফলকে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দকেই জন্মবর্ষরূপে দেওয়া হয়েছে। জন্মের তারিখ নেই। রামমোহনেব জীবনী-লেখিকা সোফিয়া ডবসন কোলেট কতিপয় কারণে ঐ তারিখকে ভ্রমাত্মক মনে কবেন এবং ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মে-কে বামমোহনের জন্মদিন ব'লেই গ্রহণ করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জানুযারি তারিখের Sunday Mirror পত্রিকায় রেঃ সি. এচ. এ. ডাল (Dall) একটি পত্রে জানান যে, কলকাতায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় তাঁব বন্ধু ও মক্কেলদের এক মজলিসে বলেন: "My father was born at Radhanagar, near Krishnanagar in the month of May 1772 ; or according to the Bengali era, in the month of Jyaistha 1179." রেঃ ডাল তখন জন্ম-তারিখটি জানতে চাইলে রমাপ্রসাদ কিন্তু তা দিতে অসমর্থ হন। পরে রামমোহন বংশের কোনও আত্মীয় (মিস কোলেট এঁকে রামমোহনের lineal descendant বলেছেন, কিন্তু রামমোহনের বংশধররা রায় এবং তাঁর দৌহিত্রের বংশধররা মুখার্জী-চ্যাটার্জী নয়) বাবু ললিতমোহন চ্যাটার্জী নাকি রবীন্দ্রনাথের কাছে বলেছিলেন যে, রামমোহন রায় ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মে জন্মেছিলেন। এই তথ্য আবার রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক ফণিভূষণ মুখার্জী মিস্ কোলেটকে দিয়েছিলেন। এইসব তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রেই মিস্ কোলেট রামমোহন ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই সিদ্ধান্তে এসেছেন।

অন্যপক্ষে, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব'লে যাদের মত, তাঁদের যুক্তি ব্রিস্টলের স্মৃতিফলক এবং রামমোহনের বন্ধু ও মনিব মিঃ জন ডিগ্‌বির ছুটি লিখিত উক্তি। ডিগ্‌বি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের 'বেদান্তসার'-এর ইংরেজী অনুবাদ Abridgment of the Vedant ইংলণ্ডে প্রকাশ করেন। তাতে তিনি রামমোহনের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তিনি বলেছেন, ঐ বই প্রকাশকালে, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের বয়স ৪৩ বছর এবং জন ডিগ্‌বির সঙ্গে রামমোহনের যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন রামমোহনের বয়স ২৭ বছর। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের বয়স ৪৩ হ'লে রামমোহনের জন্মবর্ষ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দই হয়। ডিগ্‌বি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতে আসেন এবং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় তাঁর সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় হয়। এই হিসাবেও রামমোহনের জন্মবর্ষ ১৭৭৪-ই হয়।

সুতরাং ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের পক্ষে যুক্তিগুলি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। তবে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দকে জন্মবর্ষ ধরলে অসুবিধা এই যে, এর সমর্থকরা রামমোহনের জন্মদিনটি বার করতে পারেন নি। কিন্তু ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের সমর্থকরা ২২ মে-কে জন্মদিনরূপে খাড়া করেছেন। সুতরাং ব্যবহারিক দিক থেকে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দকে রামমোহনের জন্মবর্ষ ব'লে ধরা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ফল খুব বড় হ'লে তার বোঁটার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের জন্মদিন নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু মহাপুরুষদের একটা জন্মদিনের (কল্পিত হ'লেও ক্ষতি নেই) প্রয়োজন আছে বৈকি!

৩

প্রথম জীবন

রামকান্ত বিষয়ী লোক ছিলেন। মিস্ কোলেট বলেছেন, তিনি কিছুদিন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার রাজসরকারে সরকারের কাজ করেছিলেন। এই তথ্যের কোনও প্রামাণিক ভিত্তি নেই। তবে ব্রজবিনোদবাবু ধনী ব্যক্তি ছিলেন। রামকান্ত উত্তরাধিকারসূত্রে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি পেয়েছিলেন। তাঁর বিষয়বুদ্ধিও অল্প ছিল না; সুতরাং রামমোহনের শৈশব যে খুব স্বচ্ছলতার মধ্যে কেটেছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

রামকান্ত ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণব হ'লেও বিষয়ী লোক ছিলেন। তাই তিনি বিষয়ী লোকের মতোই ছেলেদের গ'ড়ে তোলার দিকে মন দিয়েছিলেন। শৈশব থেকেই রামমোহন অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি এমন প্রখর ছিল যে, কোন কিছু একবার শুনলে তা তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে যেত এবং দ্বিতীয়বার তা শোনার প্রয়োজন হ'তো না। রামমোহন যে অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন, তা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনেও আমরা পরিচয় পেয়েছি। কারণ, নানাবিধ কর্মে সর্বদা ব্যস্ত থাকার মধ্যেও তিনি অনেকগুলি ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, যা অতি প্রখর স্মৃতিশক্তি দ্বারাই সম্ভব ছিল।

শিশু রামমোহনের এই অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিই সম্ভবতঃ রামকান্তকে পুত্র রামমোহনের শিক্ষার বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী ক'রে তুলেছিল। শৈশবে রামমোহন পাঠশালায় কিছুদিন বাংলা ভাষা শিখেছিলেন। কিন্তু তখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিতান্ত প্রাথমিক স্তরে ছিল। কবিতার দিক দিয়ে বাংলা ভাষা অবশ্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল—কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, বিজয়গুপ্ত, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রভৃতির কাব্য এবং বৈষ্ণব পদাবলী তখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবময় সম্পদ্ ছিল। কিন্তু বাংলা গদ্য নিতান্ত শৈশবাবস্থায় ছিল। বাংলা ভাষা নিতান্ত লৌকিক ভাষা ছিল; বাংলা দেশে সুদীর্ঘকাল মুসলমান রাজত্বের ফলে ফারসী ভাষাই ছিল রাজভাষা, সুতরাং শিক্ষিত শ্রেণীর ভাষা। রাজসরকারের কাজ বা বিষয়কর্মের জন্যেও প্রয়োজন ছিল ফারসী ভাষার। তাই রামকান্ত বাড়ীতে মৌলবী রেখে রামমোহনকে ফারসী ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন। অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধির অধিকারী হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই রামমোহন ফারসী ভাষা শিখে ফেলেছিলেন। রামমোহন ফারসী ভাষা

কিছুটা শিখে ফেললে রামকান্ত তাঁকে ভালভাবে ফারসী ও আরবী ভাষা শেখার জন্তে পাটনা পাঠালেন। ঐ সময়ে পাটনা পূর্ব-ভারতে ঐসলামিক ভাষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। পাটনায় রামমোহন আরও ভালো ক'রে ফারসী ভাষা শিখলেন। ফারসী ভাষা শিক্ষার ফলে তিনি ফারসী সাহিত্যেব বিখ্যাত মরমী কবিদের রচনা ও সুফীবাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। ফারসী সাহিত্যের সাদী, হাফিজ প্রভৃতি কবিদের রচনা তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। তিনি প্রায়ই সাদীর কবিতা উদ্ধৃত করতেন। সাদীর একটি বাণী তাঁর খুব প্রিয় ছিল: "জীবের সেবা ভিন্ন আব কিছু ধর্ম নয়। তসবি (ছবি), জায়নামান (আসন) ও আলখাল্লায় ধর্ম নেই।" কথিত আছে, পরবর্তী জীবনে রামমোহন নাকি এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, এই বাণীটি যেন তাঁব স্মৃতিফলকে উদ্ধৃত হয়। আরবী ভাষায় তিনি ইউক্লিড ও এরিস্টটলেব রচনাব আববী অনুবাদ ও কোরানের সঙ্গে সুপরিচিত হলেন। ইউক্লিড ও এবিস্টটল তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত ক'রে তোলে এবং রামমোহন এইভাবে বাল্যেই পাশ্চাত্য ন্যায ও দর্শনেব সঙ্গে পবিচিত হন।

মরমী সুফীবাদ ও কোরান বামমোহনের ধর্মীয় সংস্কাব ও চিন্তায় যুগান্তব এনে দিলো। শৈশব থেকে তিনি যে ধর্মীয় আবহাওয়াব মধ্যে লালিত হযেছিলেন, সুফীবাদ ও কোরানের শিক্ষা ছিল তা থেকে স্বতন্ত্র। হিন্দু ধর্মেব বহু দেবদেবীর পূজা ও পৌত্তলিকতা, যা তাঁর কাছে এতদিন অতি প্রিয বস্তু হয়ে ছিল, তা এখন অবিশ্বাসেব বস্তু হযে উঠলো।

কথিত আছে, রামমোহন বাল্যকালে তাঁদের গৃহদেবতা গোপীনাথের অতিশয় ভক্ত ছিলেন। দেবদেবীর আখ্যান, পুরাণ-কাহিনী, বিশেষতঃ কৃষ্ণলীলা, তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতো। বাল্যকালে তিনি নাকি ভাগবত-পুরাণেব কিছু আবৃত্তি না ক'বে জলগ্রহণ করতেন না। মানভঞ্জন পালা-গান শুনতে শুনতে তিনি নাকি কান্নায় ভেঙে পড়তেন। বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জনের জন্যে তিনি নাকি বাইশ বার 'পুবশ্চরণ' যাগ করিয়েছিলেন। তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী উইলিয়ম অ্যাডাম রামমোহনের জীবদ্দশাতেই, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন, "He seems to have been religiously disposed from his early youth, having proposed to seclude himself from the world as a *Sannyasi* or devotee, at the age of fourteen, from which he was only dissuaded by the entreaties of his mother." রামমোহন যে বাল্যকাল থেকে অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই; তিনি ১৪ বছর বয়সে সন্ন্যাসী হ'তে চেয়েছিলেন, মায়ের অনুরোধেই হন নি, একথাও সত্য হ'তে পারে। কিন্তু এতদিন তিনি ছিলেন বহু দেবদেবী-অধ্যুষিত পৌরাণিক পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী, কিন্তু এখন ফারসী-আরবী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁর সেই আশৈশব-সঞ্চিত বিশ্বাস ও সংস্কারের ভিত্তিমূল নড়ে গিয়েছিল।

তাঁর এই মানসিক পরিবর্তন সম্ভবতঃ তাঁর অভিভাবকদের সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছিল। তাই কথিত আছে, তাঁরা তাঁকে হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্রের সঙ্গে সুপরিচিত করবার জন্যে তাঁকে সংস্কৃত শিখতে কাশীতে পাঠিয়েছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্র অধিগত করলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে, বিশেষতঃ বেদ ও উপনিষদে, তিনি নিরাকার একেশ্বরবাদের সন্ধান পেলেন। কোরান ও বেদান্ত তাঁকে একই সত্যের সন্ধান দিলো—ঈশ্বর এক এবং ঈশ্বর নিরাকার। বহু দেবদেবী ও তাঁদের বিগ্রহপূজা ভ্রমাত্মক।

রামমোহন তাঁর আত্মকথামূলক পত্রে বলেছেন :—

> In conformity with the usage of my paternal race, and the wish of my father, I studied the Persian and Arabic languages,—these being indispensible to those who attached themselves to the courts of the Mahommedan princes, and agreeably to the usage of my maternal relations, I devoted myself to the study of the Sanskrit and the theological works written in it, which contain the body of Hindoo literature, law and religion.

লক্ষণীয়, এই উক্তির মধ্যে পাটনায় গিয়ে আরবী-ফারসী ও কাশীতে গিয়ে সংস্কৃত শিক্ষার কথা বলা হয় নি—কেবল আরবী-ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি রামমোহন সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্যের উদ্‌ঘাটন করেছেন, তাঁর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

> রামমোহনের বাল্যকাল সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না বলিলেই চলে। তাঁহার বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে কিংবদন্তী এইরূপ : তিনি কিছুদিন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পড়িয়া, বাড়ীতে ফার্সী শেখেন, অতঃপর তাঁহার পিতা তাঁহাকে আরবী শিখিবার জন্য পাটনায় এবং শেষে সংস্কৃত শিখিবার জন্য কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন। এই সকল কথার মধ্যে কতটা সত্য নিহিত আছে, তাহা বলা দুরূহ। রামমোহনের বন্ধু অ্যাডাম সাহেব আবার একখানি পত্রে লিখিয়াছেন (ইং ১৮২৬) যে, রামমোহন দশ বৎসর কাশীতে থাকিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন যে একাদিক্রমে দশ বৎসর কাশীতে থাকিতে পারেন না, তাহা সুনিশ্চিত।...
>
> রামমোহন তাঁহার জীবনের প্রথম ১৪ বৎসর যে প্রধানতঃ রাধানগরের বাড়ীতেই কাটাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বাড়ীতেই চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহার সহিত সুখসাগরের নিকটবর্তী পালপাড়া গ্রাম-নিবাসী নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের পরিচয় হয়। এই নন্দকুমার প্রথমজীবনে অধ্যাপক ছিলেন ও পরজীবনে তান্ত্রিক সাধনা করিয়া হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে পরিচিত

হন। মনে হয়, রামমোহনের সংস্কৃত শাস্ত্রে অধিকার অনেকটা ইহার শিক্ষারই ফল। অন্ততঃ তিনিই যে রামমোহনকে তান্ত্রিকমতে আকৃষ্ট করেন, তাহা নিঃসন্দেহ। তিনি বয়সে রামমোহন অপেক্ষা প্রায় ১১ বৎসরের বড় ছিলেন।

একথা স্মরণীয় যে, ঐ সময়ে বাংলা দেশে আরবী-ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষার জন্যে মাদ্রাসা ও চতুষ্পাঠীর অভাব ছিল না। পাটনা, কাশী প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার মতো যানবাহনের বা পথঘাটের যথেষ্ট সুবিধা ছিল না। বালকের পক্ষে একাকী থাকবার মতো স্থানেরও নিশ্চয় অভাব ছিল। যুবক রামমোহন যখন পরে ঐসব স্থানে গিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর মৃত্যু হ'লে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি কে পাবে, তার উইল ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং বিষয়ী ও বিচক্ষণ রামকান্ত দেশে আরবী-ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাঁর বালকপুত্রকে ঐরকম দূরবর্তী স্থানে পাঠাবেন, তা যুক্তিসহ নয়। তাই আমাদের মনে হয়, রামমোহন তাঁর জীবনের প্রথম ১৪ বছর প্রধানতঃ রাধানগরেই কাটিয়েছিলেন। এখানেই তিনি আরবী-ফারসী ও সংস্কৃত শিখেছিলেন। তাঁর ধর্মীয় চিন্তায় এখানেই পরিবর্তন এসেছিল। কোরানের একেশ্বরবাদ, বেদান্তের একেশ্বরবাদ, মহানির্বাণতন্ত্রের একেশ্বরবাদ—সকল কিছুই তাঁকে একেশ্বরবাদ সম্পর্কে সুনিশ্চিত এবং পৌরাণিক ও পৌত্তলিক হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে সন্দিহান ক'রে তুলেছিল।

বাল্যকালেই রামমোহনের তিনটি বিবাহ হয়েছিল। রামমোহন পরবর্তী জীবনে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের ঘোর বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শৈশবে ও বাল্যকালে এই বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের উপর তাঁর হাত ছিল না। তখনকার হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ সুপ্রচলিত ছিল এবং কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ ছিল, অনেকক্ষেত্রে আশ্চর্য-রকমের বেশি। পূর্বোক্ত উইলিয়ম অ্যাডামের পত্র থেকে আমরা জানতে পারি, অতি শৈশবে রামমোহনের একটি বিবাহ হয়েছিল এবং ঐ স্ত্রী মারা গেলে তাঁর বাবা মাত্র প্রায় ন বছর বয়সে এক বছরেরও কম সময়ের ব্যবধানে তাঁকে দুটি বালিকার সঙ্গে বিবাহ দেন। প্রথমা বালিকা ছিলেন বর্ধমান জেলার কুড়মন-পলাশী গ্রামের শ্রীমতী দেবী এবং দ্বিতীয়া বালিকা ছিলেন ভবানীপুরের মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী উমা দেবী। উমা দেবী নিঃসন্তানা ছিলেন। শ্রীমতী দেবীর গর্ভেই পরে রামমোহনের দুই পুত্র হয়েছিল। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী দেবীর মৃত্যু হয়েছিল। উমা দেবীর মৃত্যু হয়েছিল রামমোহনের মৃত্যুর বহু পরে।

রামমোহন যেখানেই শিক্ষালাভ করুন, ফারসী, আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষার ফলে তিনি

সুফীবাদ, ইসলাম ও বেদান্তের সঙ্গে সুপরিচিত হয়েছিলেন এবং পৌরাণিক পৌত্তলিক হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এই সন্দেহ তিনি নিশ্চয় প্রকাশ করতেন এবং হিন্দু দেবদেবীর প্রতি তাঁর অবিশ্বাস নিশ্চয়ই তাঁর পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনকে উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত ক'রে তুলতো। রামমোহনের এই চিন্তাকে তাঁরা নিশ্চয় অকালপক্কতা ও উন্মার্গতাই মনে করতেন। ফলে, অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে পড়লো। এই আদর্শের দ্বন্দ্ব তিক্ততায় পরিণত হ'লে রামমোহন কৈশোরেই গৃহত্যাগ করেন। তাঁর আত্মকথামূলক পত্রে বলা হয়েছে :

> When about the age of sixteen, I composed a manuscript calling in question the validity of the idolatrous system of the Hindoos. This, together with my known sentiments on that subject, having produced a coolness between me and my immediate kindred, I proceeded on my travels, and passed through different countries, chiefly within, but some beyond, the bounds of Hindoostan, with a great aversion to the establishment of the British power in India.

রামমোহন ষোল বছর বয়সে পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মের সমালোচনা ক'রে একখানি বই লিখলে তাঁর পিতামাতা তাতে বিরক্ত হন। পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠায় রামমোহন গৃহত্যাগ করেন। গৃহত্যাগের অন্য কারণও ছিল। নব-প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাব বিরাগ। আত্মকথামূলক এই পত্রে বলা হয়েছে, তিনি গৃহত্যাগ ক'রে প্রধানতঃ হিন্দুস্থানেব মধ্যে এব' হিন্দুস্থানের বাইরে কোনও কোনও স্থানেও ভ্রমণ করেন।

আত্মকথামূলক এই পত্রে একটি পুস্তক রচনার কথা বলা হ'লেও উইলিয়ম অ্যাডাম তাঁর স্মৃতিকথায় যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে তিনি এই ধরনের কোনও পুস্তক রচনার কথা বলেন নি। তিনি বলেছেন, হিন্দু পরিবারের পুত্রদের মতোই রামমোহন বিনীতভাবে পিতার কাছে ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। পিতা তখন তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং ধৈর্যের সঙ্গে পুত্রের বক্তব্য শুনতেন। পুত্রও পিতার যুক্তি কিছু কিছু স্বীকার ক'রে নিতেন, তারপর বলতেন, "কিন্তু আপনি যা বলছেন, তা থেকে আপনার ঐ সিদ্ধান্তে আসা যায় না।" রামমোহনের এই 'কিন্তু' পিতাকে বিরক্ত করতো। তিনি একবার ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "আমি কিছু যুক্তি দিলেই তুমি তার প্রতিবাদে প্রতিবারেই ঐ 'কিন্তু' যোগ কর!" ["The father complained of this, and on one occasion at least, burst out in the tone of remonstrance, as of an injured party: Whatever argument I adduce you have always your

Kintu, your counter-statement, your argument, your counter-conclusion to oppose to me."]

রামমোহনের অন্য এক বন্ধু ডক্টর ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার প্রায় অনুরূপ একটি চিত্রই দিয়েছেন :

> Without disputing the authority of his father, he often sought from him information as to the reasons of his faith; he obtained no satisfaction; and he at last determined at the early age of 15, to leave the paternal home, and sojourn for a time in Tibet, that he might see another form of religious faith.

এখানেও কোন পৌত্তলিকতাবিরোধী পুস্তক রচনা বা পিতা-পুত্রে কলহের কথা নেই।

যে-কোনও কারণেই হ'ক, রামমোহন ১৫-১৬ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন। তিনি গৃহত্যাগ ক'রে কোথায় গিয়েছিলেন, তা নির্দিষ্টভাবে কিছুই জানা যায় না। তিনি যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন, সে-বিষয়ে সকলে একমত। ডক্টর ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার লিখেছেন, রামমোহন ঐ সময়ে ভারতের বাইরে তিব্বতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে দু-তিন বছর ছিলেন। তিব্বতে তিনি সম্ভবতঃ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি আর একপ্রকার পৌত্তলিকতাই দেখেছিলেন, দেখেছিলেন দেবতাজ্ঞানে লামাদের পূজা। রামমোহন এই ধরনের পৌত্তলিকতা ও দেবতাজ্ঞানে জীবন্ত মানুষের পূজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। ফলে, লামা-পূজক তিব্বতীরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু তিব্বতী মেয়েরা তাঁর প্রতি সদয় ব্যবহার করে, যে সদয় ব্যবহারের কথা তিনি জীবনে ভোলেন নি এবং যার ফলে স্ত্রীজাতির প্রতি সারাজীবন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা পোষণ ক'রে গেছেন।

কিন্তু রামমোহনের তিব্বত-ভ্রমণ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> ...রামমোহনের বয়স যখন ১৫, তখন তিনি অন্য প্রকার ধর্ম দেখিবার মানসে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া দুই-তিন বৎসরের জন্য তিব্বতে গিয়াছিলেন,—ডাঃ কার্পেণ্টার এই কথা রামমোহনের মুখে শুনিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু রামমোহন তাঁহার কোনও রচনাতে নিজমুখে তিব্বত ভ্রমণের কথা বলেন নাই। তাঁহার প্রথম-জীবনের ভ্রমণ সম্বন্ধে, ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তুহ্‌ফাত্-উল্-মুয়াহ্‌হিদীনে' এইরূপ লিখিয়াছেন :—
>
> আমি পৃথিবীর সুদূর প্রদেশগুলিতে, পার্বত্য ও সমতলভূমিতে পর্যটন করিয়াছি।

রামমোহন কোন স্থানের নাম না করলেও তিনি যে ভারতের বাইরে ভ্রমণ করে-ছিলেন, তা এই উক্তি থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। তাছাড়া, ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার লিখেছেন, তিনি তিব্বত-ভ্রমণ সম্পর্কে রামমোহনের নিজের মুখ থেকে দুবার শুনেছেন। ডাঃ কার্পেণ্টারের এই উক্তিকে অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ নেই। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ও রামমোহনের বন্ধু গ্রাসেঁ দ্য তাসিও (Gracin de Tassy) রামমোহনের তিব্বত-ভ্রমণ সম্পর্কে তাঁর হিন্দু ও হিন্দুস্থানী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

রামমোহনের আত্মকথামূলক পত্রে বলা হয়েছে, "When I had reached the age of twenty, my father recalled me, and restored to his favour , ..." এই পত্র যদি জাল না হয়, তবে বলা যেতে পারে রামমোহন ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে বা ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "১৭৯২-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন কোথায় কি করিতেছিলেন, জানা যায় না বটে, তবে ২২ মার্চ ১৭৯৬ তারিখ দেওয়া তাঁহার লিখিত একখানি বাংলা পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঐ সময়ে তিনিও পিতার বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন।"

অর্থাৎ, ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আগেই তিনি স্বগৃহে ফিরেছিলেন এবং পিতার সঙ্গে বিষয়-কার্যে যোগ দিয়েছিলেন।

রামমোহন তখন চব্বিশ (মতান্তরে বাইশ) বছরের যুবক।

৪

প্রস্তুতি-পর্ব

১৭৯৫ থেকে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়টাকে আমরা প্রস্তুতি-পর্ব বলতে পারি। পরবর্তী জীবনে তাঁকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, তার জন্যে শক্তি ও হাতিয়াররূপে প্রয়োজন ছিল পাণ্ডিত্য এবং সামাজিক প্রতিপত্তি। সামাজিক প্রতিপত্তির জন্যে প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থ। বাল্যকাল থেকেই তাঁর জ্ঞানার্জন শুরু হয়েছিল, তাতে কোনও ছেদ বা বিরতি ছিল না। কিন্তু এতদিন ধনের জন্যে তাঁকে পরমুখাপেক্ষী থাকতে হয়েছিল। এখন ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাতে পরিবর্তন এলো। এখন থেকে রামমোহন জ্ঞানার্জনের সঙ্গে ধনার্জনও করতে লাগলেন।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে রামকান্ত রায়ের আর্থিক অবস্থা খুবই স্বচ্ছল হয়েছিল। তাঁর পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি তো ছিলই, তাছাড়া তিনি বর্ধমানের রাজাব কাছ থেকে বেশ কিছু জমি খাজনায নিয়েছিলেন এবং বর্ধমানের রানী বিষ্ণুকুমারীব সম্পত্তি দেখাশোনা করছিলেন। বর্ধমানের রাজসরকারে তাঁর খুবই প্রতিপত্তি ছিল, কারণ তিনি বিধবা রানী বিষ্ণুকুমারীর বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ন বছরের জন্যে (১৭৯১—১৮০০) ভরসুট পরগনা ইজারা নিয়েছিলেন। বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে লিখিত রামমোহনের পত্র থেকে জানা যায়, এর রাজস্ব কয়েক লক্ষ টাকা ছিল ("the revenue of which was lakhs of rupees")। রামকান্তের জ্যেষ্ঠপুত্র জগমোহন এই ইজারার জন্যে বাবার জামিন হয়েছিলেন। জগমোহনের নিজস্ব কি রোজগার ছিল বা কিসের যোগ্যতায় তিনি বাবার জামিন হ'তে পেরেছিলেন, তা জানা যায় নি। তবে দেখা যায়, ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রামকান্ত রায় মেদিনীপুরের বেতোয়া পরগনার হরিরামপুর নামে একটি বড় তালুক জ্যেষ্ঠপুত্র জগমোহনের নামে কেনেন।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে রামকান্ত রায় রাধানগবে তাঁর পৈতৃক ভদ্রাসন ত্যাগ ক'রে নিকটবর্তী লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে একটি নূতন বাসভবন নির্মাণ করেন এবং সেখানে সপরিবারে চ'লে যান। তবে রাধানগরের পৈতৃক বাসভবনে বা ভদ্রাসনে তাঁর অংশ তিনি ছাড়েন নি। এখন থেকে কিছুদিন লাঙ্গুলপাড়াই রামকান্ত রায়ের ও তাঁর পরিবারের বাসভবন হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে রামমোহন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং তিনিও পিতার পরিবারেই দুই স্ত্রী নিয়ে বাস করছিলেন। তিনি এই সময়ে পিতার বিষয়-সম্পত্তির কিছু অংশ দেখাশোনা করছিলেন। এই সময়ে পিতা-পুত্রের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল।

স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে রামকান্ত রায় লাঙ্গুলপাড়ায় নূতন বাড়ীতে দিন কাটাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটলো। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর (বাংলা ১২০৩ সালের ১৯ অগ্রহায়ণ) রামকান্ত নিজের সম্পত্তির কিছু অংশ নিজের জন্যে রেখে বাকী সমস্ত সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে দানপত্র ক'রে ভাগ ক'রে দিলেন। রামকান্ত হঠাৎ এই ব্যবস্থা কেন করেছিলেন, তা জানা যায় নি। হ'তে পারে তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছিল না, তিনি তাঁর অবর্তমানে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে পুত্রদের মধ্যে বিরোধ হ'তে পারে, এরূপ আশঙ্কা করছিলেন। যে-কোনও কারণেই হ'ক, রামকান্ত তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে এই ব্যবস্থা করলেন।

তিন ভাই, জগমোহন, রামমোহন ও রামলোচন, তিনজনেই মোটামুটি সমান অংশ পেলেন। তবে হরিরামপুরের তালুকটি অতিরিক্ত জগমোহনের ভাগে পড়লো। বসতবাড়ীর মধ্যে লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ীটি সমানভাবে জগমোহন ও রামমোহনের রইলো। রাধানগরের পৈতৃক বাড়ীর স্বত্ব পেলেন রামলোচন। কলকাতায় জোড়াসাঁকোতে রামকান্ত রায়ের একটি বাড়ী ছিল, সেটি রামমোহন একাই পেলেন। জমিজমা, পুষ্করিণী প্রভৃতি সমস্ত কিছুই ভাগ-বাটোয়ারা করা হ'লো। রামকান্ত তাঁর দলিলে (এই দলিল বাংলাতেই লেখা হয়েছিল এবং পরবর্তী কালে রামমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র জগমোহনের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদের সঙ্গে রামমোহনের মামলাকালে এর ইংরেজী অনুবাদ আদালতে উপস্থিত করা হয়েছিল) কোন্ পুত্র কোন্ সম্পত্তি পাবেন, তার তালিকা দিয়ে লেখেন যে, তাঁর তিন পুত্র এই ভাগ অনুযায়ী বসতবাটী ও জমিজমা ভোগ করবেন, কারও সম্পত্তির উপর অন্য কারো কোনপ্রকার দাবি থাকবে না। তিন পুত্রের কাউকে নগদ টাকা দেওয়া হ'লো না, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি ইতিপূর্বে যাঁকে যা দেওয়া হয়েছে, তা তাঁরই থাকবে এবং পরে যদি দেওয়া হয়, তা হ'লেও এইরূপ ব্যবস্থাই থাকবে।

পরে তিন পুত্রের অংশ ছাড়া তাঁর স্বোপার্জিত সম্পত্তির সামান্য অংশ রামকান্তের নিজের রইলো। তাঁর বর্তমান ঋণ ও উপার্জনের সঙ্গে তাঁর পুত্রদের এবং পুত্রের আয়ের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক রইলো না। অতঃপর তাঁর যা উপার্জন, তা তিনি যাঁকে ইচ্ছা দেবেন। তাঁর পৈতৃক বিগ্রহের সেবা ও পূজার ভার তাঁর পুত্ররা সমভাবে নেবেন; কিন্তু তাঁর নিজের স্থাপিত বিগ্রহের সেবা ও পূজাদির দায় তাঁর নিজের রইলো, তার সঙ্গে পুত্রদের কোনও সংস্রব নেই। জগমোহন ও রামমোহন তাঁদের মাতামহ-দত্ত সম্পত্তি পাবেন; রামলোচনের মাতামহ-দত্ত সম্পত্তি রামলোচন পাবেন; তারিণী দেবী নিজ

পুত্রদের নামে যে জমি ও পুষ্করিণী কিনেছেন, তা তারিণী দেবী পাবেন; পরলোকগত রামশঙ্কর রায়ের কন্যা রামমণি দেবী যে-সব সম্পত্তি কিনেছেন, তা রামমণির থাকবে। তালুক হরিরামপুর সম্পূর্ণ জগমোহন রায়ের, তার সঙ্গে রামমোহন বা রামলোচনের কোন সংস্রব নেই।

রামকান্ত রায়ের তিন পুত্রই এই দলিলে নিজ নিজ অংশে স্বীকৃতিসূচক অঙ্গীকার ও স্বাক্ষর দেন। এবং এই দানপত্র খানাকুল-কৃষ্ণনগরের কাজীর কাছে রেজিস্ট্রি ক'রে নেওয়া হয়।

রামমোহনের কোন কোন জীবনীকার লিখেছেন, রামকান্ত পুত্র রামমোহনকে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। কেউ কেউ এমনও লিখেছেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে এই দলিল হয়েছিল। বর্ধমানের রাজার সঙ্গে মামলায় রামমোহন আত্ম-সমর্থনকালে নিজেকে "a son separating himself from his father during his life-time, and by his own exertion acquiring property unconnected with the father, and after his father's death inheriting no portion of his father's property" ব'লে বর্ণনা করেছিলেন। রামমোহনের এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য ছিল। তিনি পিতার জীবদ্দশাতেই পিতার পরিবার থেকে পৃথক হয়েছিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পরে পিতার কোনও সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পান নি। কিন্তু পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি পিতার সম্পত্তির অংশ, যা পরিমাণে নিতান্ত কম নয়, পিতার কাছ থেকে দানরূপে পেয়েছিলেন।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে কৃত রামকান্তের এই দানপত্র এবং তদনুসারে রামমোহনের পিতৃ-সম্পত্তিলাভ রামমোহনের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। এই সম্পত্তির উপর ভিত্তি ক'রেই তিনি ধীরে ধীরে বৈষয়িক জীবন গ'ড়ে তুলেছিলেন। সেদিন রামকান্ত, যে কারণেই হ'ক, নিজের সম্পত্তির অংশ দায়মুক্তভাবে রামমোহনকে যদি না দিতেন, তবে রামমোহনের জীবনের গতি অন্যরূপ হ'তো। মনে রাখা দরকার, সে-যুগে সামাজিক প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে অর্থ ও ভূসম্পত্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। পিতা রামকান্তের দানই রামমোহনকে সেদিন একক প্রচুর ধনোপার্জনের ও ভূসম্পত্তির মালিক হওয়ার সুযোগ ক'রে দিয়েছিল। এখন থেকে রামমোহনকে আর পিতার মুখাপেক্ষী হ'তে হয় নি। এখন থেকে রামমোহনের নিজের স্বতন্ত্র জীবন-পথ গ'ড়ে তোলার কোনও অন্তরায় ছিল না।

এখানে লক্ষণীয়, রামমোহন এই দানপত্র গ্রহণকালে দানপত্রে উল্লিখিত শর্ত, তাঁর পিতামহ ও প্রপিতামহের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহসমূহের সেবা ও পূজাদির দায়িত্ব, অন্য ভাইদের সঙ্গে সমানভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। ইতিপূর্বেই তিনি একেশ্বরবাদ ও নিরাকার

ঈশ্বরের উপাসনায় বিশ্বাসী হ'লেও, পৌত্তলিক হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বিরোধী মতামত তখনও তীব্র ও কঠোর হয়ে ওঠে নি। তখনও তাঁর অন্বেষণ ও প্রস্তুতি-পর্ব চলছিল।

সম্পত্তি-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে রামকান্ত রায়ের একান্নবর্তী পরিবারেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এলো। দানপত্র অনুসারে কিছুদিন পরে মা রামমণিসহ রামলোচন লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ী ছেড়ে রাধানগরে চ'লে গেলেন এবং ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ (বাংলা ১২১৬ সালের পৌষ) পর্যন্ত সেখানেই বাস করতে লাগলেন। লাঙ্গুলপাড়ায় তারিণী দেবী তাঁর দুই পুত্র জগমোহন ও রামমোহন ও তাঁদের পত্নীদের নিয়ে বাস করতে লাগলেন। রামকান্ত বর্ধমানে চ'লে গেলেন এবং সেখানে তাঁর নিজস্ব ভবনে থেকে বর্ধমানে ইজারা-লওয়া জমিদারি ও বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদের মা মহারানী বিষ্ণুকুমারীর বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করতে লাগলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "সম্পত্তি-বিভাগের পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত রামকান্ত সাধারণতঃ বর্ধমানেই থাকিতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে লাঙ্গুলপাড়া ও রাধানগরে যে না-যাইতেন, এমন নহে। তাঁহার পুত্রেরাও সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য বর্ধমানে যাইতেন। দেশে থাকিলে রামমোহনও অন্য পুত্রদের মত পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। কিন্তু রামকান্তের পত্নীরা কখনও বর্ধমানে গিয়া বাস করেন নাই।"

দানপত্রে তারিণী দেবীকে তাঁর পুত্রদের নামে কেনা ও রামমণিকে তাঁর নিজের নামে কেনা সম্পত্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রামকান্তের জ্যেষ্ঠা পত্নী নিঃসন্তানা সুভদ্রা দেবীর কোনও উল্লেখ নেই। তা থেকে বোঝা যায়, সুভদ্রা দেবী এর বহু আগেই পরলোকগমন করেছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও লিখেছেন: "সম্পত্তি-বিভাগের ফলে রামলোচন রায় ও তাঁহার মাতা লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ি হইতে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সেখানে (লাঙ্গুলপাড়ায়) বিশেষ ব্যবস্থার পরিবর্তন হইল না। তারিণী দেবী কর্ত্রী হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক সকল কর্ম নির্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূ, দৌহিত্র (গুরুদাস মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতি তাঁহারই তত্ত্বাবধানে বাস করিতে লাগিলেন।" রামকান্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ সন্তান ও কন্যার সঙ্গে শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়েছিল। গুরুদাস এই শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। ইনি রামমোহনের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম রামমোহনের মতে বিশ্বাসী ও তাঁর অনুগামী হন।

রামমোহনের কোন কোন জীবনীকার লিখেছেন, রামমোহন তাঁর ধর্মীয় মতামতের জন্যে স্বগৃহে বেশীদিন থাকতে পারেন নি। তিনি কাশী চ'লে গিয়েছিলেন। সেখানে দশ-বারো বছর ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি তাঁর দুই স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে

গিয়েছিলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত উইলিয়ম অ্যাডামের পত্রে বলা হয়েছে, রামমোহন পৌত্তলিক হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করায় সমস্ত আত্মীয়-স্বজন থেকে বহু দূরে কাশীতে দশ-বারো বছর বাস করেছিলেন (was obliged to reside for ten or twelve years at Benares, at a distance from all his friends and relatives…)। উইলিয়ম অ্যাডামের এই উক্তির উপর ভিত্তি ক'রে মিস কোলেট লিখেছেন, সম্ভবতঃ খুব ভালভাবে সংস্কৃত শিক্ষার জন্যেই রামমোহন কাশীতে গিয়ে বাস করেছিলেন এবং ঐ সময়ে তিনি হিন্দুশাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি ধ'রে নিয়েছিলেন, রামমোহন তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি পান নি, সুতরাং তাঁর নিজস্ব আয়ের কোন পথ ছিল না। তিনি ঐ সময় ইংরেজী লিখতে সবেমাত্র শুরু করেছিলেন, তাই তিনি নিশ্চয়ই সংস্কৃত শাস্ত্র কপি ক'রে জীবিকা অর্জন করতেন।

কিন্তু পরবর্তী কালে যেসব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা থেকে জানা গেছে, রামমোহন অতি অল্প কালের জন্যেই কাশীতে গিয়েছিলেন এবং ঐ সময় তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও আয় যথেষ্ট ছিল। গোবিন্দপ্রসাদ বনাম রামমোহনের মামলায় রামমোহনের পক্ষে রামমোহনের জ্যেষ্ঠতাত নিমানন্দের পুত্র গুরুপ্রসাদ রায় যে জবানবন্দি দেন, তা থেকে জানা যায়, সম্পত্তি-বিভাগের কয়েক মাস পরে, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন লাঙ্গুলপাড়া ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে বাস করেন। তাঁর দুই স্ত্রী শাশুড়ী তারিণী দেবীর কাছে লাঙ্গুলপাড়াতে থাকেন। ঐ সময়ে রামমোহন নিশ্চয় স্থায়িভাবে কলকাতায় বাস করতেন না। তিনি মাঝে মাঝে লাঙ্গুলপাড়াতেও আসতেন।

তখনকার কোম্পানির বাজ্যের রাজধানী কলকাতার সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্ক যে আগে থেকেই গ'ড়ে উঠেছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। কোম্পানির কাছ থেকে তাঁর বাবা যে জমিদারি ইজারা নিয়েছিলেন, তা দেখাশোনার সূত্রেও রামমোহনকে সম্ভবতঃ কলকাতায় আসতে হ'তো। অন্যান্য পুত্রদের ও নিজের তুলনায় রামমোহনের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক অনেক বেশি ছিল ব'লেই সম্ভবতঃ রামকান্ত রায় কলকাতার পুষ্করিণীসহ বসতবাড়ীটি রামমোহনকেই দিয়েছিলেন। এই সময় জমিদারি-পরিচালনার সূত্রে বা অন্যান্য সূত্রে রামমোহনের সঙ্গে ইংরেজদের আলাপ-পরিচয় হয় ও তিনি ইংরেজী শিখতে শুরু করেন, যদিও এই শেখা প্রাথমিক মাত্র ছিল।

কলকাতায় এসে রামমোহন তেজারতি কারবার শুরু করেছিলেন। ঐ সময়ে তাঁর কারবারে গোলকনারায়ণ সরকার নামে এক ব্যক্তিকে কেরানী নিযুক্ত করেছিলেন। কয়েক বছর বাদে (বাংলা ১২০৮ সাল—ইং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি গোপীমোহন চ্যাটার্জী নামে এক ব্যক্তিকে তাঁর তবিলদার বা কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। এ থেকে বোঝা যায়, তেজারতি কারবারে তাঁর দ্রুত উন্নতি হচ্ছিল। গোবিন্দপ্রসাদ রায় বনাম

রামমোহন রায় মামলায় রামমোহনের পক্ষে অন্যতম সাক্ষী গোলকনারায়ণ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মে তাঁর জবানবন্দিতে বলেন যে, একুশ-বাইশ বছর আগে রামমোহন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন পদস্থ কর্মচারী অ্যানড্রু র‍্যামসে-কে সাড়ে সাত হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। একুশ-বাইশ বছর আগে, অর্থাৎ ১৭৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, এই ঘটনা ঘটেছিল। ঐ মামলার অন্যতম সাক্ষী গোপীমোহন ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রদত্ত তাঁর জবানবন্দিতে বলেন যে, বাংলা ১২০৯ সালে (১৮০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে) রামমোহন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পদস্থ কর্মচারী টমাস উডফোর্ডকে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। সাক্ষীরা নিশ্চয় প্রমাণের গুরুত্বের জন্যেই বেছে বেছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীদের নামগুলির উল্লেখ করেছিলেন। এছাড়াও, নিশ্চয় বহু খাতক ছিল রামমোহনের। সুতরাং তেজারতি কারবার যে রামমোহনের আয়ের একটা প্রধান উৎস ছিল, তা সহজেই বলা চলে। গোপীমোহনের ও রামমোহনের ভাগিনেয় গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, রামমোহন ঐ সময় কোম্পানির কাগজ কেনাবেচা করতেন। তা থেকেও তাঁর মোটা আয় হ'তো। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুলাই রামমোহন দুটি তালুক কিনেছিলেন—গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুর। দুটি তালুকই বর্ধমান জেলায় অবস্থিত—প্রথমটি জাহানাবাদে ও দ্বিতীয়টি চন্দ্রকোণায়। প্রথমটি তিনি কিনেছিলেন গঙ্গাধর ঘোষের কাছ থেকে ৩,১০০ টাকায় এবং দ্বিতীয়টি কিনেছিলেন রামতনু রায়ের কাছ থেকে ১,২৫০ টাকায়। গোবিন্দপ্রসাদ বনাম রামমোহনের ঐ মামলায় বর্ধমানের জমিদার ও রামমোহনের বন্ধু রাজীবলোচন রায়ের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, ঐ দুটি তালুক থেকে রামমোহনের বাৎসরিক আয় ছিল ৫,০০০ টাকা।

ঐ সময়ে রামমোহন নিজের তেজারতি ও কোম্পানির কাগজের কারবার ও বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা ছাড়াও পিতার কিছু সম্পত্তিরও দেখাশুনা করতেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "...রামমোহনের লিখিত ২১ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৮ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৭৯৯ তারিখের দুইটি পত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, ১৭৯৮ ও ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি ভুরসুট পরগনায় পিতার বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছেন। এই সকল আভাস-ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, রামমোহন এই কয়েক বৎসর বিষয়কর্ম উপলক্ষে কলিকাতা, বর্ধমান, লাঙ্গুলপাড়া ও নিকটবর্তী নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।"

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দুটি তালুক কিনবার কয়েক মাস পরে তিনি উত্তর ভারতে পাটনা, বারাণসী ও অন্যান্য দূরবর্তী স্থান ভ্রমণের জন্যে যান। ঐ সময়ে তিনি তাঁর সদ্যক্রীত তালুক দুটির দেখাশোনার ভার তাঁর বন্ধু বর্ধমানের অন্যতম প্রভাবশালী জমিদার রাজীবলোচন রায়কে দিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে এই চুক্তি হয় যে, যদি প্রবাসে তাঁর মৃত্যু ঘটে তবে তাঁর ঐ তালুক দুটি তাঁর ভাগিনেয় গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পাবেন। ঐ সময় রামমোহনের

বয়স ২৭ (মতান্তরে ২৫) হ'লেও তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। সাধারণতঃ বলা হয়, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদের জন্ম হয়। কিন্তু রামমোহন যখন এই চুক্তি করেন, তখন তাঁর স্ত্রী নিশ্চয় সন্তানসম্ভবা ছিলেন না। তা থাকলে চুক্তিতে, তাঁর মৃত্যুর পর তালুক দুটি কে পাবে, সে সম্পর্কে তাঁর ভাবী সন্তানের উল্লেখ থাকাই স্বাভাবিক ছিল। রাধাপ্রসাদের জন্মকাল নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। ঐ মামলায় সাক্ষ্যদানকালে রাজীবলোচন বলেন যে, রাধাপ্রসাদ বাংলা ১২০৭ সালে (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মেছিলেন। কিন্তু রামমোহনের ভাগিনেয় তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, রাধাপ্রসাদ বাংলা ১২০৮ সালে (১৮০১-২ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের মনে হয়, রামমোহন উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষে ফিরে আসার পরই তাঁর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হয়েছিলেন এবং গুরুপ্রসাদের সাক্ষ্যে প্রদত্ত রাধাপ্রসাদের জন্মকালই ঠিক। রামমোহন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই সম্ভবতঃ উত্তর ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলেন।

উত্তর ভারতে তিনি দীর্ঘকালও থাকেন নি, সংস্কৃত শাস্ত্রও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "এই যাত্রার উদ্দেশ্য খুব সম্ভব চাকুরি বা অর্থোপার্জন। যে র‍্যাম্‌জেকে তিনি বৎসর তিনেক পূর্বে সাত হাজার টাকা কর্জ দেন, তিনি তখন কাশীতে ছিলেন।" সোফিয়া ডবসন কোলেটের সাম্প্রতিক (১৯৬২) সংস্করণের সম্পাদকরা গ্রন্থের পরিশিষ্টে যে Additions and Corrections দিয়েছেন, তাতে তাঁরা লিখেছেন যে, চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর স্টিফেন এন. হে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আগস্ট তারিখের একটি পত্রে সম্পাদকদের জানিয়েছেন যে, ডক্টর হে-র জনৈক বন্ধু এলাহাবাদ সেন্ট্রাল রেকর্ড অফিসে বেনারসের কমিশনার্স অফিসের নথিপত্র (Miscellaneous Revenue Records) ঘাঁটতে ঘাঁটতে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন ও জুলাই মাসের Memorandum of Writers' Salary etc.-য় দেখতে পান যে, নটি নামের মধ্যে একটি নাম রয়েছে রামমোহন রায়। "Ram Mohun Roy @ 100 = 500 Rs." সম্পাদকরা মন্তব্য করেছেন যে, এ থেকে মনে হয়, রামমোহন সম্ভবতঃ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে বেনারসে সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন অন্যত্র কাজে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

> ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় টমাস উডফোর্ড নামে কোম্পানির আর একজন সিবিলিয়ানকে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ দেন। এই টাকাটা কর্জ দিবার সময় রামমোহনের তহবিলে মাত্র দুই হাজার টাকা থাকায় বাকি তিন হাজার টাকা জোড়াসাঁকোর জয়কৃষ্ণ সিংহের নিকট হইতে আনা হয়। উডফোর্ড ইহার জন্য রামমোহনকে তমসুক লিখিয়া দেন।

> ইহার কয়েক মাস পরেই রামমোহন ঢাকা-জালালপুরে (বর্তমান ফরিদপুরে) যথারীতি জামিন দিয়া উডফোর্ডের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন (৭ মার্চ ১৮০৩) দেখিতে পাই। উডফোর্ড ঢাকা-জালালপুরের কলেক্টর ছিলেন। রামমোহনের এই দেওয়ানী-পদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। দুই মাস পরেই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তিনি পদত্যাগ করেন। ইহার কারণ, অসুস্থতার জন্য উডফোর্ডের ঢাকা-জালালপুর ত্যাগ।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মার্চ থেকে ১৪ মে পর্যন্ত রামমোহন যদি ফরিদপুরে চাকরি করেন, তবে বেনারসের সরকারী কেরানীদের নামের খাতায় তাঁর নামে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন ও জুলাই মাসের মাইনের হিসাব কিভাবে উঠতে পারে? হয় এই রামমোহন রায় অন্য কোনও ব্যক্তি ছিলেন, নয় হে-প্রদত্ত সংবাদের কোথাও কোন ভুল আছে। হয়তো কপি করবার সময়ে বা পড়বার ভুলে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দকে ১৮০৩ পড়া হয়েছে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে কিছু বলা যায় না। তবে রামমোহন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগেই যে ফিরে এসেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: "...রামমোহনের বিদেশ-প্রবাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।" মিস্ কোলেটের গ্রন্থের সম্পাদকরাও Supplementary Notes-এ বলেছেন: **Rammohun's stay in Upper India must have been short. He returned to Calcutta probably towards the end of the year 1800.**

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রামমোহনের দ্রুত বৈষয়িক উন্নতি ঘটছিল এবং ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দুটি তালুক কিনেছিলেন যা থেকে আদায়-খরচ ও সদর-জমা ২১,৮৬৮ টাকা দিয়ে বছরে রামমোহনের পাঁচ-ছ হাজার টাকা আয় হ'তো। তেজারতি, কোম্পানি কাগজের কেনাবেচার ওপরে চাকরিও ছিল।

কিন্তু ঐ সময়ে ১৭৯৯ ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ঘোরতর ভাগ্যবিপর্যয় দেখা দিলো। এবং তিন বছরের মধ্যেই তাঁরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন:

> ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মহারানী বিষ্ণুকুমারীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমানে রামকান্ত রায়ের যে প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ছিল, তাহার অবসান হইল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রামকান্ত রায়ের ভুরসুটের ইজারার মিয়াদ ফুরাইয়া গেল এবং দেখা গেল, তাঁহার খাজনার কিস্তি বাকী পড়িয়াছে। এই সময়ে বাকী খাজনা বাবদ তাঁহার বর্ধমানের রাজার দাবীও প্রায় আশী হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

এই সকল ঋণ শোধ করিবার সঙ্গতি রামকান্তের ছিল না। সুতরাং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সর্বপ্রথমে গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে বাকী খাজনার জন্য হুগলীর দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিলেন। এই টাকার (সুদ ও আসলে ৩,৩৩৮৶৫) কিয়দংশ রামকান্ত নিজে শোধ করিলেন, বাকিটা তাঁহার পুত্র ও জামিন জগমোহন রায়ের সম্পত্তির অংশ-বিশেষ বিক্রয় করিয়া শোধ করা হইল, এবং রামকান্ত ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মুক্তি পাইলেন।

রামমোহন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। তখন তাঁর বাবা জেলে আটক ছিলেন। বাবাকে ঋণমুক্ত ক'রে কারামুক্ত করবার মতো সঙ্গতি রামমোহনের নিশ্চয় তখন ছিল। কিন্তু রামমোহন এ-বিষয়ে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। অথচ পূর্বে উল্লিখিত দুটি চিঠি থেকে জানা যায়, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেও তিনি বাবার ভুরসুট পরগনার ইজারা লওয়া জমিদারির দেখাশোনা করতেন। কি এমন ঘটনা ঘটলো যার ফলে রামমোহন পিতার ও ভ্রাতাব এই বিপদের সময়ে উদাসীন রইলেন।

আমাদের মনে হয়, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে রামমোহনের সঙ্গে কোন কারণে, সম্ভবতঃ তাঁর ধর্মীয় একেশ্বরবাদী মতামত ও মুসলমানী পোশাক-আশাক, চাল-চলন, মাংসাহার প্রভৃতি কারণে তাঁব পরিবার-পরিজনের সঙ্গে তিক্ততা আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। এই কারণেই তিনি স্বগৃহ ও আত্মীয়-পরিজন থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন। ঐ সময়ে উত্তর ভারত ভ্রমণের এটা অন্যতম কারণ হ'তে পারে। যাই হ'ক, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব এই ভয়ানক দুরবস্থার কালে রামমোহনের মতো একজন বিবেকবান্ মহানুভব ব্যক্তি কেন তাঁদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেন নি, যে-কোনও জীবনীকারের কাছে এটি একটি গুরুতর প্রশ্ন। এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হ'তে পারে, পিতা ও ভ্রাতার সঙ্গে রামমোহনের তীব্র মতান্তর ও মনান্তর, যা তাঁকে এতো কঠিন ক'রে তুলেছিল। কেবল ধর্মীয় মতামত নয়, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পর্কে রামমোহনের এই মনোভাব সম্ভবতঃ মাতা তারিণী দেবীকেও ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, এমনকি ক্রুদ্ধ করেছিল। যার ফলে রামমোহনের প্রতি অবশিষ্ট জীবনে তিনি এতোই কঠিন হ'তে পেরেছিলেন।

যাই হ'ক, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রামকান্ত কোম্পানির বাকী খাজনার দায় থেকে মুক্তি পেলেও, তাঁকে আবার জেলে যেতে হ'লো। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

> কিন্তু বর্ধমানের রাজা প্রাপ্য টাকার জন্য তখনই আবার তাঁহাকে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিলেন। এইবারে রামকান্তকে প্রথমে হুগলী ও পরে বর্ধমানের জেলে রাখা হইল। পরে বর্ধমানের মহারাজাকে পাঁচ শত টাকা নগদ ও বাকি

টাকা এগার বৎসরে শোধ করিবেন—এই মর্মে একটি কিস্তিবন্দির দলিল লিখিয়া দিয়া দেওয়ানী জেল হইতে মুক্তি পান। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে জগমোহন রায়ও গভর্নমেণ্টের খাজনা বাকি ফেলিলেন এবং তাঁহাকেও মেদিনীপুরের দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। এই জেল হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে।

রামমোহনের এই ভাগ্যবিপর্যয় হইতে একমাত্র রামমোহনই মুক্ত রহিলেন।

রামমোহন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কলকাতায় ফিরে আসেন। ঐ সময়ে তাঁর স্ত্রীরা লাঙ্গুলপাড়াতেই ছিলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ফরিদপুরে উডফোর্ডের কাছে চাকরি নেওয়ার আগে তিনি নিশ্চয় কলকাতায় তাঁর কারবার ও দেশে জমিজমা দেখাশোনা করতেন। এই সময়ে ইংরেজ সিবিলিয়ানদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। পূর্বে তাঁর যে a feeling of great aversion to the establishment of the British power in India ছিল, তা এখন তিরোহিত হয়েছিল। তিনি তাঁর আত্মকথামূলক পত্রে লিখেছেন :

> …I first saw and began to associate with Europeans, and soon after made myself tolerably acquainted with their laws and form of Government. Finding them generally more intelligent, more steady and moderate in their conduct, I gave up my prejudice against them and became inclined in their favour, feeling persuaded that their rule though a foreign yoke, would lead more speedily, and surely to the amelioration of the native inhabitants; and I enjoyed the confidence of several of them even in their public capacity.

এই সময়ে রামমোহনের কোম্পানির কর্মচারীমহলে যথেষ্ট আনাগোনা চলছিল এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিস বিচার-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেছিলেন এবং এদেশীয় আইনগুলিকে বিধিবদ্ধ করবার-ও ব্যবস্থা করেছিলেন। কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালত দেওয়ানী বিচারের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ ছিল। আদালতে আইনের ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলিম আইন নিয়ে নানা সমস্যা প্রায়ই দেখা দিতো। রামমোহন আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর মুসলমানী পোশাক ও আরবী-ফারসী জ্ঞানের জন্যে তো তিনি অনেকের কাছে "মৌলবী রামমোহন" নামেও পরিচিত ছিলেন। আরবী-ফারসী ও সংস্কৃত জানায় হিন্দু ও মুসলিম আইনগুলির ব্যাখ্যায় তাঁর সহায়তা করবার ক্ষমতা নিশ্চয় ছিল। এই সূত্রে তিনি সম্ভবতঃ সদর দেওয়ানী আদালতেও

যাতায়াত করতেন এবং কাজী বা বিচারকদের কাছে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ও সম্মান-প্রতিপত্তি ছিল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড ওয়েলেস্‌লি ইংলণ্ড থেকে আগত সিবিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেছিলেন। এই কলেজে সিবিলিয়ানদের বাংলা, হিন্দী, উর্দু, ফারসী প্রভৃতি শেখানো হ'তো। রামমোহন কিছু কিছু ইংরেজী জানতেন এবং এদেশীয় বহু ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তাই সম্ভবতঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেও তাঁর যাতায়াত ছিল।

সদর দেওয়ানী আদালত ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যে তিনি সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন, তা ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড মিণ্টোর কাছে লিখিত আবেদনপত্র থেকে জানা যায়। তিনি লিখেছিলেন:

> 'The education which your petitioner has received, as well as the particulars of his birth and parentage, will be made known to your Lordship by a reference to the principal officers of the Sudder Dewani Adawlat and the College of Fort William.…(তার শিক্ষা ও বংশ সম্পর্কে সকল সংবাদ সদর দেওয়ানী আদালত ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান কর্মচারীদের কাছ থেকে জানা যাবে।)

রামমোহন যখন রংপুরে দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং তাঁর চাকরি স্থায়ী করবার জন্যে তৎকালীন রংপুরের কালেক্টর জন ডিগ্‌বি কোম্পানির কাছে সুপারিশ করেন, তখন তিনিও লেখেন (৩১ জানুয়ারি, ১৮১০) যে, রামমোহনের চরিত্র, জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান কাজী ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ফারসী ভাষার প্রধান মুন্‌শি সংবাদ দিতে পারবেন।

এ থেকে সদর দেওয়ানী আদালত ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগই প্রমাণিত হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়েছিল এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে রামমোহন উত্তর ভারত 'ভ্রমণ' শেষে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে আবার তিনি চাকরি উপলক্ষে বেশির ভাগ সময় কলকাতার বাইরেই ছিলেন। সুতরাং এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ১৮০১ ও ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দেই নিশ্চয় গ'ড়ে উঠেছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন:

> এই সকল উক্তি হইতে মনে হয়, রামমোহন সদর দেওয়ানী আদালতের ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহিত কোন না কোন প্রকারে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইংরেজ কর্মচারিগণের ফার্সী ও মুসলমান শিক্ষার প্রয়োজনের জন্য সে-যুগে

কলিকাতায় মুসলমানী বিদ্যার খুব চর্চা ছিল। সুতরাং রামমোহন কলিকাতায় উচ্চপদস্থ মুসলমান মৌলবীদের সাহায্যে আর্বী-ফার্সীর ব্যুৎপত্তি গভীরতর করেন, তাহাও অসম্ভব নয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেই সম্ভবতঃ রামমোহনের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও কিছুকালের জন্যে মনিব জন ডিগ্‌বির সঙ্গে পরিচয় হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মিঃ জন ডিগবি সিভিলিয়ান হয়ে এদেশে আসেন। অন্যান্য সিভিলিয়ানেব মতোই তাঁকেও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কিছুদিন এদেশীয় ভাষা শিক্ষা ক'রতে হয়। এই সময়েই রামমোহনের সঙ্গে জন ডিগ্‌বির পরিচয় হয়। ঐ সময়ে রামমোহনের বয়স সাতাশ বছর ছিল ব'লে ডিগ্‌বি বলেছেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের জন্ম হয়েছিল ধরলে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেই রামমোহনেব বয়স সাতাশ ছিল। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের জন্ম হয়েছিল ধরলে, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনেব বয়স সাতাশ হয়। কিন্তু ঐ সময় ডিগ্‌বি ভারতে আসেন নি। তাই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেই মিঃ জন ডিগ্‌বিব সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় হয়েছিল বলা চলে।

এব আগে থেকেই বহু সিভিলিযানেব সঙ্গে বামমোহনেব পবিচয় ছিল। তাই এই পবিচয স্বাভাবিক ছিল। এই দীর্ঘকায, গৌবকান্তি, বুদ্ধিদীপ্ত. যৌবনচঞ্চল প্রাণবন্ত যুবকটি যে সহজেই মানুষের মন জয করবেন, তাতে আশ্চর্য কী। রামমোহনের সঙ্গে ডিগবিব বন্ধুত্ব অল্পকালের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। তাঁদের এই বন্ধুত্ব যে বিশেষভাবে বামমোহনের জীবনে কার্যকব হ'যছিল তা আমরা পরে দেখব।

১৮০১ থেকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দেব গোড়ার দিক পর্যন্ত কয়েক বছর রামমোহনের কলকাতায় ও লাঙ্গুলপাড়ায় জমিজমা ও কারবারেব দেখাশোনা, পড়াশোনা, সদর দেওয়ানী আদালত ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যাতায়াত প্রভৃতি কাজে কেটেছিল। এই সময়, ১৮০১-২ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদের জন্ম হয়েছিল। রাধাপ্রসাদেব জননী ছিলেন রামমোহনের দ্বিতীয়া পত্নী (জীবিতা পত্নীদের মধ্যে প্রথমা) শ্রীমতী দেবী। শ্রীমতী দেবী ও উমা দেবী দুজনেই লাঙ্গুলপাড়ায় শাশুড়ীর কাছে থাকতেন। সুতরাং লাঙ্গুলপাড়াতেই রাধাপ্রসাদের জন্ম হয়েছিল এবং মা ও ঠাকুরমার কোলেই তিনি মানুষ হচ্ছিলেন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ রামমোহনের জীবনের একটি চিহ্নিত বছর। যদি বেনারসে তিনি ইতিপূর্বে কোন চাকরি না করেন, তবে এই বছরই তাঁর চাকরি-জীবনের সূত্রপাত। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকা-জালালপুরের কালেক্টরের দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন। ঐ সময়ে ইংরেজ সিভিলিয়ানরা এদেশীয় ভাষায় কথা বলতে এবং কাজকর্ম চালাতে প্রায়ই

অক্ষম ছিলেন। এদেশের লোকরাও ইংরেজী জানতো না। তাই কাজের সুবিধার জন্তে সিভিলিয়ানরা প্রায়ই ব্যক্তিগত দেওয়ান বা মুন্‌শি রাখতেন। রামমোহন ঐভাবেই উডফোর্ডের দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন, সরকারীভাবে নিযুক্ত দেওয়ান ছিলেন না। এখানে তিনি মাস দুই মাত্র চাকরি করেছিলেন। উডফোর্ড শারীরিক অসুস্থতার জন্তে সাময়িকভাবে চাকরি ত্যাগ করেন বা ছুটি নেন। তাই রামমোহনকেও চাকরি ছাড়তে হয়।

এই সময়ই রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ের মৃত্যু ঘটে (বাংলা ১২১০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, ইং ১৮০৩ সালের মে-জুনে)। বর্ধমানের বাড়ীতে রামকান্তের মৃত্যু ঘটে। রামমোহন পিতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে ছিলেন কিনা সে-বিষয়ে মতভেদ আছে। মিঃ অ্যাডাম লিখেছেন, রামমোহন যে পিতার মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন, সে-কথা তিনি রামমোহনের মুখে শুনেছেন।

R. Roy, in conversation, mentioned to me with much feeling that he had stood by the deathbed of his father, who with his expiring breath continued to invoke his God—Ram! Ram! with a strength of faith and a fervour of pious devotion which it was impossible not to respect although the son had then ceased to cherish any religious veneration for the family deity.

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু বলেন :

আর্থিক দুশ্চিন্তার ও দুর্দশার মধ্যে···বর্ধমানের বাড়িতে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে রামলোচন রায় সম্ভবতঃ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার দৌহিত্র গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মৃত্যুর পরের দিন বর্ধমানে আসিয়া পৌছেন। তাঁহার অপর দুই পুত্রের মধ্যে জগমোহন রায় তখন মেদিনীপুর জেলে, রামমোহন খুব সম্ভব কলিকাতায় অথবা ঢাকা-জালালপুর হইতে কলিকাতার পথে। ···তিনি পিতার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়াই আমার ধারণা।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মতের সমর্থনে গোবিন্দপ্রসাদ রায় বনাম রামমোহনের মামলা থেকেও কিছু কিছু তথ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

আমরা মকদ্দমার যেসকল কাগজ-পত্রের সাহায্যে এই অধ্যায় রচনা করিয়াছি, উহাদের মধ্যে তারিণী দেবীকে রামমোহনের পক্ষ হইতে জেরা করিবার উদ্দেশ্তে লিখিত কয়েকটি প্রশ্ন আছে। উহাদের একটি এইরূপ :—"উল্লিখিত রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর সময়ে রামমোহন রায় কোথায় ছিলেন, এ-বিষয়ে কি জানেন, কি শুনিয়াছেন, কি বিশ্বাস করেন?" ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন জগমোহন সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে ; কিন্তু রামলোচন সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হয় নাই। জগমোহন পিতার মৃত্যুর সময়ে অনুপস্থিত

ছিলেন। সেজন্য মনে হয়, রামমোহনও পিতার মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন না। তাহা ছাড়া রায়-পরিবারের পুরোহিত রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্যের জবানবন্দিতে আছে :—"রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর সময়ে জগমোহন রায় মেদিনীপুর জেলে ছিলেন এবং রামমোহন রায় বিদেশে ছিলেন ; সে দেশের নাম তাঁহার স্মরণ নাই।"

ব্রজেন্দ্রবাবুর এই যুক্তি ও মন্তব্যকে সহজে উপেক্ষা করা যায় না। তাছাড়া, এটা সুস্পষ্ট যে, তারিণী দেবীকে এই প্রশ্ন করবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রামমোহন পিতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁর সঙ্গে তাঁর পিতার মধুর সম্পর্ক আগেই ছিন্ন হয়েছিল এবং তিনি পিতার মৃত্যুর পর কোনও সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পান নি বা গ্রহণ করেন নি, তা-ই প্রমাণ করা। পিতার মৃত্যুর বছরেই রামমোহন তাঁর পৌত্তলিকতা-বিরোধী সম্ভবতঃ মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। এই গ্রন্থ-রচনার পূর্বেই পৌরাণিক পৌত্তলিক হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতামত সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ঐ মতামত তিনি নিশ্চয় গোপন করতেন না, এবং তা তাঁর পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং ব্রাহ্মণ-সমাজের মনে কঠোর আঘাত দিয়েছিল। পনেরো-ষোল বছরের কিশোরের এইসব মতামতকে চঞ্চলমতি ও অপরিণতবুদ্ধি বালকের বাক্‌চাপল্য ব'লে পিতামাতা ক্ষমা করলেও, ত্রিশ বছরের যুবকের এইসব অভিমত নিশ্চয় ক্ষমার যোগ্য ছিল না। সুতরাং ধর্মভীরু রামকান্তের নিকট রামমোহন ঐ সময়ে ধর্মজ্ঞানহীন, অনাচারী ও পরিত্যাজ্য ছিলেন। মৃত্যুশয্যায় ধর্মভীরু রামকান্তের যখন একমাত্র করণীয় ছিল তাঁর ইষ্টদেবতার উপাসনা, স্মরণ ও ধ্যান, তখন তাঁর শয্যাপার্শ্বে বা সম্মুখে তাঁর ইষ্টদেবতায় অবিশ্বাসী ও তাঁর ইষ্টদেবতার অপমানকারী পুত্রের উপস্থিতি বিন্দুমাত্র আনন্দের বা আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল না।

রামমোহনও জানতেন, তাঁর নিজের ধর্মবিশ্বাস পিতার চিরাচরিত আজন্ম-পোষিত ধর্মবিশ্বাসকে ও পিতাকে কতখানি আঘাত দিয়েছে। যে কারণেই হ'ক, আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রামমোহন ঋণদায়ে বন্দী পিতা ও ভ্রাতাকে সাহায্য না করায়, তা নিশ্চয়ই ভাগ্যহত, বৃদ্ধ, রুগ্ন, মুমূর্ষু পিতার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও গর্হিত ছিল। এ কাজ রামমোহন নিশ্চয় কোনও গুরুত্বপূর্ণ কারণেই করেছিলেন ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সে কাজের জন্যে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ, সকলের চক্ষে হেয় হয়েছেন, সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এইসব নানা কারণেই রামমোহন যে তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে বিরত থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক, পিতার সঙ্গে জীবনে শেষবারের মতো সাক্ষাতের ইচ্ছা তাঁর মনে যতোই প্রবল হ'ক। রামমোহন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ছিলেন। সাংসারিক বা ঐহিক কোনও বন্ধনই তাঁর কাছে দৃঢ় ছিল না। প্রয়োজনবোধে এ-সব সম্পর্ক তিনি, অত্যন্ত বেদনাদায়ক হ'লেও, এড়িয়ে চলতেন।

তাই পত্নী-পুত্রকে দূরে রাখতেও তাঁর বাধে নি; বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে তিনি তাঁর সঙ্কল্পের কথা স্ত্রী-পুত্রদের জানান নি। এবং পরে তাঁদের কাতর মিনতি তাঁকে তাঁর সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করে নি। রামমোহন এ-সময়ে বেদান্তে বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি ভগবদ্‌গীতার বাণীর সঙ্গেও সুপরিচিত ছিলেন। কেবল পরিচিত ছিলেন না, ঐ ভাবাদর্শেই যে তিনি জীবনাদর্শকে গ'ড়ে তুলেছিলেন, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। সুতরাং মৃত্যু তাঁর কাছে সাধারণ মানুষের মতো এতো শোকাবহ বস্তু ছিল না।

এইসব নানা দিক থেকে বিচার করলে পিতার মৃত্যুকালে পিতাপুত্রের মিলনের এই মধুর দৃশ্যটিকে কল্পিত ও অবাস্তবই মনে হয়।

পিতার মৃত্যুর পর পিতার শ্রাদ্ধ নিযে রামমোহনের সঙ্গে মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয়-স্বজন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সকলেব মতদ্বৈধ ঘটে। কি ধবনেব সে মতদ্বৈধ, তা ঠিক জানা যায় নি। তবে একটা মতবিরোধ ঘটেছিল, এব' তার ফলে বামমোহন পৃথকভাবে কলকাতায় শ্রাদ্ধ করেছিলেন, তা জানা যায়। ব্রজেন্দ্রবাবু লিখেছেন:

> বামকান্তের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ লইযা বামমোহন ও অন্যান্য সকলের মধ্যে একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। পবিশেষে বামমোহন নিজ-ব্যয়ে কলিকাতায় এক শ্রাদ্ধ করিলেন, তাবিণী দেবী দৌহিত্রের অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া লাঙ্গুলপাড়ায শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিলেন এব' সেই শ্রাদ্ধ কবিলেন রামলোচন রায। জগমোহন জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে মেদিনীপুর জেলেব মধ্যেই আব একটি শ্রাদ্ধ করিলেন।

রামকান্তেব মৃত্যুর পব তাঁর বি ়য়-সম্পত্তির কি হয়েছিল, এবং রায়-পবিবারের অবস্থা কি রকম দাঁডিয়েছিল, সে সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রবাবু লিখেছেন:

> মৃত্যুকালে রামকান্তের কোন নগদ টাকা ছিল না। সম্পত্তির মধ্যে বর্ধমানে সাত-আট হাজার টাকা মূল্যের একটি বাড়ি ও পঞ্চাশ-ষাট বিঘা নিষ্কর ও ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল। বাড়িটি বর্ধমানের মহারাজা ঋণের জন্য দখল করিয়া লইলেন, ব্রহ্মোত্তর জমি রামকান্তের নির্দেশ অনুযায়ী তারিণী দেবী কর্তৃক দেবসেবায় নিয়োজিত হইল।
>
> রামকান্তের মৃত্যুর ও জগমোহনের কারাবাসের জন্য রায়-পরিবার যখন দুর্দশা-গ্রস্ত, তখন রামমোহনেব অবস্থা বেশ সম্পন্ন। তিনি নিজেও এই কথার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন এবং আমরা তাঁহাকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লাঙ্গুলপাড়ায় একটি নূতন তালুক কিনিতে দেখি।

মিস্ কোলেট লিখেছেন, এখন রামমোহন তাঁর পিতাকে ব্যথা দেওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর মতামতগুলি দুনিয়াকে জানাতে শুরু করেন। আমাদের

ধারণা, কয়েক বছর আগে থেকেই তাঁর ধর্মীয় চেতনা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং তাঁর পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি তাঁর মতামত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করছিলেন, সেজন্যে তাঁর পিতামাতা-ভ্রাতা, আত্মীয়-পরিজন ও সমাজে সকলের কাছে তিনি বিষ-নজরে পড়েছিলেন। এজন্যে তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ী থেকে ও আত্মীয়-স্বজন থেকে যতোটা সম্ভব দূরে থাকছিলেন। পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তিনি মুর্শিদাবাদে যান। ঐ সময়ে তাঁর পূর্বোক্ত খাতক ও পৃষ্ঠপোষক র‍্যাম্‌সে ও উডফোর্ড দুজনেই মুর্শিদাবাদে ছিলেন। চন্দ ও মজুমদার সঙ্কলিত রামমোহন-সম্বন্ধীয় Letters and Documents থেকে জানা যায়, রামমোহন মুর্শিদাবাদে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ আগস্ট থেকে মুর্শিদাবাদের আপীল আদালতের তৎকালীন রেজিস্ট্রার মিঃ উডফোর্ডের ব্যক্তিগত মুন্‌শি নিযুক্ত হন। এখানে তিনি বছর দুই চাকরি করেছিলেন।

মুর্শিদাবাদে থাকাকালেই ১৮০৩-১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর একেশ্বরবাদ সম্পর্কে গ্রন্থ "তুহ্‌ফাত্‌-উল্‌-মুওয়াহ্‌হিদিন" (একেশ্বরবাদীদের উদ্দেশে উপহার) প্রকাশ করেন। বইখানি ফারসী ভাষায় লেখা, তবে বইখানির ভূমিকাটি লেখা আরবী ভাষায়। রামমোহন আরবী-ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ইতিমধ্যে তিনি ইংরেজ ও খ্রীষ্টানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন। আরবী-ফারসী ভাষা শিক্ষার ফলে কোরান ও ঐসলামিক ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় পৌত্তলিক হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনে যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল, বেদান্তের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে নিরাকার ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সম্পর্কে তাঁর মত দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খ্রীষ্টানদের সান্নিধ্যে এসে তাঁর সে মত আরও সুদৃঢ় হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন, সকল ধর্মের মূলকথাই হ'লো ঈশ্বর এক ও নিরাকার। সুতরাং হিন্দু ধর্মের বহু দেবদেবীর পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে নীরব থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর এই গ্রন্থে বললেন: এক পরমসত্তা বিশ্ব সৃজন ও পালন করছেন, এটাই হ'লো সকল ধর্মের ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরই বিভিন্ন রকমের কাঠামো গ'ড়ে উঠেছে, যেগুলি বিভিন্ন ধর্মের লোকদের কল্পনা দ্বারা নিতান্ত অযৌক্তিকভাবেই খাড়া করা হয়েছে। সকল ধর্মের ভিত্তি এক, এই সত্যকে গ্রহণ করায় রামমোহনই সকল ধর্মের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের প্রয়োজনীয়তার দিকটি সর্বাগ্রে লক্ষ্য করেন।

হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্ম, সকল ধর্মই এক ও নিরাকার ঈশ্বরের কথা বলেছে, তবু হিন্দুরা মুসলমানদের ম্লেচ্ছ ও বিধর্মী, মুসলমানরা হিন্দুদের কাফের ও অবিশ্বাসী মনে করে। মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যেও অনুরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষ রয়েছে। এই ব্যাপারের অযৌক্তিকতা রামমোহনকে বিশেষভাবে উদ্বেলিত করে। তিনি তাই তাঁর এই পুস্তকে বলেন:

এটা লক্ষ্য করা যায়, কোনও কোনও ধর্মের অনুগামীরা বিশ্বাস করে যে, সেই বিশেষ ধর্মের অনুশাসনগুলিকে মেনে চ'লে ঐহিক ও পারত্রিক কর্তব্যগুলি পালন বা অনুষ্ঠানের জন্যেই ঈশ্বর মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং অন্যান্য ধর্মের অনুগামীরা যারা তা করে না, তারা পরলোকে শাস্তি ও যন্ত্রণা পায়। আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেই নিজ নিজ কার্যের সুফলগুলিকে ও অন্যের কুফল-গুলিকে পরলোকের জন্যে তুলে রাখে, তাই তারা কেউই ইহলোকে অন্যের মতের অসত্যতাকে প্রমাণ করতে পারে না। ফলে তারা পরস্পরের মনে কুসংস্কার ও অনৈক্যের বীজ বপন করে এবং অপর সম্প্রদায়ের লোকরা পরলোকে চিরানন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করবে, একথা প্রচার করে। অথচ এটা স্বতঃ-প্রকাশ যে, তারা সকলেই ভিন্ন ধর্ম অনুসরণ করা সত্বেও ধর্মনির্বিশেষে বাহ্য জগতের সকল ঈশ্বরদত্ত সুখই, যেমন নক্ষত্রের আলো, বসন্তের আনন্দ, বর্ষা, স্বাস্থ্য, শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল, জীবনের অন্যান্য সকল আনন্দ, সবই সমান-ভাবে উপভোগ করছে, আবার তারা সকলেই সকল প্রকার অসুবিধা ও দুঃখকষ্ট— যেমন, অন্ধকার, দুঃসহ শীত, মানসিক ব্যাধি, অস্বচ্ছলতা ও সুযোগহীনতা, অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক অমঙ্গল সমানভাবে ভোগ করছে।

ব্রাহ্মণদের একটা চিরাচরিত ঐতিহ্য হ'লো এই যে, তাদের অনুষ্ঠানগুলি পালন করতে এবং তাদের ধর্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকতে ভগবান তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এই ধরনের বহু নির্দেশ সংস্কৃত ভাষায় লেখা আছে। ভগবৎ-সৃষ্ট অতি সামান্য জীব আমিও ঐ ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছি, সংস্কৃত শিখেছি, এবং ঐসব নির্দেশ কণ্ঠস্থ করেছি। এই জাতি ঐসব অনুশাসনে দৃঢবিশ্বাসী হওয়ায়, বহু দুঃখকষ্টে পড়লেও, অত্যাচারিত হ'লেও, ইসলামেব অনুগামীরা তাদের মৃত্যুর ভয় দেখালেও, ঐসব অনুশাসনকে ত্যাগ করতে পারে না। আবার অন্যপক্ষে ইসলামের অনুরাগীরা—যেখানে দেখ পৌত্তলিকদের হত্যা কর, পবিত্র যুদ্ধে কাফেরদের বন্দী কর, বন্দী ক'রে তাদের বাধ্যতা বা অর্থ নিয়ে তাদের মুক্ত ক'রে দাও—কোরানের বয়েতের এই ধরনের মর্মার্থ অনুসারে ঈশ্বরের নির্দেশ আওড়ায় এবং ঈশ্বরের নির্দেশে অবশ্য করণীয় ব'লে পৌত্তলিকদের হত্যা করে, পদে পদে নির্যাতন করে।···

সকল ধর্মের ভিত্তিই যখন এক পরমসত্তা কর্তৃক সৃজন ও পালনে বিশ্বাস, তখন ধর্মে ধর্মে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এই বিরোধ অত্যন্ত অযৌক্তিক ও পীড়াদায়ক, তা রামমোহন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন।

পাশ্চাত্যের ভলতেয়ার ও ভলনির মতোই তিনি মনুষ্য-সমাজকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এক শ্রেণীর লোক হ'লো—একদল প্রতারক যারা নিজেদের পাশে

লোককে জড়ো করবার উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে ধর্মীয় মতবাদ উদ্ভাবন করে এবং মানুষে মানুষে অনৈক্য ও উৎপাত সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় শ্রেণী হ'লো—একদল প্রতারিত যারা সত্যাসত্য বিচার না ক'রে অন্যের অনুগামী হয়। তৃতীয় শ্রেণী হ'লো—যারা প্রতারকও বটে, প্রতারিতও বটে। এরা অপরের কথায় নিজেরা বিশ্বাস করে এবং তা অপরকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে। চতুর্থ শ্রেণী হ'লো—যারা ঈশ্বরের কৃপায় প্রতারণা করে না, প্রতারিতও হয় না। রামমোহন নিজেকে ঐ চতুর্থ শ্রেণীর ব্যক্তি মনে করতেন।

পরিশেষে তিনি বলেন, কারও প্রতি বিদ্বেষ বা অন্ধ কুসংস্কার নিয়ে এ-সব তিনি লিখছেন না। তিনি লিখছেন এই আশা নিয়ে যে, সুস্থবুদ্ধি লোকরা তা বিচার ক'রে দেখবেন। তিনি আরও লেখেন যে, এ-সব বিষয়ে বিশদ আলোচনা তিনি অন্য একটি গ্রন্থে—"মনাজারাত্-উল্ আদিয়ান"-এ (বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ে আলোচনায়) করেছেন।

কিন্তু 'মনাজারাত্-উল্ আদিয়ান' নামে রামমোহনের অন্য কোন বই পাওয়া যায় নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, রামমোহন ঐ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু লেখেন নি। অন্যপক্ষে কাজী আবদুল ওদুদ 'তুহ্ফাত্' বইখানি গভীরভাবে প'ড়ে ও পর্যালোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, রামমোহন অন্য একখানি বই (মনাজারাতুল আদিয়ান) লিখেছিলেন, সেটি মুদ্রিত না হ'লেও পরিচিত ব্যক্তি ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রামমোহনের লিখিত An Appeal to the Christian Public-এর মুখপত্রে লেখা হয়েছে "although he was born a Brahman, not only renounced idolatry at a very early period of his life, but published at the same time a treatise in Arabic and Persian against that system…"

কেউ কেউ at an early period of life-এ রামমোহনের আরবী-ফারসীতে পৌত্তলিকতা-বিরোধী পুস্তক রচনার কথা উল্লেখ ক'রে বলতে চান, রামমোহন যখন তুহ্ফাত্ লিখেছিলেন তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছর ছিল; নিশ্চয় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সকে অতি অল্প বয়স বলা চলে না; সুতরাং রামমোহন নিশ্চয় তুহ্ফাত্ রচনার পূর্বে অন্য কোনও বই লিখেছিলেন। কিন্তু রামমোহন ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে আরবী ও ফারসী ভাষায় একখানি মাত্র বই লেখার কথা নিজে বলেছেন। সেই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পিতার দানপত্রে স্বাক্ষর দানকালে তিনি কুল-দেবতার সেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অর্থাৎ, তাঁর পৌত্তলিকতা-বিরোধী মনোভাব তখনও এমন প্রবল আকার ধারণ করে নি। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই, আমাদের ধারণা, এ-বিষয়ে তাঁর মতামত সুস্পষ্ট ও দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। ঐ সময়ে তাঁর বয়স পঁচিশ

বা সাতাশ ছিল। তাঁর পরবর্তী সময়ের কোনও রচনাকে যদি অতি অল্প বয়সের রচনা বলা যায়, তবে, ত্রিশ-বত্রিশ বছরের রচনাকেই বা ছচল্লিশ বা আটচল্লিশ বছর বয়সের মানুষের পক্ষে অতি অল্প বয়স বলা যাবে না কেন? সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল রামমোহন পৌত্তলিকতা বর্জন করেছেন, এটা বোঝবার জন্যে, at a very early age কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল—ঠিক আক্ষরিক অর্থে নয়। যাই হ'ক, রামমোহন মনাজারাত্-উল্ আদিয়ান নামে কোনও বই লিখেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে দৃঢ়তার সঙ্গে এখনও কিছু বলা যায় না।

মিস্ কোলেট 'তুহ্ফাত্-উল্-মুওয়াহ্হিদিন' বইখানিকে রামমোহনের অপরিণত রচনা বলেছেন। কিন্তু আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতো মনীষীরাও এই পুস্তকেব উৎকর্ষ ও মননশীলতাকে অস্বীকার করেন নি। এই পুস্তকে তিনি এদেশীয় ও পাশ্চাত্য দেশীয় চিন্তাধারার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন:

> When he was about 30 years of age, he seems to have studied the writings of the Rationalists and Free-thinkers, certainly the Muwahhidins, the Sufis, the Mutazilas, and perhaps, also the speculations of Hume, Voltaire and Volney. Like the redoubted champion of freedom that he was, he gave battle to all the so-called historical scriptures and scriptural religions of the world, and blew a long blast of defiance in his Gift to the Believers in the One God.

কাজী আবদুল ওদুদ প্রভৃতি আধুনিক সমালোচকরা যাঁরাই এই পুস্তক মনোযোগ-সহকারে পড়েছেন, তাঁরাই এই পুস্তককে বামমোহনের চিন্তাধারার বিকাশের ইতিহাসে উচ্চ স্থান দিয়েছেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে উডফোর্ড হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ঐ বছর আগস্ট মাসে সমুদ্রযাত্রা করেন। রামমোহন উডফোর্ডের ব্যক্তিগত মুন্শি ছিলেন। তাই ঐ সূত্রে তাঁর চাকরিটিও যায়।

ইতিপূর্বে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সিভিলিয়ান মিঃ জন ডিগ্বির সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় হয়েছিল। মিঃ ডিগ্বি ন্যায়বান্ ও সৎ রাজকর্মচারীরূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি কেবল ন্যায়পরায়ণ ও সৎ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সংস্কৃতিসম্পন্ন, উদার ও মহানুভব। রামমোহনের বিদ্যাবুদ্ধি, সততা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁকে সহজেই আকৃষ্ট করেছিল। ফলে, রামমোহনের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মিঃ ডিগ্বি বিহারের হাজারিবাগ জেলার তৎকালীন

সদর রামগড়ে ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। মিঃ উডফোর্ড বিলাত চ'লে গেলে, রামমোহন এখন মিঃ ডিগ্‌বির ব্যক্তিগত মুন্‌শিরূপে রামগড়ে যান। পরে তিন মাসের জন্যে মিঃ ডিগ্‌বি রামগড়ের অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেট হ'লে তিনি রামমোহনকে তিন মাসের জন্যে ফৌজদারী আদালতের সেরেস্তাদার নিযুক্ত করেন। কোম্পানির অধীনে রামমোহনের চাকরি, সাময়িক হ'লেও, এই প্রথম। এর পূর্বে তিনি উডফোর্ড বা ডিগ্‌বির ব্যক্তিগত মুন্‌শি ছিলেন।

মিঃ ডিগ্‌বি রামগড় থেকে যশোর, যশোব থেকে ভাগলপুব এবং পরে ভাগলপুর থেকে রংপুর যান। যশোব ও ভাগলপুরেও রামমোহন মিঃ ডিগ্‌বির ব্যক্তিগত মুন্‌শি ছিলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দেব ১লা জানুয়ারি রামমোহন ভাগলপুরে এসেছিলেন।

রামমোহন ১৮০৫ থেকে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কিছু কম দশ বছর মিঃ ডিগ্‌বির অধীনে কাজ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সম্পর্ক ঠিক প্রভু-ভৃত্যের, মনিব-কর্মচারীর সম্পর্ক ছিল না। রামমোহনের আত্মসম্মানবোধ যেমন পুবোপুরি ছিল, তেমনি মিঃ ডিগ্‌বি-ও তাঁকে উপযুক্ত সম্মান ও সৌজন্য দেখাতে কখনো কার্পণ্য করেন নি। তখনকার দিনে সিভি-লিয়ানরা ভারতীয় কর্মচারীদের সৌজন্য দেখাতেন না। ভারতীয় কর্মচারী যতোই উচ্চপদস্থ হ'ন না কেন, কালেক্টরের সম্মুখে তাঁর বসবার অধিকার থাকতো না, তাঁকে সারাক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকতে হ'তো। কিন্তু মিঃ ডিগ্‌বি রামমোহনকে এতোখানি সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শন করতেন যে, এ সম্পর্কে কিছু কিছু অবিশ্বাস্য কিংবদন্তীও চালু হয়েছিল। রাম-মোহন ও মিঃ ডিগ্‌বির মধ্যে নাকি লিখিত চুক্তি ছিল যে, মিঃ ডিগ্‌বি তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখতে বা তাঁকে সাধারণ ভারতীয় কর্মচারীর মতো হুকুম করতে পারবেন না।

মিস্ কোলেট লিখেছেন, এই ধরনেব কাহিনী সর্বপ্রথম মিঃ মণ্টগোমারি মার্টিন রামমোহনের মৃত্যুর পর ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর কোর্ট জার্নালে লিখিত একটি পত্রে সর্বপ্রথম প্রচাব করেন। মিস্ কোলেট লিখেছেন, মিঃ মার্টিনের অনেক তথ্যের মতোই এই তথ্যটিও ভ্রমাত্মক ছিল। তাঁদেব মধ্যে লিখিত কোনও চুক্তি ছিল না সত্য, তবে রামমোহনের প্রতি মিঃ ডিগ্‌বি যে উচ্চ ধারণা ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তা নিঃসন্দেহ। তাঁদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল এবং তাঁরা পরস্পরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। রামমোহনের ইংরেজী রচনা শ্রেষ্ঠ ইংরেজ লেখকদেরও বিস্মিত করতো। রামমোহন এতো উৎকৃষ্ট ইংরেজী মিঃ ডিগ্‌বির কাছেই শিখেছিলেন। পরবর্তী কালে মিঃ ডিগ্‌বি লণ্ডন থেকে রামমোহনের An Abridgment of the Vedant প্রকাশ করেছিলেন। ঐ পুস্তকের ভূমিকায় মিঃ ডিগ্‌বি রামমোহনের সুন্দর একটি চিত্র রেখে গেছেন। তিনি সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষায় রামমোহনের পাণ্ডিত্য, কুসংস্কার-মুক্ত মনের উদার প্রসার প্রভৃতির উল্লেখ ক'রে লিখেছেন :

At the age of twenty-two (১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দকে জন্মবর্ষ হিসাবে ধরে—অর্থাৎ ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে) he commenced the study of English language, which not pursuing with application, five years afterwards (1801), when I became acquainted with him, could merely speak it well enough to be understood upon the most common topic of discourse, but could not write it with any degree of correctness. He was afterwards employed as Dewan, or principal native officer, in the collection of revenues, in the district of which I was for five years Collector, in the East India Company's Civil Service. By persuing all my private correspondence with diligence and attention, as well as by corresponding and conversing with European gentlemen, he acquired so correct a knowledge of the English language to be enabled to write and speak it with considerable accuracy.

মিঃ ডিগবির এই রচনা থেকে আমরা ডিগ্‌বিরও একটি অসঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় পাই। তিনি রামমোহনের বিশ্ব-রাজনীতি সম্পর্কে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন যে, রামমোহন নিয়মিত ইংরেজী সংবাদপত্র পড়তেন এবং সংবাদ-পত্রগুলির ইউরোপীয় রাজনীতির সংবাদ তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতো। ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের তীব্র বিরোধ, এমনকি যুদ্ধ চলছিল। তাই ইংরেজদের পক্ষে ফ্রান্সের প্রতি, বিপ্লবী ফ্রান্সের প্রতি, কারো শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি বৈরী মনোভাবের সমতুল্য ছিল। বিপ্লবী ফ্রান্স ও ফরাসী বীর নেপোলিয়নের প্রতি রামমোহনের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল অগাধ এবং তা প্রকাশ করতে তিনি কখনো কুণ্ঠিত হতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও রামমোহনের প্রতি ইংরেজ সিভিলিয়ান মিঃ ডিগ্‌বির যে কোনরূপ বিরক্তি ছিল না, তা থেকেই বোঝা যায়, রামমোহনের প্রতি মিঃ ডিগ্‌বির কতোখানি স্নেহ-শ্রদ্ধা ছিল এবং মিঃ ডিগবির মন কতোখানি দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত ছিল। মিঃ ডিগ্‌বি লিখেছেন :

He (Rammohun) was also in the constant habit of reading the English newspapers, of which the Continental politics chiefly interested him and from thence he formed a high admiration of the talents and prowess of the late ruler of France [নেপোলিয়ন বোনাপার্ট] and was so dazzled with the speIndour of his achievement as to become sceptical as to the commission, if not blind to the atrocity of his crimes, and could not help deeply lamenting his downfall, notwith-

standing the profound respect he ever professed for the English nation; but when the first transport of his sorrow had subsided, he considered that part of his political conduct which led to his abdication to have been so weak, and so madly ambitious, that he declared his future detestation of Buonaparte would be proportionate to his former admiration.

এখানে স্মরণীয়, নেপোলিয়ন ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে সম্রাট ব'লে ঘোষণা করলেও, তখনও তিনি নবশক্তিতে উজ্জীবিত বিপ্লবী ফ্রান্সেরই মূর্ত প্রতীক ছিলেন। ইউরোপে তাঁর বিজয়-অভিযান তখনও বিপ্লবী ফ্রান্সের বিজয়-অভিযান ব'লেই ধ'রে নেওয়া হচ্ছিল। তাই রামমোহনের দৃষ্টিতে নেপোলিয়ন একটি উচ্চ আসনই অধিকার করেছিলেন। নেপোলিয়নের অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দুর্জয় দম্ভ ও পররাজ্য গ্রাসের নীতিই তাঁর পতনের কারণ হয়েছিল। পরে রামমোহন নেপোলিয়ন-চরিত্রের এইসব দিক সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। তখন নেপোলিয়নের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ঘৃণাতেই পরিণত হয়েছিল।

রামমোহন ইংরেজের কাছে চাকরি করলেও তাঁর রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করতে কখনো কুণ্ঠিত হতেন না। এমনই ছিল তাঁর তেজস্বিতা। তিনি ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে যখন ভাগলপুর গেলেন, তখন সেখানে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল, এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি তাঁর আত্মসম্মানবোধ ও তেজস্বিতারই দৃষ্টান্ত।

ঐ সময়ে ভাগলপুরের কালেক্টর ছিলেন স্যার ফ্রেডেরিক হ্যামিল্টন। মুসলমান আমলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বা অভিজাতদের সামনে দিয়ে সাধারণের পক্ষে ঘোড়ায় বা পালকিতে চ'ড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কোম্পানির আমলের গোড়ার দিকে পদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীরাও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ঐ ধরনের সম্মান আদায় করতেন। রামমোহন যেদিন ভাগলপুরে পৌছলেন, সেদিন তিনি পালকিতে ক'রে যাচ্ছিলেন। যে পথ দিয়ে তাঁর পালকি যাচ্ছিল, সেই পথের ধারে স্যার ফ্রেডেরিক দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সামনে দিয়ে একটা লোক পালকি চ'ড়ে যাচ্ছে এবং পালকি থেকে নিয়মমাফিক নামছে না দেখে তিনি চীৎকার ক'রে পালকি থামাতে বললেন। রামমোহন এই চেঁচামেচির কারণ জানতে চাইলে স্যার ফ্রেডেরিক তাঁকে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে পালকি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যেতে বললেন। স্যার ফ্রেডেরিক একজন অতি উচ্চপদস্থ হ'লেও, তাঁর এই ঔদ্ধত্য মেনে নেওয়ার মানুষ ছিলেন না রামমোহন। তিনি ভদ্রতার সঙ্গে অথচ দৃঢ়ভাবে স্যার ফ্রেডেরিকের এই অন্যায় দাবির প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু সাহেব তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং অভদ্র ভাষায় গালাগালি করতে লাগলেন। রামমোহন তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সাহেবের রাগ তাতে বিন্দুমাত্র কমলো না দেখে তিনি পালকিতে চ'ড়ে বেহারাদের এগিয়ে চলতে হুকুম দিলেন।

তিনি কেবল চলেই এলেন না, ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ কর্মচারীদের এই ধরনের অশোভন আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ও আশু প্রতিকার দাবি ক'রে তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে একখানি পত্র লিখলেন (১২ এপ্রিল, ১৮০৯)। এই পত্রখানিই সম্ভবতঃ রামমোহনের সর্বপ্রথম ইংরেজী পত্র। এই আবেদনপত্রের ভাষা যথেষ্ট উন্নত। তা থেকে বোঝা যায়, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের আগেই রামমোহন ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অধিকার করেছিলেন।

রামমোহনের এই আবেদন ব্যর্থ হয় নি। লর্ড মিণ্টো স্যার ফ্রেডেরিককে এই ধরনের আচরণের জন্যে ভর্ৎসনা করেন এবং ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সে-বিষয়ে সতর্ক ক'রে দেন।

ঐ বছর (১৮০৯) ২০ অক্টোবর মিঃ ডিগ্‌বি রংপুরের কালেক্টর নিযুক্ত হ'লে রামমোহন তাঁর সঙ্গে রংপুরে চলে আসেন। রামগড়ে ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে সাময়িকভাবে যেমন তিনি রামমোহনকে সরাসরি সরকারী কাজে নিয়োগ করেছিলেন, এখানেও তিনি তাঁকে কোম্পানির অধীনে 'দেওয়ান' বা রাজস্ব-বিভাগের প্রধান কর্মচারী নিয়োগ করেন। তবে ঐ পদে স্থায়ী নিয়োগের জন্যে কোম্পানির কর্তাদের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কোম্পানি দেওয়ান-পদে রামমোহনের নিয়োগ অনুমোদন করতে রাজী হন না। তাঁরা এ বিষয়ে কয়েকটি কারণ দেখান ; এক, রাজস্ব-বিভাগের কাজকর্মে রামমোহনের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই ; দুই, জামিনরূপে তিনি যে দুজন জমিদারের নাম দিয়েছেন, তাঁরা রংপুরের জমিদার , যে জেলায় তিনি 'দেওয়ান'-রূপে কাজ করবেন, সেই জেলার জমিদার তাঁর জামিন হবেন, এটা বাঞ্ছনীয় নয়। রামমোহনের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে মিঃ ডিগ্‌বি নিজে নিশ্চয়তা দেন এবং রামমোহন অন্য জেলার জমিদারদের জামিনরূপে দিতে চান। তা সত্ত্বেও কোম্পানির কর্তারা তাঁর নিয়োগ অনুমোদন করেন না। ফলে, রামমোহনকে সাময়িকভাবে, সম্ভবতঃ ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে, দেওয়ানের পদ ত্যাগ করতে হয়।

রাজস্ব-বিভাগের কাজকর্ম সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা ও আইন-কানুনের জ্ঞানের অভাব এবং জামিনের ব্যাপারে ত্রুটিই যে এই নিয়োগ অনুমোদনের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা ছিল, তা বলা যায় না। পরবর্তী কালে আই. সি. এস্. পরীক্ষার সময়ে অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতিকে পরীক্ষা-বহির্ভূত যে নেপথ্য-কারণ অনুত্তীর্ণ করেছিল, এক্ষেত্রেও তেমনি একটি নেপথ্য-কারণ ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> বোর্ড-অব-রেভিনিউয়ের কাগজপত্রের মধ্যে এ বিষয়ে উহার প্রেসিডেন্ট বৃলিশ ক্রোম্প সাহেবের স্বহস্তলিখিত একটি মন্তব্য আমি দেখিয়াছি। উহাতে

রামমোহনের নিয়োগ সম্বন্ধে উল্লিখিত আপত্তি দুইটি ছাড়া আর একটি আপত্তির উল্লেখ আছে, এবং সেই আপত্তিই প্রকৃত আপত্তি বলা চলে। অন্য কথার পর বুরিশ ক্রৌম্প লিখিতেছেন, "রামগড়ে সেরেস্তাদার থাকাকালীন তাঁহার কার্যকলাপ সম্পর্কে অপ্রশংসাযুক্ত কথা ('unfavourable mention of his conduct') আমার কানে আসিয়াছে।"

সম্ভবতঃ এই অপ্রশংসাসূচক কথা ছিল তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ ও দাসসুলভ মনোবৃত্তির অভাব, যা ইংরেজ পদস্থ রাজকর্মচারীদের কাছে দুঃসহ ছিল। তাঁর স্বাধীন মনোভাব, ফরাসী বিপ্লবের সমর্থন ও ইংরেজ শাসনের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে তাঁর প্রকাশ্য-মতামতও এই অপ্রশংসার কারণ হ'তে পারে।

ব্রজেন্দ্রবাবু আরও লিখেছেন যে,

ডিগ্‌বি রামমোহন সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। সেজন্য তিনি রামমোহনকে স্থায়ী দেওয়ান করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু কলিকাতার বোর্ড-অব-রেভিনিউ কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। এমন কি ডিগ্‌বির পীড়াপীড়ির উত্তরে তাঁহাকে লিখিলেন, "ভবিষ্যতে ডিগ্‌বি যদি বোর্ডের প্রতি এইরূপ অসম্মানসূচক ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা উহার সমুচিত উত্তর দিতে বাধ্য হইবেন।

তাই ব্রজেন্দ্রবাবুর মত হ'লো, রামমোহন রামগড়ে তিন মাস এবং রংপুরে মাস চারেক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কাজ করেছিলেন। বাকী সময়টা তিনি উড়ফোর্ড ও ডিগ্‌বির ব্যক্তিগত মুন্‌শির কাজ করতেন। ব্রজেন্দ্রবাবু লিখেছেন :

দেশীয় লোকের সহিত কাজকর্মের সুবিধার জন্য সেকালের অনেক সাহেব বাঙালী 'বাবু' রাখিতেন। ইহাদিগকে দেওয়ান বলা হইত। রামমোহনও ডিগ্‌বির সহিত এইরূপেই সংপৃক্ত ছিলেন। তিনি সাধারণ লোকের নিকট ডিগ্‌বির দেওয়ান বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

ব্রজেন্দ্রবাবু আরও বলেছেন যে, রামমোহন সাময়িকভাবে সরকারের দেওয়ানি করবার পর ডিগ্‌বির ব্যক্তিগত মুন্‌শিরূপে কাজ করেন এবং ডিগ্‌বি তাঁকে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে উদাসীর জমিদার রাজকিশোর চৌধুরীর জমিদারির নাবালক মালিকদের অভিভাবক নিযুক্ত করেন। তাঁর মতে, রামমোহন ঐ পদে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বহাল ছিলেন।

কিন্তু সাময়িকভাবে পদচ্যুত হ'লেও রামমোহন যে পরে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ঐ পদে তিনি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর পর্যন্ত বহাল ছিলেন, এখন তা প্রমাণিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন জাতীয় মহাফেজখানা থেকে

[illegible] শতাব্দীর শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লেখা কিছু বাংলা চিঠি সংগ্রহ ক'রে রেখেছেন। ঐসব চিঠির চারটিতে রামমোহনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ চিঠিগুলি ভূটান সরকার ও কোচবিহার সরকার এবং কোম্পানি সরকারের মধ্যে লিখিত হয়েছিল। একটি চিঠি ভূটানের রাজা রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখেছিলেন এবং ঐ চিঠিটি এসে পৌছেছিল ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ নভেম্বর। ঐসব চিঠি থেকে জানা যায়, রামমোহন কোম্পানি সরকারের পক্ষ থেকে ভূটান ও কোচবিহার সীমান্ত-বিরোধ মীমাংসার জন্যে দূতরূপে গিয়েছিলেন। এ-ও জানা যায়, ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দেও ডিগ্‌বির সঙ্গে রামমোহন ভূটানে গিয়েছিলেন। ঐসব চিঠিতে রামমোহনকে সরকারীভাবে 'দেওয়ান' বলা হয়েছে। সুতরাং রামমোহন যে রংপুরে কয়েক বছর দেওয়ানের পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে-বিষয়ে এখন সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ ভূটান ও কোচবিহারের সীমান্ত-বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে রামমোহন যে কূটনৈতিক দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, তা কূটনীতিজ্ঞরূপে তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি করেছিল এবং পরবর্তী কালে ইংলণ্ডে মুঘল বাদশাহ কর্তৃক দূতরূপে নিয়োগের পথ সুগম করেছিল। দীর্ঘ ছ'বছর রামমোহন সরকারের দেওয়ান-পদে নিযুক্ত থাকায় তিনি সমাজে 'দেওয়ান রামমোহন' ও পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে 'দেওয়ানজী' নামে পরিচিত ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, সরকারী চাকরিতে ঐ যুগে ভারতীয়দের পক্ষে দেওয়ানের পদই ছিল সর্বোচ্চ পদ।

রামমোহন দীর্ঘ কয়েক বছর রংপুরে ছিলেন। তিনি এখানে আদালত থেকে চার মাইল দূরে তামফটে মহীগঞ্জের কাছে একটি নিজস্ব বাড়ী তৈরি করিয়েছিলেন। রংপুরের পদস্থ সরকারী কর্মচারীরূপে নয়, নিজ অর্থব্যয়ে নানা জনহিতকর কাজের জন্যে রামমোহন জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। স্থানীয় ঐতিহ্য থেকে জানা যায়, তিনি স্থানীয় আদালতের কাছে নিজব্যয়ে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্যে একটি পুষ্করিণী খনন করিয়েছিলেন। তিনি ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত হওয়ায় এবং মুসলমানী ঢংয়ে পোশাক-পরিচ্ছদ—পায়জামা, চোগা, চাপকান, টুপী, পাগড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করায় 'মৌলবী সাহেব' ব'লেও অভিহিত হতেন।

রংপুরের নিজ গৃহে রামমোহন প্রতি সন্ধ্যায় বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ ক'রে আনতেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। পৌত্তলিকতা এবং হিন্দু সমাজের নানাপ্রকার কুসংস্কার ও যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস সম্পর্কেই সাধারণতঃ আলোচনা হ'তো। এই সময়ে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী রামমোহনের কাছে এসেছিলেন। হরিহরানন্দ একেশ্বরবাদী তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি কেবল সাধকই ছিলেন না, ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। রামমোহন তাঁর সাহচর্যে সংস্কৃত শাস্ত্রের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হয়ে-

ছিলেন। ঐ সময়ে রংপুর উত্তরবঙ্গের খুব উন্নত শহর ছিল। এখানে বহু মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী বাস করতেন। তাঁদের অনেকেও রামমোহনের গৃহে সান্ধ্য মজলিসে যোগ দিতেন। মাড়োয়ারীরা ছিলেন জৈন। তাঁদের সঙ্গ রামমোহনকে জৈন ধর্ম সম্পর্কে কৌতূহলী ক'রে তুলেছিল। তাই রামমোহন 'কল্পসূত্র' প্রভৃতি বহু জৈন শাস্ত্র ঐ সময়ে অধ্যয়ন করেছিলেন।

রামমোহন রংপুরে সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মতামতও সকলের কাছে সুপরিচিত ছিল। গোঁড়া সনাতনপন্থীরা রামমোহনের ওপর বিরূপ ছিলেন। তাঁরা রামমোহনের বিরোধী একটি দলও গ'ড়ে তুলেছিলেন। এই দলের নেতৃত্ব করছিলেন রংপুরের জজ কোর্টের দেওয়ান এবং সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য। গৌরীকান্ত রামমোহনের মতামতের সমালোচনা ক'রে পরে 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে একখানি পুস্তকও লিখেছিলেন। কশাঘাতে অশ্ব যেমন বেগবান্ হয়, রামমোহনও তেমনি প্রতিকূলতার আঘাতেই অধিকতর শক্তির সন্ধান পেতেন। রংপুরে তাঁর বিরোধী দলের অস্তিত্ব তাঁকে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্যে আরও উপযুক্তভাবে প্রস্তুত হ'তে উৎসাহী করেছিল।

রামমোহন যখন রংপুরে ছিলেন, তখন তাঁর লাঙ্গুলপাড়ার গৃহে তাঁর অগ্রজ জগমোহনের মৃত্যু ঘটে (বাংলা সন ১২১৮ সালের চৈত্র মাস, ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে)। কথিত আছে, জগমোহনের মৃত্যু হ'লে তাঁর অন্যতমা স্ত্রী আলোকমঞ্জরী তাঁর সঙ্গে সহমৃতা হন। রামমোহন তাঁর স্বামীশোকাতুরা বৌদিকে এই ভয়ঙ্কর আত্মহনন থেকে নিবৃত্ত করার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু রামমোহনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হ'লে যখন অগ্নিশিখা তাঁকে স্পর্শ করল্যো, তখন তিনি আর্তনাদ ক'রে চিতা থেকে নেমে আসতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তখন তাঁর ধর্মভীরু গোঁড়া আত্মীয় ও পুরোহিতরা বাধা দেন; তাঁকে বাঁশ দিয়ে জ্বলন্ত চিতার মধ্যে চেপে রাখা হয় এবং তাঁর করুণ আর্তনাদকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্যে ঢাক-ঢোল, খোল-করতাল বাজানো হ'তে থাকে। এই নৃশংস দৃশ্য রামমোহনকে ব্যাকুল ক'রে তোলে, কিন্তু এইসব হৃদয়হীন আত্মীয় ও ব্রাহ্মণদের হাত থেকে বৌদিকে উদ্ধার করতে পারেন নাই। তিনি বেদনায়, ক্ষোভে, ক্রোধে ও ঘৃণায় জর্জরিত হয়ে সেই মুহূর্তে শপথ গ্রহণ করেন যে, এই নৃশংস প্রথা লোপ করবার জন্য তিনি জীবনপণ চেষ্টা করবেন। ১৭ বছর পরে এই প্রতিজ্ঞা তিনি পূরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মিস্ কোলেট এই কাহিনীটি তাঁর রামমোহনের জীবনীগ্রন্থে দিয়েছেন। এই কাহিনী তিনি রাজনারায়ণ বসুর কাছে শুনেছিলেন। আর রাজনারায়ণ বসু

শুনেছিলেন তাঁর পিতা নন্দকিশোর বসুর কাছে। নন্দকিশোর রামমোহনের শিষ্য ছিলেন।

কিন্তু এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রবাবু প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করেছেন :

> রামমোহনের নিজের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইং ১৮০৩ হইতে ১৮১৪ পর্যন্ত এগার বৎসর তিনি শুধু ভাই বা মা নয় নিজের পুত্র-পরিবার হইতেও দূরে ছিলেন। ইং ১৮০৯ হইতে ১৮১৩ পর্যন্ত রামমোহনের ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মাতুলের সহিত রংপুরে ছিলেন। গুরুদাসের পিতার একটি পত্র হইতে রামমোহন ও গুরুদাস জগমোহনের মৃত্যুর সংবাদ জানিতে পারেন।…
>
> জগমোহনের তিন পত্নীর মধ্যে কেহ সত্যই স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন কি-না, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। অন্ততঃ গোবিন্দপ্রসাদের মাতা দুর্গা দেবী যে অনুগমন করেন নাই, তাহা সুনিশ্চিত, তিনি স্বামীর মৃত্যুর ৯ বৎসর পরে (১৩ এপ্রিল ১৮২১) রামমোহনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে একটি মকদ্দমা আনিয়াছিলেন। তবে রায় পরিবারে অনুগমনের রেওয়াজ ছিল বলিয়া মনে হয় না। রামমোহনের পিতা রামকান্তের তিন পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের কেহই সহমরণে যান নাই। রামমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামলোচনের পত্নীও সহমৃতা হন নাই। সে যাহা হউক, জগমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার কোন পত্নী সহগামিনী হইলেও রামমোহন যে সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, তাহা সুনিশ্চিত ; কারণ, তখন ও পরবর্তী দুই বৎসর পর্যন্ত তিনি যে সুদূর রংপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি।

রামমোহন একাদিক্রমে ছ-সাত বছর রংপুরে ছিলেন, একথা সত্য। তাঁর স্ত্রীরা তাঁর মায়ের নিকট লাঙ্গুলপাড়ায় ছিলেন, এ-ও সত্য। কিন্তু ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লাঙ্গুলপাড়ার সঙ্গে রামমোহনের কোন সম্পর্ক ছিল না, একথা সত্য হ'তে পারে না। তিনি মাঝে মাঝে নিশ্চয় লাঙ্গুলপাড়ায় আসতেন। আমাদের মনে রাখা দরকার, যে বছর (১৮১২) জগমোহনের মৃত্যু হয়েছিল, সেই বছরই রাম-মোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের জন্ম হয়। সুতরাং যেখানেই থাকুন, রামমোহন যে মাঝে মাঝে লাঙ্গুলপাড়ায় আসতেন, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। জগমোহনের মৃত্যুর পর রামমোহনের লাঙ্গুলপাড়ায় আসা স্বাভাবিক। কারণ, কয়েক বছর আগে (১৮০৯-১০) রামলোচনের মৃত্যু হয়েছিল ; এখন জগমোহনেরও মৃত্যু হওয়ায় রায়-পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বলতে রামমোহনই একা ছিলেন।

তবে একথাও সত্য যে, মহাপুরুষদের জীবনকে কেন্দ্র ক'রে অনেক কাহিনী-কিংবদন্তী

গ'ড়ে ওঠে। সেরকম একটি কাহিনী এক্ষেত্রে গ'ড়ে ওঠা অসম্ভব নয়। নিজের পরিবারের কোন ঘটনাই রামমোহনকে এইরকম একটি নৃশংস সামাজিক প্রথা সম্পর্কে সচেতন ক'রে তুলেছিল, একথা ভাবাও ঠিক নয়। সমাজের সকল হৃদয়হীন কুসংস্কারই তাঁর মনকে আলোড়িত করতো। হুগলী ও বর্ধমান জেলায় সহমরণ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সুতরাং বাল্যকাল থেকেই যে তিনি এইরকম বীভৎস একটি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে সচেতন হবেন, সেটাই স্বাভাবিক।

রামমোহনের পদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জি. এস. লিওনার্ড তাঁর History of Brahmo Samaj-এ বলেছেন, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস জমিদারিগুলির স্থায়ী বন্দোবস্ত করেছিলেন এবং তিন বছর পরে ঐ ব্যবস্থা কোম্পানির পরিচালকসভার অনুমোদন পেয়েছিল। স্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইউরোপীয় কালেক্টরদের অধীনে বাংলা দেশের সমস্ত জমির জরিপ ও মূল্যায়ন করার প্রয়োজন ঘটেছিল। কোনও কোনও কালেক্টরকে কিছু জেলায় অবিলম্বে বন্দোবস্ত চালু করবার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল। মিঃ ডিগ্‌বির ওপর রংপুর, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলার ভার ছিল। এই কাজে তিনি তিন বছর নিযুক্ত ছিলেন। এবং এই কাজে তিনি তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে ছিলেন। এর জন্যে প্রধানতঃ তাঁর দেওয়ানের কর্মোৎসাহ ও শ্রমই দায়ী ছিল।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসে বলেছেন, উত্তরবঙ্গের ঐ জেলাগুলিতে কাজ বিশেষভাবে জটিল ছিল। কারণ, ঐ অঞ্চলে বহু প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন, তাঁদের মধ্যে জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ ছিল। প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বিরোধী দাবিগুলি সম্পর্কে বহু কাগজপত্র ও দলিলদস্তাবেজ পরীক্ষা ক'রে দেখার দরকার হ'তো। অনেকক্ষেত্রে প্রকৃত মালিক কে, তা প্রমাণ করবার মতো কোনও কাগজপত্র ছিল না। সেক্ষেত্রে বন্দোবস্তের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে ব্যক্তিগত বিচার ও স্থানীয় তদন্তের উপর নির্ভর করতে হ'তো। তাই সে সময়ে বন্দোবস্তের কাজে সাধারণতঃ কালেক্টরদের প্রধান এজেন্ট ছিলেন এদেশীয় সেরেস্তাদাররা। কালেক্টররা এইসব সেরেস্তাদারের সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ অনুযায়ী অনেক পরিমাণে পরিচালিত হতেন।

শাস্ত্রী মশায় এখানে দেওয়ান অর্থে সেরেস্তাদার শব্দ ব্যবহার করলেও, সেরেস্তাদার এবং দেওয়ানের কাজ ও পদ সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। সেরেস্তাদাররা ছিলেন দলিল ও কাগজপত্রের রক্ষক এবং দেওয়ানরা ছিলেন রাজস্ব-বিভাগের প্রধান কর্মচারী। রামমোহন রামগড়ে সামান্য কিছুদিন ফৌজদারী আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন এবং রংপুরে তিনি কয়েক বছর দেওয়ান ছিলেন। সেরেস্তাদারের পদের চেয়ে দেওয়ানের পদ অনেক

[illegible]। সেরেস্তাদাররা যেখানে মাসিক চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সিক্কা টাকা বেতন পেতেন, সেখানে দেওয়ানরা পেতেন মাসিক প্রায় দেড় শ সিক্কা টাকা। (সিক্কা টাকা বাদশাহী ও কোম্পানি আমলের বেশি ওজনের টাকা।)

যাই হ'ক, ঐ সময়ে দেওয়ানের পদ যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাতে কোনও সংশয় নেই। মিঃ লিওনার্ড কাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর জমিদারী হিসাবপত্রে ও জরিপের বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা ছিল; তিনি মিথ্যা হিসাব ও বিবরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমিন ও আমলাদের ধূর্ততা ও অসাধু কলাকৌশলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; প্রকৃত মালিক নির্ধারণে ও জমির গুণাগুণ নির্ণয়েও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সুতরাং স্থায়ী বন্দোবস্ত ও রাজস্ব-সংগ্রহের ব্যাপারে রামমোহন যে মিঃ ডিগ্‌বির বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই অবস্থায় দেওয়ান অসৎ হ'লে তাঁর যে জমির মালিকদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণের প্রচুর সুযোগ ছিল, তা বলাই বাহুল্য। বেশির ভাগ দেওয়ানই যে তা করতেন, তা-ও বলা চলে। দেওয়ানদের এই অসাধুতার ফলে কালেক্টররা সহজেই জনপ্রিয়তা হারাতেন। কিন্তু ডিগবির জনপ্রিয়তা থেকেই বোঝা যায়, রামমোহন এ ব্যাপারে নিষ্কলুষ ছিলেন। অবশ্য, যেখানে অসাধুতার সুযোগ অত্যধিক, সেখানে সাধু ব্যক্তিদেরও দুর্নাম এড়ানো সম্ভব নয়। রামমোহনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

রামমোহন যখন সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়েছিলেন, তখন তিনি একজন বড় জমিদার এবং তাঁর বার্ষিক আয় প্রায় দশ হাজার টাকা। তা থেকে রামমোহনের এই বিরোধীরা রামমোহনের নামে এই ব'লে কলঙ্ক আরোপ করতে চেয়েছিল যে, রামমোহন নিশ্চয় তাঁর চাকরির সময়ে অন্যায়ের আশ্রয় নিয়েছিলেন, সোজা কথায়, ঘুষ খেতেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ মিত্র, রামমোহনের প্রতি যাঁর শ্রদ্ধা ছিল সর্ববিদিত, তিনি Calcutta Review পত্রিকায় একটি নিবন্ধে লেখেন যে, "If Rammohun Roy kept his hands clean, and abstained as in the absence of all positive evidence to contrary we are bound to suppose, from defeating the ends of justice for a consideration, he must have been a splendid exception." কিশোরীচাঁদের এই কথাগুলির মধ্যে অনেকেই রামমোহনের অসাধুতা সম্পর্কে ইঙ্গিতের সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু কিশোরীচাঁদ নিজেই "the absence of all positive evidence"-এর কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, "The evidence on the subject is too inconclusive to arrive at a decision." অর্থাৎ রামমোহনের এই দুর্নামের স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই এবং প্রমাণাভাবে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। সেক্ষেত্রে, "he (Rammohun)

must have been a splendid exception." সত্যই সে-যুগে রামমোহন একটি বিস্ময়কর ব্যতিক্রম ছিলেন। মিঃ সিডলার্ড বলেছেন, "...had Mr. Digby's dewan been so corrupt as he is suspected to have been, Mr. Digby himself could never have obtained renown for justice and probity."

যাঁরা সরকারী কর্মচারীরূপে রামমোহনের অসাধুতার কথা বলেন, তাঁরা ভুলে যান যে, রামমোহন সরকারী চাকরিতে ঢোকার আগেই জমিদার ছিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে কয়েক মাস ও পরে ১৮০৯ থেকে কিছুদিন ছাড়া ১৮১৫ পর্যন্ত কয়েক বছর তিনি সরকারী চাকরিতে ছিলেন। কিন্তু ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দেই গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুরের তালুক দুটি কিনেছিলেন। ঐ দুটি তালুক থেকেই তাঁর বছরে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা আয় হ'তো। তিনি সরকারী কাজে যোগ দেওয়ার বহু পূর্ব থেকেই তেজারতি ও কোম্পানির কাগজ কেনাবেচার কারবার করতেন। সেজন্য কলকাতায় তাঁর স্থায়ী অফিস ছিল, তাতে কেরানী ও তফিলদার ছিল। এই কারবারে তিনি যে প্রচুর টাকা রোজগার করতেন, তার অন্যতম প্রমাণ এই যে, ১৮০৮-৯-১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি বর্ধমান জেলায় লাঙ্গুলপাড়া, বীরলুক, কৃষ্ণনগর ও শ্রীরামপুরে চারটি পত্তনি তালুক কিনেছিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি রংপুরে দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ঐ দফায় ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত দেওয়ান ছিলেন। অর্থাৎ, ঐ চারটি জমিদারি কেনার সময় তিনি দেওয়ানের পদে কিছু কম পাঁচ মাস মাত্র কাজ করেছিলেন। ঐ তালুক চারটি থেকে তাঁর বার্ষিক আয় পাঁচ-ছ হাজার টাকা ছিল। জমিদারিগুলি কেনার পরেই তিনি স্থায়িভাবে দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুতরাং স্থায়িভাবে দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ার আগেই, ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর জমিদারি থেকেই আয় ছিল বার্ষিক দশ-এগারো হাজার টাকা। সেই সঙ্গে তাঁর অন্যান্য কারবার থেকেও নিশ্চয় মোটা আয় ছিল। একথা স্মরণ রাখলে, তাঁর শত্রুদের প্রচার নিতান্ত অলীক ও কপোলকল্পিতই প্রমাণিত হয়।

রংপুরে থাকাকালে তিনি কেবল বৈষয়িক বিষয়েই অসামান্য জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন নি, যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় বস্তু ছিল, তাতেও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ক'রে তুলেছিলেন। তিনি এখানে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সাহচর্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এখানে তিনি সম্ভবতঃ তাঁর বাংলা ভাষায় বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা 'বেদান্তগ্রন্থ' এবং তার সংক্ষেপিত রূপ 'বেদান্তসার' রচনা করেছিলেন। তাঁর অন্য কোন কোন রচনার কাজও তিনি এখানেই শুরু ক'রে থাকবেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দেই তা প্রকাশিত হয়েছিল।

রামমোহনের জমিদারির আয়ই যখন বার্ষিক দশ-বারো হাজার টাকা ছিল, তখন

তিনি বার্ষিক দেড় হাজার দু-হাজার টাকা মাইনের চাকরিতে কেন নিযুক্ত ছিলেন, এ প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। এ প্রশ্নের উত্তর হ'লো, রামমোহন তাঁর ধর্মীয় মতামতের জন্যে স্বীয় পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের কাছে ধিকৃত ছিলেন। আমাদের মনে হয়, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই তাই তিনি স্বসমাজ ও স্বগৃহ থেকে ক্রমাগত দূরে দূরে ছিলেন। সরকারী চাকরিতে তিনি সংস্কারমুক্ত এক শ্রেণীর মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। ইউরোপীয়রা কেবল আধুনিক যুগের বহু শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী ছিল না, তারা ধর্মের দিক থেকেও ছিল একেশ্বরবাদী। তাদের সাহচর্য রামমোহনকে কেবল মানসিক আনন্দই দেয় নি, সামাজিক নির্যাতন, উৎপীড়ন থেকেও রক্ষা করেছিল। তাছাড়া, ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি ইংরেজী ভাষা শিখতে শুরু করেছিলেন, তখন থেকে তিনি এক অজ্ঞাত ও নবাবিষ্কৃত জ্ঞানজগতের সন্ধান পেয়েছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গ, বিশেষতঃ মিঃ ডিগ্‌বির মতো একজন উদার ইংরেজের সাহচর্য, তাঁর কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ছিল। তিনি মিঃ ডিগ্‌বির কাছেই তাঁর ইংরেজী শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছিলেন। মিঃ ডিগ্‌বির সঙ্গে তাঁর মনের মিল এতোই গভীর ছিল যে, ডিগ্‌বি যখন বিলাতে চলে গিয়েছিলেন, তখন রামমোহনও ডিগবির সান্নিধ্যলাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন এবং বিলাত যাওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিলেন! ইংরেজদের মহলে তিনি বহু মনের মতো বন্ধুর সন্ধান পেয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন এবং তাঁর মতামতকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করতেন। সুতরাং সরকারী চাকরি তাঁর কাছে অর্থার্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন শত্রুমনোভাবাপন্ন একটি পরিবেশ থেকে দূরে থাকার উপায়ও ছিল।

ইংরেজী ভাষা শিক্ষাও এই চাকরির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজদের, বিশেষতঃ মিঃ ডিগ্‌বির নিত্য সাহচর্য তাঁকে ইংরেজী ভাষায় সুদক্ষ ক'রে তুলেছিল। এই সময়ে তিনি ইংরেজী ভাষা কীভাবে আয়ত্ত করেছিলেন, তা বোঝা যায়, চাকরি ছাড়ার পরেই ইংরেজী ভাষায় তাঁর বেদান্তসারের মতো পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ করার ক্ষমতা থেকে।

ইংরেজী ভাষায় রামমোহন কীরকম অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তা কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক মিঃ জেম্‌স্ সিল্‌ক্ বাকিংহাম ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ আগস্ট তারিখে লণ্ডনের The Monthly Repository of Theology and General Literature পত্রিকার সম্পাদককে লেখা এক পত্রে রামমোহনের ইংরেজী সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি লেখেন, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি কলকাতায় প্রথম যান এবং মিঃ ইনিয়াস ম্যাকিণ্টশের বাড়ীতে রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত হন। বাকিংহাম প্রাচ্যের ভাষাসমূহের মধ্যে একমাত্র আরবী ভাষাই জানতেন। তাই তিনি আলাপের প্রথম এক ঘণ্টা আরবীতেই রামমোহনের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন

কারণ, তখনও তিনি জানতেন না, রামমোহন সহজে ও সাবলীলভাবে ইংরেজীতে কথা বলতে পারেন্। কিন্তু কথা বলতে বলতে হঠাৎ আলাপ ইংরেজীতে শুরু হ'ল। তখন রামমোহনের ইংরেজী শুনে বাকিংহাম মুগ্ধ বিস্মিত হয়ে পড়লেন। "I…was surprised at the unparalleled accuracy of his language, never before heard any foreigner of Asiatic birth speak as well, and esteeming his fine choice of words as worthy of imitation even of Englismen." (তিনি কোনও এশীয়ের মুখে এ ধরনের নির্ভুল ও যথাযথ ইংরেজী ইতিপূর্বে শোনেন নি; কেবল তাই নয়, তাঁর শব্দ নির্বাচন ছিল যে-কোনও ইংরেজের পক্ষেও অনুকরণযোগ্য।) তিনি বলেন, "In English, he is competent to converse freely on the most abstruse subjects and to argue more closely and coherently than most men I know."

বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ও লেখক জেরেমি বেন্থাম একটি পত্রে রামমোহনকে লেখেন, আপনার একটি বই প'ড়ে আপনার রচনার সঙ্গে আমি পরিচিত হই। যদি বইখানায় একজন হিন্দুর নাম না থাকতো, তবে এর রচনাশৈলী দেখে নিশ্চয় বলতাম, বইখানা খুবই উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন কোনও ইংরেজের লেখা। "Your works are made known to me by a book, in which I read a style, which, but for the name of a Hindu, I should certainly have ascribed to the pen of a superiorly educated and instructed Englishman." তিনি ঐ পত্রে তাঁর প্রিয় শিষ্য জেম্স্ মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাস সংক্রান্ত বইয়ের সঙ্গে তুলনা ক'রে বলেন, "…though as to style I wish I could with truth and sincerity pronounce it equal to yours." অর্থাৎ, জেরেমি বেন্থাম রামমোহনের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিকে নিজের প্রিয় শিষ্য জেম্স্ মিলের চেয়েও উচ্চ স্থান দিয়েছেন।

ইংরেজী ভাষায় তাঁর এই অসামান্য জ্ঞান শাসক-শ্রেণীর কাছে ও ইউরোপীয় সমাজে রামমোহনের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিল। তাঁর এই জ্ঞান তাঁর সংগ্রামের পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টির কাজেও এই জ্ঞান অপরিহার্য ছিল।

তাই ইংরেজদের সাহচর্য ও কোম্পানির অধীনে চাকরি রামমোহনের জীবনে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাল ছিল। তাঁর রংপুরের গৃহে সান্ধ্য মজলিশে যে একেশ্বরবাদী কুসংস্কারমুক্ত মানুষদের সমাবেশ ঘটতো, তাতেই প্রকৃতপক্ষে ভাবী ব্রাহ্ম-সমাজের বীজ ও অঙ্কুর নিহিত ছিল। রংপুর ত্যাগের পরই তা অসংখ্য শাখায়, পত্রে, পল্লবে, পুষ্পে, ফলে সুশোভিত হয়ে উঠেছিল।

৫

সংগ্রামের পথে

মিঃ ডিগ্‌বি ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুলাই তাবিখে রংপুরের কালেক্টরের পদ ত্যাগ করেন। মিঃ ডিগ্‌বির পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থাৎ ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দেই, রামমোহন দেওয়ানের পদ ত্যাগ করেছিলেন ব'লে মিস কোলেট প্রভৃতি প্রায় সকল জীবনীকারই লিখেছেন। কিন্তু অধুনা সরকারী দলিলপত্র থেকে জানা গেছে, রামমোহন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত দেওয়ানেব পদে নিযুক্ত ছিলেন। ডিগবিব পববর্তী রংপুবেব কালেক্টর মিঃ স্কট ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দেব নভেম্বর মাসে তাঁকে ভুটানের সীমান্ত মীমাংসার ব্যাপারে দূতরূপে নিয়োগ কবেছিলেন। বামমোহনের ওপর ভুটান সরকারের যে অত্যধিক আস্থা ছিল, তা মিঃ স্কটকে লেখা ভুটান সবকারেব পত্র থেকে জানা যায়। তাতে ভুটান সরকার এই অনুবোধ জানিযেছিলেন যে, মিঃ স্কট যদি নিজে ভুটানে যেতে না পারেন, তবে তিনি যেন তাঁর প্রতিনিধিরূপে রামমোহন বায়কে পাঠান। এই পত্র মিঃ স্কট ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দেব ১২ নভেম্বর পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং রামমোহন যে নভেম্বরের শেষভাগে ভুটান যাত্রা করেছিলেন, এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। ঐ সময়ে ভুটান যাত্রার পথ অত্যন্ত দুর্গম ছিল। তিনি গোযালপাড়া, বিজনি, সিডলি, চেরাং ও পাচুমাচু উপত্যকার পথে ভুটানে গিয়েছিলেন। ঐ সময়ে ভুটান তিব্বতেব অন্তর্গত ছিল। তাই রামমোহনের ভুটান যাত্রাকে তাঁব দ্বিতীয় বার তিব্বত গমনও বলা চলে। ভুটান সরকারের সঙ্গে সীমান্ত-বিবোধ মীমাংসাই সম্ভবতঃ রামমোহনের সর্বশেষ সরকারী কাজ। যদি তাই হয, তবে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর পযন্ত রামমোহন যে সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে-বিষযে সন্দেহ নেই।

রামমোহন এখন সরকারী কাজ ছেড়ে তাঁর জীবনের প্রধান কর্মে আত্মনিয়োগ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং বাংলা দেশের প্রত্যন্ত সীমায় প'ড়ে থাকাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। মিঃ ডিগ্‌বির মতো মানুষের প্রিয় সঙ্গও আর ছিল না। তিনি যে 'বেদান্তগ্রন্থ' বাংলা ভাষায় রচনা করেছিলেন, তার প্রকাশও প্রয়োজন ছিল। তাই রামমোহন নিশ্চয় রাজধানী কলকাতায় স্থায়িভাবে ফিরে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি এখন ঐশ্বর্যবান্, সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তি। সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য প্রতিপত্তিশালী বন্ধুদেরও তাঁর এখন অভাব নেই।

এদের সঙ্গে নিয়মিত মিলনের জন্তেও তাঁর কলকাতায় চলে আসা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

রামমোহন কিছুদিন আগে থেকেই কলকাতা আসবার জন্ম প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি কলকাতায় কেনার জন্তে বাসোপযোগী বাড়ীর সন্ধান করছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নামে দুখানা বাড়ী কেনা হ'লো। প্রথমটি চৌরঙ্গীতে বড়-হাতাযুক্ত একটি দোতলা বাড়ী। বাড়ীটি এলিজাবেথ ফেনউইক নামে এক মেমের কাছে ২০,৩১৭ টাকায় কেনা হয়।

দ্বিতীয় বাড়ীটি কেনা হয় মানিকতলায় ফ্রান্সিস মেণ্ডেস নামে এক সাহেবের কাছে তেরো হাজার টাকায়। এটা বাগান-বাড়ী। এই বাড়ীটি এখন ১২৩ আপার সার্কুলার রোডস্থ (বর্তমানে আচার্য প্রফুল্ল রায় রোড), উত্তর কলকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের বাসভবন। এই বাগান-বাড়ীটি ১৫ বিঘা জমির উপর অবস্থিত ছিল। এর দক্ষিণ সীমা তখনকার সুকিয়া স্টীট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রামমোহন কলকাতা আসার আগে তাঁর জন্য তাঁর জ্যেঠতুত ভাই রামতনু রায় রামমোহনের নির্দেশমতো এখানে একটি বাড়ী তৈরি করান এবং ইউরোপীয় কায়দায় বাড়ীটিকে সুসজ্জিত ক'রে তোলেন। রামতনু ঐ সময় মানিকতলায় থাকতেন ও রামমোহনের অনুরাগী ছিলেন। এই বাড়ীতেই রামমোহন তাঁর ইউরোপীয় বন্ধু-বান্ধবদের আপ্যায়িত করতেন। এদেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও আপ্যায়িত হতেন। বিদেশ থেকে যাঁরা ভারত-ভ্রমণে আসতেন, তাঁরা প্রায় সকলেই রামমোহনের সঙ্গে এই বাড়ীতে সাক্ষাৎ করতেন ও অভ্যর্থিত হতেন। এঁদের মধ্যে ইংরেজ পরিব্রাজক ফিজ্ ক্লারেন্স আর্ল অব মান্স্টার, ফরাসী বিজ্ঞানী ভিক্তর জাকমঁ, বিখ্যাত বিশপ হেবারের পত্নী মিসেস হেবার ও ইংরেজ মহিলা ফ্যানি পার্ক্সের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামমোহন ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত যাওয়ার প্রাক্কালে এই বাড়ীটি নিলামে বিক্রি ক'রে দেন।

তাঁর আরও একটি বাড়ী ছিল কলকাতায়, এখনকার ৮৫ আমহার্স্ট স্টীটে। বাড়ীটি 'সিমলা হাউস' নামে পরিচিত ছিল। এই বাড়ীতে রামমোহনের পরিবারবর্গ থাকতেন। পরে যখন রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ সুপ্রীম কোর্টের উকিল হয়েছিলেন, তিনি তখন এই বাড়ীতেই থাকতেন। রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদও (ইনিই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন) এই বাড়ীতে থাকতেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে চৌরঙ্গীতে ও মানিকতলায় বাড়ী দুটি কেনার সময়ে রামমোহন তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীটি বিক্রি ক'রে দিয়েছিলেন। যাই হ'ক, মানিকতলার বাড়ীটিই রামমোহনের জীবনে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এইটিই ছিল তাঁর সংগ্রামের প্রধান দুর্গ।

রামমোহন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বা ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় স্থায়িভাবে এসে কলকাতায় বাস করেন।

রামমোহন যখন কলকাতায় এসে বাস করলেন, তখন তাঁর বয়স তেতাল্লিশ বছর (বা একচল্লিশ)। গৌরকান্তি, দীর্ঘকায় পুরুষ, উজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্ত দুই চক্ষু, উচ্ছল প্রাণশক্তিতে পূর্ণ দেহ ও মন। অতি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, এদেশীয় বা বিদেশীয় যেই তাঁর সংস্পর্শে আসতো, আকৃষ্ট না হয়ে পারতো না। কলকাতায় স্থায়িভাবে বাসের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিই তাঁকে কেন্দ্র ক'রে মিলিত হলেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে তরুণ।

কৈশোর থেকেই হিন্দু ধর্মের যে ব্যাপারটি তাঁকে বিচলিত করেছিল, এবং যার বিরোধিতার জন্যে তিনি পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, স্বগৃহ সকলের মায়া ত্যাগ করেছিলেন, সেই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তিনি প্রথম সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। তিনি ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর তুহফাত-উল্ মুওয়াহ্‌হিদিনে লিখেছেন, সকল ধর্মের ভিত্তি এক, সকল ধর্মেরই ভিত্তি হ'লো এক সর্বশক্তিমান্ পরমসত্তা—যিনি বিশ্ব সৃজন ও পালন করছেন। ইসলাম, খ্রীষ্ট ধর্ম, শিখ ধর্ম প্রভৃতিতে এটা স্বতঃপ্রকাশ, কিন্তু হিন্দু ধর্মের মূলেও যে ঐ সত্য রয়েছে, আমরা পৌরাণিক পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মকে মেনে নিয়ে তা একেবারে বিস্মৃত হয়েছি, রামমোহন তা জনসাধারণের কাছে প্রমাণ ক'রে দেখাতে চাইলেন। তিনি দেখাতে চাইলেন পরবর্তী কালে হিন্দু ধর্মে বহু দেবদেবী ও বিগ্রহপূজা প্রাধান্য লাভ করলেও, এটা হিন্দু ধর্মের হীন রূপ, হিন্দু ধর্মের উন্নততর রূপ উপনিষদ্‌গুলি বা বেদান্তের মধ্যেই নিহিত আছে। বেদান্ত এক ও অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মের কথাই বলেছেন।

উপনিষদ্ বা বেদান্ত সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সংস্কৃত ভাষা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের একচেটে ভাষা, বহু দেবদেবী-অধ্যুষিত আনুষ্ঠানিক পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মই ব্রাহ্মণদের উপজীবিকার একমাত্র উপায়, সুতরাং ব্রাহ্মণরা নিজেদের স্বার্থে বেদান্তের সত্যকে জনসাধারণের কাছে প্রচারে বিরত আছেন। হিন্দু ধর্ম থেকে পৌত্তলিকতা দূর করতে হ'লে জনসাধারণকে বেদান্তের সঙ্গে সুপরিচিত করতে হবে। তা করতে হ'লে সংস্কৃতে বেদান্তের টীকা ভাষ্য ব্যাখ্যা রচনা করলে চলবে না, করতে হবে জনসাধারণের ভাষা বাংলা ভাষায় বেদান্তের অনুবাদ ও প্রচার।

এই উদ্দেশ্যেই রামমোহন এখন আরবী-ফারসীতে গ্রন্থ রচনা ত্যাগ ক'রে বাংলা ভাষাতেই গ্রন্থ-রচনার কাজে মন দিয়েছিলেন। রংপুরে থাকাকালেই তিনি শঙ্করাচার্যের বিখ্যাত বেদান্ত সূত্রের বাংলা অনুবাদ করতে শুরু করেন। রংপুরে থাকাকালেই তাঁর এই কাজ সম্পূর্ণ হয়। কলকাতায় এই বইয়ের মুদ্রণ চলতে থাকে। এজন্যে রাম-

মোহনকে রংপুর থেকে নিশ্চয় মাঝে মাঝে কলকাতা আসতে হ'তো। রামমোহনের কলকাতা আসবার বছরেই (১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে) এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বেদান্তগ্রন্থের আখ্যাপত্রে বেদান্তগ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে The Bengali Translation of the Vedant, or Resolution of all the Veds, the most celebrated and reserved work of Brahminical Theology, establishing the unity of the SUPREME BEING and that he is the only object of worship.

কিন্তু বাংলা তখনও নিতান্ত শৈশবাবস্থায় ছিল। বাংলা ভাষায় অনেক কাব্য রচিত হ'লেও প্রকৃতপক্ষে বাংলা গদ্য চিঠিপত্র প্রভৃতি নিতান্ত প্রাত্যহিক ব্যবহারের ঊর্ধ্বে ওঠে নি। এরকম বাংলা গদ্যে বেদান্তের মতো দুরূহ ভাবগুলিকে সাধারণের জন্যে প্রকাশ করা দুষ্কর, এমনকি অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। কিন্তু জনসাধারণের ভাষাতেই বেদান্তের বাণী প্রচার অপরিহার্য ছিল। খ্রীষ্ট ধর্মে যখন নানারূপ বিকৃতি দেখা দিয়েছিল, তখন মূল বাইবেল ও খ্রীষ্টধর্মের মূল বাণীগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করবার জন্যে ইংলণ্ডে জন উইক্লিফ ও জার্মানিতে মার্টিন লুথার মাতৃভাষা ইংরেজী ও জার্মানিতে বাইবেলের অনুবাদ করেছিলেন। ইউরোপের জনসাধারণ বাইবেলের বাণী সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল এবং ঘটেছিল এক ব্যাপক ধর্মবিপ্লব, এর ফলেই খ্রীষ্ট ধর্মে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের জন্ম হয়েছিল। মার্টিন লুথার প্রভৃতি ব্যক্তিরা খ্রীষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি, তারা খ্রীষ্ট ধর্মকে বিপথগামী করবার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছিলেন। রামমোহনও হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি, তিনি হিন্দু ধর্মের বিপথগামিতার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছিলেন। রামমোহন এই সময়ে ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন, ইউরোপের ধর্মবিপ্লবের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সুগভীর ছিল। তাই মাতৃভাষাতে, বাংলা গদ্যে, বেদান্তের অনুবাদ ও প্রচারের তিনি অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।

কিন্তু এ পথ ছিল দুর্গম, দুস্তর। যে বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক অস্তিত্বই ছিল না, তাকে বেদান্তের মতো দুরূহ বিষয় প্রকাশের মাধ্যম ক'রে গ'ড়ে নেওয়া যে অভাবনীয় কর্ম ছিল, তা অনুমান করা কঠিন নয়। রামমোহনের প্রতিভা তা করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই বেদান্তগ্রন্থের 'অনুষ্ঠান'-প্রকরণে তিনি বাংলা গদ্য কিভাবে পড়তে হবে, এবং কিভাবে তার অন্বয় ক'রে অর্থ বুঝতে হবে, সে সম্পর্কে পাঠকদের পরামর্শ দেন :

> প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপারের নির্বাহের যোগ্য কেবল কথকগুলিন শব্দ আছে এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো

[illegible] কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ ২ ইহাতে মনোযোগের শূন্যতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি।···বাক্যের আরম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যেই ২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন ২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পাবে না তাহার উদাহরণ দিই। ব্রহ্ম যাহাকে সকল বেদে গান করেন আর যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতে নির্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি তথাপি সকলের শেষে হয়েন এই যে ক্রিয়া শব্দ তাহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অন্বয় হইতেছে আর মধ্যেতে গান করেন যে ক্রিয়া শব্দ আছে তাহার অন্বয় বেদ শব্দের সহিত আর চলিতেছে এ ক্রিয়া শব্দের সহিত নির্বাহ ক্রিয়ার অন্বয় হয়।

রামমোহনকে অনেকে বাংলা গদ্যের জনক বলেছেন। তা সত্য না হ'লেও বাংলা গদ্যকে দুরূহ উন্নত চিন্তার মাধ্যমরূপে তিনি যে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তিনি বেদান্ত বা উপনিষদসমূহের ব্যাখ্যা ও আলোচনা বাংলা ভাষায় করায়, তা জনসাধারণের বোধগম্য হয়ে পড়বে এবং জনসাধারণ পৌরাণিক পৌত্তলিক হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে আস্থাহীন হয়ে পড়বে, এই আশঙ্কায় একদল স্বার্থান্বেষী লোক (ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা) রামমোহনের সমালোচনা করেন এবং বেদ-বেদান্তের মতো গ্রন্থকে লৌকিক ভাষায় প্রচার করা উচিত নয় ব'লে অভিযোগ করতে থাকেন। তাঁদের এই সমালোচনার উত্তর রামমোহন 'ঈশোপনিষদ'-এর বাংলা অনুবাদের অনুষ্ঠানে দিয়েছিলেন :

বেদান্তের বিবরণ ভাষাতে [বাংলাভাষাতে] হইবার পরে প্রথমত স্বার্থপর ব্যক্তিরা লোকসকলকে ইহা হইতে বিমুখ করিবার নিমিত্ত নানা দুষ্প্রবৃত্তি লওয়াইয়া ছিলেন তখন কেহ ২ কহিয়া থাকেন যে এ গ্রন্থ অমুকের মত হয় তোমরা ইহাকে কেন পড় আর গ্রহণ কর অর্থাৎ ইহা শুনিলে অনেকের অভিমান উদ্দীপ্ত হইয়া এ শাস্ত্রকে একজন আধুনিক মনুষ্যের মত জানিয়া ইহার অনুশীলন হইতে নিবর্ত্ত হইতে

পারিবেন। অত্যন্ত দুঃখ এই যে কুবুদ্ধি ব্যক্তিরা এমত সুগম অর্থাব্যাখ্যা বাক্যকে কিরূপে কর্ণে স্থান দেন কোনো শাস্ত্রকে ভাষায় [বাংলাভাষায়] বিবরণ করিলে যে শাস্ত্র যদি বিবরণকর্ত্তার মত হয় তবে ভগবদ্গীতা যাহাকে বাঙ্গালি ভাষায় এবং হিন্দোস্থানি ভাষায় কয়েকজন বিবরণ করিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তির মত হইতে পারে ও রামায়ণকে কীর্ত্তিবাস [কৃত্তিবাস] আর মহাভারতের কথক কাশীদাস ভাষায় বিবরণ করেন তবে এসকল গ্রন্থ তাঁহাদের মত হইল আর মনু প্রভৃতি গ্রন্থের অন্য ২ দেশীয় ভাষাতে বিবরণ দেখিতেছি তাহাও সেই সেই দেশীয় লোকের মত তাঁহাদের বিবেচনায় হইতে পারে ইহা হইলে অনেক গ্রন্থের প্রামাণ্য উঠিয়া যায়।

আমরা উপরে রামমোহনের যে বাংলা গদ্য উদ্ধৃত করেছি, তা সাধারণের জন্য লিখিত হ'লেও অত্যন্ত দুর্বোধ্য। এই দুর্বোধ্যতার প্রধান কারণ যতিচিহ্নের অব্যবহার। পরে তাঁর রচনায় ইংরেজীর অনুসরণে যতিচিহ্ন—পূর্ণচ্ছেদ, কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি ব্যবহার হ'তে থাকে এবং তাঁর গদ্য অনেক সুবোধ্য হয়ে ওঠে। সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদেই তাঁর রচনায় প্রথম এইরকম যতিচিহ্ন দেখা যায়। অবশ্য, এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা গদ্যে ইংরেজীর মতো যতিচিহ্নের ব্যবহার রামমোহন প্রবর্তন করেন নি। বাংলা বইয়ে ইংরেজীর মতো যতিচিহ্নের ব্যবহার শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস ও ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসে সর্বপ্রথম করা হয়। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি-ই 'নীতিকথা' দ্বিতীয় ভাগ পুস্তকে রেঃ ইউস্টেস্ কারি ও ইয়েটসের পরামর্শ-মতো এইরকম যতিচিহ্নের ব্যবহার করে। এই যতিচিহ্নের ব্যবহারের ফলে বাংলা গদ্য যে অনেক সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে, তা নিঃসন্দেহ। অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে যতিচিহ্নের ব্যবহার প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের দু বছর আগেই (১৮১৮) বাংলা গদ্যে ইংরেজীর অনুকরণে ফুলস্টপ, কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি যতিচিহ্নের ব্যবহার প্রবর্তিত হয়েছিল।

রামমোহন বেদান্তগ্রন্থের হিন্দুস্থানী ভাষায় অনুবাদও প্রকাশ করেন এবং বিনামূল্যে এই অনুবাদ বিতরণ করেন। একথা 'বেদান্তসারে'র ইংরেজী অনুবাদের মুখপত্র থেকে জানা যায়।

'বেদান্তগ্রন্থ' রচনার পরেই রামমোহন বেদান্তগ্রন্থের একটি সংক্ষেপিত রূপ 'বেদান্তসার' রচনা করেন। 'বেদান্তসার' তিনি বাংলায় রচনা করলেও ঐ বই তিনি হিন্দুস্থানী ও ইংরেজীতেও অনুবাদ করেন। বেদান্তগ্রন্থের মতোই বেদান্তসারের রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দেই হয়েছিল মনে হয়। হিন্দীতে এই বই অনুবাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দুদেরও বেদান্তের একেশ্বরবাদী

বাণী সম্পর্কে সচেতন ক'রে তোলা। বিদেশীরা হিন্দু ধর্মকে প্রধানতঃ Heathenism ব'লে মনে করতো। রামমোহন বেদান্তসার ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে বিদেশীয়দের জানাতে চাইলেন যে, প্রকৃত হিন্দু ধর্ম ইসলাম বা খ্রীষ্ট ধর্মের তুলনায় কোনও অংশে হীন নয়, হিন্দু ধর্মের অবিকৃত রূপ হ'লো নিরাকার এবং এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস। রামমোহন বেদান্তসারের ইংরেজী অনুবাদ ক'রে হিন্দু ধর্মকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলির সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কেবল স্বদেশীবদের নয়, বিদেশীয়দেরও ভুল ভাঙাতে চাইলেন। বেদান্তসারের ইংরেজী অনুবাদের নাম Abridgment of the Vedant. Abridgment of the Vedant ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। Government Gazette পত্রিকায় এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। বেদান্তসার যে এর আগেই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল, তা Abridgment-এর মুখপত্রে উল্লিখিত হয়েছে। মিস্ কোলেট প্রভৃতি অনেকে যে বেদান্তসার ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বলেছেন, এ থেকে প্রমাণিত হয়, তা ভ্রমাত্মক।

রামমোহন প্রধান দশটি উপনিষদ্‌কেও বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করবেন স্থির করেছিলেন। তিনি তাঁর এই ইচ্ছা ও সঙ্কল্প অনুসারে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তলবকারোপনিষদ্ বা কেনোপনিষদ্ ও ঈশোপনিষদ্ বাংলা ও ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। কঠোপনিষদ্ ও মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ বাংলায অনুবাদ করেন ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। কঠোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি মুণ্ডকোপনিষদ্ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায ও ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। রামমোহন 'ছান্দোগ্য' ও 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদ্-ও সম্পাদিত বা অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেছিলেন ব'লে জানা যায়। তবে ঐসব পুস্তকের কোনও কপি আজও পাওয়া যায় নি। তিনি বাংলা ভাষায় গদ্যে ভগবদ্গীতার অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেছিলেন ব'লেও জানা যায়। ঐ পুস্তকেরও কোন কপি আজও পাওয়া যায় নি। গীতা সম্পর্কে রামমোহন অতিশয় উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি বলতেন, "যে গীতার বাণী যে শোনেনি, তার কথা কে শুনবে?" আধুনিক কালে রামমোহনই ছিলেন বেদান্তের সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাতা ও ভাষ্যকার। কেবল তাই নয়, তিনি ইংরেজীতে বেদান্তের অনুবাদ ক'রে বিশ্বের কাছে হিন্দু ধর্ম ও বেদান্তের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করেছিলেন। তাঁর আরব্ধ কর্মই স্বামী বিবেকানন্দ সুসম্পন্ন করেছিলেন পরবর্তী কালে।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় "English Translation of An Abridgment of the Vedant" কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতে প্রবাসী ইংরেজরা

তা থেকে বেদান্ত সম্পর্কে অবহিত হ'লেও রামমোহনের কাছে তা যথেষ্ট ছিল না। তাঁর গুণগ্রাহী বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক মিঃ ডিগ্‌বি বিলাতে চ'লে গিয়েছিলেন। বেদান্তসার ও কেনোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ-গ্রন্থ রামমোহন তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মিঃ ডিগ্‌বি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বই দুখানি লণ্ডন থেকে প্রকাশ করেন। এই বই দুখানি যে ইংলণ্ডে, তথা ইউরোপের পণ্ডিত সমাজে খুবই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ঐ বছর An Abridgment-এর জার্মান ভাষায় অনুবাদ Auflosung des Wedant জেনা থেকে প্রকাশিত হয়। অবশ্য, লণ্ডন থেকে An Abridgment প্রকাশের পূর্বেই তা ইংলণ্ডের সুধী সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। কলকাতায় Abridgment প্রকাশিত হওয়ার পর ইংলণ্ডের Monthly Repository of Theology and General Literature পত্রিকায় দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তাতে An Abridgment সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছিল।

রামমোহন যখন বেদান্তের ভাষ্য ও অনুবাদ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁকে ঘিরে একটি সুধী-পরিমণ্ডলও গ'ড়ে উঠেছিল। স্বদেশের উন্নতিসাধনে, ধর্ম-সংস্কারে ও সমাজ-সংস্কারে এঁদের কম-বেশি সকলের উৎসাহ ছিল। এঁরা বিদ্যাবুদ্ধিতেই কেবল অগ্রণী ছিলেন না, এঁদের অনেকেই ছিলেন বিত্তশালী ও সমাজে প্রতিষ্ঠাবান্। এই সুধী-মণ্ডলীর মজলিশ বসতো রামমোহনের ও মজলিশের অন্যান্য সভ্যদের বাড়ীতে। মজলিশের নাম ছিল 'আত্মীয়-সভা'। এই মজলিশে প্রধানতঃ রামমোহনের অনুরাগী ও বন্ধুরা সমবেত হ'লেও অনেক সময় বিরোধীরাও এসে যোগ দিতেন, তখন আত্মীয়-সভা বিতর্ক-সভায় পরিণত হ'ত। অনেক সময় লিখিত প্রশ্ন আসতো বিরোধীপক্ষ থেকে, তারও আলোচনা হ'তো, এবং তার জবাবও দেওয়া হ'তো। প্রতি সপ্তাহে আত্মীয়-সভার একবার অধিবেশন হ'তো। সভায় হিন্দু শাস্ত্র পাঠ, ব্যাখ্যা ও আলোচনা এবং রামমোহন ও তাঁর বন্ধুদের রচিত নিরাকার একেশ্বরবাদী সঙ্গীত গাওয়া হ'তো।

রামমোহন যখন কলকাতায় এসে বসবাস করছিলেন, তখন তাঁর মতবাদ সম্পর্কে কলকাতার নব্য শিক্ষিত সমাজ অবহিত ছিল। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তখন ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিলেন। ফলে, রামমোহনের নূতন চিন্তাধারা তাঁদের অনেককেই সহজে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। এঁদের মধ্যে অনেকেই তৎকালীন বাংলা দেশের সর্বাধিক ধনী ও প্রতিপত্তিশালী পরিবারের লোক ছিলেন। সকলেই যে নব চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে আসতেন, তা-ও নয়। অনেকে রামমোহনের মতো একজন খ্যাতিমান্ ও প্রতিভাবান্ পুরুষের বন্ধুত্ব ও সাহচর্যের লোভে আসতেন। অনেকে আসতেন রামমোহনের কাছে পরামর্শ ও নানা সমস্যার সমাধানে

সহায়তা নিতে। অধিকাংশই ছিলেন রামমোহনের প্রায় সমবয়সী, রামমোহন যাঁদের 'বেরাদার' (ফারসী ভাই, ইংরেজী ব্রাদার) ব'লে সম্বোধন করতেন। আত্মীয়-সভার প্রতিষ্ঠাকালে এইসব ব্যক্তিরা কারা ছিলেন, তা ঠিক বলা যায় না। মিস্ কোলেট তাঁর বইয়ে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় (১ জুলাই, ১৮৬৫) প্রকাশিত কেশবচন্দ্র সেনের একটি রচনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন: "The meetings were not public and were attended chiefly by Rammohun's personal friends. Among these may be mentioned Dwarkanath Tagore, Brajamohun Mazumdar, Haladhar Bose, Nandakishore Bose and Rajnarayan Sen."

ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথের (১৭৯৪—১৮৪৬) বয়স ছিল বাইশ বছর। অতি অল্প বয়সেই দ্বারকানাথ তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর চারিত্রিক ও মানসিক গঠনে রামমোহনের প্রভাব যে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রামমোহনের সকল ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মে তিনি উৎসাহী সহযোগী ছিলেন। ব্রজমোহন মজুমদার (১৭৮৪—১৮২১) ও তাঁর ভাই কৃষ্ণমোহন মজুমদার দুজনেই রামমোহনের বন্ধু ও সহযোগী ছিলেন। ব্রজমোহন 'পৌত্তলিক-মুখ-চপেটিকা' (পৌত্তলিক-প্রবোধ) নামে পৌত্তলিকতা-বিরোধী একটি পুস্তকও লিখেছিলেন। এঁরা আত্মীয়-সভার সদস্য ছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসুর (১৮০২—১৮৪৫) বয়স ঐ সময়ে চোদ্দ-পনেরো বছর ছিল। তিনি রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ও ছিলেন। তিনি রামমোহনের বিশ্বস্ত অনুগামী হলেও, ঐ সময়ে তিনি আত্মীয়-সভার ঠিক সভ্য ছিলেন বলা চলে না। রামমোহনের মৃত্যু-শতবার্ষিকীতে প্রকাশিত Centenary Publicity Booklet No. 1-এ শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাস থেকে রামমোহনের যে সংক্ষেপিত জীবনী উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে:

Amongst the rich and influential men who gathered around him at that time [আত্মীয়-সভা প্রতিষ্ঠাকালে] may be mentioned Babu Dwarkanath Tagore of Jorasanko, Babu Prasanna Kumar Tagore of Pathuriagata, Babus Kali Nath and Baikuntha Nath Munshi of Taki, Babu Brindaban Mitra, grandfather of Rajendra Lal Mitra, Babu Kasi Nath Mullick of Calcutta, Raja Kali Sankar Ghosal of Bhukailash, Babu Annada Prosad Banerji of Telinipara and Babu Baidya Nath Mukherji, the grandfather of Justice Anukul Mukherji. Besides these, there were many others…"

পাথুরেঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পৌত্র ও গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র প্রসন্নকুমার

ঠাকুরের (১৮০১—৬৮) বয়স ঐ সময়ে চোদ্দ-পনেরো বছর ছিল। টাকির জমিদার কালীনাথ মুন্‌শির (১৮০১—৪৬) বয়সও ঐরকম ছিল। তাঁর ভাই বৈকুণ্ঠনাথের (১৮০৬—৫৫) বয়স ছিল আরও কম। এঁরা পরে সকলেই রামমোহনের একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত সহযোগী হয়েছিলেন। এঁরা আত্মীয়-সভায় যাতায়াত করতেও পারেন, কিন্তু এঁরা কেউ যে ঐ সময়ে রামমোহনের personal friend ছিলেন না, তা নিঃসন্দেহ। প্রসন্নকুমারের পিতা গোপীমোহন (১৭৬১—১৮১৮) রামমোহনের চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। তিনি সংস্কৃত, ফারসী, উর্দু, ইংরেজী, ফরাসী ও পোর্তুগীজ ভাষা জানতেন। সঙ্গীতে তাঁর অশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি নিজেও বাংলায় অনেক গান লিখেছিলেন। ভারতের বহু শ্রেষ্ঠ গায়ক ও ওস্তাদ তাঁর অকৃপণ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন, কালি মির্জা রামমোহনের খুবই প্রিয় ছিলেন। রামমোহন কালি মির্জার কাছে গান শিখতেন। কালি মির্জার বহু গান তাঁর পৌত্তলিকতা-বিরোধী অভিযানে প্রেরণা যোগাতো। গোপীমোহন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় মুক্তহস্তে দান করেছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের গভর্নর-ও ছিলেন। হিন্দু কলেজের জন্য দানের ক্ষেত্রে তাঁর স্থান ছিল বর্ধমানের মহারাজাব পরেই। বামমোহনেব সঙ্গে বয়োজ্যেষ্ঠ গোপীমোহনের যে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

✓আত্মীয়-সভায় যাঁরা নিয়মিত যোগ দিতেন, তাঁদের মধ্যে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৫—১৮৪৪) অন্যতম। ইনি হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি কাশীতে ও অন্যান্য স্থানে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হরিহরানন্দ তাঁর এই ভাইয়ের সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় করিয়ে দিলে, বামমোহন তাঁর সম্পর্কে খুবই যত্ন নেন এবং নিজের সংস্কৃত পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্রের কাছে তাঁকে বেদান্ত বিশেষভাবে অধ্যয়নের জন্য নিয়োগ করেন। আত্মীয়-সভা স্থাপিত হ'লে রামমোহন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ঐ সভায় উপনিষদ্‌ পাঠ ও ব্যাখ্যার ভার দেন। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী-ও প্রায়ই আত্মীয়-সভায় যোগ দিতেন। সুতরাং ঐ সময়ে আত্মীয়-সভায় যে ধনী ও জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ হ'তো, তা সহজেই বলা যায়। কেবল হিন্দুরাই নয়, অন্য ধর্মের লোকরাও এই সভায় আসতেন। আত্মীয়-সভায় গোলাম আব্বাস নামে একজন মুসলমান গায়ক গান গাইতেন বলা হয়েছে। ভারত-বন্ধু ডেভিড হেয়ার-ও এই সভায় যোগ দিতেন।

আত্মীয়-সভা স্থাপিত হওয়ার পর দু বছর এর সাপ্তাহিক অধিবেশনগুলি বসতো রামমোহনের মানিকতলা ভবনে। পরে এই সভা কিছুদিন তাঁর সিমলা ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এই সভার অধিবেশন সভ্যদের অনেকের গৃহেও বসতো। শেষ পর্যন্ত এই সভা স্থায়িভাবে বড়বাজারের হিন্দী কবি বিহারীলাল চৌবের বাড়ীতে হ'তে

থাকে। এখানেই ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে রামমোহনের বিখ্যাত তর্কযুদ্ধটি হয়েছিল।

আত্মীয়-সভায় পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্র শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন। গোবিন্দ মালা নামে এক সুগায়ক রামমোহন ও তাঁর বন্ধুদের রচিত সঙ্গীত গাইতেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ-ও উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা কবতেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, রামমোহন সুন্দর সুন্দর গান লিখতে পারতেন। গানগুলি একেশ্বরবাদ প্রচারে বিশেষ সহায়ক ছিল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের আত্মীয়-সভার এক অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্রহ্মসঙ্গীতটি গীত হয়।

কে ভুলালো হায়
কল্পনাকে সত্য করি জ্ঞান, এ কি দায়।
আপনি গড়হ যাকে,
যে তোমাব বশে, তাঁকে
কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায ?
কখনো ভূষণ দে॰, কখনো আহাব ,
ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেক কবহ স॰হাব।
প্রভু বলি মান যাবে,
সম্মুখে নাচা॰ তাবে—
হেন ভুল এ স॰সারে দেখেছ কোথায় ?

রামমোহনের গানগুলি কেবল হৃদযাবেগে ও ভাবেব মনোহাবিত্বে নয, যুক্তিতেও সুন্দর। তাব অন্য একটি গানে তিনি পৌত্তলিকতার যুক্তিহীন মূঢতাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ কবেন :

মন এ কি ভ্রান্তি তোমার। আবাহন বিসর্জন বল কর কার।
যে বিভু সর্বত্র থাকে, ইহ গচ্ছ বল তাকে,
তুমি কেবা, আন কাকে, এ কি চমৎকার।
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করো, ইহ তিষ্ঠ বল
তারে, এ কি অবিচার।
এ কি দেখি অসম্ভব,
বিবিধ নৈবেদ্য সব,
তারে দিয়া কব স্তব, এ বিশ্ব যাহার।

সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন, সুতরা॰ কোনও দেববিগ্রহেও ঈশ্বর আছেন, তাঁকে পূজার দোষ কি—এই ধরনেব যুক্তি যাঁরা দেন তাঁদের উত্তরে রামমোহন তাঁর ই॰রেজ পাঠকদের ঈশোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদেব ভূমিকায় বলেছিলেন :

For whenever a Hindu purchases an idol in the market, constructs one with his own hands, or has one made under his own superintendence, it is his invariable practice to perform certain ceremonies, called Pran-Pratishtha, or the endowment of animation, by which he believes that its nature is changed from that of the mere materials of which it is formed, and that it acquires not only life but natural powers.…

…the worshipper of images ascribes to them at once the opposite natures of human and superhuman beings. In attention to their supposed wants as living beings, he is seen feeding, or pretending to feed them every morning and evening; and as in the hot season he is careful to fan them, so in cold he is equally regardful of their comfort, covering them by day with warm clothing, and placing them at night in a snug bed.…

রামমোহন এইভাবে শাস্ত্রীয় উক্তি ও সাধারণ যুক্তির সাহায্যে পৌত্তলিক হিন্দুধর্মকে তীব্রভাবে আঘাত করেন। তাঁর এই আক্রমণ তাঁকে সনাতনী হিন্দু সমাজের কাছে যেমন ঘোর শত্রু ক'রে তোলে, তেমনি আবার পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত অসংখ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তাঁর সমর্থনে জড়ো করে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পশ্চাতে আসেন নব্য শিক্ষিত তরুণরা।

ইতিপূর্বেই রামমোহন তাঁর ডিগ্‌বি প্রভৃতি ইংরেজ বন্ধুদের সংস্পর্শে আসায় খ্রীষ্ট ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই পরিচয় যে এখন আরও গভীরতর হয়েছিল, তা জানা যায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ডিগ্‌বিকে লেখা রামমোহনের এক পত্র থেকে। তাতে তিনি বলেছেন :

The consequence of my long and uninterrupted researches into religious truths has been that I have the doctrines of Christ more conducive to moral principles and better adapted for the use of rational beings, than any others which have come to my knowledge ,·

তিনি মিঃ ডিগ্‌বি বিলাত চ'লে যাওয়ার পর ক বছরে কি কাজ করেছেন, সে সম্পর্কে বলেছেন, তিনি হিন্দুদের ইহলোকে ও পরলোকে সুখী করবার জন্যে পৌত্তলিকতার অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে প্রচার করেছেন, এবং তাদের পৌত্তলিকতার অযৌক্তিকতা ও ঈশ্বরের অদ্বিতীয়তা প্রমাণের জন্য বেদান্ত ও বেদের কিছু অংশ বাংলায় ও হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ করেছেন। এই কাজের গোড়ার দিকে তিনি ব্রাহ্মণ-সমাজের

সেচ্ছাচারীর ব্যক্তিদের কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন এবং নিকট আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। ঐ সময়ে তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুরাই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনাস্থল ছিলেন। পরে অবশ্য তাঁর দেশের অনেকেই কুসংস্কার ত্যাগ ক'রে সত্য সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁদের অনেকেই যাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত হ'তে পারতেন না, তাঁরাও এখন তাঁর মতকেই সমর্থন করছেন।

এই পত্রে রামমোহন ইংলণ্ড যাওয়ার জন্যও তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং জানান যে, ডিগ্‌বি যদি পরবর্তী অক্টোবর মাসের মধ্যে ভারতে না ফিরে আসেন, তবে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই ইংলণ্ড রওনা হবেন। এই পত্রটি মিঃ ডিগ্‌বি লণ্ডন থেকে ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত An Abridgment of the Vedant-এর ভূমিকায় প্রকাশ করেছিলেন। তাই মনে হয়, পত্রটি ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে বা ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে লিখিত হয়েছিল। ডিগ্‌বি পরবর্তী অক্টোবরেও ভারতে আসেন নি। তিনি ভারতে এসেছিলেন ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু রামমোহনের প্রতিশ্রুত ইংলণ্ড গমন ঐ সময়ে হয়ে ওঠে নি। সম্ভবতঃ তাঁর বিরোধীপক্ষের আক্রমণ-প্রতিরোধ ও তাঁর পরিবারের মধ্যে কলহ-বিবাদই এর প্রধান কারণ ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য, ডিগ্‌বি ভাবতে ফিবে আসার পব আবাব সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি এক বছরের জন্য ছুটি নিয়ে স্বদেশে রওনা হন। কিন্তু পথে উত্তমাশা অন্তরীপে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

রামমোহনের অনেক মতামত ইংরেজীতেও প্রকাশিত হওয়ায় ভারতবর্ষের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট কলেজেব ইংরেজীর প্রধান অধ্যাপক শঙ্কর শাস্ত্রী ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'মাদ্রাজ কুরিয়ার' পত্রিকায় রামমোহনের বক্তব্যেব প্রতিবাদ ক'রে এক দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করলেন। অধ্যাপক শাস্ত্রীর মতগুলি খণ্ডন ক'রে রামমোহন লিখলেন তাঁর A Defence of Hindu Theism (হিন্দু একেশ্বববাদেব সমর্থনে) এবং অধ্যাপক শাস্ত্রীর পত্রের সঙ্গে সেটি মুদ্রিত ক'রে প্রকাশ করলেন। তাতে তিনি হিন্দু ধর্মের অদ্বৈতবাদকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন না, হিন্দু ধর্মের অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনী ও অবতারবাদের অযৌক্তিকতাকে প্রমাণ ক'রে দেখালেন।

কলকাতাতেও বিখ্যাত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রামমোহনের মতামত খণ্ডনের জন্য একটি পুস্তিকা রচনা করেন। পুস্তিকাটির নাম 'বেদান্তচন্দ্রিকা'। ঐ বাংলা পুস্তিকার সঙ্গে ঐ পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদ An Apology for the Present System of Hindu Worship প্রকাশিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতরূপে সমাজে খুবই সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের

প্রথম প্রধান পণ্ডিত। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঐ পদ ত্যাগ ক'রে তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের জজ-পণ্ডিত হন। ঐ পদে তিনি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতার সমর্থন করলেও তাঁর মন সংস্কারমুক্ত ছিল। যে সতীদাহ প্রথা নিরোধের জন্য রামমোহন চিরস্মরণীয় হয়েছেন, রামমোহনের পূর্বেই তিনি সতীদাহ যে হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে আবশ্যিক বা বিধবার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ করণীয় নয়, এই মত প্রকাশ করেছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সতীদাহ সম্পর্কে তাঁর শাস্ত্রীয় মতামত জিজ্ঞাসা করলে, তিনি হিন্দু শাস্ত্রের মতামত উদ্ধৃত ক'রে সতীদাহের বিরুদ্ধেই মতামত দিয়েছিলেন। তাঁর এই মতামত রামমোহনের সতীদাহ-বিরোধিতায় খুবই সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু পৌত্তলিকতার ক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের সঙ্গে একমত হ'তে পারেন নি। তাঁর 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' ও তার ইংরেজী অনুবাদ বেনামিতেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এই পুস্তিকার রচয়িতা যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তা অনেকেরই জানা ছিল। রামমোহনও জানতেন।

রামমোহন তাঁর 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' নামে বাংলা পুস্তিকায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মতামত খণ্ডন ক'রে দেখান। মৃত্যুঞ্জয়ের ইংরেজী পুস্তিকার উত্তর দেওয়ার জন্য তিনি ইংরেজীতে লেখেন A Second Defence of the Monotheistical System of the Veds.

'ভট্টাচার্যের সহিত বিচারের' ভূমিকায় রামমোহন ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় লেখেন :

মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্যের বেদান্তচন্দ্রিকা লিখিবাতে এবং তাঁহার অনুগত-দিগের ঐ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অন্তঃকরণে যথেষ্ট হর্ষ জন্মিয়াছে যে এইরূপ শাস্ত্রার্থের অনুশীলনের দ্বারা সকল শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ যে পথ তাহা সর্বসাধারণে প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং কোন্ পক্ষে ভ্রম আর প্রতারণা ও স্বার্থপরতা আছে তাহাও বিদিত হইতে পারে এবং ইহাও একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে ভট্টাচার্য একবার প্রবর্ত্ত হইয়া পুনরায় নিবর্ত্ত হইবেন না অতএব দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকার উদয়ের প্রতীক্ষাতে আমরা রহিলাম। কিন্তু তিন প্রকারে অন্তঃকরণে খেদ জন্মে প্রথম এই যে সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য এই যে সর্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিবে কিন্তু প্রগাঢ় সংস্কৃত শব্দ সকল ইচ্ছা-পূর্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎ-পর্যের অন্যথা করা হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্ত-চন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধ-গম্য হয়॥ দ্বিতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকা সাড়ৈষট্টিপৃষ্ঠ তাহাতে অভিপ্রায় করি যে বেদান্তের

আট নয় সূত্রের অধিক নাম আর বেদের দুই তিন প্রমাণ লিখিয়া থাকিবেন অধিকন্তু ওই সকল সূত্র কোন অধ্যায়ের কোন পাদের হয় তাহা লিখেন না এবং বেদান্তচন্দ্রিকার মঙ্গলাচরণীয় প্রভৃতি শ্লোকসকল কোন গ্রন্থের হয় তাহা প্রায় লিখেন না অতএব নিবেদন দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সূত্র এবং শ্রুতি আর স্মৃত্যাদির প্রমাণ ভট্টাচার্য লিখিবেন তাহার বিশেষরূপে নিদর্শন যেন লিখেন ॥ তৃতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকা প্রথমে লিখেন যে এ গ্রন্থ কাহার ভাষা বিবরণের উত্তর দিবার জন্য লেখা যাইতেছে এমৎ নহে অথচ প্রথম অবধি শেষ পর্যন্ত যে অগ্রাহ্যনামরূপ অমুকেরা ইত্যাদি উক্তির দ্বারা কেবল আমাদিগেরই শ্লেষ করিয়াছেন এবং স্থানে ২ যাহা আমরা কদাপি কোনো গ্রন্থে লিখি নাই এবং স্বীকার করি নাই তাহা আমাদের মত হয় এমৎ জানাইয়াছেন অতএব তৃতীয় প্রার্থনা এই যে শাস্ত্রার্থের অনুশীলনে সত্যকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যদি আমাদের লিখিত মতকে ভট্টাচার্য দূষিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহার পৃষ্ঠা এবং পংক্তির নির্দেশপূর্বক লিখিয়া যেন দোষ দেন তাহা হইলে বিজ্ঞলোক দোষাদোষ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন ॥ ভট্টাচার্য শাস্ত্রালাপে দুর্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না যদি ভট্টাচার্য কৃপাপূর্বক দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে পূর্বের ন্যায় দুর্বাক্যে পরিপূর্ণ না করেন তবে যথেষ্ট শ্লাঘা করিয়া মানিব ইতি ॥

রামমোহনের উপরের মন্তব্যগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, রামমোহনের বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতরা জোড়াতালি দিয়ে রামমোহনের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ খাড়া করবার চেষ্টা করতেন, আলোচনার কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতেন না। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মাত্র আট-নটি সূত্রের উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা দিয়ে সমগ্র বেদান্তের মত প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। অর্থ যাতে সহজে সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য না হয়, সেজন্য বাংলা ভাষায় দুরূহ দুর্বোধ শব্দ প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ ক'রে বক্তব্যকে ঘোরালো ক'রে তুলেছিলেন। রামমোহনের উক্তি ও যুক্তির অপব্যাখ্যা করেছিলেন এবং রামমোহন ও তাঁর সমর্থকদের কটুবাক্যে তিরস্কৃত করেছিলেন। রামমোহন আলোচনাকালে বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে কটুবাক্য প্রয়োগকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। কেবল এদেশীয় পণ্ডিতরা নয়, ইংরেজ পাদরীরাও এই দোষ থেকে মুক্ত ছিলেন না। পরবর্তী কালে যখন খ্রীষ্টান পাদরীদের সঙ্গে তাঁর তর্কযুদ্ধ বেধেছিল, তখনও তিনি তর্ককালে যুক্তি ছেড়ে কটুবাক্য আশ্রয়ের পদ্ধতি ত্যাগ করতে বার বার তাদের অনুরোধ করেছিলেন। তর্কযুদ্ধে তাঁর এই অনুত্তেজিত ভাব তাঁর রচনাগুলিকে মহনীয় ক'রে তুলেছে। তবে রামমোহন সরস ও সুচতুর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে অত্যন্ত পটু ছিলেন। তাঁর সমস্ত রচনাই ঐরকম অসংখ্য শ্লেষ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে পূর্ণ রয়েছে, যা কটুবাক্যের চেয়ে

সহজে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে সমর্থ হ'তো। বলা বাহুল্য, রামমোহন-প্রস্তাবিত মৃত্যুঞ্জয়ের দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকা আর প্রকাশিত হয় নি।

এই সময়ে আর একজন এদেশীয় পণ্ডিতের সঙ্গে রামমোহনের যে তর্কযুদ্ধ হয়, তা 'বেদান্তচন্দ্রিকা' প্রভৃতির মতো যুক্তির নামে কটূক্তি ছিল না। তা উৎসবানন্দ (ভট্টাচার্য) বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে রামমোহনের তর্কযুদ্ধ। এই তর্কযুদ্ধই সম্ভবতঃ রামমোহনের প্রথম তর্কযুদ্ধ ছিল। এই তর্কযুদ্ধ নিশ্চয় ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দেই হয়েছিল, কারণ, এই বিতর্কের শেষ নিবন্ধেব কাল রামমোহন নিজেই দিয়েছেন—২০ অগ্রহায়ণস্য ১২২৩।

তখন আত্মীয়-সভাব অধিবেশন হ'তো বামমোহনের মানিকতলা বাগানবাড়ীতে। ঐ সভায় আলোচনার জন্য বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মহামহোপাধ্যায় উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ প্রশ্নপত্র পাঠাতেন। রামমোহনও সভা থেকে ঐসব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। উত্তর-প্রত্যুত্তরগুলি সবই সংস্কৃতে রচিত ও বাংলা হরপে ছাপা হ'তো। এই বিচারের উত্তর-প্রত্যুত্তর-সম্বলিত চারখানি বই পাওয়া গিয়েছে। তাতে দেখা যায়, উৎসবানন্দের প্রশ্ন ও রামমোহনের উত্তর-সম্বলিত প্রথম পুস্তিকাটির প্রকাশকাল ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৩ বা ২১ মে ১৮১৬। বামমোহনের শেষ উত্তরের পুস্তিকাটির প্রকাশকাল ২০ অগ্রহায়ণ ১২২৩ বা ৩ ডিসেম্বর ১৮১৬। এই তর্কযুদ্ধ বা বিচারকে আচার্য শঙ্করের সঙ্গে মণ্ডন মিশ্রের তর্কযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই তর্কযুদ্ধে শঙ্কর মণ্ডন মিশ্রকে পরাজিত করেছিলেন এবং মণ্ডন মিশ্র শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ ক'রে তাঁর শিষ্যত্ব নিয়েছিলেন ও দক্ষিণহস্তে পরিণত হয়েছিলেন। উৎসবানন্দও তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে রামমোহনের অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন। পরে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হ'লে উৎসবানন্দ সভায় উপনিষদ্ পাঠ করতেন।

উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে যখন এই ধরনের লিখিত তর্কযুদ্ধ চলছিল, তখন আত্মীয়-সভার অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষে (১৭ পৌষ ১২২৩) রামমোহন মাদ্রাজী পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী রামমোহনকে প্রকাশ্যে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন এবং রামমোহনও সানন্দে তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। সেদিন আত্মীয়-সভায় সমর্থক, বিরোধী ও নিরপেক্ষ বহু দর্শকের অভ্যাগম হয়েছিল। শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব ছিলেন সংরক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু সমাজের শিরোমণি। তিনি বহু পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত সংস্কৃত অভিধান 'শব্দকল্পদ্রুম' সঙ্কলিত হয়েছিল। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেসব প্রগতিশীল আন্দোলন করেছিলেন, তার প্রতিরোধের পুরোধা

ছিলেন তিনি। তিনিও এই বিতর্কসভায় সপারিষদ্ উপস্থিত ছিলেন। রামমোহন শাস্ত্রীয় উক্তি ও অখণ্ডনীয় যুক্তির জালে মাদ্রাজী পণ্ডিতকে সম্পূর্ণরূপে নীরব ক'রে দিলেন। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর তর্কের উত্তরে রামমোহন যে জবাব দিয়েছিলেন, তা দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দীতে, বাংলা হরফে সংস্কৃতে ও বাংলায় এবং ইংরেজীতে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে ছেপে বার করেন।

গোঁড়া হিন্দু সমাজের মুখপাত্র পণ্ডিতরা রামমোহনের সুগভীর পাণ্ডিত্য ও ক্ষুরধার যুক্তির কাছে যতোই পরাভূত হচ্ছিলেন, তাঁব বিরুদ্ধে নিন্দা, কুৎসা ও আক্রমণের তীব্রতা ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। রামমোহন রক্ষণশীল হিন্দুদেব কাছে বিধর্মী, অপাঙ্ক্তেয় ও অস্পৃশ্য হয়ে উঠেছিলেন। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে ঐ সময়ে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ঘটনা নিয়ে।

যেসব মহানুভব ইংরেজ ভাবতের উন্নতিসাধনের কাজে দেহ-মন সর্বস্ব নিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন ডেভিড হেয়ার। রামমোহন ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে কেবল পরিচিত হন নি, তাঁর সঙ্গে কী ধরনের গভীর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, ইংলণ্ডে তাঁর শেষদিনগুলি যাপনেব সময়ে আমরা বলবো। এই ডেভিড হেয়ার রামমোহন-আহূত তাঁর বন্ধু-বান্ধবদেব এক সভায় উপস্থিত ছিলেন। হেয়ার ঐ সভায় বলেন, ভারতীয়দের মধ্য থেকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করবার প্রকৃষ্ট পন্থা হ'লো তাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার। রামমোহন ও তার বন্ধুরা সকলেই হেয়ারের এই প্রস্তাব একবাক্যে সমর্থন করেন এবং এ-বিষয়ে উদ্যোগী হ'তে অনুরোধ জানান। তখন সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিস্ ছিলেন স্যার এডোয়ার্ড হাইড ইস্ট। হেয়ার তার সঙ্গে আলোচনা করলে তিনিও এ-বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং স্বগৃহে কলকাতার বিশিষ্ট হিন্দুদের এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় একটা প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তাতে বলা হয় "an establishment be formed for the education of native youth." রামমোহন ভারতে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন ও বিস্তারের জন্য সর্বাধিক আগ্রহী ও উদ্যোগী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি এই অধিবেশন থেকে দূরে থাকাই সমীচীন মনে করলেন। কারণ, তিনি জানতেন, দেশের বহু ধনী ব্যক্তি যাঁরা মুক্তহস্তে এই কলেজের জন্য অর্থ দান করতে পারেন, তাঁরা তার মতের বিরোধী এবং রামমোহন এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাঁরা নিশ্চয় এ কাজে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেন না।

রামমোহন যা ভেবেছিলেন, সভাতেও ঠিক তাই ঘটলো। রামমোহন সভায় উপস্থিত না থাকলেও প্রসঙ্গক্রমে তাঁর নাম উঠলো। তখন উপস্থিত অনেকেই স্যার

এডোয়ার্ড হাইড ইস্টকে জানিয়ে দিলেন যে, যদি রামমোহন রায় এ সংস্থার সঙ্গে জড়িত না থাকেন, তবে তাঁরা এই সংস্থার জন্য সকল কিছু সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছেন। হেয়ার রামমোহনকে এ ব্যাপার জানালে তিনি সানন্দে জানালেন যে, কলেজ প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য, সেজন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করতে তিনি প্রস্তুত। স্যার এডোয়ার্ড ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ মে তারিখে বিচারপতি হ্যারিংটনকে লেখা একটি পত্রে লেখেন :

> The meeting was accordingly held at my house on the 14th of May, 1816, at which 50 and upwards of the most respectable Hindu inhabitants of rank or wealth attended, including also the principal Pandits ;···I found that one of them in particular, a Brahmin of good caste, and a man of wealth and influence, was mostly set against Rammohun Roy.···He expressed a hope that no subscription would be received from Rammohun Roy. I asked why not ? "Because he had chosen to separate himself from us, and to attack our religion." "I do not know what Rammohun's religion is··· , but I hope that my being a Christian, and a sincere one, to the best of my ability, will be no reason for your refusing my subscription to your undertaking."···he answered readily··· "No, not at all , we shall be glad of your money ; but it is different thing with Rammohun, who is a Hindu, and yet has publicly reviled us, and written against us and our religion."

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডোয়ার্ড হাইড ইস্টের এই পত্র থেকে বোঝা যায়, রামমোহনের প্রতি রক্ষণশীল হিন্দুদের ঘৃণা কী তীব্র ছিল। যে খ্রীষ্টানদের তাঁরা ম্লেচ্ছ ও বিধর্মী মনে করে, তাদের কাছ থেকেও চাঁদা আনন্দের সঙ্গে নেওয়া যায়, কিন্তু অদ্বৈতবাদী রামমোহনের কাছে, অসম্ভব। তাদের চোখে, রামমোহন ম্লেচ্ছেরও অধম।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি হিন্দু কলেজ (পরবর্তী কালের প্রেসিডেন্সি কলেজ) স্থাপিত হ'লো। বাংলা দেশের ধনী ব্যক্তিরা মুক্তহস্তে অর্থ দান করলেন, তাঁদের মধ্যে রামমোহনের সমর্থক ও সুহৃদও বহু ছিলেন। কিন্তু বাংলা দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার সর্বাধিক সমর্থক যাঁকে বলা-ও চলে, তাঁকে হিন্দু কলেজ থেকে দূরে রেখে রক্ষণশীলদের সে কী আনন্দ!

কেবল সমাজেই রামমোহন সেদিন ঘৃণিত ও অপাঙ্‌ক্তেয় হন নি, তাঁর স্বগৃহেও তিনি দুর্বার ঘৃণা ও বিদ্বেষের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিংবদন্তী আছে, রামমোহন একবার

[illegible] [illegible] তাদের কুলদেবতাকে প্রণাম না ক'রেই বাড়ীতে ঢুকে মায়ের দর্শন চেয়েছিলেন। তখন মা তারিণী দেবী নাকি বলেছিলেন, যে পুত্র কুলদেবতাকে প্রণাম করে না, আমি তার মুখদর্শন করি না। রামমোহন তখন নাকি মাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কুলদেবতাকে প্রণাম করেছিলেন এবং বলেছিলেন আমি আমার মায়ের ঠাকুরকে প্রণাম করছি। এ কাহিনী কতদূর সত্য জানি না। কিন্তু রামমোহন যে মায়ের ঠাকুরকে বেশিদিন মায়ের ঠাকুর ব'লে প্রণাম করতে পারেন নি, তা নিঃসন্দেহ। তাঁর একেশ্বরবাদী পৌত্তলিকতাবিরোধী মতবাদ তাঁকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের চক্ষে ঘৃণিত বিধর্মীতেই পরিণত করেছিল। তাই লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ীতে তাঁর যাতায়াত প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। অথচ তাঁর দুই স্ত্রী ও দুই পুত্র তখনও লাঙ্গুলপাড়ায় তারিণী দেবীর কাছে থাকতেন। রামমোহন কলকাতায় বাস করলেও গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে চান নি। তাই তিনি লাঙ্গুলপাড়ার কাছেই রঘুনাথপুরে একটি পৃথক বাড়ী নির্মাণ করাতে শুরু করলেন। লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ীর অংশ আগেই ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি তিনি তাঁর ভাগিনেয় গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখে দিয়েছিলেন। রঘুনাথপুরেও লোকালয়ে রামমোহনের স্থান জুটলো না, বা স্বেচ্ছায় তিনি লোকালয় থেকে দূরে থাকার জন্যই রঘুনাথপুরের শ্মশানেব কাছে নির্জন স্থানে তার এই বাড়ীটি নির্মাণ করাচ্ছিলেন।

হঠাৎ সম্ভবতঃ তাঁর মায়ের সঙ্গে বিরোধ তীব্রতব হয়ে ওঠে। কি কারণে বিরোধ অকস্মাৎ তীব্রতর হয়ে উঠলো, তা জানা যায় নি। আত্মীয়-সভার সদস্যরা শপথ করেছিলেন যে, তাঁরা বিগ্রহপূজাব জন্য কোনভাবে অর্থব্যয় বরবেন না। রামমোহন একেশ্বরবাদী ও বিগ্রহপূজার বিরোধী হ'লেও সম্ভবতঃ এতদিন তাঁর পিতার দানপত্রের শর্ত অনুসারে কুলদেবতার ব্যয়ের অংশ দিয়ে আসছিলেন। এখন তিনি ঐ ব্যয় বন্ধ ক'রে দেন। ফলে, মার সঙ্গে তাঁর কলহ চরমে ওঠে এবং রঘুনাথপুরে বাড়ী সম্পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও তিনি সপরিবারে লাঙ্গুলপাড়া ছেড়ে রঘুনাথপুরে চলে যান (২৮ জানুয়ারি, ১৮১৭ ; বাংলা ১৭ মাঘ, ১২২৩)। এইভাবে লাঙ্গুলপাড়ার সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্ক শেষ হয়।

কলকাতায় কাজের অবকাশে রামমোহন রঘুনাথপুবে আসতেন। রঘুনাথপুরের নির্জন শ্মশানভূমিতে অবস্থিত তাঁর এই গৃহটি তাঁর ধ্যানধারণার পক্ষে খুবই অনুকূল ছিল। এই গৃহ-প্রাঙ্গণে তিনি একটি মঞ্চ নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং তাতে লেখা ছিল ওঁ তৎ সৎ একম্ অদ্বিতীয়ম্। কলকাতা থেকে আসবার বা কলকাতা যাওয়ার সময়ে তিনি এই মঞ্চটি প্রদক্ষিণ করতেন। কথিত আছে, ঐরূপ মঞ্চ-প্রদক্ষিণকালে তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী উমা দেবী তাঁকে নাকি প্রশ্ন করেছিলেন, পৃথিবীতে কোন্ ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ। রামমোহন

উত্তরে বলেছিলেন, কোনও গাই কালো, কোনও গাই সাদা, কোনও গাই বাদামী, কিন্তু সব গাইয়েরই দুধ সাদা। এই কথাই তিনি তাঁর তুহ্‌ফাত-উল্-মুওয়াহ্‌হিদ্দিনেও বলেছিলেন : সব ধর্মের মূল ভিত্তি এক। রামমোহন হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম, সকল শ্রেষ্ঠ ধর্মের মধ্যেই দেখেছিলেন, এদের ভিত্তি এক—এক ও অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা। তাই তিনি একেশ্বরবাদের মধ্যে কেবল ধর্মের মূল ও সত্য রূপকেই প্রত্যক্ষ করেন নি, দেখেছিলেন সর্বধর্মসমন্বয়ের মানব-মিলনের এক অবিচ্ছেদ্য সূত্র।

রামমোহন লাঙ্গুলপাড়া ত্যাগ ক'রে রঘুনাথপুরে চ'লে গেলেও, মা ও আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে থাকলেও, কিন্তু পারিবারিক কলহের অবসান হ'লো না।

রামমোহন তাঁর কুলদেবতার সেবার জন্যে দেয় অর্থ বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে মা তাঁর পৌত্র (জগমোহনের পুত্র) গোবিন্দপ্রসাদকে দিয়ে রামমোহনের বিরুদ্ধে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুন সুপ্রীম কোর্টের ইকুইটি ডিভিজনে একটি মামলা দায়ের করান। এই মামলায় তিনি দাবি করেন যে, ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পিতামহ রামকান্ত পুত্রদের মধ্যে দানপত্রযোগে সম্পত্তি ভাগ ক'রে দিলেও পরে জগমোহন ও রামমোহন তাঁদের পিতার সঙ্গেই একত্র বাস করতে থাকেন এবং জগমোহন ও রামমোহনের ক্ষেত্রে দানপত্র কার্যকর হয় নি। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে রামকান্তের ও ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে জগমোহনের মৃত্যু হয়। পিতা জগমোহনের মৃত্যুর পর গোবিন্দপ্রসাদ তাঁর পিতৃব্য রামমোহনের সঙ্গেই বাস করতে থাকেন। পরে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি রামমোহন লাঙ্গুলপাড়া ত্যাগ ক'রে রঘুনাথপুরে চলে যান। যেহেতু রামকান্ত, জগমোহন ও রামমোহন যৌথ পরিবারে বাস করতেন, সেইহেতু রামমোহনের সমগ্র সম্পত্তিই যৌথ পরিবারের সম্পত্তি এবং জগমোহনের একমাত্র উত্তরাধিকারীরূপে গোবিন্দপ্রসাদ সেই সম্পত্তির অর্ধেকের ন্যায্য মালিক। রামমোহন তাঁকে তাঁর ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করছেন।

মকদ্দমা রুজু হওয়ার পরও তারিণী দেবী মিটমাটের চেষ্টা করেন এবং রামমোহনের সিমলাস্থ বাড়ীতে গিয়ে রামমোহনের কাছে কুলদেবতার সেবার জন্য কিছু জমি চান। রামমোহন তাতে রাজী হন না। তিনি বলেন, তিনি মাকে টাকা দেবেন, তবে এক শর্তে, মা তা দিয়ে বিগ্রহসেবা করবেন না, দরিদ্রসেবা করবেন। কিন্তু তারিণী দেবী তাতে রাজী হন না।

রামমোহন আত্মপক্ষ-সমর্থনে বলেছেন, তিনি ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে পিতার জীবদ্দশা থেকেই পৃথক হয়েছেন এবং তাঁর সম্পত্তি স্বোপার্জিত, তাতে গোবিন্দপ্রসাদের কোন অধিকার নেই।

এই মামলা তিন বছর ধ'রে চলেছিল। রামমোহনের বিরোধীরা তাঁকে জব্দ করবার জন্য এধরনের আরও কয়েকটি মামলা তাঁর বিরুদ্ধে এনেছিলেন। কিন্তু

রামমোহনের বিরুদ্ধে গোবিন্দপ্রসাদের এই মামলাটিই সর্বপ্রথম মামলা এবং এই মামলা যে তারিণী দেবীর প্ররোচনাতেই হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহ। পরে মামলার শেষের দিকে গোবিন্দপ্রসাদ তাঁর পিতামহী তারিণী দেবীকে অন্যতম সাক্ষী হিসাবে হাজির করতে চেয়েছিলেন। তারিণী দেবী সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত না হ'লেও, রামমোহনের পক্ষ থেকে তাঁকে জেরা করবার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন প্রস্তুত করা হয়েছিল। সেগুলি মকদ্দমার নথিপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে :

আপনার পুত্র রামমোহনের ধর্মমতের জন্য তাহার সহিত আপনার কি বিবাদ ও মনান্তর হয় নাই, এবং আপনি যেভাবে হিন্দুধর্মের পূজা-অর্চনা করিতে ইচ্ছা করেন, সেই সকল করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় প্রতিশোধস্বরূপ কি আপনি আপনার পৌত্রকে মকদ্দমা করিতে প্ররোচিত করেন নাই ?

আপনি, বাদী এবং আপনার অন্য পরিজনেরা কি রামমোহনের রচনাবলী ও ধর্মমতের জন্য তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই ?

আপনি কি বার বার বলেন নাই যে, আপনি রামমোহনের সর্বনাশ করিতে চান, এবং ইহাও কি আপনি বলেন নাই যে, ইহাতে পাপ হওয়া দূরে থাকুক, রামমোহন পূর্বপুরুষের আচার পুনরায় অবলম্বন না করিলে তাহার সর্বনাশ সাধন করিলে পুণ্যই হইবে ?

আপনি কি সর্বসমক্ষে বলেন নাই, যে হিন্দু প্রতিমাপূজা ত্যাগ করে, তাহার প্রাণ লইলেও পাপ নাই ?

হিন্দুধর্মের প্রতিমাপূজা-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি করিতে কি রামমোহন প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করেন নাই ?

বাদী, আপনি এবং বিবাদীর অন্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কি এই বিষয়ে পরামর্শ হয় নাই ?

ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিবাদী যদি আপনার ইচ্ছা ও অনুরোধ এবং পূর্বপুরুষের প্রথার বিরুদ্ধাচরণ না করিতেন, তাহা হইলে এই মকদ্দমা হইত না—এ কথা আপনার জ্ঞান-বিশ্বাস মতো শপথ করিয়া অস্বীকার করিতে পারেন কি ?

বিবাদী প্রতিমা-পূজা বজায় রাখিতে অস্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে সর্বস্বান্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য করা, এমন কি মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়াও কি আপনার বিবেক-বুদ্ধিতে অনুচিত নয় বলিয়া বিশ্বাস করেন না ?

এই মকদ্দমা আরম্ভ হইবার পর আপনি নিজে বিবাদীর কলিকাতাস্থ সিমলার বাড়িতে আসিয়া কি বিগ্রহের সেবার জন্য কিছু জমি চান নাই ?

বিবাদী কি উহার পরিবর্তে দরিদ্রের সাহায্যের জন্য অনেক টাকা দিতে চাহেন

নাই, এবং প্রতিমা-পূজার জন্য কোনরূপ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন নাই ?

তখন কি আপনি বিবাদীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করাতে বিবাদীর উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই ?

কেবল রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ নয়, তাঁর নিজের আত্মীয়-স্বজন, এমন কি তাঁর নিজের মা—পর্যন্ত তাঁর প্রতি কতোখানি বিরূপ হয়েছিলেন, এ থেকে সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। কিন্তু রামমোহন তাঁর বিশ্বাসে ছিলেন অটল। তিনি সকল প্রতিবোধ ও আক্রমণকে হেলায় উপেক্ষা ক'রে আপন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছিলেন। তাঁর সংগ্রামের ক্ষেত্র ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু সমাজের চিরকলঙ্ক সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হলেন।

৬

সতীদাহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

সতীদাহ হিন্দু সমাজে সুদীর্ঘকাল ধ'রে প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুসারে মৃত স্বামীর সঙ্গে জীবিতা স্ত্রীকে একই চিতায় সমারোহের সঙ্গে দাহ করা হ'তো। কোন কোন ক্ষেত্রে শোকাতুরা সদ্য-বিধবারা স্বেচ্ছায় স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হ'লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারের ও সমাজের চাপে স্ত্রীলোকরা স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হ'তো। তাদের চিতার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হ'তো, যাতে আগুনের ছোঁয়া লাগলে তারা চিতা থেকে উঠে পালাতে না পারে। রামমোহনের বৌদি জগমোহনের স্ত্রী আলোকমঞ্জরীর 'সতী" হওয়া সম্পর্কে ঐরকম একটি বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে। ভারতে সতীদাহ প্রথা সুপ্রাচীন কাল থেকে থাকলেও, তা কখনই সর্বব্যাপী ছিল না, বা তা সকল বিধবার ক্ষেত্রেই আবশ্যিক ছিল না। কোন কোন মুসলমান শাসক এই প্রথা নিরোধ করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন জানা যায়। তবে হিন্দুদের ধর্মে অকারণে হস্তক্ষেপের অনিচ্ছায় তাঁরা সতীদাহ কখনো নিষিদ্ধ করেন নি। ইংরেজরাও এই অমানুষিক প্রথায় শিউরে উঠলেও হিন্দু প্রজাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হবে, এই ভয়ে এই প্রথা নিরোধের জন্য কোনো আইন করেন নি। আমরা জানি, কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত জোব চার্নক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বামীর চিতায় দাহের জন্য আনীতা একটি বিধবা বালিকাকে উদ্ধার ক'রে তাকে পরে নিজের পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

ইংরেজ শাসনের সূচনাকালে ইংরেজরা ব্যক্তিগতভাবে সতীদাহ প্রথাকে অমানুষিক ও নৃশংস ভেবে ঘৃণা করলেও সরকার এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। কারণ, সতীদাহ প্রথা রোধ করলে হয়তো হিন্দু প্রজারা বিক্ষুব্ধ হবে, এই ছিল তাঁদের ভয়। ঐ সময়ে এদেশীয়দের ধর্মে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ না করবার নীতি সরকার কঠোরভাবে মেনে চলতেন। এজন্য কোম্পানি সরকার ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত তাঁদের অধিকৃত অঞ্চলে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। তাই গোড়ার দিকের ইংরেজ পাদরীদের বৃটিশ-শাসিত অঞ্চলের বাইরে বাংলা দেশে ডেনিশ-শাসিত অঞ্চলে শ্রীরামপুরে ঘাটি গাড়তে হয়েছিল। তবু অনেক সময় ইংরেজ রাজকর্মচারীরা এই বীভৎস প্রথার অনুমোদন করতে পারেন নি, এবং সরকারী কোনও আইন না থাকা সত্ত্বেও সতীদাহের বিরোধিতা করছিলেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহবাদের কালেক্টর এম. এচ. ব্রুক তাঁর এলাকায়

ব্যক্তিগত বিবেকবুদ্ধি অনুসারে সতীদাহের অনুমতি দেন নি এবং তাঁর এই কাজের জন্য তিনি তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসকে এ-বিষয়ে জানিয়ে তাঁর কাজের অনুমোদন চেয়েছিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিস তাঁর কাজের অনুমোদন করলেও সেই সঙ্গে তাঁকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন যে, বলপ্রয়োগে বা তাঁর পদাধিকার বলে তাঁকে সতীদাহ বন্ধ করবার কোন অধিকার সরকার দেওয়া সমীচীন মনে করছে না। কারণ, হিন্দুদের এই ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে পূর্ববর্তী শাসকরা কেউ নিষিদ্ধ করেন নি ; বর্তমান সরকার তা করতে গেলে সরকারের প্রতি তাদের অশ্রদ্ধা বাড়বে এবং সেক্ষেত্রে সতীদাহের সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের অন্য একজন জিলা ম্যাজিস্ট্রেট, জে. আর. এল্‌ফিন্‌স্টোন বারো বছরের একটি বালিকাকে সতীদাহের কবল থেকে রক্ষা করেন এবং সতীদাহের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটদের কর্তব্য কি তা জানতে চেয়ে তিনি তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লিকে একটি পত্র লেখেন। লর্ড ওয়েলস্‌লি এ ব্যাপারে নিজে কিছু নির্দেশ না দিয়ে এ সম্পর্কে সদর নিজামত আদালতের অভিমত জানতে চান। সদর নিজামত আদালত চার মাস পরে একজন পণ্ডিতের মতামতসহ সতীদাহের ক্ষেত্রে সরকারী পদস্থ কর্মচারীদের করণীয় কি হ'তে পারে, তা লিখে পাঠান। কিন্তু এ-বিষয়ে সরকার কিছুই করেন না।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের ম্যাজিস্ট্রেট এ-বিষয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সদর নিজামত আদালতকে নির্দেশ চেয়ে পাঠান। নিজামত আদালত পত্রটি তৎকালীন বড়লাট লর্ড ময়রার (পরবর্তী কালের মার্কুইস অব হেস্টিংস্) কাছে পাঠিয়ে দেন। আট মাস পরে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে সরকারী নির্দেশ দেওয়া হয়। তাতে বলা হয় যে, বিধবা অনিচ্ছুক হ'লে, ষোল বছরের চেয়ে কম বয়সের হ'লে, গর্ভবতী হ'লে, মাদকদ্রব্য সেবন করিয়ে বশীভূত করা হ'লে, সতীদাহ করবার আদেশ দেওয়া হবে না। পরে এই নির্দেশের সঙ্গে বিধবা শিশু-সন্তানের জননী হ'লেও সতীদাহ অনুমোদন না করবার নির্দেশ সংযোজিত করা হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সতীদাহের নিয়মিত তালিকাও রাখা হ'তে থাকে। তাতে "সতী"র নাম, বয়স, বর্ণ প্রভৃতি সব-কিছুরই উল্লেখ থাকে।

১৮১৫ থেকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে তালিকা রাখা হয়, তাতে দেখা যায়, ১৮১৫, ১৮১৬, ১৮১৭ ও ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে সতীদাহের সংখ্যা কলকাতা বিভাগে (বর্ধমান, কটক ও বালেশ্বর, হুগলি, যশোর, জঙ্গল মহাল, মেদিনীপুর, নদীয়া, কলকাতার উপকণ্ঠ ও চব্বিশ পরগনায়) ২৫৩, ২৮৯, ৪৪২ ও ৫৪৪ ; ঢাকা বিভাগে (বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ঢাকা শহর, ফরিদপুর, ময়মনসিং, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা) ৩১, ২৪, ৫২, ৫৮ ; মুর্শিদাবাদ বিভাগে

(বীরভূম, ভাগলপুর, মুঙ্গের, দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ শহর, পূর্ণিয়া, রাজসাহী, রংপুর) ১১, ২১, ৪২, ৩০ ; পাটনা বিভাগে (বিহার, পাটনা শহর, রায়গড়, শরণ, শাহবাদ ও তিরহুত) ২০, ২৯, ৪৯, ৫৭ ; বারাণসী বিভাগে (এলাহাবাদ, ফতেপুর, বুন্দেলখণ্ড, কলপি, কাশী শহর, গোরখপুর, আজিমগড়, জৌনপুর, গাজীপুর, মির্জাপুর) ৪৮, ৬৫, ১০৩, ১৩৭ ; এবং বেরিলি বিভাগে (আগ্রা, আলিগড়, বেরিলি জেলা, কানপুর, এটাওয়া, ফরাক্কাবাদ, মোরাদাবাদ, শাহরণপুর) ১৫, ১৩, ১৯, ১৩।

এই তালিকা থেকে দুটি ব্যাপার খুবই লক্ষণীয় : এক, সতীদাহের সংখ্যা কলকাতা বিভাগেই সর্বাধিক এবং কলকাতা বিভাগের মধ্যে হুগলী ও বর্ধমান জেলাতেই সর্বাধিক ; হুগলী জেলায় ৭২, ৫১, ১১২ ও ১৪১ এবং বর্ধমান জেলায় ৫০, ৬৭, ৯৮ ও ১৩২। সুতরাং সতীদাহের সমস্যা সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে রামমোহনের নিজস্ব অঞ্চলেই যে সবচেয়ে ভয়াবহ হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা বলা চলে এবং রামমোহনকে যে তা বিশেষভাবে পীড়িত করবে, তা খুবই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়—সতীদাহের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছিল ; ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে মোট সতীদাহের সংখ্যা ছিল ৩৭৮, তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল ৮৩৯, অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি।

সতীদাহের এই দ্রুত ও অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সরকারকে খুবই চিন্তিত ক'রে তুলেছিল। এর কারণ অনুসন্ধানের জন্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ দেওয়া হয়। হুগলী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ওকেলি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর কর্তৃপক্ষকে লিখে জানান, তিনি বহু অনুসন্ধান ও চিন্তা-ভাবনার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, তাঁর জেলাতেই সতীদাহ সর্বাধিক ; কারণ, হুগলী জেলা কলকাতার নিকটে অবস্থিত এবং কলকাতা ও কলকাতার সন্নিহিত অঞ্চলের দেশীয় অধিবাসীরা ব্যভিচারে, দুশ্চরিত্রতায় ও দুর্নীতিপরায়ণতায় অন্য সকল স্থানকে ছাড়িয়ে যায় ("It is notorious that the natives of Calcutta and its vicinity exceed all others in profligacy and immorality of conduct") এবং কালীর উপাসক কলকাতায় সর্বাধিক। তিনি কালীকে বলেন "মাতাল ও চোরের দেবী" (the idol of the drunkard and thief")।

কিন্তু মিঃ ওকেলির উক্তিগুলি যুক্তিসহ নয়। কলকাতা শহরে সতীদাহ নিষিদ্ধ ছিল। তাই কলকাতার পার্শ্ববর্তী জেলায় সতীদাহের সংখ্যা বেশি হওয়া অযৌক্তিক নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, কলকাতার সংলগ্ন চব্বিশ পরগনা ও যশোর জেলায় সতীদাহের সংখ্যা স্বল্প, এমন কি কলকাতার শহরতলীতেও হুগলী, বর্ধমান, এমন কি নদীয়ার তুলনাতেও অল্প। সতীদাহের সঙ্গে কালীপূজার কোন সম্পর্ক থাকলে চব্বিশ পরগনা জেলায়, যা কালীঘাটের পাশেই, সতীদাহের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হ'তো। কিন্তু চব্বিশ পরগনায় সতীদাহের সংখ্যা নগণ্য। তাছাড়া, কালী-উপাসকরা অহিংসায়

বিশ্বাসী না হ'লেও, বলিদানে অভ্যস্ত হ'লেও, সতীদাহে উৎসাহী ছিল বলা যায় না। শাক্তরা দেবীর উপাসক হওয়ায় নারীকে তারা দেবীর অংশরূপে কল্পনা করতেই অভ্যস্ত। অন্যপক্ষে, রামমোহনের বংশ বৈষ্ণব হ'লেও, যদি জগমোহনের স্ত্রীর সহমরণের ঘটনা সত্য হয়, তাঁরা সতীদাহের বিরোধী ছিলেন না। তবে হঠাৎ সতীদাহের সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি যে যুক্তি দিয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহে গ্রহণীয়। তিনি বলেন :

> ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সতীদাহের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোন অধিকার পুলিসকে দেওয়া হয় নি, তখন বৈধ বা অবৈধ ভাবে সতীদাহ করা হ'তো। কিন্তু হিন্দুরা এ-বিষযে সচেতন ছিল যে, সবকার এই প্রথাকে অত্যন্ত বীভৎস মনে করেন এবং এই প্রথা প্রত্যক্ষভাবে রদ না করলেও এর হ্রাস চান, প্রয়োজন হ'লে এই প্রথা রদও কবতে পারেন। কিন্তু এখন অবস্থাব পবিবর্তন হয়েছে। সতীদাহ শাস্ত্রানুযায়ী হচ্ছে কিনা, তা দেখার জন্য সরকার পুলিস কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ কবতে নির্দেশ দিয়েছে, অর্থাৎ সতীদাহ সম্পন্ন করতে দিযেছেন। এতে সতীদাহে সরকাবেব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, যখন শাস্ত্রেব অনুশাসনের সঙ্গে সবকাবের অনুমোদন সংযুক্ত হযেছে, তখন সতীদাহের সংখ্যা যে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

তিনি সেই সঙ্গে সতীদাহের কারণ সম্পর্কে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিও উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, সতীদাহ নিরোধ সম্পর্কে উত্তরাধিকারীরা যারা সতীদাহের ফলে বৈষয়িক দিক থেকে লাভবান হয়, ব্রাহ্মণরা যারা এই প্রথা থেকে আংশিকভাবে জীবিকা অর্জন কবে, এবং দুর্নীতিপরায়ণ বিবেকবুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা যারা এই বীভৎস বলিদানেব মধ্যে আনন্দ-উত্তেজনা লাভ করে, তারাই সতীদাহ নিরোধেব বিরোধিতা করবে। সুতরাং সতীদাহ সম্পর্কে সরকারের অনুমোদন অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত।

অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটরা-ও প্রায় অনুরূপ মন্তব্যই করেন। ফলে, শেষ পযন্ত বড়লাট সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে অনুমোদন প্রত্যাহার না করলেও এ-বিষয়ে আর বিধিনিষেধ জারী করা বন্ধ রাখেন।

সতীদাহ সম্পর্কে সরকারের মনোভাব প্রতিকূল হ'লেও সরকার সতীদাহ বন্ধ করতে চান নি এই কারণে যে, এতে এদেশীয়দের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হবে। সতীদাহ সত্যই হিন্দু ধর্মানুযায়ী কিনা তা জানবার জন্যও সরকার সচেষ্ট হন। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি সহমরণ সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্রে অনুসন্ধান ক'রে জানবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ভাষার ভূতপূর্ব প্রধান পণ্ডিত ও তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের জজ-পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে অনুরোধ করেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বেদান্ত-বিষয়ে আলোচনায় রামমোহনের মতামতের বিরোধিতা করলেও সহমরণের ক্ষেত্রে ছিলেন তাঁর পূর্বসূরী। মৃত্যুঞ্জয় হিন্দু শাস্ত্র মন্থন ক'রে সতীদাহ সম্পর্কে সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অভিমত দেন। তাতে তিনি বলেন, মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হওয়া আবশ্যিক নয়, ইচ্ছাধীনমাত্র। শাস্ত্রে অনুগমন ও ধর্মজীবনযাপন, দুটিরই বিধান আছে এবং বলা হয়েছে, অনুগমনের চেয়ে ধর্মজীবনযাপন শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা হয় না বা অনুগমনের সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হয়, তার কোনও দোষ হয় না। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এই অভিমত দেন এবং ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" মাসিক পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় মৃত্যুঞ্জয়ের এই অভিমতের সারাংশ ইংরেজীতে মুদ্রিত হয়।

ইতিমধ্যে এদেশীয়দের দুটি আবেদন বড়লাটের কাছে পাঠানো হয়। সম্ভবতঃ সতীদাহ সম্পর্কে সরকার যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন, তা প্রত্যাহার ক'রে সতীদাহের অবাধ সুযোগ দাবি ক'রেই একটি আবেদন দেওয়া হয়েছিল। তারই প্রতিবাদে সতীদাহের বিরোধীরা অপর একটি আবেদন বড়লাটের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা ক'রে প্রেরিত আবেদনপত্রটি পরে এশিয়াটিক জার্নালের ১ জুলাই, ১৮১৯, সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ আবেদনপত্রটি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বড়লাটের কাছে প্রেরিত হয়েছিল এবং তাতে কলকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সই ছিল। ঐ আবেদনপত্রে আবেদনকারীরা বলেছিলেন:

> ...Cases have frequently occurred when women have been induced by the persuasions of their next heirs, interested in their destruction, to burn themselves on the funeral piles of their husbands; that others who have been induced by fear to retract a resolution rashly expressed in the first moments of grief, of burning with their deceased husbands, have been forced upon the pile and there bound down with ropes, and pressed with green bamboos until consumed with the flames; that some after flying from the flame, have been carried back by their relations and burnt to death. All these instances, your petitioners humbly submit, are murders according to every Sastra, as well as to the common sense of all nations.

বিধবাটির মৃত্যুতে যেসব নিকটতম আত্মীয়ের লাভ, তারাই স্বার্থের বশবর্তী হয়ে সদ্য-বিধবাকে নানাভাবে স্বামীর চিতায় আরোহণ ক'রে নিজেদের দগ্ধ করতে প্ররোচিত করে, অনেক সময় স্ত্রীলোকরা স্বামীর মৃত্যুতে শোকাতুরা হ'য়ে ঝোঁকের মাথায় সহমৃতা হওয়ার কথা ব'লে ফেলে, তখন তাদের আত্মীয়রা তাদের সহমৃতা হ'তে

বাধ্য করে; তাদের স্বামীর চিতার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয় এবং তারা জলন্ত চিতায় দগ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বাঁশ দিয়ে সজোরে চিতার ওপর চেপে রাখে; তারা কোন প্রকারে চিতা থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হ'লে তাদের আত্মীয়রা তাদের ধ'রে এনে জোর ক'রে চিতায় তুলে দেয় এবং দাহ করে। এ ব্যাপার যে সকল শাস্ত্র এবং সকল জাতির লোকের সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে হত্যা মাত্র, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আবেদনকারীরা এই কথা বলিষ্ঠভাবেই প্রকাশ করেন। সরকার যাতে এই নৃশংস প্রথার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন, আবেদনকারীরা সেজন্যে প্রার্থনা জানান।

এই আবেদনে সতীদাহ প্রথাকে সরাসরি আইন ক'রে নিষিদ্ধ করবার কথা বলা হয় নি বটে, তবে সতীদাহ যাতে প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে, এমনসব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। হিন্দু ধর্মে সতীদাহের অনুমোদন আছে, তবে তা ইচ্ছাধীন ব্যাপার মাত্র—বিধবা ইচ্ছা করলে স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিতে পারে। হিন্দু ধর্মে এ-ও বলা হয়েছে, বিধবা স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় আরোহণ করবে, তাকে বলপ্রয়োগের দ্বারা, চিতার সঙ্গে বেঁধে বা অন্যভাবে বলপ্রয়োগ ক'রে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাহ করা চলবে না। সতীদাহের সংখ্যাবৃদ্ধির একমাত্র কারণ, সদ্য-বিধবাদের শোকাতুর মনের দুর্বলতার সুযোগে তাদের কাছ থেকে সহমৃতা হওয়ার স্বীকৃতি আদায় করা এবং সেই স্বীকৃতি পরে প্রত্যাহার করতে না দেওয়া। স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছায় বিধবাদের স্বামীর সহমৃতা হ'তে সুযোগ দিলে সতীদাহের সংখ্যা অত্যল্প হবে, তা শাস্ত্রানুযায়ীই হবে, এবং সরকারকে এদেশীয়দের ধর্মে হস্তক্ষেপ না করবার নীতি ত্যাগ করতে হবে না।

সতীদাহ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় যখন সরকার এবং অন্যান্য চিন্তাশীল ও হৃদয়বান্ ব্যক্তিরা চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন, তার বহু পূর্ব থেকেই রামমোহন এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়েছিলেন, যদিও তখনও তিনি এ ব্যাপারে লেখনী ধারণ করেন নি। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন জগমোহনের স্ত্রী সহমৃতা হয়েছিলেন বলা হয়, তখন থেকেই রামমোহন সতী-দাহের অমানুষিকতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন ব'লে অনেকেই মনে করেন। কিন্তু রামমোহনের মতো কোনও ব্যক্তিকে পারিবারিক কোন ঘটনা সমাজের এইরূপ বীভৎস একটি প্রথা সম্পর্কে সচেতন ও বিদ্রোহী ক'রে তুলেছিল, তা ভাবা অর্থহীন। রামমোহন নিশ্চয় এ-বিষয়ে তার বহু পূর্ব থেকেই সচেতন ছিলেন এবং এ-বিষয়ে লেখনী ধারণ না করলেও এর বিরুদ্ধে আলোচনা, প্রচার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সক্রিয় ছিলেন। কথিত আছে, তিনি সতীদাহ থেকে বিধবা ও তার আত্মীয়-স্বজন ও ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের বিরত করতে শ্মশানে শ্মশানে ঘুরতেন। তিনি সতীদাহ যাতে শাস্ত্রানুযায়ী হয়, অর্থাৎ বিধবা যাতে স্বেচ্ছায় স্বামীর জলন্ত চিতায় প্রবেশ করে, সেজন্য শ্মশানে শ্মশানে ফিরে পুরোহিতদের আগে চিতায় অগ্নিসংযোগের ব্যবস্থা ক'রে পরে বিধবাদের

তাতে প্রবেশ করতে দিতে অনুরোধ করতেন। কিন্তু পুরোহিত ও আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর যুক্তি-তর্কে ও অনুনয়-বিনয়ে, সৎ পরামর্শে কর্ণপাত করতেন না, তাঁকে নানাভাবে অপমান ও ভর্ৎসনা প্রভৃতি করতেন। কথিত আছে, মাত্র একটি ক্ষেত্রে দুজন বিধবা নাকি শাস্ত্রানুযায়ী স্বামীর জলন্ত চিতায় পর পর স্বেচ্ছায় প্রবেশ করেছিলেন। কনিষ্ঠা পত্নী নাকি দর্শকদের উদ্দেশে একটি তেজোদীপ্ত ক্ষুদ্র ভাষণও দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আপনারা সকলে দেখলেন, আমার স্বামীর প্রথমা পত্নী তাঁর কর্তব্য পালন করলেন এবং এখন দেখুন, আমিও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবো। আমার প্রার্থনা, এখন থেকে আপনারা হিন্দু স্ত্রীলোকদের সহমৃতা হওয়া থেকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করবেন না। যদি তা করেন, তবে আপনাদের উপর আমাদের অভিশাপ রইলো।"

এই ধরনের ঘটনা নিতান্তই বিরল। এবং বিধবার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মৃত্যুবরণ শাস্ত্র-সঙ্গত হওয়ায় রামমোহনের এতে আপত্তি থাকার কথা ছিল না, যদিও তিনি জানতেন ধর্মীয় জীবনযাপনই হিন্দু বিধবাদের সর্বোৎকৃষ্ট পথ। কারণ, শাস্ত্রে বলা হয়েছে, সহমরণের দ্বারা পরলোকে কোটি কোটি বছর স্বামী-সহবাস করা যায়, অন্যপক্ষে ধর্মীয় জীবনযাপনের দ্বারা হিন্দু বিধবা স্বামীর সঙ্গে মিলনের পরিবর্তে পরমাত্মার সঙ্গে মিলন লাভ করেন।

যাই হ'ক, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহের অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি দেখে যখন সরকার ও বিবেকবান্ ব্যক্তিমাত্রেই চিন্তিত, তখন রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ধারণ করলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে (নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে) রামমোহনের "সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ" নামে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হ'লো। এতে রামমোহন সতীদাহের সমর্থক ও বিরোধী দুই সৎ হিন্দুর সংলাপের মধ্য দিয়ে সতী-দাহের সমর্থনে প্রদত্ত যুক্তিসমূহকে খণ্ডন ক'রে দেখিয়েছেন। ঐ সঙ্গে এই পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদও (Translation of a Conference between an Advocate for and an Opponent of, the practice of burning widows alive) প্রকাশিত হ'লো। পুস্তিকা দুখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মৌচাকে ঢিল পড়লো।

পুস্তিকাটির শুরু হয়েছে এইভাবে :

প্রথমে প্রবর্তকের প্রশ্ন।—আমি আশ্চর্য জ্ঞান করি যে তোমরাও অনুমরণ যাহা এদেশে হইয়া আসিতেছে তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস করিতেছ।

নিবর্তকের উত্তর।—সর্বশাস্ত্রেতে এবং সর্বজাতিতে নিষিদ্ধ যে আত্মঘাত তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস পাইলে তাঁহারাই আশ্চর্য বোধ করিতে পারেন যাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই এবং যাঁহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়া থাকেন।

তারপর প্রবর্তক (সমর্থক) অঙ্গিরা, হারীত প্রভৃতির বচন উদ্ধৃত ক'রে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, স্ত্রী যদি স্বামীর সহমৃতা হয়, তবে সে স্বামীর সঙ্গে সাড়ে তিন কোটি বছর স্বর্গে বাস করে। স্বামী যদি অতিশয় পাপাত্মা হয়, স্ত্রীর ঐ পুণ্য তাকেও স্বর্গলাভের যোগ্য করে। তার উত্তরে নিবর্তক (বিরোধী) মনুস্মৃতি, উপনিষদ্, বেদ প্রভৃতি উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছেন যে, মনুস্মৃতির বিবোধী কোনও স্মৃতির মত যে গ্রহণীয় নয়, তা সর্বজনস্বীকৃত। মনু বলেছেন, "পতির মৃত্যু হইলে পবিত্র যে পুষ্প মূল ফল তাহার ভোজনের দ্বারা শরীরকে কৃশ করিবেন এবং অন্য পুরুষের নামও করিবেন না। আর আহারাদি বিষয়ে নিয়মযুক্ত হইয়া এক পতি যাহাদের অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রী তাঁহাদের যে ধর্ম তাহার আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচযের অনুষ্ঠানপূর্বক থাকিবেন। ইহাতে মনু এই বিধি দিয়াছেন যে, পতি মরিলে ব্রহ্মচযে থাকিয়া যাবজ্জীবন কালক্ষেপ করিবেন অতএব মনুস্মৃতির বিপরীত যে সকল অঙ্গিরা প্রভৃতির স্মৃতি তুমি পড়িতেছ তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতু বেদে কহিতেছেন॥ যৎকিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং॥ যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য জানিবে। যেহেতু জীবন থাকিলে নিত্য নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারে অতএব স্বর্গকামনা করিয়া পরমায়ুসত্ত্বে আয়ুর্ব্যয় করিবেক না অর্থাৎ মরিবেক না।…" এইভাবে প্রবর্তক ও নিবর্তকের মধ্যে নানা যুক্তি-তর্ক ও শাস্ত্র-বচনের উদ্ধৃতি ও উত্থাপনের দ্বারা রামমোহন এই পুস্তিকায় প্রমাণ করেন যে, সহমরণের দ্বারা স্বর্গে স্বামী-সহবাসের দ্বারা সুখভোগের কামনার চেয়ে ব্রহ্মচয পালনের দ্বারা ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই অধিক শ্রেয়। তাছাড়া, প্রবর্তক যে সকল স্মৃতিবচন উদ্ধৃত ক'রে সহমরণের সমর্থন করেছিলেন, নিবর্তক সেগুলির খণ্ডন ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি বললেন, "ঐ সকল বচনেতে এবং ঐ বচনানুসারে রচিত সংকল্পবাক্যেতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে পতির জলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্বক আরোহণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেক কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে, তাহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখ। এ সকল বন্ধনাদি কর্ম কোন্ হারীতাদি বচনে আছে যে তদনুসারে করিয়া থাকহ অতএব এ কেবল জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীহত্যা হয়।"

নিবর্তকের এই উক্তির জবাবে প্রবর্তক বললেন যে, "যদ্যপি এরূপ বন্ধনাদি করা শাস্ত্রপ্রাপ্ত নহে তথাপি তাবৎ হিন্দুর দেশে এইরূপ পরম্পরা হইয়া আসিতেছে এ প্রযুক্ত আমরা করি।" নিবর্তক প্রতিবাদে বললেন, তাবৎ হিন্দুর দেশে নয়, তাবৎ হিন্দুর দেশের অল্প অংশ এই বাংলা দেশেই কিছুকাল যাবৎ এরূপ করা হচ্ছে; আর দীর্ঘকাল ধ'রে ক'রে আসা হচ্ছে ব'লেই যে তা নিন্দনীয় নয়, এমন হ'তে পারে না। স্ত্রীবধ মনুষ্যবধ

চৌর্যাদি দীর্ঘকাল ধ'রে হয়ে আসছে ব'লে তা যেমন নির্দোষ হ'তে পারে না, সেইভাবে স্বামীর চিতায় বন্ধন ক'রে স্ত্রীবধও নির্দোষ হ'তে পারে না।

তখন প্রবর্তক আর এক যুক্তির অবতারণা করলেন। তিনি বললেন, সহমরণ পাপ হ'ক বা না হ'ক, আমরা তা বন্ধ হ'তে দেব না। কারণ, বিধবারা সহমৃতা না হয়ে জীবিতা থাকলে তারা ব্যভিচারিণী হবে। তার উত্তরে নিবর্তক বললেন, স্বামী বিদেশে থাকলেও স্ত্রী ব্যভিচারিণী হ'তে পারে। সে সম্ভাবনা দূর করবার কি ব্যবস্থা প্রবর্তকরা করেছেন?

তখন প্রবর্তক অন্য অভিযোগ তুললেন, তিনি বললেন, তাঁরা সহমরণের সমর্থন করেন ব'লে তাঁদের নির্দয় বলা হয়, এ কেমন কথা? অথচ তাঁরা অতিথিসেবা প্রভৃতির দ্বারা সর্বদাই প্রমাণ করেন যে, তাঁরা অতিশয় দয়ালু ও হৃদয়বান্। তখন নিবর্তক বললেন: "অন্য অন্য বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে কিন্তু বালককাল অবধি আপন আপন প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য অন্য গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীদাহ পুনঃ দেখিবাতে এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে এই নিমিত্ত কি স্ত্রীর কি পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না। যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগ-মহিষাদি হনন পুনঃ পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগমহিষাদির বধকালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না কিন্তু বৈষ্ণবদের অত্যন্ত দয়া হয়।"

শেষ পর্যন্ত প্রবর্তক হার মানেন এবং বলেন: "তুমি যাহা যাহা কহিলে তাহা আমি বিশেষ মতে বিবেচনা করিব।"

রামমোহন সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজবোধ্য করবার জন্য এই সংলাপের আকারে নিবন্ধটি রচনা করেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সতীদাহের বিরোধী যে পুস্তিকা রচনা করেছিলেন, তা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হওয়ায় জনসাধারণের কাছে বোধগম্য ছিল না। রামমোহন বাংলা ভাষায় সংলাপের আকারে পুস্তিকাটি রচনা ক'রে সতীদাহের শাস্ত্রীয়তা ও অশাস্ত্রীয়তা সম্পর্কে বাঙ্গালী জনসাধারণকে যেমন সজাগ করলেন, তেমনি ঐ পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদটিও ইংরেজ সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের এবং অবাঙ্গালী হিন্দুদের সতীদাহের অযৌক্তিকতা সম্পর্কে সচেতন ক'রে তুললো। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে নি, আক্রমণও তীব্র হয় নি। কিন্তু রামমোহনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ ও আক্রমণ প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো।

কয়েক মাসের মধ্যেই, ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি, রামমোহনের 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ-এর' উত্তরে সতীদাহের সমর্থকদের পক্ষে থেকে "বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হ'লো। পুস্তিকাখানি রামমোহনের

অনুকরণে সংলাপের ভঙ্গিতে রচিত। রচয়িতা কাশীনাথ তর্কবাগীশ। পুস্তিকাটি তাঁর পৃষ্ঠপোষক কালাচাঁদ বসুর আদেশে লিখিত ব'লে পুস্তিকার মলাটে লিখিত ছিল। কলকাতার ঘোষালবাগানে কাশীনাথ তর্কবাগীশের চতুষ্পাঠী ছিল। কালাচাঁদ বসুর পিতা গুরুপ্রসাদ বসু ঐ চতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার বহুলাংশে বহন করতেন। সুতরাং কালাচাঁদ বসুর আদেশে এই পুস্তিকার রচনা স্বাভাবিক। ঐ পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে রামমোহন তাঁর 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' পুস্তিকাটি রচনা ও প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকা প্রথম পুস্তিকার বর্ষকাল পরে (১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে) রচিত ও প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকারও তিনি ইংরেজী অনুবাদ (Second Conference) সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করেন এবং পুস্তিকাটি বড়লাট-পত্নীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয়।

রামমোহন তার দ্বিতীয় সম্বাদে বিরোধী পক্ষের উক্তি ও যুক্তিগুলি একে একে খণ্ডন ক'রে দেখান। কেবল তাই নয়, ঐ পুস্তিকার শেষ অংশে তিনি প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংলাপের মধ্য দিয়ে যেসব দুর্লভ যুক্তির অবতারণা করেন, তাতে নারীজাতির প্রতি তার কেবল মানবিক অনুকম্পা নয়, নারীজাতির প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধাও ফুটে উঠেছে। বিধবাদের নৃশংস মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করাই নয়, ভারতের নারীজাতিকে তার আপন মহিমায় ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করাই যে রামমোহনের লক্ষ্য ছিল, এই যুক্তি-গুলি থেকে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। রামমোহনের বাংলা গদ্য আধুনিক কালের পাঠকের কাছে কিছুটা দুর্বোধ লাগলেও এই পুস্তিকার শেষাংশ উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করা কঠিন। ঐ অংশটি এইরূপ :

> প্রবর্তক।—স্ত্রীলোককে স্বামীর সহিত মরণে প্রবৃত্তি দিবার যথার্থ কারণ এবং এরূপ বন্ধন করিয়া দাহ করিবাতে আগ্রহের কারণ ১৮ পৃষ্ঠার ১৮ পঙ্ক্তিতে প্রায় লিখিয়াছি, যে স্ত্রীলোকের স্বভাব অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা এবং ধর্মজ্ঞানশূন্যা হয়। স্বামীর পরলোক হইলে পর, শাস্ত্রানুসারে বিধবার পুনরায় বিবাহ হইতে পারে না, একবারে সমুদায় সাংসারিক সুখ হইতে নিরাশ হয়, অতএব এ প্রকার দুর্ভাগা যে বিধবা তাহার জীবন অপেক্ষা মরণ শ্রেষ্ঠ। যেহেতুক শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠানপূর্বক শুদ্ধভাবে কালযাপন করা অত্যন্ত দুর্ঘট, সুতরাং সহমরণ না করিলে নানা দোষের সম্ভাবনা, যাহাতে কুলত্রয়ের কলঙ্ক জন্মে, এই নিমিত্ত বাল্যকাল অবধি স্ত্রীলোককে সর্বদা উপদেশ দেওয়া যায় যে, সহমরণ করিলে স্বামীর সহিত স্বর্গভোগ হয়, এবং তিন কুলের উদ্ধার হয়, ও লোকত মহাযশ আছে, যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া স্বামী মরিলে অনেকেই সহমরণ করিতে অভিপ্রায় করে, কিন্তু অগ্নির উত্তাপে চিতাভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত বন্ধনাদি করিয়া দাহ করা যায়।

নিবর্ত্তক।—এই যে কারণ কহিলা তাহা যথার্থ বটে, এবং আমারদিগের সুন্দররূপে বিদিত আছে, কিন্তু স্ত্রীলোককে যে পর্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে বধ পর্যন্ত করা লোকত ধর্ম্মত বিরুদ্ধ হয়, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি এইরূপ নানাবিধ দোষোল্লেখ সর্বদা করিয়া তাহারদিগ্যে সকলের নিকট অত্যন্ত হেয় এবং দুঃখদায়ক জানাইয়া থাকেন, যাহার দ্বারা তাহারা নিরন্তর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, এ নিমিত্ত এবিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহারদিগকে আপনা হইতে দুর্বল জানিয়া যে যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবত যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহারদিগকে পূর্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন। পরে কহেন, যে স্বভাবত তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে, কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারদিগকে যে যে দোষ আপনি দিলেন, তাহার সত্যকে মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক।

প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসে তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়, আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাতা আছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণপূর্বক কৃতার্থ হয়েন।

দ্বিতীয়ত তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহারদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য নাই।

তৃতীয়ত বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক, তবে পুরুষেরা প্রায় লেখা পড়াতে পারগ এবং নানা কাজকর্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্বত্র বিখ্যাত

অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না। স্ত্রীলোকের এই এক দোষ আমরা স্বীকার করি, যে আপনারদের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহার দ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায়, এ পর্যন্ত যে কেহ কেহ প্রতারিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়।

চতুর্থ যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক এক পুরুষের প্রায় দুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি যে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতিকষ্ট যে ব্রহ্মচর্য তাহার অনুষ্ঠান করে।

পঞ্চম তাহারদের ধর্মভয় অল্প, এ অতি অধর্মের কথা, দেখ কি পর্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাঁহারা দশ পনের বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে অনেকেই ধর্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামীর দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতাপূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম নির্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন, যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে। অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম করিয়া থাকে; এবং সূপকারের কর্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণাদি আপন আপন নিয়মিত কালে করে, যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহাদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; ঐ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী শাশুড়ি দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন; এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষপূর্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে; আর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ যাঁহারদের ধনবত্তা নাই, তাঁহারদের স্ত্রীলোক সকল গো সেবাদি কর্ম করেন এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী লইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা

যাহা ভৃত্যের কর্ম তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্বপ্রকার জ্ঞাতসারে ও দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাস মধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্মভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয়, যে এক স্ত্রীর পক্ষ লইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্বদা তাড়ন করে, এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদেব প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহাদিগকে করে, অনেকেই ধর্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপি কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই সেই পতিহস্তে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই, যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।

রামমোহন তৎকালীন সমাজে ভারতীয় নারীর যে দুঃখময় অবস্থাব নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন এবং স্ত্রীজাতির প্রতি যে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন, তা তৎকালীন অন্য কোনও মনীষীর রচনায় দেখা যায় না। তিনিই সম্ভবতঃ ভারতের কেন, সমগ্র এশিয়াব প্রথম Feminist বা নারীপ্রেমিক ছিলেন। নারীর প্রতি সকল হৃদয়হীন অবিচার অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে তাকে পুরুষের উপযুক্ত সহধর্মিণী ও সহকর্মিণী ক'রে তুলবার স্বপ্ন এদেশে তিনিই দেখেছিলেন। নারীর জীবন ও স্বাধিকারের আদর্শ তিনি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্যেই পেয়েছিলেন। পরবর্তী কালে নারীর অধিকাব-সমূহ কিভাবে হরণ করা হয়েছে, তিনি তার The Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females'-এ সুন্দরভাবে দেখিয়েছিলেন। সে সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো।

সতীদাহ নিরোধকে রামমোহনের অন্যতম প্রধান কীর্তি বলা হয়। তার প্রধান কারণ, রামমোহনই সর্বপ্রথম এর শাস্ত্রীয় দিক্ এবং এর লৌকিক অশাস্ত্রীয় দিক সম্পর্কে

বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় অসামান্য পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিদৃপ্ত যুক্তির মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন ক'রে তোলেন। তাব এই নিবন্ধ দুটি আকারে ক্ষুদ্র হ'লেও তৎকালীন হিন্দু সমাজে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তার তুলনা নেই। তাঁর নিবন্ধগুলিই ইংবেজ সরকারকে সতীদাহ নিরোধেব পক্ষে শক্তিশালী হাতিয়ার জুগিয়েছিল। সরকার শেষ পর্যন্ত নিঃসন্দেহ হ'তে পেরেছিল যে, সতীদাহ নিরোধ করলে হিন্দুর ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ কবা হবে না, কেবল একটি নৃশংস স্বার্থপুষ্ট জঘন্য প্রথা বিলুপ্ত করা হবে। তাই সতীদাহ নিরোধের উপযুক্ত ক্ষেত্র রামমোহনই রচনা করেছিলেন বলা একান্তই যুক্তিসঙ্গত হবে।

সতীদাহ বিষয়ে রামমোহন যখন তাঁব গভীব শাস্ত্রজ্ঞান ও বিশাল মননশীলতাকে অপূর্বভাবে নিয়োগ করেছিলেন, তখনও কিন্তু তাঁকে অন্য সীমান্তে সমানভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁর "গোস্বামীর সহিত বিচার" পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। রামমোহন এঁকে "ভগবদ্‌গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামিজী" বলেছেন। ইনি প্রকৃতপক্ষে কে ছিলেন, তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। গোস্বামীজী সাকারের উপাসনাব সমর্থনে ও রামমোহনের মতবাদেব বিরুদ্ধে একটি হস্তলিখিত নিবন্ধ পাঠিয়েছিলেন; রামমোহন এই পুস্তিকায গোস্বামীজীব উত্থাপিত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দেন। রামমোহন তাঁব পুস্তিকাব প্রারম্ভে বলেছেন: "অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্ব্বব্যাপি যে পবব্রহ্ম তাহার তত্ত্ব হইতে লোক সকলকে বিমুখ করিবাব নিমিত্তে ও পরিমিত এবং মুখ নাসিকাদি আকাব বিশিষ্টেব ভজনে প্রবর্ত্ত করাইবার জন্যে ভগবদ্‌-গৌরাঙ্গপরাযণ গোস্বামিজী পবিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর প্রত্যেকে দেওযা যাইতেছে বিজ্ঞ সকলে বিবেচনা কবিবেন।" এই গোস্বামীজী কে ছিলেন, তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'র তৃতীয় বার্ষিক বিবরণেব (১৮১৯-২০) পরিশিষ্টে মুদ্রিত পুস্তক-তালিকায় রামমোহনের একখানি পুস্তিকাব এইরূপ উল্লেখ আছে—Reply to M/s of Ramgopal Sormono. তাই মনে হয়, রামগোপাল শর্মা নামে কোনো গোস্বামী ঐ স্বহস্তলিখিত পুস্তিকাখানি পাঠিয়েছিলেন এবং রামমোহন তারই উত্তরে তাঁব "গোস্বামীর সঙ্গে বিচাব" রচনা করেছিলেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের "কবিতাকারের সহিত বিচার" প্রকাশিত হয়। রামমোহন বেদান্তের অপব্যাখ্যা করেছেন এই অভিযোগ ক'রে এবং রামমোহনকে নানাভাবে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার ক'রে "কবিতাকাব" এই বেনামীতে "প্রত্যুত্তর" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাকারেব ঐ "প্রত্যুত্তর" পুস্তিকাখানি পাওয়া যায় নি। রামমোহন "কবিতাকারের সহিত বিচারে" ঐ "প্রত্যুত্তরের" প্রত্যুত্তর দিয়েছেন।

এই "কবিতাকার" কে, তা এখনও নির্ধারিত হয় নি। তবে সম্ভবতঃ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "বেদান্তচন্দ্রিকা"র উত্তরে রামমোহন যে "ভট্টাচার্যের সহিত বিচার" লেখেন, এ তারই "প্রত্যুত্তর" ছিল। সম্ভবতঃ এই "প্রত্যুত্তর" মৃত্যুঞ্জয় বা তাঁর চতুষ্পাঠীর কেউ লিখেছিলেন। রামমোহন "কবিতাকারের সহিত বিচারের" ভূমিকায় লিখেছিলেন, "ঐ সকল মূল উপনিষদ্ ও আচার্যের ভাষ্য এবং বেদান্ত দর্শন ও তাহার ভাষ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্যের বাটীতে এবং কালেজে ও অন্য অন্য পণ্ডিতের নিকট এই দেশেই আছে।" দেশে এত পণ্ডিত থাকতে রামমোহন কেন বিদ্যালঙ্কারের নাম করেছিলেন? এ থেকে মনে হয়, রামমোহন জানতেন, ঐ পুস্তিকার নেপথ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রয়েছেন।

"প্রত্যুত্তর" পুস্তিকায় "কবিতাকাব" ছদ্মনামধারী লেখক রামমোহন "বেদের ও সূত্রের অর্থ কোন কোন স্থানে পরস্পর বিপরীত" করেছেন ব'লে অভিযোগ করেছিলেন।

রামমোহন তার প্রত্যুত্তরে বলেন:

> ...আমরা ঈশ কেন কঠ মুণ্ডক মাণ্ডুক্য ঐ দশোপনিষদের মধ্যে সম্পূর্ণ পাঁচ-উপনিষদের ভাষা বিবরণ [বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা] ভগবান আচার্যের [শঙ্করাচার্যের] ভাষ্যের অনুসারে করিয়াছি তাহার এক মন্ত্রও ত্যাগ করা যায় নাই এবং বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্র অবধি শেষ পর্যন্ত ঐ ভাষ্যের অনুসারে ভাষাবিবরণ করিয়াছি তাহার কোন এক সূত্রের পরিত্যাগ হয় নাই সেই সকল ভাষাবিবরণের পুস্তক শত শত নগরে এবং এতদ্দেশে পাওয়া যাইবেক এবং ঐ সকল মূল উপনিষদ্ ও আচার্যেব ভাষ্য এবং বেদান্ত দর্শন ও তাহার ভাষ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্যের বাটীতে এবং কালেজে ও অন্য অন্য পণ্ডিতের নিকট এই দেশেই আছে তাহা দৃষ্টি করিলে বিজ্ঞলোক জানিতে পারিবেন যে বেদের স্থান স্থানের বিপরীত অর্থকে ও বেদান্ত দর্শনেব বিপরীত সূত্রকে ভাষার বিবরণ করা গিয়াছে কিম্বা সম্পূর্ণ উপনিষদ্ সকলেব ও বেদান্ত দর্শনের অর্থ করা গিয়াছে যদি সম্পূর্ণ উপনিষদের ও সূত্রের ভাষাবিবরণ দেখিতে পায়েন তবে কবিতাকারের বিষয়ে যাহা উচিত বুঝেন কহিবেন কবিতাকার বরঞ্চ স্থানের স্থানের শ্রুতিকে আপন পুস্তকে উল্লেখ করিয়া সর্বপ্রকারে ভাষ্যের অসম্মত অর্থ লোকের ধর্মনাশের নিমিত্ত লিখিয়াছেন...।

এখানে স্মরণীয়, এই সময়েই রামমোহন মুণ্ডকোপনিষদের বাংলা অনুবাদ (১৮১৯) এবং শঙ্করাচার্যের "আত্মানাত্মবিবেকের" বাংলা অনুবাদ (১৮২০) প্রকাশ করেন।

রামমোহনের সংগ্রাম কেবল চিন্তার ক্ষেত্রেই চলছিল না। তাঁর চিন্তা হিন্দু ধর্ম ও সমাজে যে বিপ্লবের সূচনা করছিল, তার ফলে তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে সকল দিক থেকেই বিপন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে, তাঁর একেশ্বরবাদী মতবাদ ও

পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধিতার জন্য তাঁর মায়ের প্ররোচনায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ তাঁর বিরুদ্ধে মামলা এনেছিলেন, যে মামলা রামমোহনের মানসিক স্থৈর্য ও শান্তি যথেষ্ট পরিমাণে বিঘ্নিত করছিল। এই সময়েই সেই মামলা চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল এবং ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর রামমোহন মামলায় বিজয়ী হয়েছিলেন।

রামমোহন এই মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেছিলেন যে, তিনি দীর্ঘকাল তাঁর ধর্মীয় মতামত ও সামাজিক চাল-চলনের জন্য আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথকভাবেই ছিলেন, তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই স্বোপার্জিত, সুতরাং এই সম্পত্তিতে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র গোবিন্দপ্রসাদেব কোনও দাবি থাকতে পারে না। রামমোহনের জ্যেঠতুত দুই ভাই গুরুপ্রসাদ রায় ও রামতনু রায়, বর্ধমান জেলার বিশিষ্ট জমিদাব রাজীবলোচন রায়, রামমোহনের ভাগিনেয গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তান্ত্রিক হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী এবং রামমোহনের কর্মচারী প্রভৃতি ব্যক্তিবা রামমোহনের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। গুরুপ্রসাদ রায় ও রামতনু বায বলেন, জগমোহন রায় ও তাঁর পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় একত্র থাকলেও, তাঁদেব আয়-ব্যয় স্বতন্ত্র ও পৃথক ছিল। এরকম ব্যবস্থা তাঁদের বাবা ও কাকা-জ্যেঠাদের আমলেও ছিল। সুতরাং একত্র ও এক অন্নে থাকার অর্থ এই নয় যে, তাঁদের আয়-ব্যয় বা সম্পত্তি যৌথ।

বাজীবলোচন রায় রামমোহনের তালুকগুলির দেখাশোনা করতেন। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি ঐসব বিষয়-সম্পত্তিব আয় সর্বদা রামমোহনকেই দিয়েছেন, এর সঙ্গে জগমোহন বা তাঁর পুত্রের কোনও সম্পর্ক ছিল না। রামমোহনের কলকাতা অফিসেব তহবিলদার তাঁব সাক্ষ্যে বলেন যে, ঐ কারবার রামমোহনের একার ছিল। জগমোহনেব বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে লেন-দেন যে স্বতন্ত্রভাবে জগমোহনের সঙ্গেই হ'তো, সে সম্পর্কে মূল্যবান্ কাগজপত্র দেখানো হয়। এইভাবে রামমোহনের সম্পত্তি যে তাঁর নিজস্ব ও স্বোপার্জিত এবং তা যে যৌথ নয়, তা আদালতে সুপ্রমাণিত হয়।

গোবিন্দপ্রসাদের সাক্ষীরাও গোবিন্দপ্রসাদের বিরুদ্ধে যায় এমন অনেক কথা তাঁদের সাক্ষ্যে বলেন। তাঁর অন্যতম সাক্ষী বেচাবাম সেন বলেন, এখন তিনি গোবিন্দপ্রসাদের অধীনে কাজ কবেন এবং তাঁর কাগজপত্র সব দেখে জেনেছেন যে, ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্পত্তি-বিভাগের পর জগমোহন ও রামমোহন এবং জগমোহনের মৃত্যুর পর গোবিন্দপ্রসাদ ও রামমোহন এক অন্নে থাকলেও তাঁদের বিষয়-সম্পত্তি, আয-ব্যয় পৃথক ছিল। গোবিন্দপ্রসাদেব অন্য তিনজন সাক্ষী, রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভয়াচরণ দত্ত-ও তাঁদের সাক্ষ্যে যা বলেন, তাতে গোবিন্দপ্রসাদের কোন সুবিধা হয় না। রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সম্পত্তি ভাগের পর জগমোহন ও রামমোহনের সম্পত্তি যৌথ ছিল বা পৃথক ছিল, তা তিনি জানেন না ; তাঁদের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটেছিল ব'লেও

তিনি কখনও শোনেন নি। রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রামকান্ত রায়ের জীবিতকালে বা তাঁর মৃত্যুর পর ঐ পরিবারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার তিনি বিশেষ জানেন না বা জানবার সুযোগ পান নি। তৃতীয় সাক্ষী বলেন, তিনি রামকান্তের জীবিতকালে ঐ পরিবারের খোঁজ-খবর জানতেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তিনি আর বিশেষ কিছুই জানেন না। গোবিন্দপ্রসাদ এই অবস্থায় রামমোহনের মা তারিণী দেবী-সহ আরও সাক্ষী হাজির করতে চান, এবং ক্রমাগত দিন নিতে থাকেন। আদালত থেকে বার বার তলব পেয়েও সতেরজন সাক্ষীর মধ্যে মাত্র পাঁচজন হাজির হন। গোবিন্দপ্রসাদ তাঁর পিতামহী তারিণী দেবীকে সাক্ষী মানলেও তিনি কিন্তু হাজির হন না। গোবিন্দপ্রসাদ ইতিমধ্যে (আগস্ট, ১৮১৯) নিজেকে নিঃস্ব ঘোষণা ক'রে pauper-রূপে যাতে মামলা চালাবার সুযোগ পান, সেজন্য আদালতের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু রামমোহন আদালতে প্রমাণ ক'রে দেখান যে, গোবিন্দপ্রসাদ নিঃস্ব নন, তিনি এখনও প্রায় বারো হাজার সিক্কা টাকা মূল্যের সম্পত্তির মালিক। ফলে, আদালত গোবিন্দপ্রসাদের নিঃস্ব-রূপে মামলা চালাবার আবেদন না-মঞ্জুর করেন।

এই অবস্থায় গোবিন্দপ্রসাদ নিজেকে অত্যন্ত নিরুপায় মনে করেন এবং পিতৃব্যের কাছে একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি লেখেন :

শ্রীকৃষ্ণ শরণম্

সেবক শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দেব শর্ম্মণঃ প্রণামা পরার্দ্ধ নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ ও সেবকের মঙ্গল পরং আমি অন্য অন্য লোকের কথা প্রমাণ মহাশয়েব নামে হিস্সা পাইবার প্রার্থনায় শুপরেম কোর্টে একুইটিতে অজযার্থ নালিশ করিয়াছিলাম এক্ষণে জানিলাম যে আমার বুঝিবার ভ্রমে ও বিষয়ে প্রবর্ত হইয়া নানাপ্রকার ক্লেশ পাইতেছি এবং মহাশয়েবও মনস্তাপ এবং অর্থব্যয় অতএব মহাশয় আমার পিতাব তুল্য আমার অপরাধ মর্যাদা করিয়া জদি আমাকে নিকট যাইতে অনুমতি করেন তবে আমি নিকট পৌঁছিয়া সকল বিশয় নিবেদন করি।

শ্রীচরণাম্বুজেষু ইতি।

সন ১২২৬ সাল তাং ১৪ কার্তিক

এই পত্র পাওয়ার পর রামমোহন যে ভ্রাতুষ্পুত্রের অপরাধ মার্জনা করেছিলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। এর কিছুদিন পরেই, ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর মামলার শেষ শুনানির দিন ছিল। ঐদিন গোবিন্দপ্রসাদ বা তাঁর পক্ষের কেউ আদালতে উপস্থিত হলেন না এবং তাঁর মামলা ডিসমিস হয়ে গেল।

গোবিন্দপ্রসাদ পিতৃব্যের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করলেও, তাঁর মনের বিষ কিন্তু তিনি

ত্যাগ করতে পারেন নি। এক বছর পরে তাঁর মা দুর্গা দেবী রামমোহনের নামে সুপ্রীম কোর্টের ইকুইটি ডিভিসনে রামমোহনের বিরুদ্ধে অন্য একটি মামলা দায়ের করেন। ঐ মামলায় দুর্গা দেবী বলেন যে, তাঁর টাকা দিয়েই রামমোহন রামেশ্বরপুর ও দুর্গাপুরের তালুক দুটি কিনেছিলেন, দুর্গা দেবী ঐ মামলায় তালুক দুটি দাবি করেন। ঐ মামলায় গোবিন্দপ্রসাদ মার পক্ষ নেন এবং নিজের স্বাক্ষর দেন। দুর্গা দেবী ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিল মামলা দায়ের করেছিলেন। তিনি তাঁর দাবির অনুকূলে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণই দিতে পারেন না। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর ঐ মামলা ডিসমিস হয়ে যায়।

এইসব মামলায় রামমোহনেব কেবল অর্থব্যয় হয় নি, মানসিক শান্তিও অত্যন্ত বিঘ্নিত হয়। সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনেব সকল আক্রমণ তিনি নির্ভীকভাবে প্রতিরোধ করেন।

তারিণী দেবীই গোবিন্দপ্রসাদের মামলায় প্রধান উৎসাহদাত্রী ছিলেন। কিন্তু জীবিত একমাত্র পুত্রের সঙ্গে তাঁর এই বিবোধ শেষ পর্যন্ত তাঁকে অশান্ত ক'রে তোলে। গোবিন্দপ্রসাদের মামলার রায় বাব হওযার কিছুদিন পরেই ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শান্তির সন্ধানে গৃহ ত্যাগ ক'বে পুরীধামে চলে যান। তিনি একাকিনীই যান, সঙ্গে একজন পরিচারিকাও নেন না। সেখানে তিনি দু বছর ছিলেন। তিনি ঐ সময়ে প্রতিদিন জগন্নাথদেবের মন্দিরে ঝাঁট দিতেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

এই মহিয়সী মহিলা বাল্যকালে পিতৃকুলের শাক্ত ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ ক'রে স্বামীব কুলের বৈষ্ণব ধর্ম ও আচাব-অনুষ্ঠানকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। শেষদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর সেই ধর্মবিশ্বাসে অবিচল ছিলেন। নিজের ধর্মবিশ্বাসের জন্য প্রাণপ্রিয় পুত্রকেও ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। নিজের ধর্মমতের জন্য রামমোহন পিতামাতা, ভ্রাতা, আত্মীয়-পরিজন, সমাজ, সকলকেই ত্যাগ করেছিলেন। চিত্তের এই দৃঢ়তা বামমোহন তাঁর মায়েব কাছেই নিশ্চয় পেয়েছিলেন। ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার লিখেছেন, মায়ের কথা বলতে বলতে বামমোহনের চক্ষু আর্দ্র হয়ে উঠতো। তিনি আরও লিখেছেন যে, পুরী যাত্রার আগে তারিণী দেবী পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং নাকি বলেছিলেন, "বাবা, তোমার মতই ঠিক। কিন্তু আমি দুর্বল স্ত্রীলোক। এতোদিন যাকে সত্য ব'লে জেনে এসেছি, এই বৃদ্ধ বয়সে তা ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর সেইটুকুই তো আমার জীবনের শেষ সান্ত্বনা।" ল্যাণ্ট কার্পেণ্টারের এই বিবরণ কতখানি সত্য জানি না। তবে রামমোহন-জননী যে রামমোহনের মতোই নিজের ধর্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে থেকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

বিদেশে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বৃদ্ধা জননীর মৃত্যু যে রামমোহনের কাছে খুবই মর্মান্তিক ছিল, তা বলাই বাহুল্য।

৭

খ্রীষ্টভক্ত রামমোহন : সংগ্রাম দক্ষিণে বামে

পিতার মৃত্যু-বৎসরেই রামমোহন যেমন তাঁর একেশ্বরবাদী প্রথম গ্রন্থ 'তুহ্‌ফাত-উল্ মুওয়াহ্‌হিদিন' প্রকাশ করেছিলেন, তেমনি মাতার গৃহত্যাগের বৎসরেই (১৮২০) তিনি খ্রীষ্টের ও খ্রীষ্টবাণীর প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ ক'রে প্রকাশ করলেন তাঁর The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness গ্রন্থখানি। ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ডিগ্‌বিকে লেখা তাঁর পত্রে তিনি লিখেছিলেন—I have found the doctrines of Christ more conducive to moral principles, and better adapted for the use of rational beings, than others which have come to my knowledge ;..." খ্রীষ্টের বাণীগুলি যে মানুষের নৈতিক চরিত্র-গঠনে সর্বাধিক উপযোগী এবং যুক্তিশীল মানুষের পক্ষে সর্বাধিক গ্রহণীয়, রামমোহন এই সিদ্ধান্তে ধর্মীয় সত্য সম্পর্কে তাঁর অবিরাম অনুসন্ধানের ফলে উপনীত হয়েছিলেন। সুতরাং খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে যে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠবেন, তা-ই স্বাভাবিক।

তিনি ইংরেজ বন্ধুদের থেকেই নিশ্চয় খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচয় পেয়েছিলেন। তাঁর এই পরিচয় আরও গভীর ও নিবিড় হয়ে ওঠে ইংরেজী বাইবেল ও খ্রীষ্টান মিশনারিদের সংস্পর্শে এসে। কিন্তু তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন ইংরেজী বাইবেল ও খ্রীষ্টান মিশনারিদের মতামতেই সন্তুষ্ট হ'তে পারে নি। মূল বাইবেলের প্রথম অংশ Old Testament হিব্রু ভাষায় ও শেষাংশ New Testament গ্রীক ভাষায় রচিত ছিল। মূল বাইবেল পড়বার জন্য রামমোহন হিব্রু ও গ্রীক দুটি ভাষাই শিখলেন। কথিত আছে, তিনি হিব্রু ভাষা একজন ইহুদীর কাছে শিখে মাত্র ছ মাসে আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় কতোখানি দক্ষতা লাভ করেছিলেন, তা পরবর্তী কালে তাঁর খ্রীষ্টধর্ম সংক্রান্ত বিতর্কমূলক রচনাগুলির মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর গভীরভাবে বাইবেল পাঠের ফলশ্রুতি ছিল তাঁর Precepts of Jesus (খ্রীষ্টবাণী) গ্রন্থখানি। ঐ গ্রন্থখানির মুখপত্রে তিনি লেখেন যে, তিনি খ্রীষ্টের বাণীগুলিকে বাংলা এবং সংস্কৃতেও অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করবেন। কিন্তু Precepts প্রকাশের পরে তিনি এমন এক অভাবনীয় অবস্থার সম্মুখীন হলেন, যার ফলে খ্রীষ্টের বাণীগুলিকে তিনি আর বাংলা ও সংস্কৃতে অনুবাদ করবার সুযোগ পান নি।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে রাজত্ব লাভের পর প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল ইংরেজ মিশনারিরা যাতে এদেশে ইংরেজ-শাসিত অঞ্চলে ধর্মপ্রচার না করে, তার ব্যবস্থা করেছিল। ইংরেজ মিশনারিরা এদেশে এসে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করলে তা এদেশীয়দের ধর্মে হস্তক্ষেপ বিবেচনায় এদেশের লোকরা ইংরেজদের প্রতি বিরূপ হবে, এই ছিল তাদের ভয়। তাই ১৭৯৯-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন মার্শম্যান, কেরী প্রভৃতি ইংরেজ মিশনারিরা এদেশে এলেন, তখন তাঁরা কলকাতায় ঠাঁই পেলেন না। তাঁরা কলকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুরে গিয়ে তাঁদের আস্তানা গাড়লেন। কারণ, তখনও শ্রীরামপুর ডেনিসদের অধীন এলাকা ছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে নূতন সনদ পাওয়ার পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাদের এই নীতি পরিত্যাগ করলো এবং কলকাতায় খ্রীষ্টান ধর্মসংস্থা স্থাপিত হ'লো।

কিন্তু কলকাতা তখনও খ্রীষ্টান মিশনারিদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল না। এ-বিষয়ে শ্রীরামপুরের মিশনারিরাই সর্বাধিক উদ্যোগী ছিলেন। তাঁরা বাঙ্গালীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বাংলা ভাষার অনুশীলন করছিলেন এবং বাংলা গদ্যের বিকাশে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাই শ্রীরামপুরের মিশনারিদের, বিশেষতঃ জসুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম কেরীর, দান অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এঁরা এদেশে ছাপাখানা স্থাপন এবং সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র প্রকাশ ক'রে বাংলা দেশে আধুনিক যুগের আগমনকে ত্বরান্বিত করতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিলেন। সুতরাং আধুনিক ভারতের যুগ-মানব রামমোহন যে এঁদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখবেন, এটা-ই ছিল স্বাভাবিক। রামমোহন এঁদের সঙ্গে পরিচিতও হয়েছিলেন। শ্রীরামপুরে মিশনারিদের কাছে যে এঁর যাতায়াত ছিল, তা ব্যাপ্টিস্ট মিশন সোসাইটির ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণী থেকেও জানা যায়।

কিন্তু রামমোহন তাঁর Precept of Jesus প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের কাছ থেকেই আঘাত পেলেন সর্বাধিক। এই আঘাত ছিল যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি নিষ্ঠুর। রামমোহন তাঁর খ্রীষ্টবাণী সংকলনের সময়ে খ্রীষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলি বাদ দিয়েছিলেন; যিশুখ্রীষ্ট যে ভগবানের অবতার, তাও তিনি অস্বীকার করেছিলেন। খ্রীষ্টধর্মে God, Son of God (যিশু খ্রীষ্ট) ও Holy Ghost, এই ত্রীশ্বরত্বের যে মতবাদ প্রচার করা হয়, তা-ও তিনি স্বীকার ক'রে নেন নি। কিন্তু গোঁড়া খ্রীষ্টানদের কাছে, যিশুর জীবনের অলৌকিকতা, মানবজাতির পাপমুক্তির জন্য তাঁর মৃত্যুবরণ ও যিশুর ঈশ্বরত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। এ সম্পর্কে রামমোহনের নীরবতা বা অস্বীকৃতি তাঁদের কাছে খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার সমতুল্য ছিল। সুতরাং তাঁরা যিশুর বাণী-প্রচারকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সহায়ক না ভেবে, তাকে খ্রীষ্টধর্মের মূল সত্যকে অস্বীকার ব'লেই মনে করলেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় রামমোহনের Precepts of Jesus প্রকাশিত হ'লে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের প্রকাশিত সাময়িকপত্র Friend of India-র ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সমালোচনা বার হ'লো। সমালোচনা করলেন "A Christian Missionary"-র ছদ্মনামে রেঃ ডেওকার স্মিট। সেই সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে সম্পাদক ডঃ জস্থুয়া মার্শম্যান বইখানি সম্পর্কে কিছু কিছু বিরূপ মন্তব্যও করলেন। তাতে তিনি রামমোহনকে "an intelligent Heathen, whose mind is as yet completely opposed to the *grand design* of the Saviour's becoming incarnate" ব'লে বর্ণনা করলেন।

এই সমালোচনা ও সম্পাদকীয় মন্তব্য রামমোহনের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। কারণ, Heathen তাকেই বলে যে একেশ্বরে বিশ্বাস করে না, বহু দেবদেবীর মূর্তি, প্রকৃতি-ভূত-প্রেত প্রভৃতির উপাসনা করে। অথচ রামমোহন অল্পবয়স থেকেই একেশ্বরে বিশ্বাসী, তিনি খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামের মতোই হিন্দু ধর্মও যে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনার কথাই বলেছে, তা প্রচার ক'রে আত্মীয়-স্বজন, সমাজ-সম্প্রদায় সকলের কাছে নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হয়েছেন।

মিশনারিদের সমালোচনা ও সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রতিবাদে রামমোহন A Friend of Truth এই ছদ্মনামে An Appeal to the Christian Public in defence of the 'Precepts of Jesus' (যিশুর বাণীর সমর্থনে খ্রীষ্টান জনসাধারণের কাছে আবেদন) প্রকাশ করলেন। এতে তিনি তাঁকে "হিদন্" বলার প্রতিবাদ করলেন। লিখলেন :

Although he was born a Brahman he not only renounced idolatry at a very early period of his life, but published at that time a treatise in Arabic and Persian against that system, and no sooner acquired a tolerable knowledge of English than he made his desertion of idol worship known to the Christian world by his English publications—a renunciation that, I am sorry to say, brought severe difficulties upon him, by exciting the displeasure of his parents, and subjecting him to the dislike of his near as well as distant relations, and to the hatred of nearly all his countrymen for several years. I therefore presume that among his declared enemies, who are aware of those facts, no one who has the least pretension to truth would venture to apply the designation of heathen to him.

তিনি নিজেকে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে এবং খ্রীষ্টধর্মের অন্তর্নিহিত মূল সত্যে বিশ্বাসী

ব'লে বর্ণনা করেন। তিনি যিশুর বাণীগুলিকে যে নীতির উপর ভিত্তি ক'রে সংকলন করেছিলেন, তার সমর্থনেও যিশুর নিজের উক্তিগুলি থেকে বহু প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত ক'রে দেখান। তিনি বলেন, ঈশ্বরে প্রেম ও মানুষে প্রেম—এই দুই প্রেমই খ্রীষ্টধর্মের মূলকথা। খ্রীষ্টধর্মের এই মূল সত্যকেই তিনি তাঁর Precepts of Jesus-এ সংকলিত করেছেন। তিনি তাই তাঁর Appeal to the Christian Public-এ লিখলেন :

These precepts separated from the mysterious dogmas and historical records, appear to the Compiler to contain not only the essence of all that is necessary to instruct mankind in their civil duties, but also the best and only means of obtaining the forgiveness of our sins, the favour of God, and strength to overcome our passions and to keep His Commandments.

রামমোহনের এই Appeal প্রকাশের পর ডঃ মার্শম্যান পুনরায় তাঁর Friend of India কাগজে মে মাসের সংখ্যায় Precept of Jesus-এর অত্যন্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশ করলেন। তাতে তিনি বললেন যে, রামমোহনকে intelligent Heathen ব'লে বর্ণনা করার মধ্যে রামমোহনকে খাটো করার কোনও উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। তবে যে ব্যক্তি যিশুর ঈশ্বরত্বে এবং মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁর মৃত্যুবরণে এবং পবিত্র খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রগুলির অপৌরুষেয়তায় বিশ্বাস করে না, তাকে তিনি খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী বা খ্রীষ্টান ব'লে স্বীকার করতে পারেন না। তিনি বললেন, নিউ টেস্টামেন্টে যে দুটি প্রধান মতবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা হ'লো—এক, ভগবান সকল পাপকে এতোই ঘৃণিত মনে করেন যে, কেবল যিশুর মৃত্যুবরণই সেসব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে ; দুই, মানুষের অন্তঃকরণ এতোই দূষিত যে, মানুষের স্বর্গে প্রবেশের পূর্বে তাঁর অন্তঃকরণকে দিব্য শক্তির (Divine Spirit) দ্বারা অবশ্যই নবান্বিত ক'রে নিতে হবে। অর্থাৎ, Atonement বা মানবজাতির পাপের জন্য যিশুর মৃত্যুবরণ এবং Divine Spirit বা Holy Ghost খ্রীষ্টধর্মের দুটি প্রধান সত্য।

যুক্তিবাদী রামমোহন খ্রীষ্টধর্মের তথাকথিত এই দুটি মূল সত্যকেই অস্বীকার ও পরিহার করেছিলেন। সুতরাং শ্রীরামপুরের গোঁড়া খ্রীষ্টানরা তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ডঃ মার্শম্যান তাঁর Friend of India কাগজের ত্রৈমাসিক সিরিজের প্রথম সংখ্যায় তাঁর মতের সমর্থনে যিশুর উক্তিসমূহ উদ্ধৃত ক'রে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এই নিবন্ধের প্রতিবাদে রামমোহন ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর "খ্রীষ্টান জনসাধারণের কাছে দ্বিতীয় আবেদন" (Second Appeal) প্রকাশ করেন। এই আবেদনটি দৈর্ঘ্যে প্রথম আবেদনটির প্রায় ছ গুণ ছিল।

এই দ্বিতীয় আবেদনে তিনি বললেন, তিনি নিউ টেস্টামেন্টে যিশুর জীবন সম্পর্কে যেসব অলৌকিক ঘটনা রয়েছে, সেগুলির বিশ্বাস্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন নি, বা সেগুলিকে হিন্দু ধর্মের পৌরাণিক কাহিনীর সমগোত্রও বলতে চান নি। তিনি শুধু এই ব্যাপারটিকে সত্য ব'লে গ্রহণ করেছেন যে, হিন্দুদের মন এইসব অলৌকিক কাহিনীতে এতোই পরিপূর্ণ রয়েছে যে, যিশুর জীবনের অলৌকিক কাহিনীগুলি তাদের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করবে না। এইসব অলৌকিক কাহিনী তাঁকেও আকৃষ্ট করে নি। যিশুর বাণীগুলিই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই তিনি যিশুর বাণীগুলিকে অলৌকিকতা থেকে মুক্ত ক'রেই ভারতীয়দের কাছে প্রচার করেছেন।

তিনি সেই সঙ্গে ডঃ মার্শম্যানের মতের বিবোধিতা ক'রে বলেন যে, মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যিশু মৃত্যুবরণ করেছিলেন ডঃ মার্শম্যানের এই মতবাদে তিনি বিশ্বাসী হন। তবে তিনি যে তাঁর অনুগামীদের ত্রাণকর্তা এবং ভগবানের সঙ্গে মিলনের বিষয়ে যোগসাধক (Redeemer, Mediator and Intercessor) ছিলেন, তা তিনি সর্বদাই স্বীকার করেন।

রামমোহন বলেন, খ্রীষ্টধর্মে যদি ভগবান্, যিশুর ঈশ্বরত্ব এবং হোলি গোস্টের ঈশ্বরত্ব —এই ত্রীশ্বরত্বকে স্বীকার ক'বে নেওযা হয়, তবে তা আর একেশ্বরবাদী থাকে না, ত্রীশ্বরবাদী (Trinitarian) খ্রীষ্টধর্ম অনেকেশ্বরবাদী (Polytheistic) ধর্মেরই সমান হয়। তিনি জানান যে, খ্রীষ্টধর্মের আদিযুগে, যখন খ্রীষ্টধর্ম বিশুদ্ধ ছিল, তখন তাঁরা Father (ভগবান্), Son (যিশু) ও Holy Spirit-এর পৃথকত্বে বিশ্বাসী না হ'লেও খ্রীষ্টান ব'লে আখ্যাত হতেন। যিশুর বাণীগুলি, যেগুলিব সমতুল্য কিছু অন্য কোনও ধর্মে পাওয়া যায় না, সেগুলির শ্রেষ্ঠতা এইসব অলৌকিক বিবরণ ও আধিভৌতিক বাদ-বিতণ্ডার উপর নির্ভর করে না।

তিনি বলেন Precepts of Jesus এই শিক্ষা দেয় যে, এক, ইশ্বরপ্রেম মানবপ্রেমের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে এবং মানবহিতই মানবের সুখ ও শান্তির পথ প্রশস্ত করে, দুই, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং অবিভাজ্য , তিনি সর্বব্যাপী। কেবল খ্রীষ্টধর্মের নয়, রামমোহনের নিজের ধর্মমতেরও মূলকথা ছিল তা-ই। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয , তিনি সর্বভূতে আছেন, তিনি সর্বব্যাপী ; মানবের হিতসাধনে—মানবপ্রেমেই ঈশ্বরপ্রেম প্রকাশিত হয়। তাঁর এই ধর্মমতের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের গভীর সাদৃশ্যই তাঁকে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টের বাণীকে সকল ধর্ম ও বাণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লে ঘোষণা করতে প্রণোদিত করেছিল।

হিন্দু ধর্মে বেদ ও উপনিষদেও তিনি এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কথাই শুনেছিলেন। তিনি বলেন, বেদ-উপনিষদ্ আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব

দিয়েছিল ; মানুষের ঐহিক দুঃখবেদনা এবং তা দূরীকরণের জন্য আত্মনিয়োগের আদর্শ তাতে ছিল না, কারণ ঐহিক সমস্তই ছিল মায়া মাত্র ; তাই ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেম হিন্দু ধর্মে খ্রীষ্টধর্মের মতো একান্বিত হয় নি। কিন্তু রামমোহনের কাছে ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেম ছিল অভিন্ন—মানবের হিতসাধনের মধ্যেই ঈশ্বরপ্রেম আত্মপ্রকাশ করে, এই ছিল তাঁর মত। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে রামমোহনের ধর্মীয় মতবাদের এই দিকটিই পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করেছিল। ব্রহ্মবাদী বিবেকানন্দ ছিলেন মূলতঃ মানববাদী—মানবের সেবাই ছিল তাঁর কাছে ঈশ্বর-সেবা। তাই জীবে দয়া তাঁর মন্ত্র ছিল না—তাঁর মন্ত্র ছিল জীব-সেবা।

রামমোহন কেবল যিশুর বাণীগুলিকে সংকলিত ক'রেই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি বাইবেলকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করবার জন্যও অগ্রসর হয়েছিলেন। কারণ, যিশুর জীবন ও বাণীগুলির সঙ্গে বাঙ্গালীকে পরিচিত করতে হ'লে বাংলা ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ ছিল অবশ্যপ্রয়োজনীয়। শ্রীরামপুরের মিশনারিরাও সে প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন, তাই কেরী সাহেব ইতিপূর্বেই বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু রামমোহন মূল বাইবেল ও ইংরেজী বাইবেলের সঙ্গে পরিচিত থাকায় জানতেন, বাংলা ভাষায় কেরী সাহেব বাইবেলের যে অনুবাদ করেছেন, তা প্রকাশভঙ্গি ও বাংলা বাগ্‌ধারার দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। তাই তিনি শ্রীরামপুরের দুজন পাদরির সাহায্যে মূল বাইবেল থেকে বাংলা ভাষায় নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ শুরু করেছিলেন। এই দুজন পাদরি ছিলেন রেঃ উইলিয়ম ইয়েট্‌স্ ও রেঃ উইলিয়ম অ্যাডাম। এঁরা দুজনেই গ্রীক ভাষায় এবং এদেশীয় ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তবে এঁরাও শ্রীরামপুরের অন্যান্য পাদরিদের মতোই ছিলেন ত্রীশ্বরত্বে—God, Son of God ও Holy Spirit-এ বিশ্বাসী।

Precept of Jesus প্রকাশিত হওয়ার পর শ্রীরামপুরের পাদরিদের সঙ্গে রামমোহনের বিতর্ক যখন চলছিল, তখন রামমোহন ইয়েট্স ও অ্যাডামের সহায়তায় গ্রীক থেকে বাংলা ভাষায় নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ করছিলেন। ইয়েট্‌স্ ও অ্যাডাম, দুজনেই রামমোহনকে খ্রীষ্টধর্মের ত্রীশ্বরবাদে (Trinitarianism) বিশ্বাসী ক'রে তুলবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা বা অন্যান্য খ্রীষ্টান পাদরিরা রামমোহনের খ্রীষ্টীয় মতবাদ সম্পর্কে বিরুদ্ধতায় সোচ্চার হ'লেও রামমোহনের পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও ধর্মীয় প্রতিভা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস থেকেই ডঃ মার্শম্যানের মন্তব্যের প্রতিবাদে খ্রীষ্টান জনসাধারণের উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁর আবেদনপত্রগুলি মুদ্রিত হয়েছিল। খ্রীষ্টান পাদরিদের তখনও আশা ছিল, রামমোহন

তাঁর মতামত সংশোধন ক'রে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন এবং ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে একটি বিশাল স্তম্ভে পরিণত হবেন। এই সময়কার একটি ঘটনাব বিবরণ রেঃ উইলিয়ম অ্যাডাম রেখে গেছেন। তিনি লিখেছেন :

> গ্রীষ্মকালে একদিন দুপুরবেলা আমি আমার অভ্যাসমতো পড়াশুনোয় ব্যস্ত ছিলাম। আমাকে খবর দেওয়া হ'লো যে, একজন এদেশীয় ভদ্রলোক আমাদের উঠানের গেটে অপেক্ষা কবছেন, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। এটা দেখা করতে আসাব চিরাচবিত সময় নয়। আমি গেটে গিযে দেখলাম, রামমোহন রায ; তাঁকে আমি অবিলম্বে গাড়ি থেকে নেমে বাড়ীতে আসতে অনুরোধ করলাম। তিনি কেন এই অসমযে দেখা করতে এসেছেন, তা তিনি যা বললেন তা থেকে বুঝলাম। কলকাতাব বিশপ ডঃ মিডলটন তাঁকে দেখা করবাব জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিযেছিলেন। রামমোহনের বাড়ী বিশপের প্রাসাদ থেকে প্রায় দু মাইল দূরে এবং আমার বাসা দুজনেব বাড়ীর প্রাব মাঝামাঝি অবস্থিত। তিনি মানসিক দিক থেকে বেশ অশান্ত হযে উঠেছিলেন। তাঁর দেহের জন্য বিশ্রাম ও মনেব জন্য সহানুভূতির প্রযোজন ছিল। তিনি প্রথমেই মাথা থেকে তাঁর পাগড়ি খুলবার অনুমতি চাইলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গেই তা দিলাম। তারপব তিনি কিছু জলযোগ করতে চাইলেন। তবে জলযোগেব ব্যবস্থা কববার আগে তিনি আমার ভৃত্যদেব সবিয়ে দিতে বললেন। কারণ, তাবা যদি তাঁকে আমার বাড়ীতে কিছু খেতে দেখে, তবে তা লোকেব কাছে ব'লে বেড়াবে, এবং তাঁব জাত যাবে। আমি তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা কবলাম। তাবপর তাঁব ক্লান্তি কিছুটা দূর হ'লে, তিনি মানসিক দিক থেকে কেন অশান্ত হযে উঠেছেন বললেন।

রামমোহন তাঁর এই মানসিক অস্থিরতাব কাবণ সম্পর্কে বললেন, তিনি বিশপের সঙ্গে দেখা করলে বিশপ তাঁকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণেব জন্য দীর্ঘ সময ধ'রে নানা যুক্তির অবতারণা করলেন। তাতে যখন সুফল হ'লো না, তখন বিশপ তাঁকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ কবলে তাঁব জীবনে কি গৌববময় সাফল্য আসবে (The grand career which would open to him by a change of faith), তার বর্ণনা করলেন। বিশপ বললেন, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ কবলে রামমোহন "would be honoured in life and lamented in death,—honoured in England as well as in India ,—his name would descend to posterity as that of the modern Apostle of India."

বিশপের এই ধরনের প্রলোভন দেখানোতে রামমোহনের ক্ষোভ ও ঘৃণার সীমা রইলো না। বিশপ তাঁকে যুক্তি দিয়ে, তাঁব বিবেকবুদ্ধির কাছে আবেদন ক'রে তাঁকে

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে সম্মত করাতে পারলেন না। তিনি তাঁকে সম্মত করাতে চাইলেন মান-সম্মান ও খ্যাতির প্রলোভন দেখিয়ে। একজন খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক, সর্বোপরি কলকাতার খ্রীষ্টীয় ধর্মসংস্থার সর্বোচ্চ ব্যক্তি কলকাতার বিশপ ডঃ মিডলটনের কাছ থেকে এ ধরনের অখ্রীষ্টীয় আচরণ তিনি প্রত্যাশা করেন নি। তাই রামমোহন এতো অস্থির ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন।

জন ডিগ্‌বির মতোই রেঃ উইলিয়ম অ্যাডাম-ও রামমোহনের অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ, কোনও প্রলোভন যে রামমোহনকে নিজের বিচারবুদ্ধি থেকে বিচ্যুত করতে পারে না, অ্যাডাম তা জানতেন।

ধীরে ধীরে রামমোহনের পাণ্ডিত্য ও বিচারবুদ্ধির কাছে অ্যাডাম-ও পরাজয় স্বীকার করলেন। তিনি রামমোহনকে ত্রীশ্বরবাদে বিশ্বাসী ক'রে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু রামমোহনের যুক্তি তাঁকে খ্রীষ্টধর্মের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ক'রে তুললো। রেঃ ইয়েট্‌স তাঁর অন্ধ বিশ্বাসকেই আঁকড়ে থাকলেন। অনুবাদের কাজে ইয়েট্‌সের সঙ্গে রামমোহন ও অ্যাডামের মতবিরোধও দেখা দিলো।

রেঃ অ্যাডামের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি, রেঃ ইয়েট্‌স ও রামমোহন নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ করছিলেন। নিউ টেস্টামেন্টে চারটে গসপেল (Gospel) বা খ্রীষ্টের জীবনী আছে। প্রথম তিনটি গস্‌পেলের অনুবাদ বেশ ভালোয় ভালোয় হ'লো। চতুর্থ গস্‌পেল অনুবাদকালেই মতবিরোধ দেখা গেল। গ্রীক ভাষার একটি preposition নিয়েই গণ্ডগোল বাধলো। এই prepositionটির অর্থ 'কর্তৃক' হবে না 'মধ্য দিয়ে' হবে, তা-ই নিয়ে ইয়েট্‌সের সঙ্গে মতবিরোধ বাধলো। প্রথমে ইয়েট্‌স্ ইংরেজী অনুবাদের by-এর স্থলে through বা 'মধ্য দিয়ে' ব্যবহার করতে সম্মত হয়েছিলেন—"সকল কিছুই তাঁহার মধ্য দিয়া সৃষ্ট হইল।" কিন্তু এর মধ্যে ইয়েট্‌স ধর্মদ্রোহের গন্ধ পেলেন। ফলে, এই অনুবাদে তিনি সম্মত হলেন না। রেঃ অ্যাডাম বলেছেন, "রামমোহন কলম হাতে গাম্ভীর্যপূর্ণ নীরবতার সঙ্গে বসেছিলেন, সব কিছু মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন ও লক্ষ্য করছিলেন, কিন্তু কিছুই বলছিলেন না।" অনুবাদকালে এই মত-পার্থক্য অ্যাডামকে ধর্মীয় গোঁড়ামি সম্পর্কে অসহিষ্ণু ক'রে তুললো এবং তিনি শেষ পর্যন্ত ত্রীশ্বরবাদ ত্যাগ ক'রে রামমোহনের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। ইয়েট্‌স অ্যাডাম ও রামমোহনের সংস্পর্শ ত্যাগ করলেন।

রেঃ অ্যাডাম তাঁর নিজের মতপরিবর্তন ও ইয়েট্‌সের অনুবাদকার্য ত্যাগ সম্পর্কে মিঃ এন. রাইটকে লেখা ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মে তারিখের এক পত্রে বলেন :

It is now several months since I began to entertain some doubts respecting the Supreme Deity of Jesus Christ, suggested

by frequent discussions with Rammohun Roy, whom I was endeavouring to bring over to the belief of that Doctrine, and in which I was joined by Mr. Yates, who also professed to experience difficulties on the subject. Since then I have been diligently engaged in studying afresh the Scriptures with a view to this subject, humbly seeking divine guidance and illumination, and do not hesitate to confess that I am unable to remove the weighty objections which present against this doctrine.

অর্থাৎ, যিশুখ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বের বিরুদ্ধে রামমোহন যেসব যুক্তি দিয়েছিলেন, অ্যাডাম খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রগুলি গভীরভাবে পাঠ ক'রেও সেগুলি খণ্ডন করবার মতো কিছুই পেলেন না। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি রামমোহনের মতকেই নির্ভুল ব'লে মেনে নিলেন। এইভাবে শ্রীরামপুরের পাদরিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হ'লো। অ্যাডামের এই মতপরিবর্তন ত্রীশ্বরবাদী খ্রীষ্টান সমাজের প্রতি একটি সুকঠিন আঘাত ছিল। এবং অ্যাডামের এই মতপরিবর্তন একজন হিন্দুর দ্বারা হয়েছিল, তা-ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের কাছে অত্যন্ত অপমানজনক ছিল। তাই শ্রীরামপুরের পাদরিদের ক্রোধটা রামমোহনের উপর শতগুণে বর্ধিত হয়ে উঠলো।

রামমোহন খ্রীষ্টান ধর্মের বিশুদ্ধ রূপ সম্পর্কে যেভাবে চিন্তা করছিলেন, ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেও একদল প্রগতিশীল খ্রীষ্টান চিন্তা করছিলেন সেইভাবে। তারা 'ইউনিটারিয়ান' (Unitarian) বা একেশ্বরবাদী নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা রামমোহনের মধ্যে একজন শক্তিশালী সমর্থকের সন্ধান পেলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে অ্যাডামের ট্রিনিটারিয়ান (Trinitarian) মতবাদ ত্যাগ ও ইউনিটারিয়ান মতবাদের সমর্থনের কথা সকলেই জানলো। ট্রিনিটারিয়ানবাদীরা তাঁকে ব্যঙ্গ ক'রে 'The Second Fallen Adam' আখ্যা দিলো। আদিমানব প্রথম অ্যাডাম শয়তানের প্রলোভনে পড়েছিলেন, রেঃ অ্যাডাম-ও শয়তানের প্রলোভনে পড়েছেন, এই মর্মার্থ।

রামমোহনের উপর শ্রীরামপুরের পাদরিদের ক্রোধ এখন খ্রীষ্টীয় মতবাদ নিয়ে তীব্র বাদানুবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো না। শ্রীরামপুরের পাদরিদের খ্রীষ্টীয় মতবাদকে রামমোহন একেশ্বরবাদের বিরোধিতা ও অনেকেশ্বরবাদের প্রকারভেদ ব'লে বর্ণনা করায়, তাঁরা এখন হিন্দু ধর্মের একেশ্বরবাদের মূলে যে-বেদান্ত এবং রামমোহনের ধর্মীয় মতবাদ যে-বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই বেদান্তকেই আক্রমণ করতে শুরু করলেন।

শ্রীরামপুরের পাদরিরা 'সমাচার-দর্পণ' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ

করতেন। এই কাগজে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জুলাই তারিখে বেদান্তকে আক্রমণ ক'রে একটি পত্র প্রকাশিত হ'লো। তাতে বলা হ'লো যে, বেদান্তে যেহেতু সর্বভূতে ঈশ্বর বর্তমান বলা হয়েছে, সুতরাং বেদান্তের মতবাদ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ নয়, তা সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)। বেদান্তে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সত্য এবং অবশিষ্ট সব-কিছু মায়া বলা হয়েছে ; ফলে, এই মতবাদে বিশ্বের বাস্তবতাকে এবং মানবাত্মার দায়িত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে ; ঈশ্বর ভিন্ন অন্য সব-কিছুকে মায়া বা অসত্য বলায় ঈশ্বরকে খাটো করা হয়েছে। সমাচার-দর্পণের সম্পাদক বেদান্ত-বিরোধী এই পত্রটি প্রকাশ ক'রে সেই সঙ্গে এর প্রতিবাদে উত্তর-ও আহ্বান করলেন।

রামমোহন সঙ্গে সঙ্গে এই আহ্বানে সাড়া দিলেন। তিনি শ্রীরামপুরের ত্রীশ্বরবাদী পাদরিদের খ্রীষ্টীয় মতবাদকে একেশ্বরবাদের বিরোধী বলায়, শ্রীরামপুরের পাদরিরা যে বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের বিরোধী প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছেন, রামমোহন তা বুঝেছিলেন। তাই তিনি বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য কি, তা ব্যাখ্যা ক'রে প্রশ্নকর্তার প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটিকে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন ক'রে 'সমাচার-দর্পণে' প্রেরণ করলেন। অবশ্য, এই নিবন্ধটি রামমোহন তাঁর সংস্কৃত-শিক্ষক শিবপ্রসাদ শর্মার কাছে প্রকাশার্থ পাঠান।

সমাচার-দর্পণের সম্পাদক প্রত্যুত্তর আহ্বান করলেও রামমোহন-প্রেরিত প্রত্যুত্তর ছাপতে সম্মত হলেন না। সমাচার-দর্পণে ১লা সেপ্টেম্বর (১৮২১) তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি মাত্র ছাপা হ'ল। তাতে বলা হ'ল :

> শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শর্মা-প্রেরিত পত্র এখানে পৌঁছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল যড়দর্শনের দোষো-দ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইতে বাধা নাই, অন্যথা সর্বসমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই।

এই "অজিজ্ঞাসিতাভিধান" বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় রামমোহনের পত্রে কি ছিল, যাতে শ্রীরামপুরের পাদরিরা এই প্রত্যুত্তর ছাপতে চান নি? শ্রীরামপুরের পাদরিরা যাকে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বলেছেন, তা ছিল ত্রীশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয় মতবাদের সমালোচনা। রামমোহন বলেছিলেন যে, শ্রীরামপুরের পাদরিরা যখন ত্রীশ্বরবাদী খ্রীষ্টধর্মের সমর্থনে উদ্গ্রীব, তখনই তাঁরা হিন্দু ধর্মের একেশ্বরবাদের বিশুদ্ধতা অপ্রমাণে উদ্যোগী হয়েছেন।

সমাচার-দর্পণ রামমোহন-প্রেরিত উত্তর প্রকাশ করতে অসম্মত হ'লে রামমোহন নিজেই একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করলেন। এর বাংলা অংশের নাম 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' এবং ইংরেজী অংশের নাম 'Brahmanical Magazine'. এই সাময়িক পত্রটির

এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অন্ত পৃষ্ঠায় তার ইংরেজী অনুবাদ ছাপা হ'তো। তাতে বাঙ্গালী ও ইংরেজ পাঠকের উভয়ের বোঝার সুবিধা হ'তো। রামমোহন 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' ও Brahmanical Magazine-এর প্রথম দুই সংখ্যায় সমাচার-দর্পণে প্রকাশিত বেদান্ত-বিরোধী প্রশ্নাবলী ও তার উত্তরগুলি বাংলা ও ইংরেজীতে ছাপলেন।

'ব্রাহ্মণ সেবধি' বা 'ব্রাহ্মণ ও মিশিনরি সম্বাদ'-এর প্রথম সংখ্যার প্রাবন্ধে রামমোহন লিখলেন :

> শতার্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিশনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিষ্টান কবিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দু দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্মের উৎকর্ষ ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রিষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও যিশুখ্রীষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্মের ঔৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু জানা কর্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেইরূপ মিশনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্যদের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্বল ও দীন ও ভয়ার্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না ;···

এইরূপ মুখবন্ধের পর রামমোহন Brahmanical Magazine ও ব্রাহ্মণ-সেবধির দুই সংখ্যায় ১৪ জুলাই সমাচার-দর্পণে প্রকাশিত পত্রের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি বলেন :

বেদান্তবাদিরা মায়াকে অজ্ঞান কহেন যেহেতু জ্ঞান হইলে মায়ার কার্য যাহার দ্বারা ঈশ্বর হইতে জীব সকল পৃথক দেখায় সে কার্য আর থাকে না অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। মায়া শব্দের প্রয়োগ মুখ্যরূপে ঈশ্বরের জগৎকারণশক্তিতে ও গৌণরূপে ঐ শক্তির কার্যেতে হয়। রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয় তাহার সহিত জগতের দৃষ্টান্ত বেদান্তে দেন, ইহার তাৎপর্য এই যে ভ্রম-সর্পের ন্যায় জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া জগৎ সত্তাবিশিষ্ট হয় সেইরূপ জগৎকে স্বপ্নের সহিত সাদৃশ্য দেন যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসকল জীবের সত্তার অধীন হয় সেইরূপ জগৎ পরমেশ্বরের সত্তার অধীন অতএব জীব হইতে ও সকল হইতে প্রিয় পরমাত্মাই সর্বথা হয়েন আর বেদান্তে ঈশ্বর ভিন্ন বস্তু নাই ঈশ্বর সকল ও ঈশ্বর সকলেতে ইহা কহেন, তাহাব তাৎপর্য এই যে যথার্থ সত্তা কেবল পরমেশ্বরের হয় অতএব ঈশ্বর কেবল সত্য ও সর্বব্যাপি অন্য তাবৎ অসত্য।

তিনি লেখেন :

ঈশ্বর সকল ও সকলে ব্যাপক এমৎ প্রয়োগ খ্রিষ্টানদের কেতাবেও শুনিতে পাই তাহার তাৎপর্য বুঝি এমৎ না কহিবেন যে ঘট পট সকল ঈশ্বর ববঞ্চ তাৎপর্য এই হইতে পারে যে তিনি সর্বব্যাপক…

রামমোহন এই প্রত্যুত্তর দানকালে কেবল বেদান্তে বর্ণিত হিন্দু ধর্মের সমর্থনেই অগ্রসর হন নি, তিনি হিন্দু পুরাণসমূহের কাহিনী-কিংবদন্তীগুলিব সমর্থনেও অগ্রসর হলেন। তিনি বললেন, অল্পবুদ্ধি সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্যই হিন্দু পুরাণে নানা রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। হিন্দু ধর্মেব রূপক-কাহিনীগুলি যদি হিন্দু ধর্মকে হীন ক'বে দেখাবার উপযুক্ত কারণ হয়, তবে খ্রীষ্টধর্মেও যে ঐরূপ রূপক-কাহিনীর আশ্রয় নেওযা হয়েছে, তাতে খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব কিভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে? তিনি লেখেন :

পুরাণ ও তন্ত্রে দোষ দিবার উদ্দেশে লিখিয়াছেন যে পুবাণে ঈশ্বরের নানাবিধ নাম রূপ কহেন ও স্ত্রীপুত্রবিশিষ্ট ও বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী কহেন ইহাতে নানা ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের বিষয়ভোগ সম্ভবে ও ঈশ্বরের বিভুত্ব থাকে না অতএব মিসনরি মহাশয়দিগ্যে বিনয়পূর্বক জিজ্ঞাসা করি যে তাহারা মনুষ্য-রূপবিশিষ্ট যিশুখ্রীষ্টকে ও কপোতরূপবিশিষ্ট হোলি গোস্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিনা আর সাক্ষাৎ ঈশ্বর যিশুখ্রীষ্টের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ভোগ ও হস্তাদি কর্মেন্দ্রিয় ভোগ তাঁহারা মানেন কি না এবং তাহাকে ইন্দ্রিয়গ্রামবাসীভূত স্বীকার করেন কি না অর্থাৎ তাঁহার ক্রোধ হইত কি না তাঁহার মনঃপীড়া হইত কি না তাঁহার দুঃখ বেদনাদি জন্মিত কি না এবং তাঁহার আহারাদি ছিল কি না তেঁহ আপন মাতা ও ভ্রাতা ও কুটুম্ব সমভিব্যবহারে বহুকাল যাপন করিয়াছেন কি না তাঁহার জন্ম মৃত্যু হইয়াছিল কি না এবং সাক্ষাৎ

হোলি গোস্ট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিতেন কি না আর স্ত্রীর সহিত আপন আবির্ভাবের দ্বারা যিশুখ্রীষ্টকে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন কি না···

রামমোহন যিশুখ্রীষ্টের ও হোলি গোস্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি খ্রীষ্টধর্মের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ এবং যিশুর বাণীসমূহের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বেই বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দু ধর্মের পৌরাণিক কাহিনীসমূহে ও অবতারবাদেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি হিন্দু ধর্মের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদেই বিশ্বাসী ছিলেন। খ্রীষ্টান মিশনারিরা বেদান্ত ও হিন্দু পুরাণের অপব্যাখ্যা দ্বারা যখন হিন্দু ধর্মকে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেন, তখন তিনি হিন্দু ধর্মেব সমর্থনে হিন্দু ধর্মকে খ্রীষ্টান মিশনারিদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য অগ্রসর হলেন। তিনি দেখালেন রূপক-কাহিনীসমূহের জন্য হিন্দু ধর্ম যদি হীন হয়, তবে হোলি গোস্টের কাহিনী ও যিশুর মানব-জীবনের কাহিনী থাকার জন্য খ্রীষ্টধর্মও হীন।

রামমোহনের এইসব যুক্তির বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান মিশনারিদের কিছু বলবার মতো যুক্তি ছিল না। তবু তাঁরা Friend of India পত্রিকায় (আগস্ট, ১৮২১) রামমোহনের এই উত্তরের জবাবে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করলেন। এই নিবন্ধে যুক্তির চেয়ে কটূক্তিই প্রবল ছিল। জনসাধারণের পড়ার জন্য 'সমাচার-দর্পণে' এই আলোচনার সূত্রপাত হ'লেও এবার মিশনারিরা বাংলায় কিছু লেখা সমীচীন মনে করলেন না। কারণ, রামমোহনের যুক্তিগুলি অকাট্য ছিল, সেগুলি পাঠের ফলে হিন্দু জনসাধারণ খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বেই বেশি বিশ্বাস করবে, মিশনারিরা তা জানতেন। তাই তাঁরা বাংলায় রচনা বন্ধ ক'রে কেবল ইংরেজীতেই রচনা প্রকাশ করলেন।

রামমোহন তাঁর উত্তরদানকালে এইসব প্রশ্ন তুলেছিলেন :

> যিশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বরেব পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন···
>
> যিশু খ্রীষ্টকে কখন কখন মনুষ্যেব পুত্র কহেন অথচ কহেন যে কোনো মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না···
>
> আপনাবা ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চভাবে আরাধনা করিবেক কহিয়া থাকেন অথচ প্রপঞ্চাত্মক শরীরে যিশু খ্রীষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে আরাধনা করেন···

কিন্তু ত্রীশ্বরবাদী খ্রীষ্টানদের এইসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। তাঁরা Friend of India-তে যে 'উত্তর' প্রকাশ করলেন তা মিথ্যাভাষণ ও কটূক্তিতে পূর্ণ। তাঁরা "মিথ্যার পিতা হইতে হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি", "হিন্দুদের মিথ্যা দেবতা সকল" প্রভৃতি 'লে হিন্দু ধর্মকে হীন প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করলেন। রামমোহন Friend of India-র প্রকাশিত এই ইংরেজী নিবন্ধের উত্তরে তাঁর Brahmanical

Magazine ও ব্রাহ্মণ-সেবধিতে ইংরেজীতে ও বাংলায় শিবপ্রসাদ শর্মার নামেই জবাব দিলেন। তিনি নিবন্ধের শেষে মিশনারিদেব এইরকম কটূক্তি ও অসৌজন্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানিয়ে লিখলেন :

"...সাধারণ ভব্যতা ও সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে কিন্তু আমাদিগ্যে জানা কর্তব্য যে আমরা বিশুদ্ধ ধর্মসংক্রান্ত বিচারে উদ্যত হইয়াছি পরস্পব দুর্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই।...

কিন্তু রামমোহনের এই পবামর্শ কার্যকরী হয় নি। শ্রীরামপুরের মিশনাবিরা তাঁদেব ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের সোসাইটির বিবরণীতে যথেষ্ট বিষ উদ্‌গিরণ করেন। তাঁরা শ্রীরামপুবের ব্যাপ্টিস্ট মিশন থেকে বেদান্ত-বিবোধী একটি বাংলা পুস্তিকাও প্রচার করেন। রামমোহন এ-বিষযে তাঁব শেষ উত্তর দেন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে Brahmanical Magazine-এর চতুর্থ তথা শেষ সংখ্যায়। এবার বাংলা ভাষায় কিছু আর প্রকাশিত হয় নি। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ সেবধি মোট তিন সংখ্যা ও Brahmanical Magazine মোট চার সংখ্যা ছাপা হয়েছিল।

রামমোহন ট্রিনিটারিয়ান বা ত্রীশ্ববাদী পাদবিদেব মতবাদের অসামঞ্জস্য ও বৈপবীত্য প্রমাণেব জন্য বাংলায় 'পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ' ও তার ইংরেজী অনুবাদ Dialogue First between a Trinitarian and Three Chinese Converts প্রকাশ করেন। এগুলি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকা-দুটি বামমোহন সহমরণ বিষয় প্রবর্ত ও নিবর্তেব সম্বাদেব মতোই প্রশ্নোত্তবছলে বচনা কবেছিলেন। কটূক্তিতে নয়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ও শ্লেষে তাঁব লেখনী যে কতখানি ক্ষুবধাব ছিল, এই পুস্তিকা-দুটি তার প্রমাণ।

"এক খ্রীষ্টিয়ান পাদরি ও তাঁহার তিনজন চীন দেশস্থ শিষ্য ইঁহাদের পরস্পর কথোপকথন" থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হ'লো :

পাদরি—তিনজন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, ওহে ভাই ঈশ্বর এক কি অনেক ?

প্রথম শিষ্য—উত্তর করিল, ঈশ্বর তিন।

দ্বিতীয় শিষ্য—কহিল, ঈশ্বর দুই।

তৃতীয় শিষ্য—উত্তর দিল, ঈশ্বব নাই।

পাদরি—হ . কি মনস্তাপ, শয়তানেব অর্থাৎ অতি পাপকাবীর ন্যায় উত্তর করিলে ?

প্রথম শিষ্য—আপনি কহিয়াছিলেন যে পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং হোলি

গোস্ট অর্থাৎ ধর্মাত্মা ঈশ্বর হয়েন, ইহাতে আমাদের গণনামতে এক, এক, এক, অবশ্য তিন হয়।

... ...

পাদরি—হা এমত নহে, তুমি তিন ব্যক্তিকে তিন ঈশ্বর করিয়া কখনও বিশ্বাস করিবা না এবং তাঁহাদিগের শক্তি ও প্রতাপ তুল্য নহে এমত জানিও না কিন্তু এ তিন কেবল এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য—এ অতি অসম্ভব এবং আমরা চীনদেশীয লোক পরস্পর বিপরীত বাক্য বিশ্বাস কবিতে পারি না।

পাদরি—ওহে ভাই এ এক নিগূঢ় বিষয।

... ...

প্রথম শিষ্য—হাস্য করিয়া কহিল, মহাশয় দশ সহস্র ক্রোশ হইতে এই ধর্ম আমারদিগকে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইয়া আসিযাছেন, যাহা বোধগম্য হয় না।

পাদরি— দ্বিতীয শিষ্যকে প্রশ্ন করিলেন, যে কিরূপে তুমি দুই ঈশ্বর নিশ্চয় করিলে?

দ্বিতীয শিষ্য—অনেক ঈশ্বর আছেন আমি প্রথমতঃ অনুমান করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি সংখ্যার ন্যূন করিয়াছেন।

পাদরি—আমি কি তোমাকে কহিযাছি যে, ঈশ্বর দুই হয়েন,...

দ্বিতীয় শিষ্য—সত্য বটে আপনি স্পষ্ট এমত কহেন নাই যে ঈশ্বর দুই কিন্তু যাহা আপনি কহিয়াছেন তাহাব তাৎপয এই হয। · আপনি এরূপ উপদেশ দিলেন যে তিন ব্যক্তি পৃথক পূর্ণ ঈশ্বব ছিলেন, পরে আপনি কহিলেন যে পশ্চিম দেশের কোন গ্রামে ঐ তিনেব মধ্যে একজন বহুকাল আগে মারা গিয়াছেন, ইহাতেই আমি নিশ্চয় কবিলাম যে এইক্ষণে দুই ঈশ্বর বর্তমান আছেন।

পাদরি—...পরে তৃতীয শিষ্যকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন, যে তোমার দুই ভাই পাষণ্ড বটে কিন্তু তুমি উহারদিগের অপেক্ষাও অধম হও, কারণ কোন্ আশয়ে তুমি উত্তব কবিলে যে ঈশ্বর নাই।

... .

তৃতীয় শিষ্য—...আপনি পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন যে এক ঈশ্বর ব্যতিবেকে অন্য ছিলেন না এবং ঐ খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল আরবের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদীরা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে, ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে ঈশ্বর নাই ইহা ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি।

খ্রীষ্টীয় ত্রীশ্বরবাদ যে কতখানি অযৌক্তিক, ভ্রান্ত, এমন কি হাস্যকর, রামমোহন তা গভীর পাণ্ডিত্য, শাণিত যুক্তি ও সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে প্রমাণ ক'রে দেখালেন। শ্রীরামপুরের পাদরিরা ত্রীশ্বরবাদের গোঁড়া ভক্ত হওয়ায় রামমোহনের মধ্যে তাঁরা একটি দুর্জয় শত্রুর সন্ধান পেলেন। ইতিমধ্যে শ্রীরামপুরের পাদরিদের নিজের ঘরে তিনি যে ভাঙন ধরিয়েছিলেন, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে রেঃ অ্যাডামের ত্রীশ্বরবাদ ও শ্রীরামপুরের পাদরিদের সংসর্গ ত্যাগ তা সুস্পষ্ট ক'রে তুলেছিল। রেঃ ইয়েট্স্ সম্পর্কেও তাঁরা সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। তবে রেঃ ইয়েটস স্ববিতে ত্রীশ্বরবাদের সমর্থনে নিবন্ধাদি প্রকাশ ক'রে সন্দেহমুক্ত হলেন।

রেঃ অ্যাডাম ত্রীশ্বর মতবাদ ত্যাগ করবার ফলে এখন ভারতেও ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের মতোই বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান সংস্থা স্থাপনের জন্য উদযোগী হয়েছিলেন। রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা রেঃ অ্যাডামকে এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য দিলেন। ফলে, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় 'ক্যালকাটা ইউনিটারিয়ান কমিটি' গঠিত হ'লো। এই কমিটিতে সুপ্রীম কোর্টের ব্যারিস্টার থিওডোর ডিকেন্স, বিখ্যাত বণিকসংস্থার জর্জ জেমস্ গর্ডন, এটর্নি উইলিয়ম টেট্, সরকারী সার্জন ডঃ ম্যাক্লেঅড, সরকারী কর্মচারী নর্ম্যান কার, রে. অ্যাডাম, রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধা-প্রসাদ রায় ছিলেন। রামমোহন এই সংস্থার জন্য মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করেন। রেঃ অ্যাডাম এই নবপ্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্টান সংস্থার [illegible] (Minister) নিযুক্ত হন। রামমোহন ইংলণ্ড ও আমেরিকার ইউনিটারিয়ান সংস্থাগুলির সঙ্গে পত্রালাপ ও যোগাযোগ স্থাপন করেন। রামমোহন যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের সমর্থনেই ইউনিটারিয়ানদের প্রতি এতো আকৃষ্ট হয়েছিলেন, হিন্দু ধর্মের বেদান্ত ও একেশ্বরবাদের প্রতি তাঁর আসক্তি ও শ্রদ্ধা যে বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি, বেদান্তের সত্য যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলিরই অনুরূপ, তা প্রতিষ্ঠা করতেই যে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করছেন, তা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু রে অ্যাডাম-ও বুঝতে পারেন নি।

রামমোহনের কাছে যতোই যুক্তি-তর্কে পরাজিত হচ্ছিলেন, ততোই শ্রীরামপুরের পাদরিরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। ডঃ মার্শম্যান ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে Friend of India কাগজের ত্রৈমাসিক সিরিজে Precept of Jesus-এর বিশদ সমালোচনা প্রকাশ করলেন।

রামমোহন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁর খ্রীষ্টান জনসাধারণের কাছে তৃতীয় তথা শেষ আবেদন প্রকাশ ক'রে ডঃ মার্শম্যানের উক্তি ও যুক্তির জবাব দিলেন। রামমোহনের পূর্ব দুটি আবেদন শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস থেকেই ছাপা হয়েছিল। এখন শ্রীরামপুরের পাদরিরা রামমোহনের উপর এতোই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁর

শেষ আবেদনপত্রটি ছাপতেও রাজী হ'লেন না। তাঁরা 'সবিনয়ে' জানালেন, তাঁরা খ্রীষ্টধর্ম সংক্রান্ত রামমোহনের কোনও নিবন্ধ ছাপতে পারবেন না। অগত্যা রামমোহনকে তখন নিজের নিবন্ধ ছাপার জন্য একটি ছাপাখানা খুলতে হ'লো। তিনি ধর্মতলায় ইউনিটারিয়ান প্রেস নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করলেন। তা থেকেই তাঁর খ্রীষ্টান জনসাধারণের কাছে তৃতীয় আবেদনটি ছাপা হ'লো। তৃতীয় আবেদনপত্রটি দৈর্ঘ্যে খুব বড় ছিল। প্রথম আবেদনপত্রটি দৈর্ঘ্যে ছিল ২০ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয়টি ছিল ১৫০ পৃষ্ঠা এবং তৃতীয়টি ছিল ২৫৬ পৃষ্ঠা।

রামমোহন ডঃ মার্শম্যানের যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলিকে একে একে খণ্ডন ক'রে দেখালেন। খ্রীষ্টধর্মীয় শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান, বিশেষতঃ হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় রচিত মূল বাইবেলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁর উক্তি ও যুক্তিগুলিকে অকাট্য ক'রে তুলেছিল।

রামমোহন তাঁর তৃতীয় তথা শেষ আবেদনপত্রের ভূমিকায় লেখেন যে, তিনি পরবর্তী এপ্রিল মাস থেকে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করতে চান। ঐ পত্রিকায় খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা থাকবে এবং ইউনিটারিয়ান ও ট্রিনিটারিয়ান উভয় মতবাদের সমর্থনে ও বিপক্ষে কোন মিশনারি নিবন্ধ পাঠালে তা ছাপা হবে। রামমোহনের এই ঘোষণায় আর. টাইলার নামে এক ডাক্তার খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বের সমর্থনে খ্রীষ্টান জগতের পক্ষ থেকে রামমোহনকে প্রকাশ্যে বা ব্যক্তিগতভাবে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন। রামমোহন বললেন, টাইলার ত্রীশ্বরবাদের সমর্থনে লেখা পাঠাতে পারেন, অবশ্য তা কোনও মিশনারির দ্বারা স্বাক্ষরিত হওয়া চাই। কারণ, তিনি খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিব সঙ্গেই আলোচনা করতে চান। যাঁরা এ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাঁদের সঙ্গে নয়।

রামমোহনের এই জবাব ডাঃ টাইলারকে আরও ক্ষিপ্ত ক'রে দিলো। তিনি ৩০ এপ্রিল তারিখের (১৮২৩) বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় রামমোহনের বিরুদ্ধে বিষ বর্ষণ করলেন। পরদিন রামমোহন বেঙ্গল হরকরায় লিখে জানালেন যে, তিনি ভূমিকায় মিশনারিদেরই আলোচনায় আহ্বান জানিয়েছিলেন, ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের নয়। তবে ডাঃ টাইলারের মতো ব্যক্তিদের সঙ্গে কিভাবে লড়াই করতে হয়, তা-ও রামমোহনের অজানা ছিল না। তিনি রাম দাস (Ram Doss) ছদ্মনামে ইংরেজীতে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। পুস্তিকাটির নাম—A Vindication of the Incarnation of Deity as the common basis of Hinduism and Christianity against the schismatic attacks of R. Tyler Esq. M. D.

এই পুস্তিকায় রামমোহন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সঙ্গে ট্রিনিটারিয়ান খ্রীষ্টানদের অবতারবাদে বিশ্বাসী হিন্দুদের সঙ্গে হাত মেলাতে বললেন। কারণ, তাঁরা সগোত্র। ট্রিনিটারিয়ানরা যেমন যিশুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন, হিন্দুরাও তেমনি রামের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন। তাই তাঁদের মিলনের একটা সমতল ক্ষেত্র আছে। ট্রিনিটারিয়ানদের এক ঈশ্বরের মধ্যে তিন ঈশ্বর এবং হিন্দুদের তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ দেবদেবী প্রায় একই।

রামমোহন নিতান্ত বিদ্রূপের ছলে ত্রীশ্বরবাদী খ্রীষ্টান ও বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী হিন্দুদের হাত মেলাতে বলেছিলেন। ট্রিনিটারিয়ান খ্রীষ্টানদের খোঁচা দেওয়ার জন্য রামমোহন এ-কথা লিখলেও, প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামপুরের ট্রিনিটারিয়া খ্রীষ্টান মিশনারিরা ঐ পথই অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা রামমোহনের ইউনিটারিয়ানিজম্ বা বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য গোঁড়া সংরক্ষণপন্থী হিন্দুদের সঙ্গেও হাত মিলিয়েছিলেন। তাই রামমোহনের 'Vindication of Incarnation' পুস্তিকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লক্ষ্য যে শ্রীরামপুরের পাদরিরাও ছিলেন, তা সহজেই বলা চলে।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল 'সমাচার-দর্পণে' "ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী"-প্রেরিত চারি প্রশ্ন-সম্বলিত একখানি পত্র প্রকাশিত হ'লো। অবশ্য, 'সমাচার-দর্পণ'-সম্পাদক পত্রশেষে এই মন্তব্য করলেন যে, "এই পত্র অনেক বিশিষ্ট লোকের অনুরোধে দর্পণে অর্পণ করিলাম কিন্তু আমরা পরস্পর বিরোধের সহকারী নহি এবং যদ্যপি কেহ ইহার উপযুক্ত শাস্ত্রীয় উত্তর পাঠান তাহাও আমরা দর্পণে স্থান দিব।"

রামমোহন এই 'চারি প্রশ্ন'-এর উত্তর 'সমাচার-দর্পণ' পত্রিকায় না পাঠিয়ে পুস্তিকাকারে 'চারি প্রশ্নের উত্তর' ছাপান (মে, ১৮২২)। 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' তাঁর প্রথম প্রশ্নে বলেছিলেন যে, "ইদানীন্তন ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি-বিশেষেরা এবং তৎসংসর্গী গড্ডরিকাবলিকাবৎ গতানুগতিক অনেক ধনী লোকেরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়া স্বজাতীয় ধর্ম কর্ম পরিত্যাগপূর্বক বিজাতীয় ধর্ম কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এতাদৃশ সাধু সদাশয় বিশিষ্ট সন্তান সকলের সহিত সংসর্গ··· ভদ্রলোকের অবশ্য অকর্তব্য কি না।" অর্থাৎ, রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা যাঁরা ইউরোপীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করেন তাঁদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক অবশ্য কর্তব্য কি না।

রামমোহন এই প্রশ্নের উত্তরে লিখলেন :

> যে ব্যক্তি স্বয়ং এবং পিতা ও পিতামহ তিন পুরুষ ক্রমশঃ ম্লেচ্ছের দাসত্ব করে সে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি যে নিজে ম্লেচ্ছের চাকরি করিয়াছে তাহাকে স্বধর্মচ্যুত ও ত্যাজ্য কহে তবে তাহাকে কি কহি। যদি এক ব্যক্তি যবনের কৃত মিসি প্রায় নিত্য দন্তে ঘর্ষণ করে ও যবনের চোয়ানো গোলাব ও আতর এসকল জলীয় দ্রব্য সর্বদা

আহারাদিকালে ও অন্য সময়ে শরীরে রক্ষণ করে, কিন্তু অন্যকে কহে যে তুমি যবন স্পর্শ করিয়া থাক অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত ত্যজ্য হও এরূপ বক্তাকে কি কহা যায়। ও এক ব্যক্তি নিজে যবন ও ম্লেচ্ছের নিকটে যাবনিক বিদ্যার অভ্যাস করে ও মনু মহাভারতাদির বচনকে সমাচারচন্দ্রিকা ও সমাচারদর্পণ যাহা সে ব্যক্তির জ্ঞাতসারে অনেক ম্লেচ্ছ লইয়া থাকে তাহাতে ছাপা করায় কিন্তু অন্যকে কহে যে তুমি যবন শাস্ত্র পড়িয়াছ ও শাস্ত্রের অর্থকে ছাপা করাইয়াছ সুতরাং স্বধর্ম্মচ্যুত হও তবে তাহাকে কি শব্দ কহিতে পারি। আর যদি এক ব্যক্তি বহুকাল ম্লেচ্ছ সেবা ও ম্লেচ্ছকে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া এবং ন্যায়দর্শনের অর্থ ভাষাতে রচনাপূর্বক ম্লেচ্ছকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে সে আস্ফালন করিয়া অন্যকে কহে যে তুমি ম্লেচ্ছের সংসর্গ কর ও দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়া ম্লেচ্ছকে দেও অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত হও তবে সে ব্যক্তিকে কি করা যায়। ..বিশেষতো দুই স্বধর্ম্মচ্যুতের মধ্যে একজন আপনার ত্রুটি স্বীকার ও আপনাকে অপরাধ অঙ্গীকার ও দ্বিতীয় ব্যক্তি আপনাকে পবিত্র জানিয়া অন্যকে প্রাগলভ্যপূর্বক স্বধর্মরাহিত্য দোষ দেখাইয়া ত্যজ্য কহে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি কি শব্দ ব্যবহার করা যায়।· ·

এইভাবে রামমোহন যুক্তি ও শাস্ত্রীয় উক্তির দ্বারা 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী'র প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিলেন। "ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" ছদ্মনাম গ্রহণ করলেও এই ব্যক্তি যে কে ছিলেন, রামমোহন তা জানতেন। তাই তাঁর উত্তরে 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী'র ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট শ্লেষ ও বিদ্রূপ ছিল।

'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' ছদ্মনামে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 'চারি প্রশ্ন' লিখেছিলেন। তিনি ঐ সময়ে উইলিয়ম কেরীর অধীনে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে একজন সহকারী পণ্ডিত ছিলেন এবং ইংলণ্ড থেকে আগত সিবিলিয়ানদের বাংলা শেখাতেন। তিনি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 'ন্যায়দর্শন' নামে একটি পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেন। তাঁর অনুরোধে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ ন্যায়দর্শনের দশ কপি পঞ্চাশ টাকা দাম দিয়ে কেনেন।

রামমোহনের উপরি-উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে ঐ সবেরই ইঙ্গিত আছে। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন উইলিয়ম কেরীর অধীনে চাকরি করতেন। তাই শ্রীরামপুরের পাদরিদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নিশ্চয় ছিল। সুতরাং 'চারি প্রশ্ন' রচনা ও প্রকাশনার পেছনে যে শ্রীরামপুরের পাদরিদের নেপথ্য-হস্ত ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। রামমোহনের বিরুদ্ধে ত্রীশ্বরবাদী খ্রীষ্টান ও অবতারবাদী হিন্দুরা যে হাত মিলিয়েছিলেন, তা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। A Vindication of Incarnation-এ রামমোহন নিশ্চয় তারই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

রামমোহনের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' প্রকাশিত হ'লে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তার প্রত্যুত্তরে "পাষণ্ড-পীড়ন" নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তক পাথুরেঘাটা ঠাকুর-পরিবারের হরিমোহন ঠাকুরের পুত্র উমানন্দন (বা নন্দলাল) ঠাকুরের নির্দেশে লিখিত হয়। 'পাষণ্ড-পীড়নে'ও কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন নিজের নাম গোপন রেখে 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' ছদ্মনাম গ্রহণ করেন।

এই পুস্তকে কাশীনাথ রামমোহনকে "পাষণ্ড", "নগরান্তবাসী" প্রভৃতি নানা কটূক্তি করেন। রামমোহন কলকাতার পূর্ব সীমায় অবস্থিত মানিকতলায় বাস করতেন, সেই অর্থে তাঁকে "নগরান্তবাসী" বলা যেতে পারে। কিন্তু নগরান্তবাসীর অন্য এক অর্থ চণ্ডাল।

রামমোহন 'পাষণ্ড-পীডনের' উত্তরে প্রকাশ করেন তাঁর 'পথ্যপ্রদান' নিবন্ধ। এর ইংরেজী অনুবাদ-ও তিনি প্রকাশ করেন। নাম Medicine for the Sick offered by one who laments his inability to perform all righteousness. 'পথ্যপ্রদান' ও Medicine for the Sick ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

রামমোহন তাঁর এই নিবন্ধে 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' নামধারী ব্যক্তিকে 'ধর্মসংহারক' আখ্যা দেন। তিনি ভূমিকায় লেখেন :

> সমগ্র পুস্তক প্রায় দুর্বাক্যে পরিপূর্ণ হয়। ইহাতে এই উপলব্ধি হইতে পারে যে দ্বেষ ও মৎসরতায় কাতর হইয়া ধর্মসংহারক শাস্ত্রীয় বিবাদছলে এইরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্তঃকরণের ক্ষোভ নিবারণ করিতেছেন, অন্যথা দুর্বাক্য প্রয়োগ বিনা শাস্ত্রীয় বিচার সর্বথা সম্ভব ছিল।...

রামমোহন এবং তাঁর অনুগামীরাও অনুরূপ কটূক্তি ও কদুক্তি করতে পারেন বা পারতেন। কিন্তু তা থেকে তাঁরা বিরতই থাকবেন। তার অন্যতম কারণ হিসাবে রামমোহন লিখেন যে :

> বালক ও পশ্বাদির হিতকরণে ও চিকিৎসাসময়ে তাহারা আস্ফালন ও চীৎকার এবং বিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা যদি করে ও হিংসাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে ঐ অবোধ প্রাণীর চীৎকারাদির পরিবর্ত না করিয়া দয়ালু মনুষ্যেরা তাহাদের হিতেচ্ছা হইতে ক্ষান্ত হয়েন না, সেইরূপ আমাদের হিতৈষার বিনিময়ে ধর্মসংহারকের বিরুদ্ধ চেষ্টায় ও দ্বেষ প্রকাশে আমরা রাগাপন্ন না হইয়া ওই প্রত্যুত্তরের উত্তরে শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ততোধিক স্নেহ প্রকাশ করিতেছি।...

রামমোহন এই সুদীর্ঘ নিবন্ধে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের চারি প্রশ্নের আরও বিশদ জবাব দেন। তাঁর সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞান, বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য, অখণ্ডনীয় যুক্তি ও ক্ষুরধার শ্লেষ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

এইভাবে রামমোহন একদিকে গোঁড়া ত্রীশ্বরবাদী খ্রীষ্টান পাদরির দল এবং অন্যদিকে অজ্ঞ পণ্ডিতম্মন্য সঙ্কীর্ণচেতা হিন্দু ব্রাহ্মণের দলকে সব্যসাচীর মতো দক্ষিণে ও বামে সংগ্রাম ক'রে ধরাশায়ী করেছিলেন। তাঁদের মিলিত শক্তিও একা রামমোহনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।

তিনি যখন এই সকল ধর্মীয় তর্কযুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তখনই ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল পুরীতে রামমোহনের মাতার মৃত্যু হয়েছিল। মাতার মৃত্যু-সংবাদ যথাসময়ে রামমোহন পেয়েছিলেন কিনা, এবং পুত্রের করণীয় অনুষ্ঠানাদি তিনি করেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে মাতৃবিয়োগ যে তাঁর যথেষ্ট বেদনার কারণ ছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অন্যান্য দিক থেকেও তাঁর মানসিক উদ্বেগ এই সময় থেকে বাড়তে থাকে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর মামলার শেষ শুনানি হয়ে গিয়েছিল এবং রামমোহন তাতে জয়লাভ করেছিলেন। তারপর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে জগমোহন-পত্নী দুর্গা দেবী রামমোহনের নামে যে মামলা করেছিলেন, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সে মামলা ডিসমিস হয়ে গিয়েছিল। ধর্মীয় কারণই যে এইসব বিরোধ ও মামলার পেছনে ছিল, তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট ছিল। এইসব মামলায় জয়লাভের পর রামমোহন প্রায় দেড় বছর মামলা-মকদ্দমার ঝামেলা থেকে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ তাঁকে অপ্রত্যাশিতভাবে পুনরায় মামলায় জড়িয়ে দিলো। অকস্মাৎ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ রামমোহন ও গোবিন্দপ্রসাদের নামে তিনটি মামলা আনলেন। এ মামলায় গোবিন্দপ্রসাদকে অন্যতম পক্ষ করা হ'লেও রামমোহনই ছিলেন মামলার প্রধান লক্ষ্য। মামলাগুলি কলকাতার প্রাদেশিক আদালতে আনা হ'লো। অভিযোগ—রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় তার ঋণের জন্য মহারাজা তেজচাঁদের কাছে যে তিনটি কিস্তিবন্দি চুক্তি করেছিলেন, তা রামকান্ত রক্ষা করেন নি এবং এখন তেজচাঁদের প্রাপ্য হয়েছে তিনটি কিস্তিবন্দি অনুসারে যথাক্রমে ১২,৬২৪ টাকা, ৫৬,৮০৭ টাকা ও ১৫,২০০ টাকা—অর্থাৎ একুনে প্রায় ৮৫ হাজার টাকা।

রামমোহনের প্রতিপক্ষ ছিলেন অতীব বিত্তশালী ব্যক্তি—বর্ধমানের মহারাজা। দাবির পরিমাণ-ও ছিল বিপুল। সুতরাং এই মামলা যে রামমোহনের মানসিক শান্তি অত্যন্ত বিঘ্নিত করেছিল, তা সহজেই অনুমান করা চলে।

রামমোহন তাঁর আত্ম-সমর্থনে বলেন যে, এ একটি মিথ্যা মামলা, তাঁকে জব্দ করবার জন্যই উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবেই আনা হয়েছে। তার ভাগিনেয় গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর অতিশয় অনুরাগী ও অতীব স্নেহের পাত্র। গুরুপ্রসাদ মহারাজা তেজচাঁদের পুত্র

প্রতাপচাঁদের দেওয়ান ছিলেন এবং প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নীদের তেজচাঁদ স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা করলে গুরুপ্রসাদ তাঁদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং তেজচাঁদের কবল থেকে তাঁর বিধবা পুত্রবধূদের ন্যায্য উত্তরাধিকার রক্ষা করেন। মহারাজা এই আক্রোশের বশে গুরুপ্রসাদকে জব্দ করতে না পেরে তাঁর মাতুল রামমোহনকে জব্দ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। রামমোহন আত্ম-সমর্থনে আরো বলেন যে, তাঁর পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি তাঁর পিতা ও পরিবার থেকে পৃথক হয়েছেন, স্বতন্ত্রভাবে নিজে অর্থোপার্জন করেছেন এবং পিতার কোনও উত্তরাধিকার গ্রহণ করেন নি। সুতরাং পিতার ঋণের জন্য তিনি কোনমতেই দায়ী হ'তে পারেন না। তাছাড়া, প্রায় বিশ বছর পূর্বে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে। সময়ের দিক থেকেও কিস্তিবন্দি চুক্তিগুলির তামাদি হয়ে গেছে।

প্রাদেশিক আদালত রামমোহনের পক্ষে খরচাসমেত মামলা ডিসমিস ক'রে দিলেন। তখন মহারাজা তেজচাঁদ সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করলেন। সদর দেওয়ানী আদালত-ও শেষ পর্যন্ত মামলাগুলি খরচাসহ ডিসমিস ক'রে দিলেন। কিন্তু এই মামলাগুলি দীর্ঘকাল ধ'রে চলেছিল। মহারাজা তেজচাঁদ রামমোহনের নামে যে তিনটি মামলা এনেছিলেন, তার প্রথমটির রায় বেরিয়েছিল ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর এবং শেষটির রায় বেরিয়েছিল ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর। সুতরাং এইসব মামলা যে রামমোহনের প্রচুর অর্থব্যয় ও মানসিক উদ্বেগের কারণ হয়েছিল এবং তাঁর মূল্যবান সময় ও শক্তির অপচয় ঘটিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তাঁর নিজের নামে এই মামলাগুলি তাঁকে যতো না উদ্বিগ্ন করেছিল, তার শতগুণ উদ্বিগ্ন করেছিল তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদের নামে আনীত মামলা। এ মামলাটিও রামমোহনের প্রতিপক্ষ দলের চক্রান্তের ফলেই হয়েছিল। সে মামলা আরো দু বছর পরের ঘটনা। তা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করবো।

৮

সাংবাদিকতা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সংগ্রাম

রামমোহন যখন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকে তাঁর জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তখন বুঝেছিলেন, এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশের মানুষকে তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন ক'রে তোলা—তার বিবেকবুদ্ধির জড়তা দূর করা। এজন্য প্রয়োজন দেশে শিক্ষার বিস্তার। টোল, চতুষ্পাঠী ও মাদ্রাসাগুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, তা এদেশের মানুষকে কেবল অতীত সম্পর্কে সচেতন ক'রে তোলে, তাকে অতীতকে আঁকড়ে ধরতে শেখায়, তা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন না ক'রে অতীতের স্মৃতি ও গৌরব দিয়ে বর্তমানের দীনতাকে হীনতাকে ঢাকতে সাহায্য করে।

রামমোহন জানতেন, আজকের জগতে পাশ্চাত্য দেশ এতো অগ্রসর ও শক্তিশালী হয়েছে, তার প্রধান কারণ তার চিন্তাধারায় বিপ্লব এসেছে ; সে অতীতকে সম্বল ক'রে বর্তমানের সমুদ্রে পাড়ি দেয় নি। সে গ্রীক-লাতিন ভাষা ও সাহিত্যের সম্পদকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু তাকেই সম্বল ক'রে ও আশ্রয় ক'রে থাকে নি। বর্তমানকে স্বীকার ক'রে দেশে দেশে সাধারণ মানুষের ভাষাকে—মাতৃভাষাকে—সিংহাসনে বসিয়েছে। অতীতের চিন্তাকেই সম্বল ক'রে থাকে নি, নব নব চিন্তায় উদ্বোধিত হয়েছে, বাস্তব থেকে ও অভিজ্ঞতা থেকে নব নব জ্ঞান আহরণ করেছে। শাস্ত্রবচনের চেয়ে যুক্তিকে, অধীত বিদ্যার চেয়ে অভিজ্ঞতাকে, পাণ্ডিত্যের চেয়ে প্রত্যক্ষকে অধিকতর মর্যাদা দিয়েছে। তাদের চিন্তায় এসেছে বিপ্লব, প্রাচীন বিদ্যার গলাধঃকরণ ও রোমন্থনেই তাদের বিদ্যা সীমাবদ্ধ থাকে নি, তা আত্মীকরণের দ্বারা নব নব বিদ্যার জন্ম দিয়েছে। তারা অজ্ঞাতকে করেছে আবিষ্কার, অনধিগতকে করেছে অধিকার, তাই তারা বিদ্যার সঙ্গে শক্তিরও অধিকারী হয়েছে। সে শিক্ষায় মানুষের মন অতীতের অচলায়তনের মধ্যে বাঁধা পড়ে নি, তা অতীত থেকে শক্তি সংগ্রহ ক'রে বর্তমানের তোরণ পার হয়ে ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হয়েছে।

তাই রামমোহন মাতৃভাষাকে যেমন সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিলেন, তেমনি সচেষ্ট হয়েছিলেন পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার—আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার—সঙ্গে ভারতবাসীকে পরিচিত করাতে। তিনি জানতেন, ভারতবাসী পাশ্চাত্য-চিন্তাধারার

সঙ্গে পরিচিত হ'লে সে কেবল ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হবে না, সে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকেও লাভবান্ হবে।

তাই রামমোহন যখন কলকাতায় এসে স্থায়িভাবে বসবাস করছিলেন, এবং সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তখন দেশে শিক্ষা-বিস্তার সম্পর্কে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করতেন। এই আলোচনারই ফলশ্রুতি হয়েছিল কলকাতায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা। হিন্দুদের শিক্ষার প্রয়োজনেই রামমোহন সেদিন আত্মাভিমান ত্যাগ ক'রে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে কিভাবে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিলেন, তা আগেই বলা হয়েছে। সেদিন হিন্দু কলেজের সঙ্গে রামমোহনকে জড়িত থাকতে দেওয়া হয় নি ব'লে তখনকার রক্ষণশীল হিন্দুরা আনন্দ-প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বিলাত-প্রবাসকালে (১৫ অক্টোবর, ১৮৩১) সে আনন্দ স্মৃতি 'সমাচার দর্পণে' জনৈক গোঁড়া হিন্দুর পত্রে প্রকাশ পেয়েছিল :

> রামমোহন রায় হিন্দুদের অগ্রাহ্য হইলেন ইহারো এক প্রমাণ লিখি। অনেকের স্মরণ থাকিবে যে পূর্বের চিফ জাস্টিস সর এডবার্ড হাইড ইস্ট যখন হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন তখন নগরস্থ প্রায় সকল ভাগ্যবন্ত লোক উক্ত সাহেবের অনুরোধে এবং দেশের মঙ্গল বোধে অনেক অনেক টাকা চান্দা দিলেন ইহাতে হাইড ইস্ট সাহেব তুষ্ট হইয়া কলেজের নিয়ম করিয়াছিলেন তাহাতে এতদ্দেশীয় মহাশয়দের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া ঐ পাঠশালার কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন তন্মধ্যে রামমোহন রায় গ্রাহ্য হইলেন না যেহেতু তাবৎ হিন্দুর মত নহে। রামমোহন রায় হিন্দুদের সমাজে গ্রাহ্য হওয়া দূরে থাকুক তাহার সহিত সহবাস ছিল এই অপবাদে একজন অতিমান্য লোকের সন্তান এবং অনেক ধনদানে বিলক্ষণ সক্ষম তিনিও তৎপদে নিযুক্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহাকে তৎপদাভিষিক্ত করণাশয়ে সদর দেওয়ানী জজ মেং হেরিংটন সাহেব বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহাও রক্ষা হইল না।

এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার যিনি প্রবর্তক, তাঁকেই এদেশের প্রথম পাশ্চাত্য-শিক্ষালয় থেকে দূরে সরিয়ে রেখে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ আনন্দে উৎফুল্ল হ'লেও পরবর্তী কালের মানুষ তাতে সন্তুষ্ট হয় নি। হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের অন্যতম কৃতী ছাত্র ও 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অন্যতম পুরোধা রসিককৃষ্ণ মল্লিক গোঁড়া হিন্দু সমাজের এই কাজকে ঘৃণার সঙ্গে ভর্ৎসিত করেছিলেন। তিনি রামমোহনের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে (২ এপ্রিল, ১৮৩৪) টাউন হলে অনুষ্ঠিত রামমোহনের স্মৃতিসভায় বলেছিলেন :

> Not being held in that respect that he should have been by his countrymen, he was prevented from doing all the good

that he would have done. I allude to his not being allowed to join an institution in which he might have been of the greatest service to his country.

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ রামমোহনকে হিন্দু কলেজ থেকে দূরে রাখলেও রামমোহন জনশিক্ষা ও দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি বিস্তারের ক্ষেত্র থেকে নিজেকে কখনও দূরে রাখেন নি। কারণ, তিনি জানতেন, জনশিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির বিস্তারের দ্বারাই তিনি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকে প্রচণ্ডতম আঘাত দিতে পারবেন—পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তারই একদিন রক্ষণশীল সমাজের দুর্ভেদ্য দুর্গের ভিত্তিকে ভেঙে চুরমার ক'রে দেবে।

পরবর্তী কালে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন ইউনিটারিয়ান কমিটির পক্ষ থেকে নিজ ব্যয়ে হেদুয়া পুষ্করিণীর (আজাদ-হিন্দ্ বাগ) দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা, বাংলা ভাষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হ'তো। রামমোহন যেমন আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, তেমনি তিনি কেবল জ্ঞানার্জনকেই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করতেন না। শিক্ষা দ্বারা মানুষের মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশও সাধিত হবে, রামমোহন এই শিক্ষাদর্শ পোষণ করতেন। তাই রামমোহন তাঁর বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষারও ব্যবস্থা রেখেছিলেন। রামমোহন ইংরেজী ভাষা শিক্ষার পক্ষপাতী হ'লেও, মাতৃভাষার ব্যাকরণ আয়ত্ত করবার পূর্বে কোনও বিদেশী ভাষা শেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। এই বিদ্যালয়ের জন্য বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে সামান্য চাঁদা নিলেও প্রায় সমস্ত ব্যয়ভারই তিনি নিজে বহন করতেন। এই বিদ্যালয়ের কাজকর্ম রামমোহনের নিজের নির্দেশ অনুসারেই হ'তো। তবে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা ঠিকমতো চলছে কিনা তা দেখবার জন্য ডেভিড হেয়ার, রেঃ উইলিয়ম অ্যাডাম প্রভৃতির মতো ব্যক্তিরা নিয়মিতভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শন করতেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় সম্পর্কে রেঃ অ্যাডাম লিখেছিলেন: "এই বিদ্যালয়ে দুজন শিক্ষক আছেন. তাঁদের একজনকে মাসিক ১৫০ টাকা ও অন্য জনকে মাসিক ৭০ টাকা মাইনে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে ৬০ থেকে ৮০ জন হিন্দু বালক ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা লাভ করে। খ্রীষ্টীয় মতবাদগুলির চর্চা করা হয় না, তবে নৈতিক কর্তব্যগুলি সযত্নে শেখানো হয় এবং যে সকল ছাত্র সাধারণ ইতিহাস বুঝবার মতো সামর্থ্য রাখে, তাকে খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসের তথ্যাদি শেখানো হয়।"

এই বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়, রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু প্রভৃতির মতো পরবর্তী কালের বিখ্যাত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ছাত্র ছিলেন।

রামমোহন দেখেছিলেন, ইউরোপ-আমেরিকায় জনশিক্ষার অন্যতম প্রধান বাহন ছিল সংবাদপত্র। তিনি নিজে ইংরেজী ভাষা শিখবার পর থেকে ইউরোপীয় সংবাদপত্রগুলি নিয়মিত পড়তেন এবং তা তাঁর চিন্তাধারার বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ভারতেও কিছুসংখ্যক ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু তা এদেশের জনসাধারণ তখনও ইংরেজী ভাষা না জানায় এদেশীয় লোকদের কোনও কাজে আসছিল না। রামমোহন তাঁর শিষ্যদের বলতেন, "যদি জল ফুটাতে চাও, তবে কড়াইয়ের তলায় তাপ দাও।" অর্থাৎ, জনসাধারণকে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সবদিক থেকে সচেতন ও সক্রিয় ক'রে তুলতে না পারলে সমাজের উপরতলার কিছু সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে চিন্তাধারার পরিবর্তন এনে সমাজ-বিপ্লব সাধিত হ'তে পারে না। এই কড়াইয়ের তলায় তাপ দিতে হ'লে এদেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের প্রয়োজন সর্বাধিক। তাই রামমোহন কলকাতায় স্থায়িভাবে বসবাস করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এদেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে উৎসাহী ও উদ্যোগী হয়েছিলেন।

কিন্তু ঐ সময়ে সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে অন্তরায় ছিল অনেক। এদেশে কয়েকটি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হ'লেও সাংবাদিকতার মান উচ্চ ছিল না।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জেম্‌স্‌ অগাস্টাস হিকি কলকাতায় প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র Hicky's Gazette প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু হিকি সাহেব না ছিলেন সাহিত্যিক, না ছিলেন সাংবাদিক। তাই তাঁর কাগজে কিছু কিছু চমকপ্রদ খবর, ব্যঙ্গরস, গালগল্প ও কেচ্ছাই ছাপা হ'তো। তা হ'লেও হিকির দান অস্বীকার করা যায় না। তখনকার দিনে সংবাদপত্রের কর্তব্য ছিল সরকারকে অন্ধভাবে সমর্থন করা। তা না হ'লে সরকারী দমন-নীতির খড়্গ ঘাড়ে এসে পড়া অনিবার্য ছিল। হিকি তাই সরকারী নীতি ও সরকারের সমালোচনা করতেন না। কিন্তু সরকারের উচ্চতম কর্মচারীর ব্যক্তিগত জীবনের মসীচিত্র তুলে ধরতে বিন্দুমাত্র পশ্চাদ্‌পদ হ'তেন না। হেস্টিংস্‌ ও ক্লাইভের মতো লোকরাও বাদ পড়তেন না। হেস্টিংসের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে হিকি সাহেব প্রায়ই খোঁচা দিয়ে লিখতেন। শেষ পর্যন্ত হিকিকে গ্রেপ্তার ক'রে এদেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। তিনি দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যেই মারা যান।

এডমাণ্ড বার্ক ইংলণ্ডের হাউস অব কমন্সে সাংবাদিকদের আসনের দিকে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন "Yonder sits the Fourth Estate." ফরাসী বিপ্লবের সময়ে অভিজাত শ্রেণী, যাজক শ্রেণী ও জনসাধারণ, রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান অংশ বা Estate-এর কথাই বিঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে দেশের সাংবাদিকরা যে একটি অংশ গ্রহণ করছেন, ক্রমেই চতুর্থ Estate-এ পরিণত হচ্ছেন, তা ঐ যুগের বাগ্মীশ্রেষ্ঠ এডমাণ্ড

বার্ক ঘোষণা করেছিলেন। ভারতবর্ষেও সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা আজ শক্তিশালী Fourth Estate-এ পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষে এই Fourth Estate-এর বীজ বপন করেছিলেন জেম্‌স্‌ হিকি। তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন: I have no propensity, I was not bred to a slavish life of hard work. Yet I take a pleasure in enslaving my body in order to purchase freedom for my mind and soul."

Freedom for mind and soul!—এর চেয়ে সাংবাদিকদের উচ্চাদর্শ কি হ'তে পারে! এর জন্য তাঁকে নির্বাসন ও দারিদ্র্য বরণ করতে হয়েছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা সাংবাদিকদের ঘৃণা ও সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। নানাভাবে তারা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের দমন করতেন। কিন্তু এদেশে বৃটিশ ব্যবসায়ীদের নিজেদের প্রচার ও স্বার্থরক্ষার জন্যও সংবাদপত্রের প্রয়োজন ছিল। তাই সরকার এমন সব সংবাদপত্র ও সাংবাদিক চাচ্ছিল যারা এদেশে ইংরেজ শাসন ও ইংরেজ ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত ও তৎপর থাকবে।

কিন্তু ঐ সময় ছিল বিপ্লবের যুগ। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, ইউরোপে নেপোলিয়নের আবির্ভাব সকল কিছু ঘটনাই সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের কাছে লোভনীয় ছিল। আমেরিকা ও ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের বৈরী সম্পর্ক থাকায় এবং ইংলণ্ডের বহু ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও পরাজয় ঘটায়, সেসব সংবাদ ইংরেজদের পক্ষে মুখরোচক ও তাদের মর্যাদারক্ষার পক্ষে অনুকূল ছিল না। তাছাড়া, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসী বিপ্লব যে 'স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের' বাণী উদ্‌ঘোষিত করেছিল, তাতে বিবেকবান্ সাংবাদিকমাত্রেই সাড়া না দিয়ে পারতেন না। তাই সরকারের বাধানিষেধ ও কড়া নজর উপেক্ষা ক'রে প্রায়ই ইংরেজ-বিরোধী সংবাদ ও মন্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'তো। ফলে, সাংবাদিকদের উপরে নির্যাতনের খড়্গ প্রায়ই নেমে আসতো,—সতর্কবাণী, শাস্তি, এমনকি এদেশ থেকে বিতাড়ন প্রায়ই চলতো। Indian World-এর সম্পাদক উইলিয়ম ডুয়েন (William Duane), Bengal Harkura-র সম্পাদক ম্যাক্‌লীনকে গ্রেপ্তার ক'রে এদেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। অথচ এদেশে সংবাদপত্রের চাহিদা অত্যন্ত বেড়েছিল, ইংরেজ ও ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা সংবাদপত্র পাঠের জন্য লোলুপ হয়ে থাকতো। সেজন্য সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য এইসব সরকারী বাধানিষেধ, ভয়ত্রাস ও নির্যাতন সত্ত্বেও অনেকেই এগিয়ে আসতেন। তারা সরকারের সমালোচনার পথ পরিহার ক'রে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশ করতেন। কিন্তু কোম্পানির কর্তৃপক্ষের শ্যেনদৃষ্টি তাঁদের ওপর সতত বিরাজ করতো। সংবাদপত্রের প্রথম যুগে এদেশে India Gazette, Bengal

Journal, Oriental Magazine, Indian World, Bengal Harkura প্রভৃতি কয়েকটি ইংরেজী সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রচলিত ছিল।

সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা ও সংবাদপত্রের সরকার-বিরোধিতা নিবারণ, এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সেন্সরশিপ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করেন। তাঁর নির্দেশে বলা হয়, সংবাদপত্রের মুদ্রককে সংবাদপত্রের তলায় নিজের নাম ছাপতে হবে, প্রত্যেক সংবাদপত্রের সম্পাদক ও মালিককে তাদের নাম ও ঠিকানা সরকারের সেক্রেটারিকে জানাতে হবে, রবিবারে কোনও সংবাদপত্র প্রকাশিত হ'তে পারবে না, কোন সংবাদপত্র সরকারের সেক্রেটারি বা তাঁর নিয়োজিত ব্যক্তির দ্বারা আগে পরীক্ষা না করিয়ে প্রকাশ করা চলবে না। উপরি উক্ত নির্দেশগুলির কোন একটি অমান্য করলে অবিলম্বে জাহাজযোগে এদেশ ত্যাগ করতে হবে। ঐ নির্দেশদানকালে এদেশীয় কোনও লোক সংবাদপত্রের মালিক, সম্পাদক বা মুদ্রক ছিলেন না, তাই এদেশ থেকে বিতাড়নই কঠোরতম শাস্তি ছিল।

ইংরেজ মালিক, সম্পাদক ও মুদ্রকের দ্বারা প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি স্বভাবতঃই ইংরেজদের স্বার্থরক্ষাতেই তৎপর ছিল। এগুলির পাঠকও ছিল ইংরেজরা ও ইংরেজী শিক্ষিত এদেশের মুষ্টিমেয় ভদ্রলোক।

এদেশের জনসাধারণের জন্য এদেশীয় মালিকানায় ও সম্পাদনায় এদেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা চিন্তা করছিলেন। কিন্তু সরকারের ঐ সমস্ত বিধিনিষেধ ও সেন্সরশিপ ব্যবস্থা মেনে নিয়ে সংবাদপত্র প্রকাশ করা তাঁর বিবেক ও আত্মমর্যাদার অনুকূল ছিল না। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয়-সভা'য় যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হরচন্দ্র রায়। হরচন্দ্র রায় এদেশে একটি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশে উদযোগী হলেন।

ঐ সময়ে শ্রীরামপুরের পাদরিরাও এদেশে জনসাধারণের মধ্যে খ্রীষ্টীয় মতবাদ প্রচারের জন্য বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। তারা Friend of India নামে একটি ইংরেজী সংবাদপত্র ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছিলেন। তারা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'দিগদর্শন' নামে একটি বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরাও এখন বাংলা ভাষায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশে উদযোগী হলেন।

এইভাবে রামমোহনের উৎসাহে হরচন্দ্র রায়ের 'বঙ্গাল গেজেট' ও শ্রীরামপুরের পাদরিদের প্রকাশিত 'সমাচার-দর্পণ', বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র দুটি প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হ'লো। 'বঙ্গাল গেজেট', না 'সমাচার-দর্পণ' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র, তা নিয়ে মতদ্বৈত কিছুদিন আগে পর্যন্তও ছিল। কিন্তু এখন দেখা গেছে, India Gazette পত্রিকার ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ মে তারিখে 'বঙ্গাল গেজেট' প্রকাশিত

হচ্ছে, এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আর Oriental Star পত্রিকায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ মে সংখ্যায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, "...We observe with satisfaction that the publication of a Bangalee news-paper has been commenced",—একটি বাংলা সংবাদপত্রের প্রকাশ শুরু হয়েছে। বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার-দর্পণ' ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং ঐ সংবাদটি যে 'বঙ্গাল গেজেট' সম্পর্কেই ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ১৪ মে তারিখে India Gazette-এ বিজ্ঞপ্তি ও ১৬ মে Oriental Star পত্রিকায় প্রকাশনার সংবাদ থেকে বোঝা যায়, ১৫ মে (১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ) 'বঙ্গাল গেজেট' প্রকাশিত হয়েছিল এবং 'বঙ্গাল গেজেট' বাংলায় সর্বপ্রথম সংবাদপত্র ছিল। আত্মীয়-সভার সদস্যই এই পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, তাই আত্মীয়-সভা-প্রতিষ্ঠাতা রামমোহনকে ভারতীয় সংবাদপত্রের জন্মদাতা বললে নিশ্চয় অত্যুক্তি করা হবে না। 'বঙ্গাল গেজেটে'ই রামমোহনের সতীদাহ সম্পর্কে প্রথম নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল।

কয়েক বছরের মধ্যে ইউরোপীয় রাজনীতিতে বহুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এখন নেপোলিয়নের কৃষ্ণচ্ছায়া অপসারিত হয়েছিল এবং ইংলণ্ড ইউরোপীয় রাজনীতিতে যথেষ্ট সাফল্য ও প্রাধান্য অর্জন করেছিল। ভারতেও বৃটিশ শক্তি যথেষ্ট প্রসারলাভ করেছিল ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে, বৃটিশ কর্তৃপক্ষের মনোভাবেও কিছুটা উদারনীতি দেখা দিয়েছিল। তাই বড়লাট লর্ড হেস্টিংস সেন্সরশিপ-ব্যবস্থা শিথিল করেছিলেন। সরকারের সমালোচনা এবং এদেশীয়দের ধর্মীয় চেতনায় ও অনুভূতিতে আঘাত দেয় এমন কোনও রচনা ছাড়া অন্য সকল কিছুই সম্পাদকরা তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে দেশের আইন লঙ্ঘন না ক'রে ছাপতে পারবেন, লর্ড হেস্টিংস এই মর্মে একটি নির্দেশ দেন। সংবাদপত্রের এই শৃঙ্খল-মুক্তিকে রামমোহন স্বাগত জানান।

বড়লাট কর্তৃক এই নির্দেশদানের কিছুকাল পূর্বে কলকাতায় ইংরেজ সাংবাদিকদের মধ্যে একজন শক্তিশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, তিনি জেমস্-সিল্ক্ বাকিংহাম। বাকিংহামের সঙ্গে রামমোহনের প্রথম পরিচয়ের বর্ণনা আমরা আগেই দিয়েছি। তিনি ইংরেজী ভাষায় রামমোহনের দখল দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন। বাকিংহামের সঙ্গে রামমোহনের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব গ'ড়ে উঠেছিল। কারণ, বাকিংহাম ছিলেন সেইসব ভারতবন্ধু ইংরেজদের একজন, যাঁরা ইংরেজ হয়েও ইংরেজ শাসনের মন্দ দিকগুলির সমালোচনা করতে কখনও পশ্চাদ্‌পদ হতেন না। তাই বাকিংহাম যখন Calcutta Journal প্রকাশ করলেন, তখন রামমোহন যেমন তাঁর উৎসাহী সমর্থক হয়ে উঠলেন, তেমনি অল্প দিনের মধ্যেই Calcutta Journal কোম্পানির কর্মচারীকুল ও কর্তৃপক্ষের

চক্ষুশূল এবং ইংরেজী-শিক্ষিত এদেশীয়দের সর্বাধিক প্রিয় ইংরেজী সংবাদপত্র হয়ে উঠলো। এর প্রচার-সংখ্যা হাজারে গিয়ে দাঁড়ালো এবং বাকিংহামের বার্ষিক আয় দাঁড়ালো বছরে প্রায় আট হাজার পাউণ্ড।

এদেশীয় নানা অভাব-অভিযোগ মিল্‌ক্ বাকিংহাম তাঁর কাগজে তুলে ধরতেন। সরকারের কর্মচারীদের দুষ্কর্ম এবং ইংরেজদের এদেশে নানা অবিচার, স্বজনপোষণ ও অত্যাচারের কথাও তিনি নির্ভীকভাবে লিখতেন। বাকিংহামের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সরকারের সমর্থক ছিল 'জন বুল' পত্রিকা। এই 'জন বুল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্রেস্‌বিটারিয়ান পাদরি ডঃ ব্রাইস। বাকিংহাম সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। বাকিংহাম বলতেন, "সম্পাদকদের একটি পবিত্র অধিকার (sacred right) হ'লো to admonish governors of their duties, to warn them furiously of their faults and to tell disagreeable truth." রামমোহনও ছিলেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় পূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাঁদের সাংবাদিকতার আদর্শ প্রায় এক ছিল। রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে বাকিংহাম তাঁর কাগজে পূর্ণ সহানুভূতি জানাতেন। কিন্তু বাকিংহামের Calcutta Journal ছিল ইংরেজ ও ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য। সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকদের জন্য নয়। তাই লর্ড হেস্টিংস যখন সংবাদপত্রের সেন্সরশিপ-ব্যবস্থা তুলে দিলেন, তখন রামমোহন নিজেই বাংলা ভাষায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশে অগ্রসর হলেন।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে Calcutta Journal-এ একটি বাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি বেরুলো। পত্রিকার নাম "সম্বাদ-কৌমুদী"। বিজ্ঞপ্তিতে চাঁদার কথা বলা হ'লো—"We humbly solicit the support and patronage of all who feel themselves interested in the intellectual and moral improvement of our countrymen and confidently hope that they will with their liberality and munificence, condescend to gratify our most anxious wishes, by contributing to our paper a monthly subscription of rupees two,…"

রামমোহনের "সম্বাদ-কৌমুদী"র প্রথম সংখ্যা ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত হ'লো। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বাঙ্গালীদের উদ্দেশে সম্পাদকের বিবৃতিতে বলা হ'লো যে, জনহিতই এই পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য। রামমোহন বড়লাট হেস্টিংসকে সংবাদপত্র সম্পর্কে তাঁর উদারনীতির জন্যও ধন্যবাদ জানালেন। এই সংখ্যায় দরিদ্র মধ্যবিত্ত হিন্দু বালকদের শিক্ষার জন্য সরকারকে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যও অনুরোধ জানানো হ'লো। দ্বিতীয় সংখ্যায় বাঙ্গালীদের উদ্দেশে সংবাদপত্র

পাঠের উপযোগিতার কথা বর্ণনা করা হ'লো। রামমোহন কেবল সরকারকে জনহিতকর কার্যে উদ্যোগী হ'তে আহ্বান করেন নি। তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে নিজেদের উন্নতি-সাধনের ও অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সংঘবদ্ধভাবে সচেষ্ট হ'তে বারে বারে আহ্বান জানান। ঐ সময়ে চিৎপুর রোডে জল সরবরাহের জন্য তিনি জনসাধারণকে একটি তহবিল গঠন করতে বলেন। সরকারকে উত্তরাধিকারলাভের বয়স ১৫ থেকে বাড়িয়ে ২২ করতে পরামর্শ দেন। তিনি সরকারকে জুরির সাহায্যে বিচার মফঃস্বল, জেলা ও প্রাদেশিক আদালতগুলিতেও সম্প্রসারিত করতে অনুরোধ জানান। তৃতীয় সংখ্যায় তিনি হিন্দুদের শবদাহের জন্য শ্মশানঘাটের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বলেন। তিনি বলেন, সরকার ২ ন খ্রীষ্টানদের কবর দেওয়ার জন্য সুবিশাল প্রান্তরগুলি ফেলে রেখেছেন, তখন হিন্দুদের জন্য একটিমাত্র শ্মশানঘাট রাখা তাঁদের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ নয়। বাংলা দেশ থেকে ধান-চাল বাইরের অন্যান্য বন্দরে রপ্তানি বন্ধ করার জন্যও তিনি আবেদন জানান। এদেশীয় মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা যাতে ইউরোপীয় চিকিৎসকের চিকিৎসার সুযোগ পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করতেও তিনি সরকারকে আহ্বান জানান। দুর্গোৎসব প্রভৃতির ভাসান দেখতে যখন চিৎপুর রোডে এদেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা হাজারে হাজারে এসে জড়ো হয়, তখন সাহেবরা সেই ভীড়ের উপর দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যান এবং চাবুকের ঘায়ে, গাড়ির আঘাতে, ঘোড়ার পায়ে বালক-বালিকা, শিশু-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষকে আহত করেন, মানুষে চীৎকার ক'রে প্রাণভয়ে পাশের নর্দমায় পড়ে, পায়ের তলায় পিষ্ট হয়। রামমোহন এই ধরনের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ঐ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেজন্য কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেটদের তৎপর হ'তে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এইসব খ্রীষ্টান ভদ্রলোক তাঁদের আচরণের দ্বারা তাঁদের শাসনকে ও তাদের ধর্মকে এদেশীয়দের কাছে জনপ্রিয় ক'রে তুলতে পারছেন না। ষষ্ঠ সংখ্যায় তিনি কলকাতার হিন্দুদের অনাথা বিধবাদের জন্য একটি সাহায্য তহবিল খুলতে আহ্বান জানান। সপ্তম সংখ্যায় তিনি হিন্দু পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের অন্য ভাষা শিক্ষা দেওয়ার আগে মাতৃভাষার ব্যাকরণ ভালোভাবে শেখাতে উপদেশ দেন। অষ্টম সংখ্যায় তিনি জাত যাওয়ার ভয়ে হিন্দুরা পেশা হিসাবে অনেক কারিগরি ও যান্ত্রিক কাজকে গ্রহণ করতে চান না, তাঁদের এই কুসংস্কার ত্যাগ করতেও আহ্বান জানান। এমনিভাবে নানা বিষয়ে তিনি যেমন এদেশীয়দের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সরকারকে সচেতন ক'রে তোলেন, তেমনি এদেশীয়দেরও সজাগ ক'রে দেন। জনহিত-সাধনই যে সম্বাদ-কৌমুদীর লক্ষ্য ব'লে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, সে-কথা তিনি বর্ণে বর্ণে পালন করেন। সম্বাদ-কৌমুদী অল্পদিনের মধ্যে কেবল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে না, তা জনসাধারণকে নানা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ক'রে তোলে।

কিন্তু 'সম্বাদ-কৌমুদী' ছিল সাধারণ মানুষের জন্য প্রকাশিত সংবাদপত্র। তখনও ইংরেজী ভাষা ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যথেষ্ট চালু হয় নি, বাদশাহী যুগের ফারসী ভাষাই তখনও ভারতের শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ভাষা ছিল। তাই তিনি সর্বভারতীয় একটি সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে ফারসী ভাষায় মিরাত্-উল্-আখবার (সংবাদ-দর্পণ) নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন। এখানিও সম্বাদ-কৌমুদীর মতোই সাপ্তাহিক ছিল। এতে 'সম্বাদ-কৌমুদী'র মতো কেবল এদেশীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা থাকত না। এতে আন্তর্জাতিক সংবাদ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়েও আলোচনা থাকত। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল 'মিরাত্-উল্-আখবার' প্রকাশিত হয়। তিনি এই পত্রিকায় আয়ার্ল্যাণ্ডে বৃটিশ সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডে আইরিশ দারিদ্র্য ও অসন্তোষের কারণ কি, নিপুণভাবে বর্ণনা ক'রে দেখান। তবে 'সম্বাদ-কৌমুদী'র মতো 'মিরাত্-উল্-আখবার' কাগজেও রামমোহন বৃটিশ সরকারের প্রতি তাঁর আনুগত্য সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেন। তিনি তৎকালীন বড়লাট লর্ড হেস্টিংসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেন।

কিন্তু এইসব প্রকাশ্য আনুগত্য ও প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ সত্ত্বেও আয়ার্ল্যাণ্ডে বৃটিশ নীতি সম্পর্কে তাঁর নির্ভীক সমালোচনা এবং ইংরেজ কর্মচারী ও ইংরেজদের এদেশীয়দের প্রতি অন্যায় আচরণ সম্পর্কে নিঃসঙ্কোচ মন্তব্য প্রভৃতি সরকারী কর্তৃপক্ষকে তাঁর কাগজগুলি সম্পর্কে বিরূপ ভাবাপন্ন করে। ঐ সময়ে এদেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত আরও তিনটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হ'তো—'বঙ্গাল গেজেট', 'জাম-ই-জাহান-নুমা' ও 'সমাচার-চন্দ্রিকা'। জাম-ই-জাহান-নুমা ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ মার্চ প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন এটি উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হ'তো। পরে এটি ফারসী ভাষাতেই প্রকাশিত হ'তে থাকে।

জাম-ই-জাহান-নুমার সম্পাদক ছিলেন রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও 'সম্বাদ-কৌমুদী'র প্রাক্তন সম্পাদক হরিহর দত্ত। হরিহর দত্ত ও রামমোহনের মতোই নির্ভীক ও স্বদেশহিতৈষী সাংবাদিক ছিলেন। বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার-চন্দ্রিকা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ মার্চ তারিখে। এর সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীচরণ 'সম্বাদ-কৌমুদী'তে রামমোহনের সহযোগী ছিলেন। পত্রিকা-পরিচালন-ব্যাপারে এখানেই তাঁর অভিজ্ঞতা হয়। কিন্তু ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলেন। ফলে, রামমোহনের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধ হয় এবং তিনি 'সম্বাদ-কৌমুদী' ছেড়ে নিজে 'সমাচার-চন্দ্রিকা' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 'সমাচার-চন্দ্রিকা' রামমোহনের মতামতের ঘোর বিরোধী এবং রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপত্র ছিল।

ঐ সময়ে এদেশীয় ভাষায় পাঁচটি কাগজ প্রকাশিত হ'লেও, সরকারের তীব্র উষ্মা ছিল 'বঙ্গাল গেজেট', 'সম্বাদ-কৌমুদী', 'মিরাত্-উল্-আখবার', 'জাম-ই-জাহান-নুমা' ও বাকিংহাম-প্রকাশিত 'ক্যালকাটা জার্নালে'র উপর। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বড়লাট লর্ড হেস্টিংস বিলাতে চলে গেলেন। তাঁর পরবর্তী বড়লাট লর্ড আমহার্স্ট এসে না পৌছানো পর্যন্ত জন অ্যাডাম কিছুদিন অস্থায়ী বড়লাটের কাজ করেন। তিনি সংবাদ-পত্র সম্পর্কে লর্ড হেস্টিংসের উদারনীতিকে পরিহার ক'রে কঠোরতা অবলম্বন করেন। 'জন বুল' পত্রিকা সরকারের গোঁড়া সমর্থক ছিল এবং 'জন বুল' রামমোহন সম্পর্কে ক্রমাগত সরকারের কর্মচারীদের প্ররোচিত করছিল। রামমোহনের সঙ্গে বাকিংহামের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও রামমোহনেব প্রতি 'জন বুল' পত্রিকা ও সরকারের উষ্মার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। বাকিংহাম আমলাতন্ত্রের যে নির্ভীক সমালোচনা করেছিলেন তাতে সরকারের চীফ্ সেক্রেটারি বাকিংহামের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিলেন। বাকিংহামকে রামমোহনের সমর্থন তাই তাঁদের কাছে প্রীতিকর ছিল না। বেইলি সাহেব স্পষ্টই বলেছিলেন যে, 'মিরাত্-উল্-আখবার' কাগজ স্পষ্টতঃ সরকারের ক্ষতি করছে।

সরকারী আমলাতন্ত্রের স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি সম্পর্কে বাকিংহাম সোচ্চার ছিলেন। ঐ সময় মেডিক্যাল স্কুল অব ইণ্ডিয়ান্সের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন ডঃ জেম্সন। তিনি ঐ সঙ্গে তলে তলে আরও তিনটি পদে নিযুক্ত ছিলেন। বাকিংহাম ঐ সংবাদ তাঁর 'ক্যালকাটা জার্নেলে'-এ প্রকাশ ক'রে দিলে অস্থায়ী বড়লাট জন অ্যাডাম ক্রুদ্ধ হয়ে বাকিংহামের এদেশ থেকে বিতাড়নের ভয় দেখালেন। ডঃ জেম্সন ক্ষিপ্ত হয়ে বাকিং-হামকে ডুয়েল লড়তে চ্যালেঞ্জ করলেন। দুজনে পিস্তল নিয়ে ডুয়েল লড়লেন, তবে কেউ আহত হলেন না। সরকার মানহানির মামলা আনলেন বাকিংহামেব নামে। মামলায় বাকিংহাম জিতে গেলেন।

এখন বাকিংহাম সবকারী আমলাতন্ত্রের অসংখ্য ত্রুটি, স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির দৃষ্টান্ত তাঁর কাগজে তুলে ধরতে লাগলেন। সরকারের সেক্রেটারিরা সবুজ (Green) কোট পরতেন। তিনি বিদ্রূপ ক'রে তাঁদের আখ্যা দিলেন 'Gangrene of the State'. ডঃ ব্রাইস ছিলেন পাদরি। তিনি সরকারের অত্যন্ত বশংবদ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সরকারে চাকরি নেওয়ায় বাকিংহাম তাঁর সম্পর্কে সমালোচনা করলেন, বললেন, 'একজন যাজকের পক্ষে এ ধরনের চাকরি নেওয়া অশোভন'—"it was unbecoming of the character of the minister to accept a situation like this…"

অস্থায়ী বড়লাট জন অ্যাডাম পূর্ব থেকেই বাকিংহামের উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন, এখন তিনি বাকিংহামকে দু মাসের মধ্যে ভারত ত্যাগের নির্দেশ দিলেন (১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮২৩)। বাকিংহামকে ভারত ত্যাগ করতে হ'লো।

বাকিংহামকে এদেশ থেকে বিতাড়িত ক'রেই অস্থায়ী বড়লাট জন অ্যাডাম ক্ষান্ত হলেন না, তাঁর উদ্যত খড়্গ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরও নেমে এলো। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ মার্চ স-কাউন্সিল গভর্নর-জেনারেল একটি কঠোর প্রেস অর্ডিন্যান্স জারী করলেন। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধকারী এই জঘন্য প্রেস অর্ডিন্যান্স 'অ্যাডাম্স্ গ্যাগ্' (Adam's Gag) নামে কুখ্যাত হয়েছে। এই আইনে সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র বা কোন কিছু ছাপতে ও প্রকাশ করতে হ'লে আগে গভর্নর-জেনারেলের কাছ থেকে চীফ্ সেক্রেটারির স্বাক্ষরিত লাইসেন্স নিতে হবে। সরকার অসন্তুষ্ট হ'লে যে-কোন সময়েই লাইসেন্স প্রত্যাহার ক'রে নিতে পারবে। আইনে নির্ধারিত বিধিনিষেধ ভঙ্গ করলে জেল বা জরিমানা হবে।

সংবাদপত্রের উপর এই আঘাত রামমোহন প্রভৃতির মতো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিরা নীরবে সহ্য করলেন না। ঐ সময়ে নিয়ম ছিল যে, কোনও আইন কার্যকর হওয়ার আগে সুপ্রীম কোর্টে পাঠাতে হবে। সুপ্রীম কোর্ট রদ না করলে ২০ দিন পরে আইনটি কার্যকর হবে। এই নিয়ম অনুসারে ১৫ মার্চ (১৮২০) সুপ্রীম কোর্টে আইনটি পাঠানো হ'লো। এই আইনের বিরুদ্ধে কারও কিছু আপত্তি থাকলে তা সুপ্রীম কোর্ট শুনবার জন্য ৩১ মার্চ দিন ধার্য ক'রে দিলেন।

রামমোহন সুপ্রীম কোর্টে বাংলায় ও ইংরেজীতে দুটি প্রতিবাদপত্র পাঠাবার জন্য উদ্‌যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিবাদপত্র দুটিতে স্বাক্ষর সংগ্রহের সময়ে বিভিন্ন স্বাক্ষরকারীর পরামর্শমতো প্রতিবাদপত্রগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা, পুনরালোচনা ও পরিবর্তন প্রভৃতি করতে যথেষ্ট সময় লেগে গেল। তাই সময়মতো ঐ প্রতিবাদপত্র দুটি প্রস্তুত করা গেল না। তখন রামমোহন ও তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ব্যক্তি একটি স্মারকলিপি ইংরেজীতে রচনা ক'রে সুপ্রীম কোর্টে পেশ করলেন। এই স্মারকলিপিতে রামমোহন ছাড়া আরও পাঁচ ব্যক্তি সই করেছিলেন—চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

এই স্মারকলিপির যুক্তি ও ভাষা দেখে সকলেই মনে করেছিলেন যে, এটি কোনও ইংরেজের রচনা। স্মারকলিপিতে প্রথমেই 'এদেশীয়দের বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের কথা জানানো হ'লো। ইংরেজ শাসনে এদেশীয়রা যে সব দিক থেকে উপকৃত হয়েছে, যেভাবে বৃটিশ শাসনে তারা শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে, যেভাবে সরকারের উপর তারা আস্থা স্থাপন করেছে, এদেশের লোকে যে এদেশে বৃটিশ শাসনের দীর্ঘ-স্থায়িতা চায়, তা বহু দৃষ্টান্তসহ দেখানো হ'লো। এদেশীয়রা যেসব সংবাদপত্র প্রকাশ করেছে, সেগুলিও সরকারের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য রক্ষা ক'রে চলেছে। সরকারের পক্ষে ক্ষতিকর হ'তে পারে এমন কিছু প্রকাশ করা থেকে তারা সর্বদাই বিরত

থেকেছে। তা সত্ত্বেও লাইসেন্স গ্রহণের এই নির্দেশ জারী করা হয়েছে যে, লাইসেন্স ইচ্ছামতো সরকার প্রত্যাহার করতে পারেন। এই ব্যবস্থার ফলে দেশে জ্ঞান-বিস্তারের পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হবে। বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করবার সুযোগ আর থাকবে না। সরকারের কর্মচারীরা কোনও ভুল বা অন্যায করলে সে সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের পথও থাকবে না। অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে, প্রজারা যতোই আলোকপ্রাপ্ত হয়, সরকারও ততোই শক্তিশালী হয়। ইত্যাদি।

কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট রামমোহন ও তাঁর সহযোগীদের এই আবেদনপত্রে কর্ণপাত করলেন না। ঐ সময়ে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন স্যার ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেন। তিনি ঐ আইনে অনুমতি-দানকালে এই স্মারকলিপির বিন্দুমাত্র উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না। কেবল তাই নয, তিনি অনুমোদন-দানকালে এ-কথাও বললেন যে, তিনি অনুমতি দানের বিষযে পূর্ব থেকেই সরকারের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এইভাবে জন অ্যাডামের ঘৃণিত প্রেস আইন অনুমোদিত হ'লো।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রামমোহন কিন্তু কোনও চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। তিনি ও তার সহযোগীরা ইংলণ্ডেশ্বরের কাছে আবেদন করলেন। সুপ্রীম কোর্টের আবেদনটিও সম্ভবতঃ রামমোহনই লিখেছিলেন। কারণ, অনেকের ধারণা ছিল এই আবেদনপত্রটি কোনও ইংরেজের, বিশেষ ক'রে জেম্‌স্ মিল্‌ক বাকিংহামের লেখা। কিন্তু ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুলাই ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মালিকদের যে তলবী সভা হয, তাতে ভাবতে প্রেস আইন ও বাকিংহামের বিতাড়ন সম্পর্কে আলোচনাকালে মিল্‌ক বাকিংহাম নিজে বলেন যে, লেখা তো দূরের কথা ঐ ধরনের কোনও স্মারকলিপির অস্তিত্বের কথাও তিনি জানতেন না। তিনি বলেন, কলকাতা ত্যাগের সময়েও ঐ রকম কোনও অর্ডিন্যান্স যে আসতে পারে, তা তিনি ভাবতেও পারেন নি, সুতরাং তিনি ভবিষ্যদ্‌-দ্রষ্টা না হ'লে এ ধরনের স্মারকলিপি তাঁর পক্ষে লেখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং রামমোহনই যে এই স্মারকলিপি রচনা করেছিলেন, সে সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত। এই মতকে নিঃসন্দেহে সত্য ব'লে প্রমাণিত করে ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট লেখা তাঁর আবেদনপত্রটি। কারণ, রামমোহন যে কী ধরনের ইংরেজী লিখতে পারতেন, তার সাক্ষ্য ইংলণ্ডেশ্বরের কাছে লেখা তার এই আবেদনপত্র। মিস্ কোলেট লিখেছেন: "The Appeal is one of the noblest pieces of English to which Rammohun put his hand. Its stately periods and not less stately thoughts recalls the eloquence of the great orators of a century ago." মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা, মানুষের বাক্‌স্বাধীনতা,

মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার সমর্থনে পৃথিবীতে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ যা কিছু লেখা হয়েছে, রামমোহনের এই আবেদনপত্র নিঃসন্দেহে তার সগোত্র হ'তে পারে।

এতে তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলেন, ভারতে বৃটিশ শাসনের ফলে ভারতের হিন্দু অধিবাসীরা মুসলমানদের স্বৈরশাসনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। " ·your dutiful subjects consequently have not viewed the English as a body of conquerors, but rather as deliverers, and look up to your Majesty not only as a Ruler, but also as a father and protector." কলকাতার সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার পর থেকে, স্থানীয় সরকারে বিভিন্ন চরিত্র ও চিন্তাধারার লোক আসা সত্ত্বেও এদেশবাসী নির্বিঘ্নে ও শান্তিতে বসবাস করছে। বিচক্ষণতা ও উদারতার জন্য বিখ্যাত বৃটিশ জাতির প্রভাব ও দৃষ্টান্ত এদেশবাসীকে ক্রমেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির পথে অগ্রসর করছে। এই ধরনের মঙ্গলকারী সরকারের প্রতি এদেশবাসী তাদের আচরণে বা লেখায় কখনও কোনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে নি। এমনকি এ-কথা ইংরেজ মিশনারিদের Friend of India কাগজও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছে। এদেশীয়দের দ্বারা সংবাদপত্র প্রকাশ সম্পর্কে ঐ কাগজ লিখেছে: 'How necessary a step this was for the amelioration of the condition of the Natives, no person can be ignorant who has traced the effects of the Press in other Countries. Nor has this liberty been abused by them in the least degree; " রামমোহন অতঃপর বাকিংহামের বিতাড়ন, স্যার জন অ্যাডাম কর্তৃক এই কুখ্যাত অর্ডিনান্স পাস, সুপ্রীম কোর্টের আবেদনকারীদের স্মারকলিপি প্রভৃতি সমস্ত ঘটনাই বর্ণনা করলেন। তিনি ঐ কুখ্যাত আইনে যেসব উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে, তার অলীকতাও একে একে প্রতিপন্ন ক'রে দেখালেন। তিনি বললেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যাদের কার্যকলাপে অপ্রীতিকর বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তারা যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মধ্যে প্রকৃত কোনও দোষের সন্ধান না পায়, তখন তারা দুনিয়াকে বিশ্বাস করাতে চায় যে সংবাদপত্রগুলি সরকারের বিরোধিতা করছে। কিন্তু মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বর নিশ্চয় জানেন যে, স্বাধীন সংবাদপত্র পৃথিবীর কোনো অংশে কোথাও কখনও বিপ্লব ঘটায় নি, কারণ প্রজারা সংবাদপত্রের মাধ্যমে সহজেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সরকার পর্যন্ত সকলের কাছে নিজেদের অভাব-অভিযোগ জানাতে পারে এবং সেগুলির প্রতিকার পায়, এইভাবে যে কারণে বিপ্লব ঘটে, তা অপসারিত হয়। অন্যপক্ষে, যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই, এবং ফলে যেখানে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ অপ্রকাশিত ও প্রতিকারহীন থাকে, সেখানেই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অসংখ্য বিপ্লব ঘটেছে এবং সেসব বিপ্লব সরকারের সশস্ত্র বাহিনী দমন করলেও সেসব স্থানের লোক বিদ্রোহের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকে।

এইভাবে রামমোহন তাঁর এই দীর্ঘ আবেদনপত্রটিকে ভাবে, ভাষায়, যুক্তিতে, প্রকাশভঙ্গিতে ও ব্যঞ্জনায় অতুলনীয় ক'রে তুললেন। এই আবেদনপত্রটি যে উদার-চেতা সকল ব্যক্তির মনেই গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। লণ্ডন থেকে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন তারিখে কর্নেল লীস্টার স্ট্যানহোপ রামমোহনকে একটি পত্রে লেখেন:

> The Memorial, considering it as the production of a foreigner and a Hindoo of this age, displays so much sense, knowledge, argument, and even eloquence, that the friends of liberty have dwelt upon it with wonder,…"

তিনি ঐ পত্রে আরও জানান যে, তিনি ঐ স্মারকলিপিটি একটি পত্রসহ বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সেক্রেটারির হাতে দিয়ে দিয়েছেন। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সেক্রেটারি তাঁকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে, স্মারকলিপিটি ইংলণ্ডেশ্বর অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু রামমোহনের এই প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ ই হয়েছিল। দীর্ঘ ছ মাস ধ'রে চিন্তা-বিবেচনার পর ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রিভি কাউন্সিল প্রেস আইন বলবৎ রাখার সপক্ষেই রায় দিলেন।

স্যার জন অ্যাডাম কর্তৃক ঐ প্রেস আইন ঘোষিত হওয়ার পরে রামমোহন প্রতিবাদ-স্বরূপ তাঁর 'মিরাত্-উল্-আখবার' কাগজের প্রকাশ বন্ধ ক'রে দিলেন। তিনি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত 'মিরাত্-উল্-আখবার' কাগজের শেষ ও অতিরিক্ত সংখ্যায় লিখলেন:

> পূর্বেই জানান হয়েছিল যে, মহামান্য গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর কাউনসিল একটি আইন প্রবর্তন করেছেন, যার ফলে অতঃপর এই শহরে পুলিস আফিসে স্বত্বাধিকারীর দ্বারা হলফ না করিয়ে ও গভর্নমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারির কাছ থেকে লাইসেন্স না নিয়ে কোনও দৈনিক, সাপ্তাহিক বা সাময়িক পত্র প্রকাশ করা যাবে নাই এবং এর পরেও পত্রিকা সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হ'লে গভর্নর-জেনারেল এই লাইসেন্স প্রত্যাহার করতে পারবেন। এখন জ্ঞাত করা যাচ্ছে যে, ৩১ মার্চ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় সার ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেন এই আইন ও নিয়ম অনুমোদন করেছেন। এই অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্য-সমাজে নগণ্য হ'লেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সঙ্গে এই পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করলাম। বাধাগুলি এই:
>
> প্রথমতঃ, প্রধান সেক্রেটারির সঙ্গে যে সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয়

আছে, তাঁদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হ'লেও আমার মতো সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দারোয়ান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়ে ঐরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া দুরূহ, এবং আমার বিবেচনায় নিষ্প্রয়োজন, সেই কাজের জন্য নানা জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিস আদালতের দ্বার পার হওয়াও কঠিন।

কথায় আছে—

আব্রুকে বা-সদ্ খূন ই জিগর বস্ত্ দিহদ্

বা-উমেদ্-ই করম্-এ, খাজা, বা-দারবান্ মা-ফরোশ্

অর্থাৎ,—যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোনও অনুগ্রহের আশায় তাকে দারোয়ানের কাছে বিক্রয় ক'রো না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্য আদালতে সম্ভ্রান্ত বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দনীয় ব'লেই বিবেচিত হয়ে থাকে। তা ছাড়া, সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, যার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করবার মত অবৈধ ও গর্হিত কাজ করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি ও হলফ করার অসম্মান বরণ করবার পরও গভর্নমেণ্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হ'তে পারে এই আশঙ্কায় সেই ব্যক্তিকে লোকসমাজে অপদস্থ হ'তে হবে এবং এই আতঙ্কে তার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হবে। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃই ভ্রমশীল, সত্য কথা বলতে গিয়ে তাকে হয়তো এমন ভাষা প্রয়োগ করতে হবে, গভর্নমেণ্টের কাছে অপ্রীতিকর হ'তে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলার চেয়ে মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করলাম।

গদা-এ গোশা-নশিনি ! হাফিজা ! মাখ্রোশ্

রুমুজ-ই-মসলিহত-ই খেশ্ খুস্রোয়ান্ দানন্দ্।

—হাফিজ ! তুমি কুনো ভিখারী মাত্র, চুপ ক'রে থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন।

পারস্য ও হিন্দুস্থানের যে সকল মহানুভব ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে 'মিরাত্-উল্-আখবার'-কে সম্মানিত করেছেন, তাঁরা যেন উপরোক্ত কারণসমূহের জন্য প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তাঁদের ঘটনাবলীর বিবরণ দেব ব'লে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা ভঙ্গের জন্য আমাকে ক্ষমা করেন, এটাই আমার অনুরোধ। এবং এ-ও আমার অনুরোধ যে, আমি যেস্থানে যেভাবেই থাকি না কেন, নিজেদের উদারতায় তাঁরা যেন আমার মত সামান্য ব্যক্তিকে সর্বদাই তাঁদের সেবায় নিযুক্ত ব'লে জ্ঞান করেন।

এইভাবে রামমোহন তাঁর ফারসী সংবাদপত্র 'মিরাত্' বন্ধ ক'রে দিলেন। তিনি 'সম্বাদ-কৌমুদী'র প্রকাশনা কিন্তু বন্ধ করেন নি। তা তাঁর মৃত্যুর পর পর্যন্তও প্রকাশিত

হয়েছিল। সুতরাং সংবাদপত্র প্রকাশ সম্পর্কে উপরোক্ত বাধাগুলিকেই 'মিরাত্‌' বন্ধের সমূহ কারণ বলা চলে না। 'মিরাত্‌' পত্রিকায় রামমোহন আন্তর্জাতিক রাজনীতি প্রভৃতি নিয়েও আলোচনা করতেন, তা শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য বিশেষভাবে রচিত নিবন্ধ ও আন্তর্দেশীয় সংবাদসমূহে পূর্ণ থাকতো। ফলে, সরকারের রোষদৃষ্টি তার উপর পড়ার সম্ভাবনা সমধিক ছিল। তাছাড়া, এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য ব্যয়ের পরিমাণও ছিল অধিক। তাই রামমোহন আর 'মিরাত্‌' প্রকাশের ঝুঁকি নেন নি।

তিনি এই প্রেস আইন বলবৎ থাকাকালেই মাস তিনেকের জন্য অন্য একটি পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী হয়েছিলেন। সেটি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ মে তারিখে প্রকাশিত Bengal Herald পত্রিকা। তিনি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুলাই ঐ পত্রিকার মালিকানা ত্যাগ করেন।

এদেশীয়দের দ্বারা এদেশে সংবাদপত্র প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য তাঁর অক্লান্ত সংগ্রাম রামমোহনের জীবনের একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। তার মৃত্যুর পরেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে যাঁরা অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু ব'লে মনে করেন, তাঁরা সকলেই রামমোহনের এই কীর্তির কথা একবাক্যে স্বীকার ক'রে গেছেন। বিখ্যাত সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক রবার্ট মণ্টগোমারি মার্টিন তাঁর History of the British Colonies গ্রন্থে বলেছেন : "to no individuals is the Indian Press under greater obligation than to the lamented Rammohun Roy and munificent Dwarkanath Tagore." রামমোহনের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে (১৮৩৮) কলকাতা টাউন হ'লে স্যার চার্লস মেটকাফের সম্মানে আয়োজিত Free Press Dinner-এ মিঃ এফ. জে. লেথ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহনের অক্লান্ত সংগ্রামের কথা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উল্লেখ করেন। ভারতীয় অতিথিদের মধ্য থেকে প্রসন্নকুমার ঠাকুরও তাঁদের দলপতির এই কীর্তির কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন।

রামমোহন যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, যখন ধর্মীয় বাদবিতণ্ডা, মামলা প্রভৃতি নিয়ে তার নিশ্বাস ফেলার অবকাশ ছিল না, তখন তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তি অন্য একটি ক্ষেত্রেও প্রবল বিক্রমে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেখানেও বিরোধীদের সঙ্গে তাঁর সংগ্রাম ছিল প্রচণ্ড এবং, বলা চলে, যুগান্তকারী। সে সংগ্রামে রামমোহন তাঁর জীবদ্দশায় বিজয়ী না হ'লেও, মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই সে সংগ্রাম সফল হয়েছিল এবং ভারতবর্ষের সমগ্র শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির চেহারা আমূল পরিবর্তিত ক'রে দিয়েছিল।

রামমোহন ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি যে

এদেশে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার প্রচলনের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন, তা নিজ ব্যয়ে ঐ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকেই প্রমাণিত হয়েছিল। ঐ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই এদেশে শিক্ষাধারা কি হবে বা হওয়া উচিত, তা নিয়ে প্রবল মতবিরোধ দেখা দিলো। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ অনুসারে বৃটিশ সরকার কোম্পানি সরকারকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রতি বছর এক লক্ষ টাকা কোম্পানি সরকার এদেশে শিক্ষার জন্য ব্যয় করবে। ঐ অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হবে, সেই নিয়ে বিতর্ক। ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতায় মাদ্রাসা ও বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন ক'রে সরকারী নীতির ভিত্তি স্থাপন ক'রে গিয়েছিলেন—সরকার এদেশে প্রচলিত শিক্ষাধারাই অনুসরণ ক'রে এদেশে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার করবেন। সরকার সেই নীতিই অনুসরণ করছিলেন। এদেশীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও সরকারের এই নীতির সমর্থক ছিলেন। কিন্তু রামমোহন এদেশের প্রকৃত উন্নতিসাধনের জন্য এদেশীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা—ইংরেজী ভাষা, আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক যন্ত্রবিদ্যা ও কারিগরিবিদ্যা—প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। হিন্দু কলেজ ও অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল স্থাপনের পেছনে তাঁর এই নীতিই সক্রিয় ছিল।

তাই সরকার যখন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে বহু টাকা ব্যয়ে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনে উদ্‌যোগী হলেন, রামমোহন তখন তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ নিয়ে অগ্রসর হলেন। তিনি তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত পত্র লিখলেন। তিনি তাতে যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই :

> ভারতের বর্তমান শাসকরা বহু হাজার মাইল দূর থেকে এদেশে এসে এমন একটি জাতিকে শাসন করছেন যাদের ভাষা, সাহিত্য, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও ভাবধারা তাঁদের কাছে প্রায় সম্পূর্ণ নূতন ও অপরিচিত, তাঁরা তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এদেশীয় লোকেরা যতোখানি পরিচিত, ততো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হ'তে সহজে পারেন না। সুতরাং আমরা যদি এই মুহূর্তে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তথ্য না জানাই, তবে আমরা নিজেদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব এবং আমাদের শাসকদের আমাদের নিজেদের মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে ঔদাসীন্যের অভিযোগ করবার সুযোগ দেব। কলকাতায় সরকারের একটি নূতন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের ইচ্ছা প্রশংসনীয়। কিন্তু যখন ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষার জন্যে প্রতি বৎসর কিছু পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হ'লো, তখন আমরা আশা করেছিলাম যে, এই অর্থ এদেশীয় লোকদের গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের নিয়োগ করা হবে।
>
> কিন্তু আমরা দেখছি যে, সরকার ভারতে ইতিপূর্বে যে বিদ্যা প্রচলিত আছে

তাই হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা শিক্ষাদানের জন্য একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করছেন। ঐ ধরনের বিদ্যালয় (লর্ড বেকনের পূর্বে ইউরোপে যে ধরনের বিদ্যালয় ছিল) বালকদের মনকে ব্যাকরণ ও দর্শনের কচকচিতে ভারাক্রান্ত ক'রে দেবে, যা শিক্ষাগ্রহণকারী বা সমাজ কারো কোনও ব্যবহারিক কাজে আসবে না। দু হাজার বছর আগে যে জ্ঞান পরিজ্ঞাত ছিল, সেই জ্ঞানই মাত্র তারা সেখানে লাভ করবে। "We now find that the Government are establishing a Sangscrit school under Hindoo pundits to impart such knowledge as is already current in India. This seminary (similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon) can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society. The pupils will there acquire what was known two thousands years ago, with the addition of vain and empty subtleties since produced by speculative men, such as is already commonly taught in all parts of India."

তিনি বলেন, সংস্কৃত ভাষা এতোই কঠিন যে, তা পরিপূর্ণরূপে শিক্ষালাভের জন্য সারা জীবন কেটে যায়। ফলে ঐ ভাষা জ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে একটি শোচনীয় বাধা হয়ে রয়েছে। আর যদি ঐ বিদ্যা শেখাতেই হয়, তা হ'লে সেজন্য নূতন সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার কোনও প্রয়োজন নেই, দেশে অসংখ্য সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক আছেন ও সংস্কৃত শিক্ষালয় আছে, তাঁদের ও সেগুলিকে সাহায্য দানের দ্বারাই সে উদ্দেশ্য সাধিত হ'তে পারে।

সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার দ্বারা এদেশীয়দের যেমন কোন উপকার হবে না, তেমনি বেদান্ত, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষার দ্বারাও কোনও উপকার হবে না। যে বেদান্ত প্রচারের জন্য রামমোহন সমগ্র বেদান্তকে বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, যে বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য শ্রীরামপুরের পাদরিদের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই বেদান্তের সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থায় অনুপযোগিতার কথা তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন :

Neither can such improvement arise from such speculation as the following, which are the themes suggested by the Vendant :—In what manner is the soul absorbed into the deity? What relation does it bear to the divine essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by

the Vedantic doctrines, which teach them to believe that all visible things have no real existence; that as father, brother, etc. have no actual entity, they consequently deserve no real affection and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better." কিভাবে আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক কি, এই সব চিন্তাভাবনার দ্বারাও তাদের কোনও মানসিক উন্নতি হবে না। বেদান্তের মতবাদগুলি তাদের সমাজের উপযুক্ত সদস্য ক'রে গ'ড়ে তুলতেও সহায়তা করবে না। কারণ, বেদান্ত শিক্ষা দেয় দৃশ্যমান সকল কিছুরই বাস্তবিক কোনও অস্তিত্ব নেই ; পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, সুতরাং তাদের প্রতি স্নেহমমতারও কোনও প্রয়োজন নেই ; তাঁদের কাছ থেকে ও সংসার থেকে যতো শীঘ্র পালাতে পারা যায়, ততোই মঙ্গল।

ধর্ম ও সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ ও উপযোগিতা যে এক নয়, তা রামমোহনই সেই সুদূর অতীত কালেও উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ধর্মীয় ক্ষেত্রে বেদান্তের শ্রেষ্ঠতা তিনি স্বীকার ও প্রচার করলেও এদেশীয় মানুষের সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে তাব প্রয়োগ যে অত্যন্ত ক্ষতিকর, তা মুক্তকণ্ঠে বলতেও তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি।

রামমোহন লিখলেন : যদি বৃটিশ জাতিকে বাস্তব জ্ঞান থেকে বঞ্চিত রাখার ইচ্ছা থাকতো, তবে বেকনের চিন্তাধারা অনুসারে প্রাচীনপন্থী গ্রীক-লাতিন শিক্ষার স্থলে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন করার প্রয়োজন ছিল না। তেমনি এদেশে সংস্কৃত শিক্ষাধারার প্রসার এদেশকে অন্ধকারে রাখবার জন্যই করা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু এদেশের মানুষের উন্নতিসাধনই সরকারের লক্ষ্য, সেজন্য সরকারের কর্তব্য গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরবৃত্ত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান-সমূহের শিক্ষাদানের জন্য ইউরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ ক'রে এদেশীয়দের শিক্ষার জন্য সংরক্ষিত অর্থ ব্যয় করা।

রামমোহনের এই পত্রে লর্ড আমহার্স্ট তথা কোম্পানি সরকার তখন কর্ণপাত করেন নি। কিংবা কর্ণপাত করলেও সংস্কৃত কলেজ স্থাপন থেকে বিরত হন নি। অনেকের মতে, সরকার রামমোহনের এই যুক্তিজালকে উপেক্ষা করতে পারেন নি, তাই তাঁরা সংস্কৃত কলেজের নামে শিলান্যাস না ক'রে হিন্দু কলেজের নামেই শিলান্যাস করেছিলেন এবং হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ একই ভবনে স্থাপিত হয়েছিল।

এদেশের ভাবী আদর্শ শিক্ষাধারা সম্পর্কে রামমোহন যে চিন্তার বীজ বপন করে-ছিলেন, তা কেবল এদেশীয়দের মনে নয়, ইংরেজ সরকারের মনেও অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে উঠেছিল। রামমোহনের মৃত্যুর মাত্র দু বছরের মধ্যে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি

বেরিংটন মেকলে তাঁর বিখ্যাত শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবে এদেশে ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারকেই সরকারী নীতিরূপে গ্রহণের সুপারিশ করেছিলেন এবং তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ৭ মার্চ (১৮৩৫) ইংরেজীকে এদেশের সরকারী ভাষার স্থান দিয়ে এদেশে ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ সুপ্রশস্ত ক'রে দিয়েছিলেন।

এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন যে রামমোহনের অন্যতম কীর্তি তা সকলেই সমকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। পরবর্তী কালে লর্ড রিপন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে যে শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেছিলেন, সেই শিক্ষা কমিশন তাঁদের বিবরণীতে মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন: "It took twelve years of controversy, the advocacy of Macaulay, and the decisive action of a new Governor-General before the Committee could as a body acquiesce in the policy urged by him (Rammohun Roy)."

রামমোহনের সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধিতার তাৎপর্য তাঁর সমকালীন অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেন নি। তিনি সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকেই ভারতীয়দের যুগ-যুগ-সঞ্চিত জড়তা, সঙ্কীর্ণতা, কূপমণ্ডূকতা, হৃদয়হীনতা ও বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ ব'লে বুঝেছিলেন। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার কথাও তিনি বলেন নি। তিনি মাতৃভাষা ভালভাবে শিক্ষা না করার পূর্বে বালকদের কোনও বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের বিরোধী ছিলেন। এ-বিষয়ে 'সম্বাদ-কৌমুদী'তে তিনি একটি নিবন্ধে অভিভাবকদের সতর্কও ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি দেশবাসীর পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক যন্ত্রবিদ্যা শেখার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। কারণ, এই বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যাই ইউরোপীয় মানুষকে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের তুলনায় আধুনিক কালে অধিক শক্তি ও সম্পদের অধিকারী করেছিল। আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি লর্ড আমহার্স্ট'কে লেখা তাঁর বিখ্যাত পত্রে লিখেছিলেন, "which the Nations of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world." ভারতবাসীকেও বিশ্বের অন্যান্য অংশের অধিবাসীদের তুলনায় অধিকতর উন্নত করবার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল রামমোহনের।

ভারতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার প্রবর্তন ও বিস্তার কেবল সরকারই করতে পারতেন। তাই সরকার যখন ভারতে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য নির্ধারিত অর্থ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবর্তনে ও প্রসারে ব্যয় না ক'রে এদেশের চিরাচরিত শিক্ষার পেছনে ব্যয় করতে অগ্রসর হলেন, তখন তিনি তার প্রতিবাদ না ক'রে পারেন নি। তাঁর এই প্রতিবাদকে গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুরা অন্য আলোকে দেখলেও রামমোহন

ভারতের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সম্পদকে কখনো অস্বীকার করেন নি। ডাঃ টাইলারের সঙ্গে বিতর্ককালে যখন টাইলার বলেছিলেন যে, হিন্দুরা "indebted to Christians for their civil liberty they enjoy, as well as for the rays of intelligence, now beginning to dawn upon them", তখন রামমোহন তার জবাবে বলেছিলেন :

"If by the 'Ray of Intelligence' for which the *Christian* says, we are indebted to the English, he means the introduction of useful arts, I am ready to express my assent, and also my gratitude ; but with respect to *Science*, *Literature* or *Religion* I do not acknowledge that we are placed under any obligation. For by reference to history it may be proved that the World was indebted to our *ancestors* for the first dawn of knowledge which sprang up in the East, and thanks to the Goddess of Wisdom we have still a philosophical and copious language of our own…" তিনি সংস্কৃত ভাষাকে বলেন "one of the purest and most regularly formed languages in the world."

পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য প্রযোজন ছিল ইউরোপে শিক্ষিত শিক্ষকদের। তাঁদের আনবার ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির ব্যবস্থা সরকারই করতে পারতেন। তা এদেশীয়দের দ্বারা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। তাই রামমোহন সরকারকে এদেশীয় বিদ্যাচর্চার জন্য অর্থব্যয় না ক'রে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রবর্তনে ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করতে বলেছিলেন। এদেশীয় বিদ্যাচর্চার জন্য বহু অর্থব্যয়ে নূতন সৌধ নির্মাণের উপযোগিতাও তিনি বুঝতে পারেন নি। এ ছিল তাঁর কাছে অর্থের অপচয় মাত্র। তাই তিনি লর্ড আমহার্স্টকে লেখা পত্রে বলেছিলেন :

But if it were thought necessary to perpetuate this language for the sake of the portion of the valuable information it contains, this might be much more easily accomplished by other means than the establishment of a new Sangscrit College ; for there have been always and are now numerous professors of Sangscrit in the different parts of the country, engaged in teaching this language as well as the other branches of literature, which are to be the object of the new Seminary. Therefore their diligent cultivation, if desirable, would be effectually promoted by holding out premiums and granting certain allowances to those most eminent Professors, who have already undertaken on their account to teach them,

and would by such rewards be stimulated to still greater exertions.

এদেশের যে সব দরিদ্র অধ্যাপক নিজ ব্যয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান-বিতরণে ব্রতী আছেন, তাঁদের সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করলেই এদেশে সংস্কৃত-চর্চা অধিকতর সহজে ও অল্পতর ব্যয়ে ফলবতী হ'তে পারে, এই ছিল রামমোহনের বক্তব্য। রামমোহন সরকারী ব্যয়ে এদেশে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তারের বিরোধী হ'লেও তিনি নিজে যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে কতো ভালবাসতেন, তার প্রমাণ দিয়েছিলেন নিজ অর্থব্যয়ে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে "বেদান্ত কলেজ" স্থাপন ক'রে। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জুলাই উইলিয়ম অ্যাডাম লেখেন :

Rammohun Roy has lately built a small but very neat and handsome college, which he calls the Vedanta College, in which a few youths are at present instructed by a very eminent Pandit, in Sanskrit literature, with a view to the propagation and defence of Hindu Unitarianism. With this institution he is also willing to connect instruction in European science, and learning, and in Christian Unitarianism, provided the instructions are conveyed in the Bengali or Sanskrit language.

অ্যাডামের উক্তি অনুসারে রামমোহন বেদান্ত কলেজে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এদেশীয় ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করতে চেয়েছিলেন (provided the instructions are conveyed in the Bengali or Sanskrit language)। এ থেকেও স্পষ্টই বোঝা যায়, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের প্রতি নয়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষাদানের প্রতিই রামমোহনের প্রগাঢ় আকর্ষণ ছিল। যেহেতু ঐ যুগে ইংরেজীর মাধ্যমেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিল, তাই রামমোহন এদেশে ইংরেজী শিক্ষারও সমর্থক ছিলেন।

পরবর্তী কালে রামমোহন চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের পক্ষ থেকে প্রেরিত তরুণ মিশনারি আলেকজাণ্ডার ডাফকে এদেশে শিক্ষা-বিস্তারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার ডাফ কলকাতায় এসে, তাঁর ভাষায় 'ভারতের এরাস্‌মাস' রামমোহনের সঙ্গে সর্বাগ্রে সাক্ষাৎ করেন। এই তরুণ মিশনারি এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ব্রত নিয়ে এদেশে এসেছেন শুনে রামমোহন তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হন। রামমোহন শিক্ষাকে কখনো ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখেন নি।

তাঁর মতে, সমস্ত শিক্ষাই ধর্মীয় হওয়া উচিত ; কারণ, শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল কিছু জানা নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'লো মানসিক শক্তিকে, হৃদয়াবেগকে ও বিবেকবুদ্ধিকে উন্নত ও নিয়মিত করা। "All true education ought to be religious, since the object was not merely to give information but to develop and regulate all the powers of the mind, the emotions of the heart, and the working of the conscience."

তাই তরুণ মিশনারি আলেকজাণ্ডার ডাফ যখন এদেশে শিক্ষা-বিস্তারে অগ্রসর হলেন, তখন রামমোহন হলেন তাঁর প্রধান সহায়ক। স্কটিশ চার্চের সঙ্গে রামমোহনের ধর্মীয় চিন্তাধারারও সাদৃশ্য ছিল। তিনি তাই ট্রিনিটারিয়ান খ্রীষ্টানদের ভ্রান্ত খ্রীষ্টধর্মীয় মতবাদের প্রতিরোধের উদ্দেশে চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লির কাছে এদেশে স্কটিশ মিশনারি পাঠাতে অনুরোধও করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার ডাফ এদেশে এলে রামমোহন তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস থেকে তিনি তাঁর নিজের দেশের ধর্মসংস্কারের বিষয়ে কতখানি উৎসাহ পেয়েছিলেন :

> As a youth, I acquired some knowledge of the English language. Having read about the rise and progress of Christianity in apostolic times, and its corruption in succeeding ages, and then of the Christian Reformation which shook off these corruptions and restored it to its primitive purity, I began to think that something similar might take place in India, and similar results might follow here from reformation of the popular idolatry.

আলেকজাণ্ডার ডাফ যখন রামমোহনকে জানালেন যে, তিনি তাঁর বিদ্যালয়-গৃহের জন্য বাড়ী পাচ্ছেন না, তখন রামমোহন নিজে তাঁকে চিৎপুর রোডের যে বাড়ীতে প্রথমে ব্রাহ্ম সভার অধিবেশন হ'তো সেটি খুব অল্প ভাড়ায় সংগ্রহ ক'রে দিলেন। বিদ্যালয়-গৃহ সংগৃহীত হ'লো, কিন্তু ছাত্র সংগৃহীত হয় না। সেক্ষেত্রেও রামমোহন প্রভাব বিস্তার ক'রে উদারমনা হিন্দুদের তাঁদের ছেলেদের এই মিশনারি স্কুলে পাঠাতে রাজী করালেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুলাই এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হ'লো। ডাফ ছাত্রদের বাংলায় যিশুর জীবন ও বাণী বিতরণ করতে গেলে ছাত্ররা তা নিতে চাইলো না। তখন রামমোহন এগিয়ে এসে বললেন : "ডঃ হোরেস হেম্যান উইলসনের মতো খ্রীষ্টানরা হিন্দু শাস্ত্র পড়েছেন, তাতে তাঁরা হিন্দু হয়ে যান নি। আমি বার বার কোরান পড়েছি, তাতে কি আমি মুসলমান হয়েছি ? না, আমি সমগ্র বাইবেল খুব ভালো ক'রে পড়েছি, তোমরা জানো আমি খ্রীষ্টান নয়। তবে তোমরা ঐ বই পড়তে ভয় পাচ্ছ কেন ? নিজেরা পড়, বিচার ক'রে দেখো।"

রামমোহন বাইবেল থেকে ঐ স্কুলে পাঠ দেওয়ার সময়ে মাসখানেক রোজ দশটায় বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতেন। পরেও তিনি প্রায়ই যেতেন ঐ স্কুলে। তাঁর অনুগামী কালীনাথ চৌধুরী আলেকজাণ্ডার ডাফকে বিদ্যালয়-ভবন ও অন্যান্য জিনিসপত্র দিয়ে টাকিতে ডাফের তত্ত্বাবধানে একটি বিদ্যালয় খুলতেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার, রামমোহন যখন ডাফকে এইভাবে তাঁর মিশনারি বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহিত ও সাহায্য করেছিলেন, তখন তিনি নিজে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিক্ষার বিস্তারে তাঁর মনে কখনো কোনো সঙ্কীর্ণতা ছিল না। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার—যেভাবে হ'ক, যেই করুক, তাতেই ছিল তাঁর সমর্থন। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে আলেকজাণ্ডার ডাফ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এ-বিষয়ে রামমোহনের কাছে তার কৃতজ্ঞতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রে গেছেন: "He has rendered me the valuable and efficient assistance in prosecuting some of the objects of the General Assembly's Mission." জেনারেল অ্যাসেমব্লি কলেজ (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) ছিল এই মিশনের অন্যতম প্রধান কীর্তি।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থনে যে পত্রখানি লিখেছিলেন, সে সম্পর্কে সরকারের অনমনীয় মনোভাব দেখে তিনি ভারতবর্ষে অন্ততঃ কিছুসংখ্যক বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব দিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে একটি পত্র লিখেছিলেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে মিল্ক বাকিংহামের ভারত থেকে বিতাড়ন সম্পর্কে আলোচনার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মালিকদের সভা বসেছিল, তখন ক্যাপ্টেন গাওয়ান সভাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি রামমোহন রায়ের কাছ থেকে একটি পত্র পেয়েছেন। পত্রটি ভারতে কতিপয় বিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে। পত্রটি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, এটি "written with extra-ordinary talent."

এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের জন্য স্কুল-কলেজ স্থাপনের ব্যাপারেই তিনি উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন না। তিনি ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজেও উৎসাহী ছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাঠ্যপুস্তক রচনায় ও প্রকাশনায় এই সংস্থার সঙ্গে রামমোহন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। ঐ সংস্থার বিবরণী থেকে জানা যায়, রামমোহন বাংলায় ও ইংরেজীতে একটি ভূগোল বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। তিনি সংস্থার উদ্যোগে ফার্গুসনের Introduction to Astronomy-র বাংলা অনুবাদ কার্যে মিঃ গর্ডনকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তিনি ইংরেজ শিক্ষার্থীদের জন্য

ইংরেজীতে বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেছিলেন। এই ব্যাকরণ রচনা সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, এর উদ্দেশ্য ছিল "to fecilitate intercourse between themselves (European philonthropists) and the natives." পরে তিনি বাঙ্গালী ছাত্রদের জন্য ঐ ব্যাকরণের একটি বাংলা অনুবাদ-ও প্রস্তুত করেন। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি তার বিবরণীতে ঐ বই সম্পর্কে বলে: 'The conviction that a *Bengali Grammar* better adopted to the instruction of native youths than the one on their list, has led your committee to solicit the services of Baboo Rammohun Roy in preparing one ··" রামমোহন তদনুসারে তাঁর "গৌড়ীয় ব্যাকরণ" রচনা করেন। এই পুস্তক তার বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে দ্রুত রচিত হয় এবং তার বিলাতে অবস্থিতিকালেই প্রকাশিত হয়। স্কুল বুক সোসাইটি এই পুস্তকের ভূমিকায় লেখে:

> সবদেশীয় ভাষাতে এক এক ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ আছে যদ্দারা তত্তদ্ভাষা লিখনে ও শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনাপূর্বক কথনে উত্তম শৃঙ্খলামতে পারগ হয়েন, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষার বিবরণ না থাকাতে ইহার কথনে ও লিখনে সম্যকরূপে রীতিজ্ঞান হয় না, এবং বালকদিগের আপন ভাষা ব্যাকরণ না জানাতে অন্য ভাষা ব্যাকরণ শিক্ষাকালে অত্যন্ত কষ্ট হয়, আর আপন ভাষা ব্যাকরণ যাহার বোধ অল্প পরিশ্রমে সম্ভবে তাহা জানিলে অন্য অন্য ভাষা ব্যাকরণ জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে।···

এখানে উল্লেখযোগ্য, 'স্কুল বুক সোসাইটি'র এই মন্তব্য রামমোহনের মতেরই প্রতিধ্বনি। রামমোহন যে মাতৃভাষার ব্যাকরণে অধিকার লাভের আগে অন্য ভাষা শেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন না, তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সুতরাং এদেশীয়দের শিক্ষাসূচীতে মাতৃভাষার শিক্ষাকে যে রামমোহন ভিত্তিস্বরূপ জ্ঞান করতেন, সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। রামমোহন বাংলা ভাষায় ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতির মতো পুস্তক রচনায় অগ্রণী ও উদ্যোগী হয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছিলেন। যাঁরা রামমোহনকে Anglicist বা ইংরেজীপন্থী ব'লে থাকেন, তাঁরা রামমোহনকে ভুলই বোঝেন।

রামমোহন যখন ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে প্রচণ্ড বাদবিতণ্ডায় মত্ত ছিলেন, যখন 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' ও Brahmanical Magazine, 'সম্বাদ-কৌমুদী' ও 'মিরাত্-উল্-আখবার' সংবাদপত্রগুলির প্রকাশনা, সম্পাদনা ও পরিচালনায় ব্যস্ত ছিলেন, যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর সরকারী খড়্গাঘাত প্রতিরোধের জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট ছিলেন, যখন ভারতের ভবিষ্যৎ শিক্ষা-ব্যবস্থার আদর্শ নিয়ে সরকার ও রক্ষণশীলদের সঙ্গে সংগ্রামে

নিযুক্ত ছিলেন, তখনও তাঁর অক্লান্ত লেখনী সমাজের অন্যান্য ক্ষত সম্পর্কে চিন্তাভাবনায় সক্রিয় ছিল। এর মধ্যে প্রধান ছিল নারী-স্বাধীনতা।

রামমোহনের দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না, একথা তাঁর সকল জীবনীকারই স্বীকার ক'রে গেছেন। কারণ, তাঁর স্ত্রীরা চিরাচরিত পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ ক'রে তাঁর বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদকে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই তাঁর পত্নীরা ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁদের শাশুড়ী তারিণী দেবীর কাছেই থাকতেন, রামমোহনের সঙ্গে রামমোহনের কর্মস্থলে থাকতেন না। পরে তাঁরা রঘুনাথপুরে তারিণী দেবীর কাছ থেকে পৃথক হয়ে রামমোহনের কাছে থাকলেও রামমোহন কিন্তু অধিকাংশ সময় কলকাতাতেই কাটাতেন। কলকাতায় রামমোহন ও তাঁর পরিবার পৃথক ভবনেই বেশির ভাগ সময় থাকতেন। রামমোহন থাকতেন মানিকতলার বাগানবাড়ীতে, আর রামমোহনের পরিবার থাকতেন আমহার্স্ট স্ট্রীটের শিমলা হাউসে। রামমোহনের ধর্মমত ও অসঙ্কীর্ণ উদার জীবনযাত্রাই এর প্রধান কারণ ছিল।

কিন্তু সেজন্য রামমোহন তার স্ত্রীদের প্রতি কখনও বিরূপ আচরণ করেন নি। তিনি স্বামীর কর্তব্য সর্বদাই পালন ক'রে গেছেন—নিজের ধর্মমত ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতি যা তাঁর স্ত্রীদের মনঃপূত নয়, তা তাঁদের উপর জোর ক'রে চাপিয়ে দিতে কখনও চেষ্টা করেন নি। তাদের পৃথকভাবে থাকবার, নিজেদের বিবেকবুদ্ধিমতো চলবার, পরিপূর্ণ সুযোগ দিয়ে তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকেই স্বীকৃতি দিয়ে এসেছিলেন। যে যুগে স্ত্রীকে দাসীর অধিক সম্মান দেওয়া হ'তো না, সে যুগেও রামমোহন নিজের স্ত্রীদের স্বাধীনতাকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়েছিলেন, একথা অনেকেই ভুলে যান। তার দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না, তিনি পরিবার থেকে পৃথকভাবে বাস করতেন, ইত্যাদি প্রচার ক'রে তাঁকে ছোট করবার চেষ্টা তার প্রতিপক্ষরা করেছেন। "তাঁর স্ত্রীরা তাঁকে সমাজচ্যুত জ্ঞান করতেন এবং তার সঙ্গে বাস করা পছন্দ করতেন না"—এইরকম মন্তব্য অনেকেই করেছেন। কিন্তু তারা বৃত্তের অন্ধকার দিকটাই দেখেছেন। যে যুগে স্ত্রীরা ক্রীতদাসীর জীবন-যাপন করতেন, যে যুগে তাদের পছন্দ-অপছন্দ ব'লে কোন পদার্থই সমাজে ছিল না, সেই যুগেও স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য ও পছন্দ-অপছন্দকে তিনি যে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়েছিলেন, তাঁর ধর্মসংস্কারের উৎসাহ যে তাঁর নিজের ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক চিন্তা-ভাবনাকে তাদের উপর জোর ক'রে চাপিয়ে দেয় নি (যা তিনি অতি সহজেই পারতেন), তা যে তাঁর মহান্ চরিত্রকে মহত্তর আলোকেই মণ্ডিত করেছে, তা তাঁর নিন্দুকরা লক্ষ্য করেন নি।

রামমোহনই ছিলেন ভারতে প্রথম Feminist, যিনি স্ত্রীলোকের আপন মতামত ও রুচিকে সসম্মানে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কথায় বলে, Charity begins at

home. তাঁর স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্য সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদ রামমোহন স্বগৃহেই প্রথম কার্যে পরিণত করেছিলেন।

নারীর এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল নারীর অর্থনৈতিক অধিকার। নারীর অর্থনৈতিক অধিকার কিভাবে প্রাচীন কালে রক্ষিত হ'তো এবং পরবর্তী কালে তা হরণ করা হয়েছে, তা দেখাবার জন্যই তিনি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে লিখলেন তাঁর "Modern Encroachment on the Ancient Rights of Females according to the Hindu Law of Inheritance"—হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুসারে স্ত্রীলোকের প্রাচীন অধিকারসমূহের উপর হস্তক্ষেপ।

তিনি এই নিবন্ধে দেখালেন, প্রাচীন কালের বিধি অনুসারে বিধবা স্ত্রীদের তাঁদের পরলোকগত স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার দেওয়া হ'তো এবং বিধবারা পুত্রের সমান সম্পত্তিই পেতেন। ফলে, বিধবারা তাঁদের অবশিষ্ট জীবন পুত্রদের উপর এখনকার মতো সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে না থেকে স্বাধীনভাবেই কাটাতে পারতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পরবর্তী কালে স্মৃতিকাররা এই সুন্দর বিধিটিকে বাতিল ক'রে দেন। ফলে, মাতা ও বিমাতারা সকলেই বাস্তবিক ক্ষেত্রে মৃত স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, এবং তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁদের ঐ অধিকার স্বীকৃত হ'লেও কার্যতঃ তা জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে—"the right of a widow exists in the theory only among the learned but unknown to the populace." ফলে, একদিন যে স্ত্রীলোকটিকে পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী ব'লে বিবেচনা করা হ'তো, তাকে পরবর্তী কালে তাঁর পুত্রদের উপর নির্ভরশীল এবং পুত্রবধূদের উপেক্ষার পাত্রী হ'তে হয়েছে।

রামমোহন বিশ্লেষণ ক'রে দেখান, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীর সম্মুখে তিনটি মাত্র পথ উন্মুক্ত থাকে। এক, অন্য কোনও স্বামীর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা পোষণ ক'রে অপরের নিকট সম্পূর্ণরূপে ক্রীতদাসীর মতো অবশিষ্ট জীবন কাটাতে হবে। দুই, নিজের জীবন ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য পাপের পথে নামতে হবে। তিন, প্রতিবেশীদের কাছে সম্মান ও বাহবা পেতে পেতে মৃত স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতে হবে।

রামমোহন দেখান যে, প্রাচীন শাস্ত্রকাররা বিধবা স্ত্রীদের স্বামীর সম্পত্তির পুত্রের সঙ্গে সমান অংশীদার ক'রে তাঁদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জীবনযাত্রার ব্যবস্থাই করেছিলেন—বিধবাদের সহমরণকে মুখ্য ক'রে দেখেন নি। সুতরাং প্রাচীন কালের হিন্দু উত্তরাধিকার-বিধিও সতীদাহকে সমর্থন করে নি—বিধবার পবিত্র জীবনযাপনকেই সমর্থন করেছে।

তিনি কেবল পত্নীদের ক্ষেত্রেই নয়, কন্যাদের ক্ষেত্রেও প্রাচীন কালে অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা কতোখানি স্বীকৃতি পেতো, তা-ও আলোচনা ক'রে দেখান। তিনি দেখালেন, প্রাচীন শাস্ত্রে পুত্রের সঙ্গে কন্যাকেও পিতার সম্পত্তিতে অধিকারিণী

ক'রে গেছে। কন্যা বিধবা মাতার মতো পুত্রের সঙ্গে সমান অংশের অধিকারিণী না হ'লেও সে ভ্রাতার অংশের এক-চতুর্থাংশ পেতো। কিন্তু, রামমোহন বললেন, বর্তমানে কন্যাকে পিতার উত্তরাধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হয়েছে। কেবল বঞ্চিতই করা হয় নি, অনেক ক্ষেত্রে কন্যাকে পণ নিয়ে বিবাহ দিয়ে দ্রব্যসামগ্রীর মতো বিক্রি করা ও হয়ে থাকে।

তিনি এই নিবন্ধে পুরুষের বহুবিবাহেরও তীব্র সমালোচনা করলেন। রামমোহনকে তাঁর পিতামাতা শৈশবে ও বাল্যকালে তিনটি বিবাহ দিয়েছিলেন। সেজন্য তিনি নিজে দায়ী ছিলেন না। কিন্তু বরাবরই তিনি বহুবিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। এই নিবন্ধে তিনি দেখালেন, পুরুষের বহুবিবাহ স্ত্রীলোকদের স্বামীর উত্তরাধিকার লাভের ক্ষেত্রে ঘোর অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। বাংলা দেশে যেখানে পুরুষের বহুবিবাহের সংখ্যা আশ্চর্যরকমের বেশি, সেখানে স্ত্রীলোকদের অবস্থা এতোই শোচনীয় হয়ে উঠেছে যে, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা দেশেই স্ত্রীলোকের আত্মহত্যার সংখ্যা সর্বাধিক। বাংলা দেশে স্ত্রীলোকদের অবস্থা যে কী ভয়াবহ, তার করুণ চিত্র তিনি তাঁর সহমরণ বিষয়ক দ্বিতীয় নিবন্ধে তুলে ধরেছিলেন। বাংলা দেশে বিশেষতঃ কুলীন ব্রাহ্মণরা যে ভয়াবহ সংখ্যায় বিবাহ করেন, তাঁর সম্পর্কে তিনি বলেন: This horrible polygamy among the Brahmuns is directly contrary to the law given by ancient authors." তিনি বলেন, বহুবিবাহ তো দূরের কথা, প্রাচীন শাস্ত্রে এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় ঐ স্ত্রীর দৈহিক ও নৈতিক ত্রুটির ক্ষেত্রেই কেবল স্বামীকে অপর স্ত্রী-গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

রামমোহন পুরুষের বহুবিবাহের এমন বিরোধী ছিলেন যে, উইলিয়ম অ্যাডাম বলেন, রামমোহন তাঁর উইলে এই মর্মে একটি অনুচ্ছেদ সন্নিবিষ্ট করেছিলেন যে, তাঁর পুত্ররা বা বংশধররা কেউ যদি এক স্ত্রী বর্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে, তবে তারা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

রামমোহন পুরুষের বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী ব্যবস্থাও সুপারিশ করেছিলেন। Had a Magistrate or other public officer been authorised by the rulers of the empire to receive applications for his sanction to a second marriage during the life of a first wife, and to grant his consent only on such accosations as the foregoing being substantiated, the above Law might have been rendered effectual, and the distress of the female sex in Bengal and the number of suicides, would have been necessarily very much reduced.

রামমোহন স্ত্রীলোকের অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে কতোখানি সচেতন ছিলেন, তা বোঝা যায় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ মে তারিখে 'ইণ্ডিয়া গেজেট' কাগজের একটি সংবাদের উদ্ধৃতি থেকে। ঐ তারিখের পূর্বে রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা তাঁদের একটি সভায় হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের ঔচিত্যের কথা ঘোষণা করেছিলেন। এ-বিষয়ে রামমোহন যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বসূরী ছিলেন, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য, রামমোহন বিধবাদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা ঐ সময় থেকে প্রায় এক শ ত্রিশ বছর পরে স্বাধীন ভারত সরকার কার্যে পরিণত করেছেন এবং বিধবা স্ত্রীদের পুত্রের সমান অংশের অধিকার দিয়েছেন। কন্যাদেরও বর্তমানে পিতার উত্তরাধিকারিণী করা হয়েছে। রামমোহনের দৃষ্টি যে কতো সুদূর-প্রসারী ছিল, এ দুটি দৃষ্টান্তই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

রামমোহন যখন এইভাবে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একই সঙ্গে অসাধারণ বিচারবুদ্ধি, সুদূরদৃষ্টি ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সংগ্রামে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁর ব্যক্তিগত কারণে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তারও অন্ত ছিল না। বর্ধমানের মহারাজার দাবি সংক্রান্ত মামলাগুলি তখনও নিষ্পত্তি হয় নি। তার ওপর বর্ধমানের মহারাজা ও তাঁর প্রতিপক্ষদের চক্রান্তে তাঁকে মানসিক দিক থেকে উৎপীড়িত করবার জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদকে একটি মিথ্যা ফৌজদারী মামলায় জড়িত করা হয়েছিল।

বর্ধমান জেলার কালেক্টরেটে রাধাপ্রসাদ নায়েব-সেরেস্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রাসঙ্গিক কাগজ-পত্র থেকে এখন জানা গেছে যে, বর্ধমানের মহারাজা ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা রামমোহনের পরিবারকে জব্দ করবার জন্য সম্ভবতঃ তৎকালীন কয়েকজন কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীকেও প্রভাবিত করেছিলেন। বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হাচিনসন, বর্ধমানের কলেক্টর মিঃ আর্মস্ট্রং এবং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও সরকারের আইন-পরামর্শক মিঃ মলোনির মতো ব্যক্তিরাও এঁদের মধ্যে ছিলেন। মহারাজার সঙ্গে তার বিধবা পুত্রবধূদের যে মামলা চলছিল, তাতে রামমোহনের ভাগিনেয় গুরুদাস ও জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ, উভয়েই বিধবা রানীদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। ফলে, রামমোহন-পরিবারের ও রাধাপ্রসাদের উপর মহারাজা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এই অসন্তোষের ফলে তিনি যেমন রামমোহনের বিরুদ্ধে তিনটি দেওয়ানী মামলা এনেছিলেন, তেমনি সরকারী কর্মচারীদের প্রভাবিত ক'রে রাধাপ্রসাদের বিরুদ্ধেও সরকারী তহবিল তছরুপের মামলা আনিয়েছিলেন।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও সরকারের আইন-পরামর্শক মিঃ মলোনিকে সরকারী তহবিল তছরুপ সম্পর্কে তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছিল। তিনি রাধাপ্রসাদ কর্তৃক তহবিল

তছরুপের অভিযোগ সত্য ব'লে বিবরণ দিলে রাধাপ্রসাদকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। রাধাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর কাছে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য তাঁকে নির্মমভাবে নিগৃহীত করা হ'তে থাকে।

পুত্রের এই অপ্রত্যাশিত বিপদে রামমোহন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁর উদ্বেগ শতগুণ বৃদ্ধি পায় যখন তাঁর স্ত্রী ও রাধাপ্রসাদের জননী শ্রীমতী দেবী পুত্রের জন্য ভগ্নহৃদয়ে শয্যাগ্রহণ করেন। শ্রীমতী দেবী এই আঘাত কাটিয়ে উঠতে পারেন না এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রামমোহন পত্নীশোকে ও পুত্রের বিপদাশঙ্কায় অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েন। এই মামলাতেও তাঁর প্রচুর অর্থব্যয় হয়। প্রায় তিন বছর নিম্নতন আদালতে মামলা চলার পর ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সারকিট আদালত রাধাপ্রসাদকে নিরপরাধ ঘোষণা ক'রে মুক্তি দেন। কিন্তু ঐ আদালতের তৃতীয় জজ মিঃ ওঅলপোল মামলাটি সদর নিজামত আদালতে পাঠান। ঐ বছর (১৮২৬) অগাস্ট মাসে সদর নিজামত আদালত-ও রাধাপ্রসাদকে বেকসুর খালাস দেন।

কিন্তু কয়েকটি মামলায় জলের মতো অর্থব্যয়, স্ত্রীবিয়োগ ও দীর্ঘকালীন উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা রামমোহনের সুদৃঢ় স্বাস্থ্যও ভেঙে দেয়। রামমোহনের চিকিৎসক আলেকজাণ্ডার হ্যালিডে বলেন যে, রামমোহনের এই আঘাত থেকে সেরে উঠতে প্রায় দেড় বছর সময় লাগে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আঘাত তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এর পর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য দ্রুত ভাঙতে শুরু করে, যা পরোক্ষভাবে তাঁর অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী হয়।

রামমোহনের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে প্রতিপক্ষরা অনেক কথাই বলেছেন। কিন্তু তিনি যে স্নেহশীল স্বামী ও স্নেহশীল পিতা ছিলেন, তা রাধাপ্রসাদের বিরুদ্ধে মামলা ও পত্নীবিয়োগের পর তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ থেকেই সহজে অনুমান করা যায়। তিনি তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক আদর্শ ও মতবাদের জন্য একাই সংগ্রাম করেছিলেন, সমস্ত আঘাত তিনি একাকীই হাসিমুখে বরণ করেছিলেন। এই সংগ্রামের ফলে যে সামাজিক ও মানসিক আঘাত এসেছিল, তা থেকে তিনি তাঁর পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের দূরেই রেখেছিলেন। তাঁর স্ত্রীরা তাঁর মায়ের মতোই চিরাচরিত পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাই তাঁদের যতোদিন সম্ভব তাঁর মাতার কাছেই রেখেছিলেন। তাঁর পুত্ররা মাতা ও মাতামহীর ক্রোড়ে লালিত হয়েছিলেন, তাই চিরাচরিত হিন্দু ধর্মের ধ্যানধারণা ও সংস্কার তাঁদের মনে সহজেই উপ্ত হয়েছিল। রামমোহন নিজের ধর্মাদর্শ ও সামাজিক রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানকে তাঁদের ওপর জোর ক'রে চাপিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নি।

তিনি তাঁদের আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাঁদের বিবেক ও বিচারবুদ্ধি যাতে জাগ্রত ও বিকশিত হয়, সেই চেষ্টাই করেছিলেন। তিনি কেবল তাঁদের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন নিজের জীবনের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। এই শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত খুবই কার্যকর হয়েছিল। রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ, দুজনেই মাতামহী ও মাতার প্রভাবে প্রথম-জীবনে পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁরা তা ত্যাগ করেন এবং পিতার ধর্মাদর্শকেই জীবনে গ্রহণ করেন।

জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁর দুই কন্যা—চন্দ্রজ্যোতি ও মৈত্রেয়ী। চন্দ্রজ্যোতির সঙ্গে মুর্শিদাবাদের শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। যে ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় রামমোহনের জন্মকাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে সংবাদ দিয়েছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ এরই বংশধর ছিলেন।

কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ আইনজীবীরূপে খুবই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি-পদে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম বৃত হয়েছিলেন, তবে বিচারাসনে বসবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর দুই পুত্র—হরিমোহন ও প্যারীমোহন। তাঁরা দুজনেই নিঃসন্তান ছিলেন।

৩

বিজয়ী রামমোহন: ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন

ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও রামমোহন সংগ্রাম ক'রে চললেন। তিনি বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে বিন্দুমাত্র ক্ষান্তি দেন নি। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারি এবং ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠিত ধর্মসংস্থার প্রতিনিধি কলকাতার অ্যাংলিক্যান বিশপ ড. মিডলটনের কাছে তিনি যে ধরনের ব্যবহার পেয়েছিলেন, তাতে ব্যাপটিস্ট ও অ্যাংলিকান চার্চের প্রতি তিনি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ও রেঃ অ্যাডাম এবং তাদের সহযোগীরা কলকাতায় ইউনিটারিয়ান কমিটি স্থাপন করেছিলেন। এই ইউনিটারিয়ান কমিটি ছিল খ্রীষ্টান ও হিন্দু সকল একেশ্বরবাদীদের মিলনক্ষেত্র। কলকাতায় স্কটল্যাণ্ডের প্রেসবিটারিয়ান চার্চের সঙ্গেও তিনি সহযোগিতা করছিলেন। এমন কি তিনি প্রেসবিটারিয়ান চার্চের উপাসনাতেও মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছিলেন। তিনি কলকাতাস্থ প্রেসবিটারিয়ান চার্চের যাজক ড ব্রাইসের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এদেশে স্কটল্যাণ্ড থেকে প্রেসবিটারিয়ান মিশনারিদের প্রেরণের জন্যও স্কটল্যাণ্ডের জেনারেল অ্যাসেমব্লির কাছে পত্র দিয়েছিলেন। তারই ফলে তাঁরা কয়েক বছর বাদে তরুণ মিশনারি ও শিক্ষাব্রতী আলেকজাণ্ডার ডাফকে এদেশে পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু তার সর্বাধিক সহানুভূতি ছিল ইউনিটারিয়ান খ্রীষ্টান ও তাঁদের সংস্থার প্রতি। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে হার্ভার্ড কলেজের ইউনিটারিয়ান যাজক হেনরি ওয়ের তাকে ভারতে খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের সম্ভাবনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ক'রে একটি পত্র লিখেছিলেন। ঐ পত্রের জবাব রামমোহন কয়েক মাস পরে দিয়েছিলেন। এই বিলম্বের কারণ সম্পর্কে তিনি জানিয়েছিলেন পশ্চিমের ও পূবের অনেকেশ্বরবাদীদের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক নিয়ে ব্যস্ততার ফলে সময়াভাব।

হেনরি ওয়ের তাকে যে সব প্রশ্ন করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে একটি ছিল ভারত-বাসীদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ বাঞ্ছনীয় কিনা। রামমোহন এই প্রশ্নের উত্তরে লিখেছিলেন: 'প্রত্যেক জাতিতেই যে মানুষ ভগবানকে ভয় ক'রে চলে এবং সৎপথে থাকে ভগবান তাকে গ্রহণ করেন, একথা খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমার ধারণা, যদি প্রকৃত খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও চর্চা ঘটে, তবে তাতে অন্যান্য যে-কোনও ধর্মের তুলনায় মানব জাতির নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা বেশি।"

তিনি ঐ পত্রে জানান যে, আমেরিকার অধিবাসীরা খ্রীষ্টধর্মকে তার অনেকেশ্বরবাদী মতবাদ ও অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত করবার জন্য যে চেষ্টা করছেন, তাতে তিনি আনন্দিত। তিনি একথা জানান যে, কোনও শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত হিন্দু যে ট্রিনিটারিয়ান খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে পারে, এটা নৈতিক দিক থেকে অসম্ভব। তবে তারা অনেকে ইউনিটারিয়ান খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বা গ্রহণে উৎসাহ দিতে পারে, যদি ঐ মতবাদ ভারতীয়দের পক্ষে বোধগম্য ক'রে প্রচার করা হয়। তিনি বলেন, ইউনিটারিয়ান মিশনারিরা যদি ইংরেজীতে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষা দেয় এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু খ্রীষ্টীয় মতবাদের কথা জানায়, তবে তা খুবই এদেশবাসীর পক্ষে উপযোগী হবে। কারণ, এর দ্বারাই তাদের বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির উন্নতি সাধিত হবে। তিনি জানান, I may fully justified in saying that two-thirds of the native population of Bengal would be exceedingly glad to see their children educated in English learning. এদেশীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ ও তার বিতরণে কোন ফলই হয় নি বা হ'তে পারে না।

এইভাবে রামমোহন ইংলণ্ড ও আমেরিকার ইউনিটারিয়ান মিশনারিদের সঙ্গে পত্রালাপ ও যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই সব যোগাযোগের ফলে তিনি ও মিঃ অ্যাডাম এদেশে একটি ইউনিটারিয়ান মিশন গঠনে খুবই উৎসাহ বোধ করেন। রামমোহনের সহযোগীরাও উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এই মিশনের জন্য রামমোহন পাঁচ হাজার টাকা, দ্বারকানাথ ঠাকুর আড়াই হাজার টাকা ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর আড়াই হাজার টাকা দিয়ে একটি তহবিল খোলেন। রামমোহন ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে লণ্ডনের ইউনিটারিয়ান কমিটির কাছে একটি বিবরণীও পাঠান। তাতে তিনি লণ্ডনের ইউনিটারিয়ান কমিটি তাঁর Precepts of Jesus ও খ্রীষ্টান জনসাধারণের কাছে দুটি আবেদন মুদ্রিত করেছেন ব'লেও আনন্দ প্রকাশ করেন। কলকাতার ইউনিটারিয়ান কমিটি তাঁদের উপাসনালয় ও বিদ্যালয়-গৃহের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান ক্রয়ের চেষ্টা করছেন ব'লেও জানানো হয়।

রামমোহন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে পারেন, এমন আশা যখন অনেক মিশনারি-ই মনে মনে পোষণ করছিলেন, তখনও কিন্তু তাঁরা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারতেন, রামমোহন খ্রীষ্টের বাণীগুলিকে মানুষের নৈতিক জীবন গঠনে সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লে ঘোষণা করলেও তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ ক'রে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণের কোনও উপযুক্ত কারণ দেখতে পান নি। শ্রীরামপুরের পাদরি ও ডাঃ টাইলার হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করায় তিনি হিন্দু ধর্মের সমর্থনে সকল শক্তি নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে অল্পবুদ্ধি সাধারণ মানুষের মনে ধর্মীয় চেতনা সঞ্চারের উপযোগী রূপক ব'লে বর্ণনা করতেও কুণ্ঠিত

হন নি। যিশু যদি ভগবান্ হন, তবে রামের ভগবান্ হ'তে দোষ কোথায়, এ প্রশ্নও তিনি ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনারিদের মুখের উপর ছুঁড়ে দেন। হিন্দু ধর্মের একেশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতার মধ্যে একটি সমন্বয়সাধনের চেষ্টাও যে তিনি করেন নি, এমন নয়। পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণের মধ্যে এই সমন্বয়সাধন সার্থক রূপ লাভ করলেও রামমোহনের মধ্যে এর ইঙ্গিত আমরা পাই। রামকৃষ্ণ হিন্দু পৌত্তলিকতাকে অদ্বৈতবাদে উপনীত হওয়ার সোপানরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সে সোপানের গুরুত্ব তিনি বিন্দুমাত্র কম ক'রে দেখেন নি। রামমোহনও হিন্দু একেশ্বরবাদের সঙ্গে হিন্দু পৌত্তলিকতার সমন্বয় সন্ধানে প্রায় ঐ প্রকার সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছেছিলেন।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরোপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি সংস্কৃত ভাষায় একটি নিবন্ধ রচনা করেন। ঐ নিবন্ধটি শিবপ্রসাদ শর্মার নামেই প্রকাশিত হয়। এর ইংরেজী অনুবাদ ও ইংরেজী টীকা রামমোহন A Friend of the Author এই ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। এতে হিন্দু ধর্মের এই সমস্যা তুলে ধরা হয়। অনেক শাস্ত্রে প্রতিমা-পূজার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আবার অনেক শাস্ত্রে তা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এই দুই বিরুদ্ধ মতের সমন্বয় কিভাবে হ'তে পারে?

রামমোহন বলেন, 'ভাগবতে' ব্যাসদেব এবং ব্যাসদেবের টীকাকার শ্রীধর এই মর্মে মত প্রকাশ করেছেন যে, সর্বব্যাপী পরমেশ্বর সম্পর্কে মানুষের চেতনা যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠানের উপযোগিতা ও মূল্য আছে। মানুষ যখন সেই চেতনা লাভ করে, তখন সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর হৃদয়ে আসীন হয়ে সকল কিছুই লক্ষ্য করছেন এই বোধ থেকে দীনের সেবা, অপরের প্রতি সম্মান, বন্ধুত্ব ও সর্বজীবে সমত্ববোধ, এই চারি প্রকার কর্তব্যের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের উপাসনা করে। এই ভাবই রামমোহন হিন্দু ধর্মের সমর্থনে লিখিত নিবন্ধগুলিতেও ভাষান্তরে বলেছিলেন। তিনি এই নিবন্ধে আরও লেখেন যে, ইহুদীদের ধর্মে পৌত্তলিকতাকে বা বস্তুর মাধ্যমে ঈশ্বরোপাসনাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্টধর্মে তাকে পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। ইহুদীদের ধর্ম Old Testament-এ স্থান পেয়ে খ্রীষ্ট ধর্মশাস্ত্রভুক্ত হয়েছে। সুতরাং হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে পৌত্তলিকতা ও একেশ্বরবাদ একসঙ্গে স্থান পেলে তাতে হিন্দু ধর্মের মধ্যে বৈসাদৃশ্য ও অসামঞ্জস্যের কিছু ঘটে না। বরং খ্রীষ্টধর্ম যেমন ইহুদীদের ধর্মের ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তেমনি একেশ্বরবাদের সঙ্গে পৌত্তলিকতারও ঐতিহাসিক যোগসূত্র আছে।

রামমোহন খ্রীষ্টধর্মকে মানুষের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চরিত্র গঠনে অন্যান্য সকল ধর্মের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর ব'লে ঘোষণা করলেও, আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে রামমোহন হিন্দু ধর্মের বেদান্তকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিতেন। তিনি গায়ত্রীর মধ্যেই এই

উচ্চতম আধ্যাত্মিক দর্শনের সন্ধান পেয়েছিলেন—যে গায়ত্রী পৌত্তলিক ব্রাহ্মণদেরও অপরিহার্য ইষ্টমন্ত্র। গায়ত্রীকে অপরিহার্য ইষ্টমন্ত্ররূপে গ্রহণ করায় পৌত্তলিকতা ও অনুষ্ঠানসর্বস্ব রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরাও একেশ্বরবাদকেই নিজেদের অজ্ঞাতে হ'লেও সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। ব্রাহ্মণরা নিত্য গায়ত্রী জপ করেন, অথচ গায়ত্রীর অর্থ কি বোঝেন না বা অন্যকে বুঝতে দেন না। তাই রামমোহন 'গায়ত্রীর অর্থ' বাংলা ভাষায় লিখে একেশ্বরবাদই যে হিন্দু ধর্মের ভিত্তি ও আদর্শ, তা-ই প্রমাণ ক'রে দেখালেন। তিনি 'গায়ত্রীর অর্থ' নিবন্ধের ভূমিকায় লিখলেন :

> এ পর্যন্ত বাহুল্যমতে বিধিবাক্য সকল বর্তমান থাকাতে স্বার্থপর ব্যক্তি সকলের এমৎ সাহস হঠাৎ হয় না যে এ সাধনকে অনাবশ্যক কিম্বা অকর্তব্য কহেন কিন্তু আপন লাভার্থে অনুগত লোকদিগ্যে এ উপাসনা হইতে নিবর্ত করিবার নিমিত্ত কহিয়া থাকেন যে এ সাধন শাস্ত্রসিদ্ধ হইয়াও এদেশে পরম্পরাসিদ্ধ নহে ওই অনুগত ব্যক্তিরা কি সিদ্ধপরম্পরা কি অন্ধপরম্পরা ইহার বিবেচনা না করিয়া আত্মোপাসনা হইতে বিমুখ হইয়া লৌকিক ক্রীড়া যাহাতে হঠাৎ মনোরঞ্জন হয় তাহাকেই পরমার্থ সাধন করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মোপাসনা যেমন ব্রাহ্মণাদির প্রতি সর্বশাস্ত্রে প্রাপ্ত হইযাছে সেইরূপ পরম্পরাতেও সিদ্ধ হয় ইহা বিশেষরূপে জ্ঞাত করা এই এক প্রয়োজন হইযাছে॥ প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও ত্রিপাদ গায়ত্রী ইঁহাকে বাল্যকাল অবধি জপ করেন এবং অনেকে ইহার পুরশ্চারণা করিয়া থাকেন অথচ তাঁহারদের গায়ত্রী প্রদাতা আচার্য অথবা পুরোহিত কিম্বা আত্মীয়-পণ্ডিতেরা পরব্রহ্মোপাসনা হইতে তাঁহা দিগে পরাঙ্মুখ রাখিবার নিমিত্ত এ মন্ত্রের কি অর্থ তাহা অনেককে কহেন না এবং ঐ জপকর্তারাও ইহার কি অর্থ তাহা জানিবার অনুসন্ধান না করিয়া শুকাদির ন্যায় কেবল উচ্চারণ করিয়া এ মন্ত্রের যথার্থ ফলপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন এ কারণ ইহার অর্থজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাদের জপের সাফল্য হয় এই দ্বিতীয় প্রয়োজন হইয়াছে।

সুতরাং আমরা লক্ষ্য করি, রামমোহন খ্রীষ্টধর্ম ও হিন্দু ধর্ম, এই দুয়ের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হ'লেও হিন্দু ধর্মকেই আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম শীর্ষে স্থান দিয়েছিলেন এবং হিন্দু ধর্ম ত্যাগ ক'রে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কখনও মুহূর্তের জন্যও মনে স্থান দেন নি। রামমোহন খ্রীষ্টান ব'লে নিজেকে মনে করেন কি না, এই প্রশ্ন তাই অনেকেই করতে থাকেন। রামমোহন খ্রীষ্টীয় উপাসনালয়ে যাতায়াত করাতেও এ প্রশ্ন অনেকের মনেই গভীর হয়ে ওঠে। ডঃ টাকারম্যানকে লিখিত এক পত্রে উইলিয়ম অ্যাডাম জানান যে, রামমোহন নিজেকে খ্রীষ্টান ব'লে মনে করেন কি না এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে তিনি অসমর্থ। তবে,

তাঁর মতে, পুরো সত্য না হ'লেও সত্যের খুব কাছাকাছি হ'লো এই যে, রামমোহন খ্রীষ্টান ও হিন্দু, দু-ই—তিনি খ্রীষ্টানদের সঙ্গে খ্রীষ্টান, হিন্দুদের সঙ্গে হিন্দু—"Christian with Christians and a Hindu with Hindus."

অ্যাডাম বলেন, তাঁর এই জবাবে মনে হ'তে পারে যে তিনি পরস্পরবিরোধী কিছু বলছেন, বা রামমোহন তাঁর ধর্মবিশ্বাসে আন্তরিক নয়। কিন্তু রামমোহন যে পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন, তার সব দিক বিচার ক'রে দেখলে এই কথাই বলতে হয়। তার পৌত্তলিকতার বিরোধিতা নিরঙ্কুশ, পরিপূর্ণ ও আপোসহীন। কিন্তু তাঁর পৌত্তলিকতার বিরোধিতা ব্রাহ্মণের অধিকারসমূহ, বর্ণভেদের নির্ধারিত রীতিনীতি রক্ষা করার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন নয়। দেশবাসীর কল্যাণই তার সর্বাধিক প্রিয়বস্তু। তা সাধনের জন্য বর্ণভেদের রীতিনীতি মেনে চলা তার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। অন্য পক্ষে, তিনি সহজে পৌত্তলিকতা বর্জন করলেও সহজে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে পারেন না। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের দ্বারা তিনি জাতিচ্যুত হবেন, বিষয়-সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন, প্রভাব-প্রতিপত্তি হারাবেন। তাই তিনি নামে খ্রীষ্টান না হ'লেও কার্যতঃ যে খ্রীষ্টান, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া, তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে হিন্দুরা তাকে সম্ভ্রান্ত ও উদারমনা খ্রীষ্টানদের সগোত্র ব'লে মনে করবে না। সম্প্রতি ইংরেজ বা তারও বহু পূর্বে পর্তুগীজ মিশনারিরা যে নীচজাতীয়, অজ্ঞ ও অধঃপতিত হিন্দুদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন, হিন্দুরা তাকে তাদেরই সগোত্র মনে করবে। মুসলমানরা তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। কিন্তু মুসলমানরা খ্রীষ্টান বলতে ত্রীশ্বরবাদী খ্রীষ্টানদেরই বোঝায়। সুতরাং তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তাদের চোখেও হেয় হবেন। এককথায়, এই অবস্থায় তার খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণের অর্থ হবে, তিনি যাদের থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ব'লে মনে করেন তাদেরই সগোত্র হওয়া।

এই পত্রে অ্যাডাম রামমোহনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে কতকগুলি অন্তরায়ের কথাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রামমোহন যে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বেও বিশ্বাসী ছিলেন, আধ্যাত্মিক দিক থেকে যে হিন্দু ধর্ম শীর্ষস্থানীয়, তাকে ত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তা যে রামমোহন কখনও বোধ করেন নি, অ্যাডাম প্রভৃতি রামমোহনের ঘনিষ্ঠ খ্রীষ্টান বন্ধু ও সহযোগীরাও তা উপলব্ধি করেন নি।

রামমোহন ব্রাহ্মণের অধিকারগুলি রক্ষা ক'রে চলতেন। কারণ, হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কিছু বলবার বিশেষ অধিকার ব্রাহ্মণরাই হিন্দু সমাজে ভোগ করছেন। হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে রামমোহন তাই ব্রাহ্মণের অধিকারসমূহ ক্ষুণ্ণ হ'তে দেন নি। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি জাতিভেদ বা বর্ণভেদ সমর্থন করতেন। বরং তিনি জাতিভেদের বিরুদ্ধেই মত পোষণ করতেন এবং তাঁর এই বিরুদ্ধ মতের সমর্থনে তিনি মৃত্যুঞ্জয়াচার্য-রচিত 'বজ্রসূচী'

নামে একটি গ্রন্থের 'প্রথম নির্ণয়' নামক প্রথম অধ্যায়টি বাংলায় অনুবাদ করেন। ঐ গ্রন্থের মূলও তিনি বাংলা অনুবাদের সঙ্গে প্রকাশ করেন। বজ্রসূচী গ্রন্থের 'ভাষাবিবরণে' রামমোহন লেখেন :

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি প্রকার বর্ণ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণের স্বরূপ কি ইহা প্রথমত বিচারণীয় হয়, যেহেতু ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু ইহা শাস্ত্রে কহেন। ব্রাহ্মণ শব্দে কাহাকে কহি, কি জীবাত্মা, কি দেহ, কি জাতি, কি বর্ণ, কি ধর্ম, কি পাণ্ডিত্য, কি কর্ম, কি জ্ঞান।

যদি বল জীবাত্মা ব্রাহ্মণ হন, তাহাতে সর্বপ্রকারে দোষ হয়। প্রথমত সর্বপ্রাণীর জীবকে একস্বরূপ স্বীকার করিলে সর্বপ্রাণীর ব্রাহ্মণত্ব সম্ভব হইল। দ্বিতীয়ত শরীরভেদে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন হন ইহা অঙ্গীকার করিলে, ইহজন্মে যে জীব ব্রাহ্মণ আছেন তেঁহ কর্মাধীন জন্মান্তরে শূদ্রদেহ প্রাপ্ত হইলে তাহার শূদ্রত্ব কেনে না হউক।

যদি বল দেহ ব্রাহ্মণ হয়, আচণ্ডাল মনুষ্যসকলের দেহ ব্রাহ্মণ হইল, যেহেতু মূর্তিতে ও জরা মরণাদিতে ধর্মেতে সকল দেহ তুল্য হয়।...দেহকে ব্রাহ্মণ কহিলে পিতামাতার মৃত দেহকে দাহ করিলে পুত্রের ব্রহ্মহত্যা পাপের উৎপত্তি হউক; অতএব দেহের ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি জাতিকে ব্রাহ্মণ কহ, তবে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ এবং পশুপক্ষিসকলও এক এক জাতিবিশিষ্ট হয় কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ নহে। যদি জাতি শব্দে জন্ম কহ, অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হইতে জন্ম যাহার হয় সেই ব্রাহ্মণ, তবে শ্রুতি স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ অনেক মহর্ষিদের ব্রাহ্মণত্ব ব্যাঘাত হইল, যেহেতু ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি মৃগী হইতে জন্মেন এবং পুষ্পস্তবক হইতে কৌসিব মুনি, উইঢিপি হইতে বাল্মীকি, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ, কলশ হইতে অগস্ত্য, ভেকের গর্ভে মাণ্ডুক্য, হস্তিগর্ভে অচর ঋষি, শূদ্রাগর্ভে ভরদ্বাজ মুনি, কৈবর্তকন্যাতে বেদব্যাস, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মেন ইহাদের তাদৃশ জন্ম ব্যতিরেকেও সম্যক-প্রকার জ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব শাস্ত্রে শুনিতেছি, অতএব জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি বর্ণবিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এমত কহ, তবে সত্ত্বগুণত্বপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণের শুক্লবর্ণ হওয়া আর সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ স্বভাব প্রযুক্ত ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ ও রজোগুণ ও তমোগুণ হেতুক বৈশ্যের পীতবর্ণ আর শূদ্র তমোময় হেতু তাহার কৃষ্ণবর্ণ হওয়া উচিত হয়...

যদি ধর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ কহ, তবে ক্ষত্রিয়াদি অনেকে ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্র,

পূর্ত অর্থাৎ বাপীকূপাদি প্রতিষ্ঠা ও অন্য নিত্যনৈমিত্তিকাদি ধর্মের অনুষ্ঠান করিবার ক্ষমতা রাখেন, তাহারা কি ব্রাহ্মণ হইবেন ;···

যদি পাণ্ডিত্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এমত কহ, তবে জনকাদি ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অনেকের মহাপাণ্ডিত্য শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে এবং এক্ষণেও কারণ সত্ত্বে অন্য জাতীয়দেরও পাণ্ডিত্য হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ নহে ;···

কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এমত কহিলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতিও কন্যাদান, হস্তি হিরণ্য অশ্ব পৃথিবী মহিষী দানাদি কর্ম করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের ব্রাহ্মণত্ব নাই।

··পরমাত্মার সত্তাতে বিশ্বাস দ্বারা কৃতার্থ হইয়া কার্য দানাদি সাধনে যত্নশীল এবং দয়া ও সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাৎসর্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান্ যে ব্যক্তি হন, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ কহা যায়, যেহেতু শাস্ত্রে কহে, "জন্মপ্রাপ্ত হইলে সর্বসাধারণ শূদ্র হয়, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজশব্দবাচ্য হন, বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্র আর ব্রহ্ম জানিলে ব্রাহ্মণ হন", অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ, অন্য নহে ইহা নিশ্চয় হইল।··

সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত উপবীত ধারণ করলেও এবং ব্রাহ্মণের অধিকারগুলি রক্ষার জন্য সতত যত্নবান্ থাকলেও, তিনি যে বর্ণভেদ মানতেন না, উপরের যুক্তিগুলিতে তার বিশ্বাসই তা প্রমাণ করে। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অ্যাডাম রামমোহন সম্পর্কে লেখেন যে: হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থায় পানাহারের যে সব বিধিনিষেধ আছে, তা তিনি মেনে চলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের নিষিদ্ধ আহার গ্রহণ করেন না, অন্য ধর্মের বা অন্য জাতির লোকদের সঙ্গে পানাহার করেন না। বর্ণভেদের এই নিয়মগুলিই তিনি মেনে চলেন।···তাঁর পারিবারিক ক্ষেত্রে বিবাহে বা মৃত্যুতে যে সব পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠান করা হয়, সেগুলি থেকে ব্যক্তিগতভাবে তিনি দূরে থাকেন, যদিও পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিরা সেগুলি করা প্রয়োজন মনে করলে তাতে তিনি বাধা দেন না।

রামমোহন হিন্দু সমাজের জাতিভেদকে কেবল ধর্মীয় কারণেই ঘৃণা করতেন না, তিনি রাজনৈতিক দিক থেকেও জাতিভেদকে ঘৃণা করতেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা এই ছিল যে, হিন্দুরা জাতিভেদের ফলেই সর্বদা পরস্পরকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং কখনও সংঘবদ্ধ হ'তে পারে নি, তাই হিন্দুরা যুগে যুগে বারে বারে রাজনৈতিক দিক হ'তে পরাভূত ও পরপদানত হয়েছে। তিনি মৎস্যমাংসাদি আহার ও অহিংসা সম্পর্কেও হিন্দুদের গোঁড়ামিকে তাদের দুর্বলতার কারণ মনে করতেন। তিনি বলেছিলেন বর্ণভেদ ও অত্যধিক শিষ্টতা—Caste System and excessive civilization—

হিন্দুদের রাজনৈতিক দুর্বলতার প্রধান কারণ। ফলে, রামমোহন বর্ণভেদ ও পানাহার সম্পর্কে উদার মত রাজনৈতিক কারণেও পোষণ করতেন, বলা চলে।

রামমোহনের খ্রীষ্টান বন্ধুরা রামমোহন সম্পর্কে যে ধারণাই পোষণ করুন না কেন, রামমোহন খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে যে নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠতা ও একেশ্বরবাদের সন্ধান পেয়েছিলেন, তা-ই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল; সম্ভবতঃ ইসলাম ধর্মই তাঁকে একেশ্বরবাদ সম্পর্কে সর্বপ্রথম সচেতন ক'রে তুলেছিল। রামমোহন ইসলাম সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাডাম লেখেন যে, রামমোহন হজরত মহম্মদের একটি জীবনী লিখতে যাচ্ছেন। রামমোহনের মতে, মহম্মদকে তাঁর মিত্ররা ও শত্রুরা, উভয়েই ভুলভাবে ব্যাখ্যা বা চিত্রিত করেছেন। যাই হ'ক, রামমোহন মহম্মদের জীবনী লেখার অবকাশ পান নি। তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁকে সকল ধর্মের মূল ঐক্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত করেছিল। পরবর্তী কালে পৃথিবীর ধর্ম-সমূহের এই তুলনামূলক বিচার একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছিল। এই তুলনামূলক ধর্মীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রামমোহন নিঃসন্দেহে ম্যাক্স্ মূলার, মনিয়ের উইলিয়মস্ প্রভৃতির পূর্বসূরী ছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন ও মিঃ অ্যাডামের উদ্যোগে যখন ক্যালকাটা ইউনিটারিয়ান কমিটি গঠিত হয়, তখন সকল শ্রেষ্ঠ ধর্মের মিলনকেন্দ্র বা ঐক্যস্থল যে একেশ্বরবাদ, তখন তারই প্রচার ছিল এই কমিটির উদ্দেশ্য।

দক্ষিণ ভারতে উইলিয়ম রবার্টস্ যে সাউথ ইণ্ডিয়ান ইউনিটারিয়ান কনগ্রিগেশন স্থাপন করেছিলেন, তার সঙ্গে ক্যালকাটা ইউনিটারিয়ান কমিটির যোগাযোগ ছিল কিনা জানা না গেলেও, তার সঙ্গে ক্যালকাটা ইউনিটারিয়ান কমিটির বৈসাদৃশ্য ছিল গভীর। উইলিয়ম রবার্টস্ ছিলেন ভারতীয়, তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ট্রিনিটারিয়ান খ্রীষ্টানদের মতবাদ সম্পর্কে আস্থাহীন হয়ে ইউনিটারিয়ান খ্রীষ্টধর্মের সমর্থক হয়েছিলেন। অন্যপক্ষে, রামমোহন ও তাঁর হিন্দু সহযোগীরা কেউ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নি; তাঁরা সকলেই ধর্মান্তরিতকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

রামমোহন সুস্পষ্টভাবেই তাঁর Humble Suggestions শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছিলেন: "We should feel no reluctance to co-operate with them in religious matters, merely because they consider Jesus Christ as the Messenger of God and their Spiritual Teacher; for oneness in the object of worship and sameness of religious practice should produce attachment between worshippers." অর্থাৎ, ইউনিটারিয়ানরা যিশুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করে না, তাঁকে ভগবানের বাণীবাহক ও তাঁদের আধ্যাত্মিক গুরু ব'লে মনে করে, এবং তারা একেশ্বরবাদী, তাই রামমোহন তাদের

সমর্থন ও তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। তিনি অন্যত্র-ও বলেন, তিনি ইউনিটারিয়ান খ্রীষ্টানদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন ও তাদের উপাসনালয়ে যাচ্ছেন, কারণ তারাও একেশ্বরবাদী মতবাদ বিশ্বাস করে, প্রচার করে ও শিক্ষা দেয়, যে শিক্ষা আমাদের বেদ-ও দিয়ে থাকে। "Because Unitarians believe, profess and inculcate the doctrine of divine unity—a doctrine which I find firmly maintained by Christian Scriptures and our most ancient writings commonly called the Vedas". সুতরাং রামমোহন খ্রীষ্টান উপাসনালয়ে যোগ দিলেও বা খ্রীষ্টান ধর্মসংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করলেও তিনি যে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের বিরোধী ছিলেন, তা তিনি সর্বদাই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

ইউনিটারিয়ান কমিটি স্থাপিত হ'লেও কিছুদিন কাজ চলবার পরে এর কাজে ভাটা পড়েছিল। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কমিটি আবার নূতন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। মিঃ অ্যাডাম 'ক্যালকাটা ক্রনিকল্' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। সরকার তার প্রকাশনা বন্ধ ক'রে দেওয়ায় তিনিও ঐ কমিটির কাজে পূর্ণোদ্যমে আত্মনিয়োগ করেন। লণ্ডনের ইউনিটারিয়ান কমিটি-ও কয়েক মাস আগে পনের হাজার টাকা দিয়েছিলেন। রাধাপ্রসাদ রায় অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের পাশে খানিকটা জায়গা ইউনিটারিয়ানদের উপাসনালয় করবার জন্য দিতে চাইলেন। ঐ জায়গায় তিন-চার হাজার টাকা দিয়ে একটি বাড়ী করবার কথাও হ'লো। ঐ বাড়ী না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা 'হরকরা' কাগজের বাড়ীর একাংশে অস্থায়ী উপাসনালয় স্থাপন করলেন। এখানে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আগস্ট রবিবার প্রাতঃকালীন উপাসনা শুরু হ'লো।

রাধাপ্রসাদের বিরুদ্ধে মামলা ও রাধাপ্রসাদের মাতার মৃত্যুর পর রামমোহনের স্বাস্থ্য খুবই ভেঙে গিয়েছিল। তাই প্রায় দু বছরকাল তাঁর সদা-চঞ্চল লেখনী প্রায় নিষ্ক্রিয় ছিল। ঐ সময়ে আবার তাঁর লেখনী সক্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি বাংলা অনুবাদ-সহ সংস্কৃত ভাষায় লেখা "গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধান" রচনা ও প্রকাশ করেন। সমুদয় বেদ পাঠ না ক'রেও কেবল গায়ত্রী জপ দ্বারাই ব্রহ্মোপাসনা হয়, এই নিবন্ধে রামমোহন তা-ই প্রমাণ ক'রে দেখান। তিনি ঐ নিবন্ধের ইংরেজী অনুবাদও ঐ বছরই প্রকাশ করেন। ঐ সময়ে তিনি মিঃ অ্যাডামের সঙ্গে বাইবেলে 'Sermon on the Mount' অংশও সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। তিনি Precepts of Jesus-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন, যিশুর বাণীগুলি তিনি সংস্কৃতেও অনুবাদ করবেন। সম্ভবতঃ এ ছিল সেই প্রতিশ্রুতিরই আংশিক পূরণ।

রামমোহন ইউনিটারিয়ানদের উপাসনায় সদলে যোগ দেওয়ায় অনেকেই সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তারই জবাবে রামমোহন লিখলেন তাঁর Answer of a Hindu

to the Questions—"Why do you frequent a Unitarian place of worship instead of the numerously attended Established Churches?" এই নিবন্ধটি তিনি অন্যান্য অনেক নিবন্ধের মতোই নিজের নামে প্রকাশ করেন নি। প্রকাশ করেছিলেন তাঁর তরুণ অনুগামী চন্দ্রশেখর দেবের নামে। তিনি ইউনিটারিয়ান উপাসনা-স্থলে কেন যান, তার কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে। তাঁর উত্তরও ছিল তাই।

কিন্তু ইউনিটারিয়ানদের উপাসনায় লোকাভাব ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠলো। এমনকি ইউনিটারিয়ান কমিটির অনেক সদস্যও নিয়মিত আসতেন না। রামমোহন নিজেও শেষে অনুপস্থিত হ'তে লাগলেন। মিঃ অ্যাডাম ক্যালকাটা ইউনিটারিয়ান কমিটির নাম পরিবর্তন ক'রে তাকে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ইউনিটারিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নাম দিয়ে শক্তিশালী ক'রে তুলতে চাইলেন। উদ্দেশ্য, তাতে ইংরেজ ও মার্কিন ইউনিটারিয়ানদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে এবং বাইরে থেকে উৎসাহ ও সাহায্য পাওয়া যাবে। কিন্তু তাদের উপাসনায় তবু লোকাভাব ঘুচলো না। তখন মিঃ অ্যাডাম মাদ্রাজে প্রচারকার্যের উদ্দেশ্যে কমিটির পক্ষ থেকে প্রেরিত হ'তে চাইলেন। কিন্তু কমিটি তাতে সম্মত হলেন না, বললেন কলকাতায় অ্যাডামের উপস্থিতি অপরিহার্য। তিনি অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলটিকে ইউনিটারিয়ানদের সংস্থারূপে চালাতে চাইলেন, কিন্তু রামমোহন তাতে সম্মত হলেন না। তখন অ্যাডাম বললেন, কমিটির পক্ষ থেকে তাকে যে ভাতা দেওয়া হয়, তার বিনিময়ে তাঁর জন্য কিছু কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা হ'ক। কিন্তু কমিটি সেরকম কোনও কাজ বা পদ সৃষ্টি করতে পারলেন না। ফলে, মিঃ অ্যাডাম ভগ্নমনোরথ হয়ে পড়লেন। তিনি নামে না হ'লেও কাজে যে ইউনিটারিয়ান খ্রীষ্টান সংস্থা গ'ড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন, তা যে ব্যর্থ হ'তে চলেছে, দেখলেন। তবু তিনি আশা ছাড়লেন না।

রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে অ্যাডাম ও অন্যান্য ইউনিটারিয়ান খ্রীষ্টানদের একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল, যা তাঁদের একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হওয়ার পথে প্রধান অন্তরায় ছিল। অ্যাডাম প্রভৃতি ইউনিটারিয়ান খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টের অবতারত্ব বা ঈশ্বরত্বে অথবা ত্রীশ্বরবাদে বিশ্বাসী না হ'লেও, তাদের কাছে একমাত্র যিশু-ই ছিলেন পরিত্রাতা এবং বাইবেল-ই ছিল একমাত্র শাস্ত্র যার মধ্যে দিব্য বাণী প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রামমোহন যিশুকে পৃথিবীর অন্যান্য ঈশ্বরের বাণীবাহকদের একজন ব'লেই মনে করতেন, বাইবেলকেও একমাত্র শাস্ত্র যাতে ঈশ্বরের বাণী আত্মপ্রকাশ করেছে ব'লে মনে করতেন না। ফলে, অ্যাডাম ও খ্রীষ্টান ইউনিটারিয়ানরা যখন চেয়েছিলেন একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টধর্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা, তখন রামমোহন চেয়েছিলেন পৃথিবীর সকল একেশ্বরবাদীদের নিজ নিজ ধর্মে অবিচল থেকে মিলন ও মৈত্রী। এই গভীর ও দুস্তর

স্বতপার্থক্যই ইউনিটারিয়ান কমিটি বা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ইউনিটারিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ব্যর্থতায় অনিবার্য কারণ ছিল। রামমোহন ধর্মান্তরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন—"In every nation he that feareth God and worketh righteousness is accepted with Him in whatever form of worship he may have been taught to glorify God". সুতরাং ভারতীয়রা প্রাচীন কাল থেকে ভগবানের উপাসনার যে রীতি (form) শিক্ষা ক'রে এসেছেন, সেই রীতিতেই তাঁদের ঈশ্বরোপাসনা করাই উচিত।

রামমোহন তখন খ্রীষ্টান ইউনিটারিয়ানদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে হিন্দু একেশ্বরবাদীদের জন্য স্বতন্ত্র সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই উপলব্ধি করছিলেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই এই স্বতন্ত্র সংস্থা স্থাপিত হ'লো। এই সংস্থা গঠন সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সেটি হ'লো এই :

একদিন 'হরকরা' আপিস-সংলগ্ন ইউনিটানিয়ানদের উপাসনালয় থেকে রামমোহন ও তাঁর দুজন তরুণ অনুগামী তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব ফিরছিলেন। পথে তারাচাঁদ ও চন্দ্রশেখর রামমোহনকে বললেন, "আমরা বিদেশীদের একটি উপাসনা-স্থানে উপাসনার জন্য যাই কেন? এর কি প্রয়োজন আছে? আমরা তো নিজেরা একেশ্বরের উপাসনার জন্য নিজেদের একটি উপাসনালয় স্থাপন করলে পারি?"

তরুণ অনুগামীদের এই মন্তব্য রামমোহনের মনে খুবই রেখাপাত করে। তিনি এ-বিষয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ মুনশি, মথুরানাথ মল্লিক প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা করেন এবং স্বগৃহে বন্ধু ও অনুগামীদের একটি সভা আহ্বান করেন। সভায় সকলেই একমত হন এবং তাঁদের একটি স্বতন্ত্র সংস্থা ও উপাসনালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথমে সিমলা অঞ্চলেই কোনও একটি স্থানের সন্ধান চলতে থাকে। ঐ অঞ্চলে উপযুক্ত কোনও স্থান পাওয়া গেল না। তখন তাঁরা জোড়াসাঁকোয় রামকমল বসুর একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে তাতেই তাঁদের ঐ পৃথক সংস্থা ও উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। কেউ কেউ বলেছেন বাড়ীর মালিক ছিলেন কমললোচন বসু। কিন্তু এখন জানা গেছে বাড়ীটির মালিক ছিলেন রামকমল বসু। বাড়ীটি ছিল ৪৮নং চিৎপুর রোডে।

হিন্দু একেশ্বরবাদীদের নিয়ে সমাজ বা সংস্থা গঠনের প্রচেষ্টা রামমোহনের এই নূতন নয়। ১৮০৯ থেকে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যখন তিনি রংপুরে ছিলেন, তখনও তিনি স্বগৃহে তাঁর সমধর্মী ও সমচিন্তাভাগী বন্ধুদের নিয়ে সভার আয়োজন করতেন। কলকাতায় স্থায়িভাবে বাস করবার পরে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাসে মাসে তিনি 'আত্মীয় সভা'-র আয়োজন করতেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রভাবে রেঃ অ্যাডাম

ত্রীশ্বরবাদী খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ ক'রে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী বা ইউনিটারিয়ান খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী হয়ে উঠলে, একেশ্বরবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকে দ্রুত শক্তিশালী ক'রে তোলার জন্যই তিনি ও তাঁর অনুগামীরা ক্যালকাটা ইউনিটারিয়ান কমিটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কমিটির ব্যর্থতা এবং ইউনিটারিয়ান খ্রীষ্টানদের খ্রীষ্ট একমাত্র ত্রাণকর্তা ও বাইবেল একমাত্র দিব্য বাণীর প্রকাশ এইরূপ সঙ্কীর্ণ মতবাদ, রামমোহনকে হিন্দুদের স্বতন্ত্র একেশ্বরবাদী সংস্থা ও উপাসনালয় স্থাপনে উদ্যোগী করেছিল।

এই নূতন ধর্মীয় সংস্থার প্রতিষ্ঠা হ'লো ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্ট (বাংলা ৬ ভাদ্র, ১২৩৫ সাল)। হিন্দু ধর্মে যাঁকে এক ও অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম বলেছে, তাঁরই উপাসনা হ'লো এই সংস্থার লক্ষ্য। তাই ঐ সংস্থা 'ব্রহ্ম সভা' বা 'ব্রাহ্ম সমাজ' নামে আখ্যাত হ'লো।

এই নব-প্রতিষ্ঠিত একেশ্বরবাদী হিন্দু ধর্মসংস্থার নাম প্রথম থেকেই 'ব্রাহ্ম সমাজ' ছিল কিনা, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ঐ সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবসে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন, তা মুদ্রিত হয়েছিল। তাতে 'ব্রাহ্ম সমাজ' নামই ব্যবহৃত হয়েছিল—ব্রাহ্ম সমাজ / কলিকাতা / বুধবার ৬ ভাদ্র / শকাব্দা ১৭৫০। পর বছর (১৮২৯) ৬ জুন তারিখে ঐ সংস্থার নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য যে জায়গা কেনা হয়, তার বিক্রয়-দলিলে 'ব্রহ্ম সমাজ' ('ব্রাহ্ম' নয়) নাম ব্যবহৃত হয়। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর রামমোহন ইংলণ্ড থেকে বাংলায় পুত্র রাধাপ্রসাদকে যে পত্র লেখেন, তাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরেই লেখেন: "এই অবকাশে ব্রাহ্ম সমাজের কাজের নিমিত্ত এক গীত পাঠাইতেছি।" ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর 'সমাচার-দর্পণে' প্রকাশিত একটি সংবাদে 'ব্রাহ্ম সমাজ' নামই ছাপা হয়। অন্যান্য কাগজেও 'ব্রাহ্ম সমাজ' নামই ছাপা হয়। সুতরাং এই সংস্থার সরকারী নাম যে 'ব্রাহ্ম সমাজ' ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কখনো কখনো 'ব্রহ্ম সমাজ'-ও ব্যবহৃত হ'তো। অনেক সময় 'ব্রাহ্ম্য সমাজ' বানানও ব্যবহৃত হ'তো। 'ব্রহ্ম সভা' নামটি সম্ভবতঃ 'আত্মীয় সভা'-র অনুকরণেই বা স্মৃতি ও অভ্যাস বশেই সদস্যরা ব্যবহার করতেন।

তবে সমসাময়িক সংবাদপত্র ও জনসাধারণ অনেক সময় 'ব্রহ্ম সভা' নামটি ব্যবহার করতেন। প্রকৃতপক্ষে, 'ব্রাহ্ম সমাজ' নামটি সংস্থা স্থাপনের প্রথম থেকে ব্যবহৃত হ'লেও গোড়ার দিকে কয়েক বছর দুটি নামই প্রচলিত ছিল।

হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূতের ভ্রাতা পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই সংস্থার উদ্বোধনী ভাষণ দেন। ঐ ভাষণটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। বাংলা ভাষণ ও তার ইংরেজী অনুবাদ দুটিই মুদ্রিত ক'রে বিতরণ করা হয়। ঐ ভাষণে হিন্দু শাস্ত্র মন্থন ক'রে দেখানো হয় যে, হিন্দু শাস্ত্র ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে এক ও অদ্বিতীয়

বলেছেন। বলেছেন, তিনি সর্বব্যাপী এবং তাঁতেই সকল জগৎ অবস্থিত। যিনি সর্বভূতে ও সর্বজীবে এই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন তিনিই জীবনে শান্তি লাভ করেন, তিনিই ব্রহ্ম লাভ করেন, এবং ব্রহ্মে লীন হন। সেই সঙ্গে এ-ও বলা হয় যে, প্রাকৃতিক বস্তু, মূর্তি, ব্যক্তি, যাঁরই পূজা করা হ'ক না কেন, তা পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে সেই ব্রহ্মেরই উপাসনা। কিন্তু সরাসরি ব্রহ্মের উপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ। বেদ, মনুস্মৃতি এবং প্রামাণ্য সকল হিন্দু শাস্ত্রই এ বিষয়ে একমত। এতে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ ক'রে আত্ম-সংযম, আত্মোপলব্ধি, অন্যের সেবা প্রভৃতি দ্বারা এই উপাসনা করা হয়। অন্যপক্ষে, যারা পরোক্ষভাবে তার উপাসনা করেন, তাঁরা ঈশ্বরের আংশিক রূপেরই উপাসনা করেন, ফলে, তাদের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব, কলহ বিদ্যমান থাকে। অন্যপক্ষে, যারা সরাসরি এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তারা তাঁর পরিপূর্ণ রূপেরই উপাসনা করেন। ফলে, তাদের অন্যের সঙ্গে বিরোধ থাকে না। কারণ, যারা যেভাবেই তাঁর আংশিক রূপের উপাসনা করুন না কেন, তারা তাঁরই উপাসনা ক'রে থাকেন।

রামমোহনও তাঁর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রার্থনাপত্র' বা ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Different Modes of Worship নিবন্ধে ঐ একই কথাই বলেছিলেন। তিনি পৌত্তলিকতার উপযোগিতা সম্পূর্ণরূপে কখনও অস্বীকার করেন নি, তিনি পৌত্তলিকতাকে নিরাকার এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনার তুলনায় নিকৃষ্ট, এই মতই ব্যক্ত করেছেন এবং হিন্দু শাস্ত্র থেকেও তিনি ঐ মর্মেই প্রামাণ্য উদ্ধৃতিসমূহ দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, সকল প্রকার উপাসনা-পদ্ধতি সম্পর্কে হিন্দু ধর্মের এই সহিষ্ণুতা ও সর্বগ্রাহিতা পৃথিবীতে তুলনাহীন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁর ভাষণে রামমোহনের ঐ ধর্মাদর্শেরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন মাত্র।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের বিবরণ দিতে গিয়ে কলকাতার 'জন বুল' পত্রিকা লিখেছিল যে, বেদপাঠের জন্য দুজন তেলেগু ব্রাহ্মণকে স্থায়িভাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ্ পাঠ করেছিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সেগুলির বাংলায় ব্যাখ্যা ক'রে দিয়েছিলেন। এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তী সংস্থার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত সভার কাজ হইত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ নামে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বেদ ও উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ্ পাঠ করিতেন। পরে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইত। এই সঙ্গীত করিতেন বিষ্ণু চক্রবর্তী ও পাখোয়াজ বাজাইতেন গোলাম আব্বাস নামে একজন মুসলমান। বিষ্ণু অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। সকলেই তাঁহার গান মুগ্ধ হইয়া শুনিত।

মিঃ অ্যাডাম ব্রাহ্ম সমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশনের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছিলেন (১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জানুয়ারি তারিখে ডঃ টাকারম্যানকে লিখিত পত্রে) :

> The service begins with two or three of the Pandits singing, or rather chanting in the cathedral style, some of the spiritual portions of the Ved, which are next explained in the vernacular dialect to the poeple by another Pandit. This is followed by a discourse in Bengali···and the whole is concluded by hymns both in Sanskrit and Bengali, sung with the voice and accompanied by instrumental music, which is also occasionally interposed between other parts of the service. The audience consists generally of from 50 to 60 individuals, several Pandits, a good many Brahmins, and all decent and attentive in their demeanour.

রামমোহন এইভাবে হিন্দু একেশ্বরবাদী একটি ধর্মসংস্থা গঠন করায় তাঁর একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান বন্ধুরা কিন্তু মর্মাহত হলেন। কারণ, তাঁরা আশা করেছিলেন, রামমোহন নিজে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না করলেও ইউনিটারিয়ান খ্রীষ্টানদের সমর্থন করায় ভারতবাসীদের খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণে তা সহায়ক হবে। কিন্তু তিনি এখন স্বতন্ত্র একেশ্বরবাদী হিন্দু ধর্মসংস্থা প্রতিষ্ঠা করায় তা যে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের অন্তরায় হবে, তা তাঁদের বুঝতে দেরি হ'লো না। অন্যান্য খ্রীষ্টান সম্প্রদায়গুলি তো পূর্ব থেকেই তাঁর উপর বিরূপ ছিলেন। তবে ইউনিটারিয়ান খ্রীষ্টানরা মর্মাহত হ'লেও তাঁরা রামমোহনের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন নি।

খ্রীষ্টান ইউনিটারিয়ান মতবাদ ভারতীয়দের মনে কখনও গভীর রেখাপাত করে নি। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতার শিক্ষিত হিন্দুদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করলো। ক্রমেই ব্রাহ্ম সমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশনে অধিক সংখ্যায় শ্রোতারা যোগ দিতে লাগলেন। সমাজের সদস্য-সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পেলো। সমাজ অর্থ-সংগ্রহেও সফল হ'লো। ব্রাহ্ম সমাজ যে সুস্থায়ী হওয়ার জন্যই জন্মলাভ করেছে, সে-বিষয়ে আর কারো সংশয় রইলো না। সুতরাং রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা এখন সমাজের একটি নিজস্ব ভবন ও উপাসনালয়ের প্রয়োজন একান্তভাবে অনুভব করলেন।

ভবন-নির্মাণের জন্য একটি উপযুক্ত স্থানের সন্ধান চলতে লাগলো। অবশেষে একটি স্থানের সন্ধান পাওয়া গেল। জোড়াসাঁকোয় চিৎপুর রোডের উপর একটি ছোট বাড়ী-সহ কিঞ্চিদধিক চার কাঠা জমি তাঁরা কিনলেন। বাড়ীর মালিক ছিলেন জনৈক

কালীপ্রসাদ কর। জমিটি রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নামে ৪,২০০ টাকায় ১৮২৯ সালের ৬ জুন কেনা হয়। পুরাতন বাড়ীটি ভেঙে দিয়ে ঐ স্থানে, ৫৫ আপার চিৎপুর রোডে, সমাজের নূতন ভবন নির্মিত হয়। ঐ ভবনই আদি ব্রাহ্ম সমাজেব ঐতিহাসিক ভবন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারি একটি ন্যাসপত্র দ্বারা জমি ও নূতন ভবনের রামমোহন প্রভৃতি পূর্বোক্ত মালিকরা ঐ সম্পত্তিকে তিনজন ন্যাসরক্ষক বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রাধাপ্রসাদ রায় ও রমানাথ ঠাকুরের হস্তে অর্পণ করেন।

সম্পত্তি হস্তান্তরের এই ন্যাসপত্রটি ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দলিল হয়ে আছে। এতে বর্তমান ন্যাসরক্ষকগণ ও তাঁদের পরবর্তিগণের উদ্দেশে কতকগুলি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা থেকে রামমোহন-প্রবর্তিত এই নূতন ধর্মসংস্কার আদর্শটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ন্যাসপত্রে (Trust Deed) বলা হয়:

> …Shall and do from time to time and at all times for ever hereafter permit and suffer the said messuage or building, land, tenements, heriditaments and premises, with their appurtenances, to be used, occupied, enjoyed, applied and appropriated as and for a public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly sober religious and devout manner for the worship and adoration of the Eternal Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe but not under or by any other name, designation or title peculiarly used for and applied to any particular Being or Beings by any man or set of men whatsoever…

অর্থাৎ, নিরাকার এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল ভক্তিমান্ ধর্মপ্রাণ সৎ ও সংযত ব্যক্তির মিলনের জন্য এই ভবন ও ভবন-প্রাঙ্গণাদি উন্মুক্ত থাকবে। রামমোহন একেশ্বরবাদের মধ্যেই সর্বধর্মসমন্বয়ের বা Universal Religion-এর স্বপ্ন দেখেছিলেন। কারণ, হিন্দু ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলি মূলতঃ একেশ্বরবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাই সকল প্রকার একেশ্বরবাদী উপাসকের জন্যই রামমোহন তাঁর নবধর্মমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত রেখে সর্বধর্মসমন্বয় বা তাঁর Universal Religion প্রতিষ্ঠার পথরেখা চিহ্নিত করলেন। ব্রাহ্ম সমাজের অধিবেশনে গোলাম আব্বাসের মতো মুসলমান, বা অ্যাডাম, মণ্টগোমারি মার্টিন প্রভৃতির মতো খ্রীষ্টানদের উপস্থিতি সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শই সূচিত করে।

ন্যাসপত্রে নির্দেশ ছিল:

…no graven image, statue or sculpture, carving, painting, picture, portrait or the likeness of anything shall be admitted within the said messuages, building, land, tene ments, hereditaments and premises…

মূর্তিপূজা বা পৌত্তলিকতার গন্ধমাত্র যাতে এই স্থানে প্রবেশ করতে না পারে, তিনি সে-বিষয়ে সতর্ক ছিলেন। তাই মূর্তি ও চিত্রাদি সম্পর্কে এই নিষেধাজ্ঞা। পৌত্তলিকতার অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানও তিনি নিষিদ্ধ করেন :

…no sacrifice, offering or oblation of any kind or thing shall ever be permitted therein…

জীবহিংসা সম্পর্কেও এই ন্যাসপত্রে কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকে :

…no animal or living creature shall within or on the said messuage, building, land, tenements, hereditaments and premises be deprived of life either for religious purposes or for food…

এখানে আমোদ-প্রমোদের জন্য পানাহারও নিষিদ্ধ করা হয় :

…no eating or drinking (except such as shall be necessary by any accident for the preservation of life), feasting or rioting be permitted therein or thereon…

একেশ্বরবাদী নয় এমন অন্যান্য সকল ধর্ম, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও পৌত্তলিকতা সম্পর্কে যাতে এখানে কেউ কোনো মন্দোক্তি না করেন, সে-বিষয়েও নিষেধ থাকে :

…in conducting the said worship and adoration no object animate or inaminate that has been or is or shall hereafter become or be recognized as an object of worship by any man or set of men shall be reviled or slightingly or contemptuously spoken of or alluded to either in preaching, praying or in the hymns or other mode of worship that may be delivered or used in the said messuage or building…

ঐ ন্যাসপত্রে একেশ্বরবাদী নয় এমন ধর্মোপদেশ, উপাসনা, আলোচনা, গীত প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা হয়, তেমনি বিশ্বের স্রষ্টা ও রক্ষক সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা জন্মায়, মানুষের মনে দয়া, সততা, সদ্‌গুণ, সুনীতি প্রভৃতির উদ্রেক করে, বা সকল ধর্মের মানুষে মানুষে মিলনের ও ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করে, এমন উপাসনা, আলোচনা-সঙ্গীত প্রভৃতির জন্য এস্থানের দ্বার সর্বদা মুক্ত থাকবে, এ-কথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়।

…no sermon, preaching, discourse, prayer or hymn be delivered, made or used in such worship but such as have a

tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the Universe, to the promotion of charity, morality, piety, benevolence, virtue and the strengthening the bonds of union between men of all religious persuations and creeds…

সেই সঙ্গে এই ধর্মসংস্থার উপাসনাদি পরিচালনার জন্য আবাসিকভাবে একজন সুখ্যাত, সুপণ্ডিত, সৎ ও সুনীতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগের কথা বলা হয়, বলা হয়, এখানে প্রতিদিন বা অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন উপাসনা অনুষ্ঠিত হবে।

…a person of good repute and well-known for his knowledge, piety and morality be employed… as a resident Superintendent for the purpose of superintending the worship and that such worship be performed daily or at least as often as once in seven days.

একেশ্বরবাদে রামমোহনের অবিচল বিশ্বাস, সকল ধর্মের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা, মানুষে মানুষে মিলনের জন্য তাঁর আন্তরিক আকুতি, মানুষের মধ্যে দয়, সততা, সদ্‌গুণ প্রভৃতির বিকাশের জন্য তাঁর একাগ্র উদ্যম,—সমস্তই এই ন্যাসপত্রে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হয়েছে। নূতন ধর্মসংস্থা প্রতিষ্ঠার সর্বাধিক যে বিপদ—অন্যান্য ধর্মমত বা সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ—তা থেকে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত নবধর্মসংস্থাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি নবনির্মিত ভবনটির উদ্বোধন হ'লো। বিখ্যাত সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক রবার্ট মণ্টগোমারি মার্টিন ঐ উদ্বোধন-উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন, ঐ উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ শত লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বহু ব্রাহ্মণ-ও ছিলেন। উপাসনা ও সঙ্গীতাদি শেষে তাঁদের প্রচুর অর্থ দান করা হয়।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্ট (৭ ভাদ্র, ১২৩৫) ব্রাহ্ম সমাজের উদ্বোধন হ'লেও, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি (১১ মাঘ, ১২৩৬) এই নূতন ভবন উদ্বোধনের দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজ তার একটি স্থায়ী নিবাস পেলো। তাই রামমোহনের জীবনের স্বপ্ন আজ যেন পূর্ণ সার্থকতা পেলো। ইতিমধ্যে (১৮২৯) তাঁর জীবনের আর একটি স্বপ্নও সফল হয়েছিল—সতীদাহ নিরোধ। সে সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা-দিবস ৬ ভাদ্র ও স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন-দিবস ১১ মাঘ, দুটি দিবস ব্রাহ্মরা প্রতি বছর পালন ক'রে থাকেন—ভাদ্রোৎসব ও মাঘোৎসব রূপে।

'ব্রাহ্ম সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন কিন্তু কোনদিন নিজেকে ধর্মগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। তিনি নিজেকে কোনও নূতন ধর্মের প্রবর্তক ব'লেও মনে করতেন না। রক্ষণশীল হিন্দুরা তাঁকে বিধর্মী ব'লে প্রচার করলেও তিনি বার বার বলেছেন, তিনি হিন্দু ধর্মকে কখনও আক্রমণ করেন নি। তিনি হিন্দু ধর্মকে তার শাশ্বত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট মাত্র। তাই রামমোহন তাঁর অনুগামী ও শিষ্যদের সঙ্গে বন্ধুর মতোই ব্যবহার করতেন। তিনি তাঁদের 'বেরাদার' (ফারসী—ভাই, ইংরেজী—brother) ব'লে সম্বোধন করতেন। কেবল অনুগামী বা শিষ্যদের নয়, বাইরের সকল ব্যক্তিকেই তিনি বেরাদার বা ভাই সম্বোধন করতেন। এই সম্বোধন কেবল মৌখিক মাত্র ছিল না, ছিল আন্তরিক ও স্নেহ-সৌহার্দ্যে পরিপূর্ণ। তার অনুগামীরা 'দেওয়ানজী' ব'লে সম্বোধন করলেও তাকে অগ্রজের মতোই ভক্তি করতেন। অনেক সময় তাঁরা বয়োকনিষ্ঠ হ'লেও, তাঁর সঙ্গে নির্মল হাস্য-পরিহাসে লিপ্ত হ'তে কুণ্ঠিত হতেন না। তিনিও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে নির্মল হাস্য-পরিহাসে আনন্দ পেতেন। কখনো আনন্দের কিছু ঘটলে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের কথা ভুলে অনুগামীদের বুকে জড়িয়ে ধ'রে আনন্দ প্রকাশ করতেন।

তবে প্রয়োজন হ'লে অনুগামী ও শিষ্যদের তিনি কঠোর ভর্ৎসনাও করতেন। প্রায়ই তাঁদের সদুপদেশ দিতেন। তাঁর একজন অনুগামী পানাসক্ত হওয়ায়, তিনি তার মুখদর্শন করবেন না বলেছিলেন। অনুগামীটি শেষ পর্যন্ত মদ্যপান ত্যাগ করে এবং পুনরায় রামমোহনের স্নেহ পরিপূর্ণরূপেই লাভ করে। তাঁর একজন অনুগামী—নন্দকিশোর বসু —তাঁর শ্বশুরের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরায় বিবাহ করবেন স্থির করেছিলেন। শ্বশুরের অপরাধ—তিনি সুন্দরী মেয়ে দেখিয়ে তাঁর সঙ্গে একটি কালো মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলেন। রামমোহন বলেছিলেন, "বৃক্ষের সৌন্দর্য তার ফলে। তেমনি স্ত্রীলোকের রূপ তার গুণবান্ সন্তান উৎপাদনে। তোমার স্ত্রী যদি সৎপুত্রের জননী হন, তবে তিনি নিশ্চয় সুন্দরী।" রামমোহনের এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। নন্দকিশোর বসুর পুত্র রাজনারায়ণ বসু পরবর্তী কালে স্বাদেশিকতায়, ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্বে ও দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনসমূহে নেতৃত্বদানে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার মন্ত্রের যাঁরা উদ্গাতা ছিলেন, ঋষি রাজনারায়ণ ছিলেন তাঁদের অন্যতম—তিনি শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ-ও ছিলেন।

শিষ্যরা অনেক সময় রামমোহনের ছোটখাটো ত্রুটির সরস সমালোচনা করতেন। তা রামমোহন সহৃদয়তার সঙ্গেই নিতেন। এ সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করা চলে। রামমোহন বাবরী চুল রাখতেন। তাই মাথায় চিরুনি দিতে তাঁর দেরি হ'তো। একবার তাঁর শিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্তী তাঁকে নিয়ে কোথাও যাওয়ার জন্য অপেক্ষা

করছিলেন। রামমোহন বেরুবার জন্য সাজসজ্জা করছিলেন এবং তাঁর বেরুতে বেশ দেরি হচ্ছিল। রামমোহনের একটি বিখ্যাত ব্রহ্ম-সঙ্গীত আছে—

"কত আব সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে
এ সুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে।"

তারাচাঁদ ঐ গানের কলি উদ্ধৃত ক'রে রামমোহনকে বললেন, "মশায়, ঐ গানটি কি কেবল অন্যের জন্য লেখা?" রামমোহন লজ্জা পেয়ে বললেন, "ঠিকই বলেছ, বেরাদার, আমার ভুল হয়েছে।"

রামমোহন যেমন কোনদিন নিজেকে গুরুর আসনে বসান নি, তেমনি তিনি কখনো ধর্মীয় সাধকদের মতো কৃচ্ছ্রসাধনও করেন নি। তিনি ছিলেন একালের মানুষ। তিনি তাই আধুনিক যুগের উপযোগী জীবনযাত্রারই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর পানাহার কতকটা কিংবদন্তীমূলক ছিল। গল্প আছে, তিনি দিনে বারো সের দুধ খেতেন, একাই একটি পাঁঠা খেতে পারতেন এবং পরিমিতভাবে সুরা পান করতেন। এই গল্পের মধ্যে সত্য যে কিছুটা আছে, তাতে সন্দেহ নেই। তিনি ছিলেন কৃতকর্মা পুরুষ। তাঁর মানসিক শক্তির মতোই দৈহিক শক্তিও ছিল সুপ্রচুর। এই খাদ্যতালিকা অতি-রঞ্জিত হ'লেও তাঁর দৈহিক শক্তিরই পরিচায়ক।

তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কে মিস কোলেট দুটি পত্রলেখকের পত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একটি পত্রের লেখক জি. এন. ঠাকুর। এই জি. এন. ঠাকুর কে ছিলেন, ঠিক বোঝা যায় না। কারো কারো মতে, ইনি ছিলেন জে. এন. ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র। যাই হ'ক, এই পত্র থেকে জানা যায়:

রামমোহন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন, তারপর নিয়মিত প্রাতর্ভ্রমণ করতেন। স্নানের আগে গায়ে রোজ সকালে তেল মাখতেন। দুজন ষণ্ডামার্কা লোক তাঁকে তেল মাখাতো ও ডলাই-মলাই করতো। ঐ সময় তিনি পালাক্রমে একটু একটু ক'রে সংস্কৃত ব্যাকরণ মুগ্ধবোধ পড়তেন। স্নানের পর ভারতীয় কায়দায় মেঝেয় বসে প্রাতরাশ করতেন, ভারতীয় থালাবাটিতে তাঁর খাবার সাজানো থাকতো। সকালের আহারে তিনি মাছ-ভাত খেতেন, সম্ভবতঃ দুধ-ও। তিনি সকালের আহার ও সান্ধ্য আহারের মধ্যে আর কোনও আহার করতেন না। তিনি সাধারণত বেলা দুটো পর্যন্ত কাজ করতেন, তারপর বেরিয়ে যেতেন বিকালে ইউরোপীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে। তিনি সন্ধ্যায় সাতটা থেকে আটটার মধ্যে আহার করতেন। তখন ইংরেজী কায়দায় আহার করলেও খাদ্যসামগ্রী কিন্তু থাকতো মুসলমানী ঢংয়ের—পোলাও, কোপ্তা, কোর্মা ইত্যাদি।

তিনি তাঁর শালের পাগড়ি না প'রে কোথাও বেরুতেন না। এখনকার

বাঙ্গালীরা যেমন ফ্রেঞ্চ স্মোকিং ক্যাপ প'রে বেরোন, তেমনটি না। তিনি যখন বাড়ীতে থাকতেন, তখন সর্বদাই মুসলমানী পোশাক পরতেন—চাপকান, চোগা, পায়জামা। একটা ছোট টুপি মাথার টাকরায়। তিনি কখনো খালি মাথায় থাকতেন না—এ ব্যাপারে তিনি মুসলমানী রীতি মেনে চলতেন। তিনি কখনো উপবীত ত্যাগ করতেন না। তিনি অত্যন্ত সাধু বাংলায় কথা বলতেন। তাঁর ইংরেজীও ছিল ভালো, তবে তিনি বলবার সময় ইতস্তত করতেন পাছে কোনও ভুল হয়ে যায়।

মিস্ কোলেট আর একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন অন্য একটি পত্র থেকে। পত্রলেখক R. D. H.—সম্ভবতঃ রাখালদাস হালদার। ঐ পত্রলেখক ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের প্রাক্তন ভৃত্য রামহরি দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও রামমোহনের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করেন :

> তিনি খুব ভোরে প্রায় চারটেয় ঘুম থেকে উঠতেন, কফি খেতেন, তারপর প্রাতর্ভ্রমণে যেতেন। সঙ্গে দু-চারজন থাকতেন। সাধারণতঃ তিনি সূর্যোদয়ের আগেই বাড়ি ফিরতেন এবং সকালের নিত্যনৈমিত্তিক কাজগুলি করতেন, তখন গোলকদাস নাপিত তাঁকে ঐদিনের খবরের কাগজ প'ড়ে শোনাতো। তারপর চা; ব্যায়াম; একটুখানি বিশ্রামের পর চিঠিপত্র লিখতেন; তারপর প্রাত্যহিক স্নান সারতেন; বেলা দশটায় সকালের আহার সারতেন; খবরের কাগজ পড়া শুনতেন; ঘণ্টাখানেক টেবিলের উপর দিবানিদ্রা দিতেন; দিবানিদ্রা থেকে উঠে হয় লোকজনের সঙ্গে আলাপ করতেন, নয় দেখা-সাক্ষাৎ করতে যেতেন। বিকাল তিনটেয় জলযোগ; পাঁচটায় ফলাহার, সান্ধ্য ভ্রমণ; রাত দশটায় নিশাহার; মাঝরাত পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ; তারপর তাঁর প্রিয় 'হলিলা' নামে পিঠা খেয়ে শুতে যেতেন। যখন লিখতেন তখন একা থাকতেন।

রামমোহন যে ব্রাহ্মণ পাচককে বিলাতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "ঈশ্বরোপাসনাই ছিল রামমোহনের দৈনন্দিন প্রথম কাজ।"

রামমোহনের রাজসিক জীবনযাত্রার একটি চিত্র আমরা পাই ইংরেজ মহিলা ফ্যানি পার্কসের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে। তিনি রামমোহনের বাড়ীতে একটি উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন :

> ১৮২৩, মে—সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা রামমোহন রায় নামে একজন ধনী বাঙালী বাবুর বাড়িতে একটি পার্টিতে গিয়েছিলাম। বাড়ির বড় হাতায় বেশ রোশনাই হয়েছিল এবং চমৎকার বাজি পোড়ানো হয়েছিল। বাড়ির ঘরে ঘরে নাচওয়ালীরা নাচগান করছিল···ওদের গাইবার পদ্ধতি অদ্ভুত। সময়ে সময়ে সুর

নাকের ভেতর দিয়ে আসছিল, কতকগুলি সুর বেশ মিষ্টি; এই নাচওয়ালীদের মধ্যে নিকিও ছিল—তাকে প্রাচ্যের কাটালানি বলা হয়।

যাই হ'ক, উপরের বর্ণনাগুলি থেকে রামমোহনের জীবনযাত্রা পদ্ধতি যে ধর্মপ্রবর্তক বা ধর্মগুরুর চিরাচরিত জীবনযাত্রা-পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল, তা নিঃসন্দেহে বোঝা যায়। ধর্ম যে নিতান্ত হৃদয়ের বস্তু, পানাহার বা বেশভূষার সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, রামমোহনের জীবনই তার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১০

অগ্নিশিখা নির্বাপণ: সতীদাহ নিরোধ

হিন্দু সমাজের বহু যুক্তিহীন অন্ধ কুসংস্কার দূর করবার জন্য রামমোহন সচেষ্ট হয়েছিলেন বা সেগুলির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। যেমন—জাতিভেদ, বহু-বিবাহ, বাল্যবিবাহ। বিধবাদের ক্ষেত্রে তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষেও যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বিধবাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যে নির্মম ব্যবস্থা তাঁকে বিচলিত করেছিল, তা সতীদাহ।

সতীদাহ নিবারণের জন্য রামমোহন তাঁর লেখনী ধারণ ক'রেই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি সতীদাহ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য শ্মশানে শ্মশানেও ঘুরেছিলেন। তাঁর সহমরণ বিষয়ে নিবন্ধ দুটি হিন্দু সমাজের মধুচক্রে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করেছিল। তিনি তাঁর সম্বাদ-কৌমুদীতে সতীদাহের বিরুদ্ধে অক্লান্ত প্রচার চালিয়েছিলেন। হিন্দু সমাজের সর্বনাশকারীরূপে তাঁর বিরুদ্ধে কত ছড়া-গান, কত খিস্তি-খেউড় যে বর্ষিত হয়েছিল, তার ঠিক নেই। ঐ সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে একটি ছড়া খুবই প্রচলিত ছিল। সেটি এই:

> সুরাই মেলের কুল,
> বেটার বাড়ি খানাকুল,
> বেটা সর্বনাশের মূল,
> ওঁ তৎ সৎ ব'লে বেটা বানিয়েছে ইস্কুল,
> ও শালা জেতের দফা করলে রফা
> মজালে মোদের তিনকুল।

কিন্তু এইসব লোকনিন্দা তাঁকে স্পর্শ করতো না। হীন জনের হীন কথাকে তিনি ঘৃণার সঙ্গেই উপেক্ষা করতেন। তাঁর অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, শিক্ষিত মানুষরা একে একে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াচ্ছিলেন। সংগ্রাম যতোই কঠিন হ'ক, তা উষার আলোয় উজ্জ্বল ছিল।

তাই কোম্পানি সরকার-ও সতীদাহের বিরুদ্ধে রামমোহনের নেতৃত্বে প্রগতিশীল হিন্দুদের এই আন্দোলন ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজ থেকে সতীদাহ দূর করবে, এইরূপ আশা পোষণ করতো। এইরকম আশা নিয়েই বড়লাট লর্ড হেস্টিংস বিদায় নিয়েছিলেন।

কিন্তু সতীদাহের সংখ্যা বিশেষ কমছিল না। সরকার সতীদাহ সম্পর্কে কিছু

বাধানিষেধ আরোপ করায় যেমন সতীদাহের সমর্থকরা তাকে সরকারের পরোক্ষ সমর্থন ভেবেছিল, তেমনি রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকে ক্রুদ্ধ ক'রে তুলেছিল। তারা যেন এই প্রগতিশীল আন্দোলনের জবাবেই সতীদাহ সম্পর্কে অধিকতর উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের অধিকতর উৎসাহ সত্ত্বেও শিক্ষিত সমাজের আন্দোলন যে কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, তা বোঝা যায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের সর্বোচ্চ সংখ্যার তুলনায় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে এর কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্তিতে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহের সংখ্যা যেখানে ছিল ৮৩৯, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তা হ্রাস পেয়ে ৬৫০-এ নেমে এসেছিল। পরবর্তী কয়েক বছরে এই সংখ্যা হ্রাস না পেলেও বিশেষ একটা বৃদ্ধি পায় নি। তবে ঐসময়েও যে সতীদাহের সংখ্যা ভয়াবহ ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সতীদাহের সংখ্যা ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৬৫০, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ৫৯৭, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ৬৫৪, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ৫৮৩, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ৫৭৫, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫৭২, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬৩৯ ও ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ৫১৮। আর আগের মতোই কলকাতা বিভাগই ছিল সতীদাহের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয়। যদি ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষিত প্রগতিশীল হিন্দুদের আলোচনার প্রভাব সতীদাহ নিবারণে সাহায্যকারী হয়, তবে কলকাতা বিভাগেই সতীদাহের সংখ্যা সর্বাধিক কেন, এই প্রশ্নটাই সরকারকে বিশেষ-ভাবে উদ্বিগ্ন করেছিল। প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে। কলকাতা প্রগতিশীল আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি হওয়ায়, কলকাতা জেলাতেই প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিরোধও সর্বাধিক জোরদার ছিল। প্রদীপের তলাতেই অন্ধকার থাকে সবচেয়ে বেশি।

সতীদাহের বিরুদ্ধে রামমোহনের আন্দোলন ও প্রচার যে কার্যকর হচ্ছিল, সে-কথা ডঃ মার্শম্যান-ও স্বীকার করেছিলেন। তিনি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে বিশপ হেবারের কাছে বলেছিলেন: "...the Brahmins have no longer the power and popularity which they had when he first remembers India, and among the laity many powerful and wealthy persons agree, and publicly express their agreement, with Rammohun Roy in reprobating the custom, which is now well-known to be not commended by any of the Hindu Sacred Books, though some of them speak of it as a meritorious sacrifice." তা সত্ত্বেও সতীদাহ সাম্প্রতিক কালে বেড়েছে কেন, তার উত্তরে ডঃ মার্শম্যান বিশপ হেবারকে বলেছিলেন যে, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিলাসিতা বেড়েছে এবং ইউরোপীয় অভ্যাসসমূহের অনুকরণের ফলে তাদের ব্যয়বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই তারা বিধবাদের ভরণপোষণের ব্যয় এড়াতে চায়। এই কারণেই সাম্প্রতিক কালে সতীদাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সতীদাহ সম্পর্কে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের কঠোর নির্দেশ নেই, তা ইচ্ছাধীন ব্যাপার মাত্র,

সুতরাং এই নিষ্ঠুর প্রথা নিষিদ্ধ করলে, তাতে হিন্দু ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না, সরকার এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও সতীদাহ নিষিদ্ধ করা সমীচীন হবে কিনা, সে সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জুন সদর নিজামত আদালতের অন্যতম বিচারপতি হেরিংগে এই প্রস্তাব করলেন যে, এ-বিষয়ে পুরো তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আরও কিছু বিধিনিষেধ প্রবর্তন ক'রে সতীদাহ রুখবার মতো ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হ'ক। বিচারপতি স্মিথ্ সতীদাহের অবিলম্বে সার্বিক নিরোধের পক্ষপাতী ছিলেন। বিচারপতি হেরিংগে-ও তাঁকে সমর্থন জানালেন। কিন্তু অন্যান্য বিচারপতিরা অবিলম্বে সতীদাহ নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে যেমন দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, তেমনি সরকারী বিধিনিষিধের অর্থ পরোক্ষে সতীদাহের অনুমোদন ও তার ফলে সতীদাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, এই মতও পোষণ করতেন। তাঁদের মত ছিল, অদূরভবিষ্যতে সতীদাহ নিষিদ্ধ করা হবে, এই মর্মে সারা দেশে একটি আইন জারি করা।

সতীদাহ নিবারণ সম্পর্কে নূতন বড়লাট লর্ড আমহার্স্ট-ও আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু কিভাবে সতীদাহ নিবারণ করা যায়, সে সম্পর্কে তিনি-ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ভারতে বাসকারী ইউরোপীয়রা এবং কোম্পানির কর্তৃপক্ষও এই জঘন্য প্রথা নিবারণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাতে হিন্দু ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হবে এবং হিন্দু প্রজাদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেবে, এই ছিল তাঁদের আশঙ্কা।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সতীদাহের সংখ্যা কিছু কম ছিল। কিন্তু ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তা আবার অকস্মাৎ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩৯-এ গিয়ে দাঁড়ালো। এই আকস্মিক বৃদ্ধিতে পুনরায় সরকার চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সদর নিজামত আদালত ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পুনরায় ব্যাপারটি বিবেচনা ক'রে দেখলেন। বিচারপতি স্মিথ্ পুনরায় অবিলম্বে পুরোপুরি সতীদাহকে নিষিদ্ধ ক'রে দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। বিচারপতি রস্-ও তাঁকে সমর্থন করলেন। সরকার হিন্দু সিপাহীদের মধ্যে সতীদাহ নিবারণের ফলে যে বিক্ষোভের আশঙ্কা করছিলেন, সেরূপ কোনও আশঙ্কার কারণ নেই ব'লেও তিনি মন্তব্য করলেন। বিচারপতি হ্যারিংটন সতীদাহ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত একটি ভাবী আইনের খসড়াও প্রস্তুত ক'রে ফেললেন।

কিন্তু এইসব প্রস্তাব কাউন্সিলে আলোচনার জন্য এলে ভাইস্-প্রেসিডেন্ট বেইলি তাড়াহুড়ো ক'রে এইভাবে সতীদাহ নিষিদ্ধ করা সমর্থন করলেন না। তিনি বললেন, যেসব অঞ্চলে আগেকার বিধিনিষেধগুলি বলবৎ করা হয় নি এবং যেসব অঞ্চলে বৃটিশ শাসন সম্প্রতি প্রবর্তিত হয়েছে, সেইসব অঞ্চলে সতীদাহ নিষিদ্ধ ক'রে আইন প্রবর্তন করা হ'ক। কিন্তু এই ব্যবস্থা বিশেষ ফলপ্রদ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, যেসব অঞ্চলে পূর্বেই সরকারী বিধিনিষেধ প্রবর্তিত হয়েছে বা যেখানে বৃটিশ শাসন সর্বাগ্রে প্রবর্তিত

হয়েছে, সেইসব স্থানেই সতীদাহের সংখ্যা সর্বাধিক। যেমন, কলকাতা বিভাগ। তাই বড়লাট লর্ড আমহার্স্ট ঐ প্রস্তাবের উপযোগিতায় বিশ্বাস করলেন না। অন্যপক্ষে, তিনি সতীদাহ অবিলম্বে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করবারও পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী বড়লাট লর্ড হেস্টিংসের মতোই এদেশবাসীর মধ্যে প্রচার ও শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারাই ধীরে ধীরে এই জঘন্য ব্যবস্থার বিলোপ হবে, মনে করতেন। সুতরাং তিনি সেজন্য কয়েক বছর অপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করলেন।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সদর নিজামত আদালতের বিচারপতিরা এ ব্যাপারে সরকারী ব্যবস্থার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। মিঃ বেইলি তাঁর প্রস্তাবটি আবার পেশ করলেন। কিন্তু ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারি লর্ড আমহার্স্ট সেরূপ কিছু আইন প্রণয়ন করতে অসম্মতি জানালেন। শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তার এবং সরকারী কর্মচারীদের পরোক্ষ প্রচেষ্টা দ্বারা এই জঘন্য প্রথা অদূরভবিষ্যতে লোপ পাবে, তিনি পুনরায় এই আশা পোষণ করলেন। এর দু মাস বাদেই তিনি ভারত ত্যাগ করলেন।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে লর্ড আমহার্স্টের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এলেন লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্। কিন্তু লর্ড বেণ্টিঙ্ক্ ছিলেন অন্য ধাতের মানুষ। তিনি যা করণীয় মনে করতেন, তা দৃঢ়তার সঙ্গেই করতেন, সেজন্য ঝুঁকি নিতেও পশ্চাদ্পদ হতেন না। তিনি অবিলম্বে সতীদাহ সমস্যার চিরতরে সমাধান করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি প্রথমেই সামরিক বিভাগের কর্মচারীদের এ-বিষয়ে মতামত জানলেন, সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করলে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া এদেশীয় সিপাহীদের মধ্যে হবে কিনা। তিনি যে উনপঞ্চাশজন পদস্থ সামরিক কর্মচারীর গোপন মতামত নিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই জানালেন যে, এ ধরনের ব্যবস্থা নিলে এদেশীয় সিপাহীদের মধ্যে কোনপ্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটবে না।

তাছাড়া, বৃটিশ-শাসিত যেসব অঞ্চলের লোক এদেশীয় সৈন্যবাহিনীতে সর্বাধিক, সেসব অঞ্চলে সতীদাহ প্রথার প্রকোপ কম। সতীদাহ প্রথা বাংলা দেশ ও বিহারেই সবচেয়ে বেশি। এবং ঐ অঞ্চলের লোকের সংখ্যা সৈন্যবাহিনীতে কম, বাঙ্গালীর সংখ্যা তো নগণ্য। সুতরাং সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করলে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া যে সৈন্য-বাহিনীতে হবে না, এ-বিষয়ে লর্ড বেণ্টিঙ্ক্ সুনিশ্চিত হলেন। জনসাধারণের বিক্ষোভের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। কারণ, আধুনিক শিক্ষিত ও বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন করছেন। তাছাড়া, ইংরেজরা তরবারির দ্বারাই দেশ জয় করেছে, শাসন করছে, সৈন্যবাহিনী যদি অসন্তুষ্ট বা বিক্ষুব্ধ হয়, তবে জনসাধারণকে তাঁর ভয় করবার মতো কিছু নেই—কারণ, তখনও এদেশীয় জনসাধারণ রাজনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ অনগ্রসর ছিল।

বিচার-বিভাগ ক্রমেই এই জঘন্য আত্মহত্যা বা হত্যা অবিলম্বে নিবারণের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। এই ধরনের আত্মহত্যা বা হত্যাকে আইনের অনুমোদন দিতে তাঁদের বিবেকবুদ্ধিতে বাধছিল। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সদর নিজামত আদালতের পাঁচজন বিচারপতির মধ্যে চারজন-ই অবিলম্বে এই বীভৎস প্রথা নিষিদ্ধ করবার জন্য প্রস্তাব দিলেন। কিছুদিন বাদে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচজন বিচারপতি-ই এ সম্পর্কে ঐকমত্য প্রকাশ করলেন। পুলিশ-বিভাগের কর্তারাও অনুরূপ অভিমত দিলেন। প্রশাসন বিভাগীয় কর্মচারীদের শতকরা নব্বইজন এই প্রথা বিলোপের প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

সুতরাং তাঁর নিজের পক্ষে এখন আর দুস্তর কোনও বাধা ছিল না। তবু বড়লাট উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক্ এদেশীয়দের মতামত জানাও প্রয়োজন মনে করলেন। বিশেষতঃ, কোম্পানি সরকার এদেশীয়দের ধর্মে হস্তক্ষেপের যে নীতি প্রকাশ্যভাবে অনুসরণ ক'রে আসছে, সতীদাহ প্রথা বিলোপের দ্বারা তা ক্ষুণ্ণ হবে কিনা বা কতখানি ক্ষুণ্ণ হবে, তা জানাও তিনি প্রয়োজন মনে করলেন। এ-বিষয়ে তিনি রামমোহন রায়ের মতামত নেওয়াই বিধেয় মনে করলেন। কারণ, ভারতীয়দের মধ্যে সে-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে রামমোহনের খ্যাতি তখন সমুদ্রপারেও পৌঁছেছিল।

রামমোহনের সঙ্গে লর্ড বেন্টিঙ্কের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি বেশ কৌতুককর। বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক্ যখন শুনলেন যে, সতীদাহের জঘন্য প্রথা বিলোপে তিনি রামমোহন রায়ের সাহায্য পেতে পারেন, তখন তিনি তাঁর এডিক'কে (aides-de-camp) রামমোহনের কাছে পাঠালেন, জানালেন যে, তিনি রামমোহনের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। রামমোহন বড়লাটের এডিকংকে বললেন, "আমি এখন ইহলৌকিক কার্যকলাপ থেকে অবসর নিয়েছি এবং ধর্মীয় বিষয় নিয়েই ব্যস্ত থাকি। সুতরাং বড়লাটকে আমার বিনীত শ্রদ্ধা জানাবেন এবং জানাবেন যে, মহিমান্বিত তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা আমার নেই ; আশা করি, তিনি আমাকে দয়া ক'রে মার্জনা করবেন।" এডিকং ফিরে গিয়ে এই কথাগুলি জানালে বড়লাট তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি তাঁকে গিয়ে কি বলেছিলে?" এডিকং জবাবে বললেন, "আমি তাঁকে গিয়ে বলেছিলাম, গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক্ তাঁর সঙ্গে অনুগ্রহ ক'রে দেখা করতে চান।" বড়লাট এই কথা শুনে এডিকংকে বললেন, "না, আবার যাও। তাঁকে গিয়ে বলো যে, তিনি যদি দয়া ক'রে একবার সাক্ষাৎ করেন তবে মিঃ উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক্ অত্যন্ত বাধিত হবেন।" এডিকং তাই করলেন। রামমোহন-ও আর বড়লাটের সবিনয় অনুরোধ এড়াতে পারলেন না।

এই কাহিনীটি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতার Herald Press-এ প্রকাশিত রেঃ অধ্যক্ষ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের Raja Rammohun Roy the Bengali Religious

Reformer নিবন্ধ থেকে গৃহীত। ঐ নিবন্ধে বলা হয়েছে, এই ঘটনার বিবরণ তিনি তাঁর "জনৈক বাঙ্গালী বন্ধুর" কাছে শুনেছিলেন। ঐ একই বিবরণ রামমোহনের অন্যতম শিষ্য আনন্দমোহন বসু ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন-স্মরণীতেও লিখেছিলেন। ১৮০২ শকাব্দের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও ঐ কাহিনী রামমোহনের জীবনের অন্যান্য কাহিনীর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল। ঐসব কাহিনী রামমোহনের অনেক প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। সুতরাং এই ঘটনাটিকে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়ার কোন কারণ নেই। এই কাহিনী রামমোহন ও লর্ড বেণ্টিঙ্ক, দুটি মহৎ চরিত্রের উপরই সুন্দর রেখাপাত করেছে। লর্ড উইলিযম বেণ্টিঙ্ক যে সাক্ষাতে রামমোহনের সঙ্গে এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জুলাই এই মর্মে একটি সংবাদ India Gazette কাগজেও প্রকাশিত হয়েছিল।

রামমোহন লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে কি পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা বড়লাটের বিবরণীতে লিপিবদ্ধ আছে। ঐ বিবরণীতে যা বলা হয়েছে, তা-ও কিছুটা অপ্রত্যাশিত। কারণ, রামমোহন সুদীর্ঘ বিশ বছর সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রচার ও আন্দোলন করেছেন। সতীদাহ নিবারণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন, শ্মশানে শ্মশানে ফিরেছেন, সতী-দাহকালে বিধবার আত্মীয়-স্বজন ও ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে সকল অপমান ও ভীতি-প্রদর্শনকে হাসিমুখে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু এই বিবরণী থেকে জানা যায়, রামমোহন আইন ক'রে রাতারাতি সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার বিরোধী ছিলেন।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছেন যে, বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ও ভারত-বন্ধু হোরেস হেম্যান উইলসন-ও রাতারাতি আইন ক'রে সতীদাহ বিলোপের বিরুদ্ধেই মত দিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল এইভাবে রাতারাতি আইনের দ্বারা সতীদাহ নিষিদ্ধ করলে ইংরেজ শাসনের ভবিষ্যৎ অভিপ্রায়সমূহ সম্পর্কে এদেশীয় জনসাধারণের মনে গভীর অবিশ্বাসের উদ্রেক হ'তে পারে। রামমোহন-ও অনুরূপ যুক্তিই দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, চুপিচুপি এবং জনসাধারণের অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে সতীদাহ সম্পর্কে অসুবিধার সৃষ্টি ক'রে এবং পুলিশের পরোক্ষ সহায়তায় সতীদাহ প্রথা নিরোধ করা যেতে পারে। রামমোহন এই আশঙ্কা করেন যে, রাতারাতি আইন ক'রে সতীদাহ নিষিদ্ধ করলে জনসাধারণের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হবে যে, ইংরেজরা যতদিন নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য সংগ্রাম করছিল, ততদিন তারা এদেশীয়দের ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ ও সহিষ্ণু নীতি গ্রহণ করেছিল; এখন তারা সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তাদের প্রচারিত নীতি লঙ্ঘন করছে; হয়তো এর পরেই তারা মুসলমান বিজেতাদের মতোই আমাদের উপর তাদের ধর্মকেও চাপিয়ে দেবে।

মিঃ হোরেস হেম্যান উইলসনের যুক্তিগুলির উল্লেখ ক'রে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ লিখেছিলেন :

> I must acknowledge that a similar opinion as to the probable excitation of a deep distrust of our future intentions was mentioned to me in conversation by that enlightened native, Rammohun Roy, a warm advocate for the abolition of *Sati* and of all other superstitions and corruptions engrafted on the Hindu Religion, which he considers originally to have been a pure Deism. It was his opinion that the practice might be suppressed quietly and unobservedly by increasing the difficulties and by the indirect agency of the police. He apprehended that any public enactment would give rise to general apprehension ; that the reasoning would be : 'While the English were contending for power they deemed it politic to allow universal toleration and to respect our religion, but having obtained the supremacy their first act is a violation of their profession, and the next will probably be like the Muhammadan conquerors to force upon us their own religion.'

রামমোহন তাঁর কি হিন্দু, কি মুসলমান, স্বদেশবাসীর চরিত্র গভীরভাবেই জানতেন, যা বৃটিশ শাসকরা জানতেন না। ভারতবাসীর চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তার ধর্মভীরুতা। তাই তিলক, মহাত্মা গান্ধী, মিঃ জিন্না সকলকেই রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের আমদানি করতে হয়েছিল। বৃটিশের বিরুদ্ধে কয়েক দশক পরে যখন সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল, তখন তারা ইংরেজদের ভারতীয়দের ধর্মে হস্তক্ষেপকেই প্রধান হাতিয়াররূপে গ্রহণ করেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের কালে তারা সতীদাহ নিরোধকেও ইংরেজদের ভারতীয়ের ধর্মে হস্তক্ষেপ ব'লে বর্ণনা করতে পশ্চাদ্‌পদ হয় নি। সুতরাং রামমোহনের এই পরামর্শের মধ্যে যে সুদূরদর্শিতা নিহিত ছিল, তা একবাক্যে স্বীকার করতে হয়।

ভারতে ইংরেজ সরকারের কাছে যেটি নৈতিক সমস্যারূপে দেখা দিয়েছিল, রামমোহন-ই সে সমস্যার সমাধান ক'রে দিয়েছিলেন। সতীদাহ যে হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে আবশ্যিক নয়, এবং বিধবাদের জন্য শাস্ত্র যেসব বিধিনিষেধ নির্দেশিত করেছে, তাতে সতীদাহের স্থান ব্রহ্মচর্যের দ্বারা পবিত্র জীবন-যাপনের অপেক্ষা নিম্নে এবং সতীদাহ যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়—চিতার সঙ্গে বিধবাকে বেঁধে তার ওপর কাঠ, বাঁশ প্রভৃতি চাপিয়ে—তা-ও হিন্দু শাস্ত্রসম্মত নয়—রামমোহন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছিলেন।

সুতরাং সতীদাহ নিষিদ্ধ করলে হিন্দু ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হবে, পূর্বে এই ধরনের যে ধারণা ইংরেজ সরকারের ছিল, রামমোহন-ই তা দূর করেছিলেন। রামমোহন সতীদাহের নিরোধের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রেই রেখেছিলেন। তাই সরকার সতীদাহ নিষিদ্ধ করার সময়ে আইনের ভূমিকায় লিখতে পেরেছিলেন :

> The practice of Suttee, or of burning or burying alive the widows of Hindoos is revolting to the human nature; it is nowhere enjoined by the religion of the Hindoos as an imperative duty; on the contrary, a life of purity and retirement on the part of the widow is more specially and preferably inculcated, and by a vast majority of that people throughout India the practice is not kept up nor observed; in some extensive districts it does not exist; in those in which it has been most frequent it is notorious that in many instances acts of atrocity have been perpetrated which have been socking to the Hindoos themselves and in their eyes unlawful and wicked. The measures hitherto adopted to discourage and prevent such acts have failed of success, and the Governor-General in Council is deeply impressed with the conviction that the abuses in question cannot be effectually put an end to without abolishing the practice altogether.

সহমরণ কেন বড়লাট সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তা এই অংশে সুন্দরভাবেই বলা হয়েছে : (১) বিধবাকে স্বামীর সঙ্গে দাহ করা বা জীবন্ত সমাহিত করা অমানুষিক কাজ, (২) হিন্দু শাস্ত্রে সহমরণকে আবশ্যিক কর্তব্য বলা হয় নি, বরং বিধবার পবিত্র জীবন-যাপনকেই শ্রেয়তর বলা হয়েছে; (৩) এই প্রথা ভারতের জনসাধারণের এক সুবিশাল অংশের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না, অনেক সুবিস্তৃত অঞ্চলেই এই প্রথার অস্তিত্ব নেই, (৪) যেসব অঞ্চল এই প্রথার জন্য কুখ্যাত হয়েছে, সেগুলিতে এমন সব নৃশংসতার ঘটনা ঘটেছে, যা হিন্দুদেরও বিক্ষুব্ধ করছে এবং যাকে তারা অবৈধ ও অসৎ মনে করে; (৫) সহমরণ নিবারণের জন্য বা হ্রাস করবার জন্য যেসব ব্যবস্থা এ পর্যন্ত সরকার অবলম্বন করেছেন, সেগুলি সবই ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং সহমরণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ না করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

রামমোহন আইনের দ্বারা সতীদাহকে নিষিদ্ধ করবার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিলেও, এই সকল যুক্তি লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে সতীদাহ অবিলম্বে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে উৎসাহিত করেছিল। তিনি কেবল বুদ্ধিমান্ ও বিবেকবান্ ব্যক্তিই ছিলেন না, তিনি

ছিলেন শক্তিমান্ ও দৃঢ়চেতা শাসক। . অজ্ঞ জনসাধারণের অন্যায় কার্যকে দমন করতে গিয়ে যদি জনসাধারণের বিক্ষোভ ঘটে, সে বিক্ষোভ দমিত বা শাসিত করবার মতো শক্তি যে তাঁর শাসনযন্ত্র রাখে, সে-বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন। তাই তিনি রামমোহনের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যুক্তিগুলি সম্পূর্ণ গ্রহণ করলেও রাজনীতিক বা প্রশাসনিক যুক্তি গ্রহণ করেন নি। কারণ, সে ঝুঁকি নেওয়ার সাহস ও শক্তি তাঁর ছিল।

তাই তিনি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর একটি আইন জারি ক'রে সতীদাহকে অবৈধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ ব'লে ঘোষণা করলেন। কোন বিধবা ইচ্ছায় হ'ক বা অনিচ্ছায় হ'ক, সে কাউকে অনুরোধ করুক বা না করুক, কেউ সতীদাহে সাহায্য করলে বা উৎসাহিত করলে তাকে হত্যার অপরাধে অপরাধী হ'তে হবে। বলপ্রয়োগ বা অন্য উপায়ে বিধবার সম্মতি আদায় করলে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হ'তে পারবে। এইভাবে বহু যুগের একটি বীভৎস প্রথা লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ একটি কলমের খোঁচায় চিরতরে বন্ধ ক'রে দিলেন এবং রামমোহনের চেষ্টায় হিন্দু ধর্ম তার কলঙ্ককালিমা থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেলো।

কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুরা নীরব ছিল না। যখন সতীদাহ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা চলছিল, তখন রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র 'সমাচার-চন্দ্রিকা' সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল, ৩০ নভেম্বর (১৮২৯) India Gazette সতীদাহ নিরোধের বিরুদ্ধে একটি আবেদনপত্র প্রস্তুত হচ্ছে, এই মর্মে সংবাদ দিয়েছিল।

রবার্ট মণ্টগোমারি মার্টিনের Bengal Herald কাগজের আংশিক মালিকানা রামমোহন ক্রয় করেছিলেন। Bengal Herald-এর বাংলা সংস্করণ 'বঙ্গদূত' কাগজটিও রামমোহনের 'সম্বাদ-কৌমুদী'র মতোই প্রগতিশীল হিন্দুদের মুখপত্র ছিল। তাই India Gazette লিখেছিল যে, সতীদাহের বিরোধীদের উপযুক্ত জবাব 'সম্বাদ-কৌমুদী' ও 'বঙ্গদূত'ই দেবে। সরকার সতীদাহ নিবারণের ক্ষেত্রে এইসব প্রগতিশীল সংবাদপত্র এবং ঐসব সংবাদপত্রের মালিক রামমোহনের উপর যে কতখানি নির্ভরশীল ছিলেন, India Gazette-এর এই মন্তব্য থেকে তা সহজেই বোঝা যায়।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি সতীদাহ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য দাবি জানিয়ে কলকাতার ৮০০ অধিবাসীর স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র বড়লাটের কাছে পাঠানো হ'লো। তৎকালীন সংবাদপত্র India Gazette ও Asiatic Journal থেকে জানা যায়, রক্ষণশীল হিন্দুরা ঐসব স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে যথেষ্ট বেগ পেয়েছিলেন, অনেক-ক্ষেত্রে তাঁরা সামাজিক ভীতিপ্রদর্শনেরও আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ঐ আবেদনপত্রে তাঁরা বলেছিলেন, এই সতীদাহ নিরোধের দ্বারা সরকার হিন্দু

ধর্মেই কার্যত হস্তক্ষেপ করেছেন। হিন্দু সমাজের কতিপয় লোক যারা ইউরোপীয়দের সঙ্গে নিষিদ্ধ বস্তু পানাহার ও মেলামেশা দ্বারা নিজেদের ধর্মচ্যুত করেছে, যারা পূর্বপুরুষের ধর্মকে পরিত্যাগ করেছে, তারাই হিন্দু শাস্ত্র সম্পর্কে ভ্রান্ত পরামর্শ দিয়ে সরকারকে প্রতারিত করেছে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যার মতো একটি কঠিন ও সূক্ষ্ম বিষয়ে সরকার ঐ ধরনের ব্যক্তিদেব কাছে পরামর্শ না নিয়ে দেশের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কাছেই পরামর্শ নিতে পারতেন। তাঁরা বড়লাটকে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের 'প্রকৃত অভিমত' কি, তা অবগত করাবার উদ্দেশ্যে ঐ আবেদনপত্রের সঙ্গে ১২০ জন রক্ষণশীল পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত মতামত-ও জুড়ে দিলেন। কিন্তু তাঁরা হিন্দু ধর্মশাস্ত্র থেকে যেসব উদ্ধৃতি দিলেন, সেগুলিতে বিধবাদের ব্রহ্মচর্য পালন বা সহমরণের বিধানের কথাই বললেন।

ঐ সঙ্গে গ্রামাঞ্চল থেকে ৩৪৬ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত অনুরূপ একটি আবেদনপত্র-ও পাঠানো হ'লো। তাতে ২৮ জন পণ্ডিতের সতীদাহের সমর্থনে অনুরূপ অভিমত ছিল।

ঐ আবেদনকারীদের পত্রের উত্তরে বড়লাট জানালেন যে, তাঁরা নিজেরা যেসব শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলি থেকে সতীদাহ বা সহমরণ যে আবশ্যিক নয়, তা-ই প্রমাণিত হয়েছে। সুতবাং সরকার সতীদাহ নিষিদ্ধ ক'রে হিন্দু ধর্মের উপর বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করেন নি। প্রয়োজনবোধ করলে এই আইনের বিরুদ্ধে আবেদনকারীরা সকাউন্সিল ইংলণ্ডেশ্বরের কাছে—অর্থাৎ প্রিভি কাউন্সিলে—আবেদন করতে পারেন।

সতীদাহ নিরোধের বিষয়ে লর্ড বেন্টিঙ্ক্ যে কতখানি উৎসাহী ছিলেন এবং রাম-মোহনের পাণ্ডিত্যের, মনীষার ও মানবতাবোধেব উপর যে তাঁর কতখানি আস্থা ছিল, তা এই থেকে বোঝা যায় যে, তিনি সংস্কৃত ভাষায় ও হিন্দু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মিঃ হোরেস হেম্যান উইলসনের মতো ব্যক্তির মতকেও উপেক্ষা করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, মিঃ উইলসন গভর্নমেন্টের মিলিটারি সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন বেনসনকে যে পত্র দিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন, সতীদাহের পশ্চাতে হিন্দু ধর্মের অনুমোদন আছে; সুতরাং সতীদাহ রদ করলে হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসেই আঘাত করা হবে, দু-একজন হিন্দু হিন্দু ধর্ম ও তার আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের সুবিশাল অংশ হিন্দুর চিরাচরিত ধর্মে ও আচার-অনুষ্ঠানেই বিশ্বাসী; সরকারকে কোন আইন করতে হ'লে তা সুবিশাল জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখেই করতে হবে, দু-একজন ভিন্নমত পোষণকারীর জন্য করা উচিত হবে না। "...They have therefore the weight of commands...and they cannot be directly opposed without violence to the conscientious belief of every order of Hindus." "One or two individuals who have signalised themselves by dissenting from many of the practices and principles

of the religion, may hold a different persuasion, but a vast body of the population will concur in the same impression and the Government has to legislate not for a handful of sectaries, but for the Hindus at large.

হোরেস হেম্যান উইলসনের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, সংস্কৃতিসম্পন্ন ইংরেজরাও এদেশের ধর্ম ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই পূর্ববর্তী রাজপুরুষরা সকলেই এই ঘোষিত নীতিই অনুসরণ ক'রে যাচ্ছিলেন। তাছাড়া, সতীদাহ হিন্দু ধর্মে আবশ্যিক না হ'লেও ঐচ্ছিক ছিল। সুতরাং আইন ক'রে তা নিষিদ্ধ করায় যে একেবারে ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হয় নি, তা-ও নয়। রামমোহন এই ধরনের হস্তক্ষেপেরও বিরোধী ছিলেন। তাই সতীদাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ক'রে কোনও আইন রচনায় তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু বেন্টিঙ্ক্ বৃহত্তর স্বার্থে এসব তুচ্ছ বিষয়কে প্রাধান্য দেন নি। সতীদাহ যখন মানবতার বিরোধী এবং হত্যা বা আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র, তখন তাকে নিষিদ্ধ করতে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন নি।

রামমোহন আইন ক'রে সতীদাহ নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিলেও লর্ড বেন্টিঙ্ক্ জনসাধারণের বিক্ষোভ, অসন্তোষ ও অনাস্থার ঝুঁকি নিয়েও যখন তা নিষিদ্ধ ক'রে দিলেন, তখন রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের আনন্দের সীমা রইলো না। সতীদাহ নিষিদ্ধ ক'রে আইন পাসের দুদিন বাদেই সতীদাহ নিষেধক আইনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের কাছে দুটি অভিনন্দনপত্র পাঠানো হ'লো। একটি এলো কলকাতা খ্রীষ্টান অধিবাসীদের পক্ষ থেকে। এতে ৮০০ ব্যক্তি স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। আরেকটি এলো রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের নেতৃত্বে কলকাতার প্রগতিশীল হিন্দু অধিবাসীদের পক্ষ থেকে। এতে ৩০০ ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। এই অভিনন্দনপত্র ইংরেজিতে ও বাংলায় দেওয়া হয়েছিল। এই অভিনন্দনপত্র দুটিতে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক্‌কে হিন্দু নারীজাতির প্রাণরক্ষা এবং হিন্দুর ধর্ম ও সমাজকে "স্ত্রীবধকলঙ্ক আর আত্মঘাতের অতিশয় উৎসাহকারী রূপ দুর্নাম" থেকে চিরতরে রক্ষার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানানো হয়।

"With hearts filled with deepest gratitude, and impressed with the almost reverence, we the undersigned Native inhabitants of Calcutta and its vicinity, beg to be permitted to approach your Lordship, to offer personally our humble but warmest acknowledgements for the invaluable protection which your Lordship's Government has recently afforded to the lives of the Hindoo Female part of your subjects and for your humane and successful exertions in rescuing us, for

ever, from the gross stigma hitherto attached to our character, as wilful murderers of females and zealous promoters of the practice of suicide."

এই অভিনন্দনপত্রগুলিতে কালীনাথ রায়চৌধুরী, রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও অন্যান্যদের স্বাক্ষর ছিল। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ এই অভিনন্দন-পত্রগুলির উত্তরে বলেন :

"...Those who present this Address are right in supposing that, by every nation in the world, except the Hindoos themselves, this part of their customs has always been made a reproach against them, and nothing so strongly constrasted with the better features of their own national character, so inconsistent with the affections which unite families, so destructive of the moral principles on which society is founded, has ever subsided amongst a people, in other respects so civilized. I trust that reproach is removed for ever, and I feel a sincere pleasure in thinking that the Hindoos will thereby be exalted in the estimation of mankind to an extent in some degree proportioned to the repugnance which was felt for the usage which has now ceased." অর্থাৎ, হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের অন্যান্য দিক এতো উন্নত হওয়া সত্ত্বেও তাদের এই দিকটির জন্য তারা পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতির কাছে নিন্দিত হচ্ছিল। এখন সেই নিন্দার কারণ অপসারিত হ'লো। এখন হিন্দুজাতি মানব-সমাজে উচ্চ আসনেই অধিষ্ঠিত হবে।

সত্য, রামমোহন ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ সহমরণ রহিতের জন্য যথাক্রমে সংগ্রাম ও ব্যবস্থা ক'রে হিন্দু জাতিকে এক দুরপনেয় কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। সভ্য সমাজে হিন্দুদের বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি নিন্দিত হ'লেও সতীদাহের জন্য তার যে দুর্নাম ছিল, তার তুলনা হয় না। এই বর্বর প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ায় হিন্দু সমাজ সমগ্র মানবজাতির নিন্দার হাত থেকে চিরতরে অব্যাহতি পেয়েছে। সতীদাহ আজ অতীতের বস্তু। তাই রামমোহনের এই কীর্তির পরিমাপ আমরা ঠিক করতে পারি না।

সতীদাহের সমর্থক রক্ষণশীল হিন্দুরা কিন্তু এতো সহজে হার মানবার পাত্র ছিলেন না। তাঁরা 'ব্রহ্ম সভা' নামের অনুকরণে 'ধর্ম সভা' নামে একটি সংস্থা স্থাপন করলেন। এই সংস্থার প্রধান কর্মীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামমোহনের 'সম্বাদ-কৌমুদী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও পরে 'সমাচার-চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঐ 'ধর্ম সভা'র উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর প্রচলিত রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান-গুলিকে রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও প্রয়োজনীয় পন্থা উদ্ভাবন করা—"to unite and continually devise means for protecting our religion and our excellent customs and usages." ধর্ম সভা এককালে এক স্থানেই ১১,২৬০ টাকা চাঁদা তুলে ফেললো। ঐ সংস্থার প্রথম অধিবেশনে সংস্থার কোষাধ্যক্ষ স্পষ্টই বললেন যে, যেসব হিন্দু হিন্দু সমাজের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলবে না, তাদের হিন্দু সমাজ থেকে বিতাড়িত করা হবে। তিনি কোন নাম উচ্চারণ না করলেও তাঁর লক্ষ্য যে রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা, তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না।

ধর্ম সভা সতীদাহ নিরোধ আইনের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আবেদনের জন্য প্রস্তুত হ'লো। প্রিভি কাউন্সিলে শুনানির সময়ে সরকারপক্ষ যাতে সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য যুক্তিগুলি সহজে একত্র পান, সেজন্য রামমোহন তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রকাশিত যুক্তিগুলিকে সঙ্কলিত ক'রে প্রকাশ করলেন (১৮৩০) তাঁর The Abstracts of the Arguments regarding the burning of widows considered as a Religious Rite. এটিকে বড়লাটের কাছে সতীদাহের সমর্থনে প্রেরিত আবেদন-পত্রের জবাবও বলা চলে।

এইভাবে ভারতে সতীদাহের অগ্নিশিখা নির্বাপিত হ'লো। কিন্তু সতীদাহের সমর্থকরা প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করায় বহ্নিশেষ অঙ্গারগুলিতে তখনও ধিকিধিকি আগুন জ্বলতে লাগলো। কিন্তু তাতেও রামমোহন শেষ জলসিঞ্চন করেছিলেন—সে কাহিনী আমরা বিবৃত করবো।

এই সময়ে রামমোহন অন্য সীমান্তেও সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। তিনি সরকারী চাকরি নেওয়ার আগে কলকাতায় সদর দেওয়ানী আদালতে যাতায়াত করতেন এবং প্রধান কাজীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও হৃদ্যতা ছিল, তা আমরা পূর্বেই বলেছি। তিনি সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। হিন্দু ও মুসলিম শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল সুগভীর। তাই হিন্দু ও প্রাচীন হিন্দু আইন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানও ছিল গভীর। আদালতে তাঁর যাতায়াত যে এই কারণেই ছিল, এরকম অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত নয়। তিনি ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে এবং রাজস্ব-বিভাগ ও বিচার-বিভাগের সঙ্গেও চাকরিসূত্রে ও অন্যান্য কারণে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বা পরিচিত ছিলেন। ইংরেজদের শাসন-ব্যবস্থা, ইউরোপীয় চিন্তানায়কদের বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ও আদর্শ সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞানের অভাব ছিল না। ফলে, আইনের ক্ষেত্রেও তাঁর চিন্তাধারা ছিল এদেশের পক্ষে ক্রান্তিকারী। সুতরাং এদেশের বিচার-বিভাগ ও আইন-কানুন কেমন হওয়া উচিত, তার

ভিত্তিভূমি রচনায় তাঁর দান ছিল অপরিসীম। আইন সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান সম্পর্কে এদেশের বিখ্যাত আইনবিদ্‌রা সকলেই একবাক্যে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

পূর্বেই আমরা তাঁর লেখা প্রাচীন ভারতে নারীদের অধিকার এবং বর্তমান কালে সেই অধিকার হরণ সম্পর্কে নিবন্ধটির কথা উল্লেখ করেছি। ঐ নিবন্ধে তিনি স্বামীর ও পিতার সম্পত্তিতে স্ত্রী ও কন্যার উত্তরাধিকার সম্পর্কে দাবি উত্থাপন করেছিলেন, ভারত স্বাধীনতালাভের পর ভারত সরকার সেগুলি আইন ক'রে কার্যকর করেছেন। আইন সংক্রান্ত তাঁর চিন্তাধারা যে শতাব্দী কালের চেয়েও অধিক অগ্রগামী ছিল, তা নিঃসন্দেহ।

বাংলা দেশের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে তাঁর আর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অবদান হ'লো The Rights of Hindus over Ancestral Property according to the Law of Bengal. তিনি এই নিবন্ধটি রচনা করেন ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে।

উত্তরাধিকার সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্রে দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ আছে—মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ। এই দুটি গ্রন্থের নির্দেশিত বিধি অনুযায়ীই হিন্দুদের উত্তরাধিকার-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হ'তো। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলেই 'মিতাক্ষরা'-নির্দেশিত বিধিই প্রচলিত ছিল। অন্যপক্ষে, বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল 'দায়ভাগ'-নির্দেশিত বিধি। এই দুই বিধির মধ্যে প্রধান পার্থক্য ছিল এই যে, মিতাক্ষরা অনুসারে পূর্বপুরুষের সম্পত্তি বিক্রয়াদির ক্ষেত্রে পুত্র-পৌত্রাদির সম্মতির প্রয়োজন হ'তো। অন্যপক্ষে, দায়ভাগ অনুসারে পূর্বপুরুষের সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য পুত্র-পৌত্রাদির সম্মতির প্রয়োজন হ'তো না। বাংলা দেশে দায়ভাগ-বিধি প্রচলিত থাকায় পূর্বপুরুষের নিকট থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোনও সম্পত্তি বিক্রয়ে কোনও অন্তরায় ছিল না। কিন্তু বাংলা দেশেও ইংরেজ বিচারপতিরা মিতাক্ষরার নির্দেশকেই হিন্দু উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে গ্রাহ্য করতে থাকেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার সি. ই. গ্রে মিতাক্ষরার, অর্থাৎ পূর্বপুরুষের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে পুত্র-পৌত্রাদির সম্মতির প্রয়োজনীয়তার অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। এটি বাংলা দেশে প্রচলিত হিন্দু উত্তরাধিকার-বিধির ওপর অকারণ হস্তক্ষেপ ছিল। তাছাড়া, দেশে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি না হওয়ায় ধনবান ব্যক্তিরা তাঁদের অর্থকে ভূমিতে নিয়োগ করতেন। উত্তরাধিকারসূত্রে যিনি সম্পত্তি প্রাপ্ত হতেন, তাঁর যদি সেই সম্পত্তিকে বিক্রয় করবার, অর্থাৎ অর্থে রূপান্তরিত করবার অবাধ অধিকার না থাকে, তাতে সেই সম্পত্তির ব্যবহারিক মূল্য হ্রাস পায়। যে সমাজে শিল্পের ও ধনতন্ত্রের বিকাশ হ'তে চলেছে, সেখানে ভূমিকে সহজে ও অবাধে অর্থে রূপান্তরিত করবার সুযোগ অত্যাবশ্যক। ইংরেজ বিচারকরা বাংলা দেশে প্রচলিত দায়ভাগ-রীতিকে অগ্রাহ্য ক'রে মিতাক্ষরা-নির্দেশিত রীতিকে গ্রহণ করায় তা যে শিল্প ও ধনতন্ত্রের বিকাশের পথে

অন্তরায় সৃষ্টি করবে, তা রামমোহন বুঝতেন। বাংলা দেশে দায়ভাগ প্রচলিত আছে, সুতরাং তার পরিবর্তন রোধ করা চাই, এমন সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রামমোহনের ছিল না। রামমোহন দেখেছিলেন, উন্নততর অর্থনীতিতে ভূমির অপেক্ষা অর্থ অধিক প্রয়োজনীয় ও শক্তিশালী। রামমোহন আধুনিক বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা ও কারিগরিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনীতির বিরোধী ছিলেন। সুতরাং যে আইন অনুসারে ভূমিকে সহজে ও অবাধে অর্থে রূপান্তরিত করা যায়—যা ধনতন্ত্র ও শিল্প-বিপ্লবের জন্য একান্ত প্রয়োজন—তাকেই তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন। সুতরাং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণেই রামমোহন দায়ভাগের সমর্থনে অগ্রসর হয়েছিলেন।

ইংরেজ বিচারপতিরা পূর্বপুরুষের সম্পত্তিকে পুত্র-পৌত্রাদির সম্মতি না নিয়ে বিক্রয় করাকে—অর্থাৎ পূর্বপুরুষের সম্পত্তিতে অধিকার থেকে পুত্র-পৌত্রাদিকে বঞ্চিত করাকে—নীতিবিরোধী বলেছিলেন। তার প্রতিবাদে রামমোহন বলেছিলেন, নীতিবিরোধী হ'লেই তা অবৈধ হ'তে পারে না। তিনি লিখেছিলেন, মাদকদ্রব্য বিক্রয় নীতিবিরোধী, কারণ মাদকদ্রব্য স্বাস্থ্য, এমনকি জীবন, নষ্ট করে, কর নিয়ে তার বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া অত্যন্ত অধর্ম ও দুর্নীতির ব্যাপার। সেজন্য কি ঐ কর-স্থাপনকে অবৈধ ঘোষণা ক'রে কর আদায় বন্ধ করা হবে ?

> "To permit the sale of intoxicating drugs and spirits, so injurious to health, even sometimes destructive of life, on the payment of duties publicly levied, is an act highly irreligious and immoral. Is the taxation to be, therefore, rendered invalid and payments stopped ?"

মিতাক্ষরার নীতি অনুসারে কেউ বংশে জন্মগ্রহণ করলে পূর্বপুরুষের সম্পত্তিতে আপনা থেকেই তার অধিকার বর্তায়। এই অধিকার স্বীকার ক'রে নিলে কেউ স্বোপার্জিত সম্পত্তি ছাড়া অন্য সম্পত্তি পুত্র-পৌত্রাদির সম্মতি ব্যতিরেকে বিক্রয়াদি করতে পারে না। স্বোপার্জিত সম্পত্তি ছাড়া পূর্বপুরুষের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের অধিকার না থাকাই নীতিসঙ্গত। কিন্তু এই নীতি বাঙ্গালীর চিরাচরিত প্রথার বিরোধী এবং সম্পত্তির ওপর সম্পত্তির মালিকের পূর্ণ অধিকার না থাকায় অর্থ-নীতির দিক থেকেও ক্ষতিকর। সুতরাং নীতির দোহাই দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন সমর্থনযোগ্য হ'তে পারে না। রামমোহন তাই দায়ভাগ নিয়মের সমর্থনেই তৎপর হয়েছিলেন।

এই প্রবন্ধ নিয়ে তাঁর সঙ্গে 'বেঙ্গল হরকরা' কাগজে 'A Hindu' এই ছদ্মনামধারী এক ব্যক্তির তর্কযুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত রামমোহনের মতামতই যুক্তিসঙ্গত প্রমাণিত হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালত দায়ভাগের সমর্থনেই রায় দেন। পরে

প্রিভি কাউন্সিল-ও ঐ মতেরই সমর্থন করেন। অনেকের ধারণা, রামমোহনের ঐ যুক্তিপূর্ণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটিই উচ্চতম আদালতগুলির এই সিদ্ধান্তের মূলে ছিল।

পরবর্তী কালের শ্রেষ্ঠ আইনবিদ্‌রা সকলেই একবাক্যে রামমোহনের আইন সম্পর্কে জ্ঞানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন মৃত্যুবার্ষিকীতে সভাপতিরূপে একটি ভাষণে বলেছিলেন :

> His (Rammohun's) two essays—one on the rights of the Hindoo Females and the other on the rights of a Hindoo over ancestral property—show at once his deep erudition as a lawyer and his broad views as a jurist ; and it is to the latter of the two essays that is due in no small measure the advanced state of the law relating to the free alienability of property in Bengal. The concluding paragraph of that essay is well worthy of Rammohun Roy, and will do honour to any lawyer or any jurist in the country. Every one who belongs to the profession to which I have the honour to belong, will perceive here the rudiments of that discussion, which in the writings of Sir Henry Maine, have shed such lustre over his name. And Rammohun was no professional lawyer.

সত্যই, পেশার দিক থেকে আইন-আদালতের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও তিনি আইন সম্পর্কে যে গভীর জ্ঞান ও বিস্ময়কর দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা তাঁর বহুমুখী প্রতিভারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কেবল আইনের ক্ষেত্রেই নয়, বিচার-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তাঁর ঈগল-চক্ষু এই দূরদৃষ্টিরই পরিচয় দিয়েছিল। তিনিই সর্বপ্রথম বিচার-বিভাগকে শাসন ও রাজস্ব বিভাগ থেকে পৃথক করবার জন্য বার বার আবেদন করেছিলেন। তাঁর আবেদনে সরকার কর্ণপাত না করলেও তা-ই আজও আধুনিক শাসন-ব্যবস্থা ও বিচার-ব্যবস্থার আদর্শ হয়ে আছে। তিনি ভারতের প্রাচীন গ্রাম্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে উৎকৃষ্ট বিচার-ব্যবস্থা মনে করতেন। তাই তিনি মফস্বলের জেলা ও প্রাদেশিক আদালতগুলিতেও জুরির সাহায্যে বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। এ-বিষয়ে তাঁর 'সম্বাদ-কৌমুদী' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় লিখিত নিবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রামমোহন তাঁর Questions and Answers on the Judicial System of India-য় বলেছিলেন যে, ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীকেই আদালতের সরকারী

ভাষা করা হ'ক ; দেওয়ানী আদালতগুলিতে এদেশীয় এসেসরদের নিযুক্ত করা হ'ক ; জজ ও রাজস্ব কমিশনারদের পদ পৃথক করা হ'ক ; জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পৃথক করা হ'ক ; ফৌজদারী আইন এবং সর্বভারতীয় আইন বিধিবদ্ধ করা হ'ক ; স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়ে আইন করা হ'ক। আইন-প্রণয়নের বিষয়ে এদেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করবার প্রস্তাবের মধ্যে এদেশীয়দের রাজনীতিক অধিকার দাবির ও ভবিষ্যৎ ভারতীয় আইনসভাগুলির বীজ নিহিত ছিল, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। অর্থাৎ, রামমোহন এদেশীয় বিচার-ব্যবস্থায় যেসব পরিবর্তনের দাবি করেছিলেন, সেগুলি ছিল সর্বাধুনিক আদর্শসম্মত এবং সেগুলি পরবর্তী কালে একে একে কার্যকর হয়েছিল। শাসন-বিভাগ থেকে বিচার-বিভাগের পৃথকীকরণের কাজ আজও চলছে।

সরকার এদেশে জুরির সাহায্যে বিচার-ব্যবস্থায় যে ধর্মীয় পক্ষপাত প্রবর্তন করেন, রামমোহন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় জুরি আইন (Jury Act) চালু হয়। এই আইন অনুসারে এদেশের বিচার-ব্যবস্থায় ধর্মীয় পক্ষপাত ঢোকানো হয়। এই আইন সংক্রান্ত বিলটি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ-সভার সভাপতি মিঃ উইন পার্লামেন্টে এনেছিলেন। এই আইনে বলা হয়েছিল, ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানদের জুরিতে আসন লাভের অধিকার থাকবে না। ইউরোপীয়, এমনকি এদেশীয় খ্রীষ্টানরাই, জুরিতে স্থান পাবেন এবং তাঁরাই এদেশীয় হিন্দু ও মুসলমানের বিচার করবেন। হিন্দু বা মুসলমান, সমাজে তাঁদের মর্যাদা যাই হ'ক না কেন, তাঁদের-ও এদেশীয় খ্রীষ্টানদের বিচারের অধিকার থাকবে না।

বিচার-ব্যবস্থায় এ ধরনের ধর্মীয় বৈষম্য কেবল ন্যায়ের দিক থেকেই অযৌক্তিক ছিল না, এদেশীয় খ্রীষ্টানদের অতিরিক্ত সম্মান-সুযোগ দিয়ে এদেশীয় হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধাচরণও ছিল। এ ব্যাপারে ইংলণ্ডে মিঃ জে. ক্রফোর্ডকে রামমোহন একটি পত্র লেখেন এবং তাঁকে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের পক্ষ থেকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে, হাউস্ অব লর্ড্‌সে ও হাউস অব কমন্‌সে, প্রতিবাদ উত্থাপন করতে অনুরোধ করেন। তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ আগস্ট মিঃ ক্রফোর্ডকে পত্রে লেখেন :

> In his famous Jury Bill, Mr. Wynn, the late President of the Board of Control, has by introducing religious distinctions into the judicial system of this country, not only afforded just grounds for dissatisfaction among the Natives in general, but has excited much alarm in the breast of everyone conversant with political principles. Any Natives, either Hindu or Mohamedan, are rendered by this Bill subject to judicial trial by Christians, either European or Native,

while Christians, including Native Converts, are exempted from the degradations of being tried either by a Hindu or Mussalman juror, however high he may stand in the estimation of society. This Bill also denies both to Hindus and Mussalmans the honour of a seat in the Grand Jury even in the trial of fellow Hindus and Mussalmans. This is the sum total of Mr. Wynn's late Jury Bill, of which we bitterly complain.

এই প্রসঙ্গে তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডে ধর্মীয় কারণে আইরিশ ক্যাথলিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং আইরিশদের তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের কথা উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, আয়ার্ল্যাণ্ডে ধর্মীয় কারণে আইরিশ ক্যাথলিক ও আইরিশ প্রোটেস্ট্যাণ্টদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের ফল কি হয়েছে, তা কি মিঃ উইন লক্ষ্য করেন নি। এই ধর্মীয় বৈষম্য আইরিশ ক্যাথলিকদের মধ্যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে এবং আইরিশদের ইংরেজ শাসনের হাত থেকেও নিজেকে মুক্ত করতে আগ্রহী ক'রে তুলেছে। ভারতীয় ক্ষেত্রেও ইংলণ্ড যদি ধর্মীয় বৈষম্য প্রয়োগ করতে থাকে, তবে ভারতবাসীদের মধ্যেও তা অসন্তোষের সৃষ্টি করবে। ভারতবাসীরা যখন ইউরোপীয়দের সঙ্গে সংসর্গের ফলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অধিগত করবে এবং রাজনৈতিক চেতনা ও জ্ঞান লাভ করবে, তখন তাদের মধ্যেও এই বৈষম্য নিশ্চয় ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তিলাভের আগ্রহ তীব্র ক'রে তুলবে। আয়ার্ল্যাণ্ড ইংলণ্ডের পাশেই অবস্থিত। ইংলণ্ড থেকে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে আইরিশদের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দমন করা যেতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ ইংলণ্ড থেকে বহু সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত। ভারতবাসীর ইচ্ছা ও সহযোগিতার উপরই সেখানে ইংলণ্ড তার অধিকার ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে। ভারতের জনবল ও ধনবল আয়ার্ল্যাণ্ডের তুলনায় অনেক বেশি। সুতরাং তাকে সৈন্য পাঠিয়ে দমন করা বা শাসনে রাখা ইংলণ্ডের পক্ষে দীর্ঘকাল সম্ভব নয়। সুতরাং ইংলণ্ডকে চিন্তা করতে হবে যে, ভারতবাসীদের সে বন্ধুরূপে চায়, না চিরশত্রুরূপে চায়। রামমোহন ঐ পত্রে লিখেছিলেন :

Supposing that some 100 years hence the Native Character becomes elevated from constant intercourse with Europeans and the acquirements of general and political knowledge as well as of modern arts and sciences, is it possible that they will not have the spirit as well as the inclination to resist effectually any unjust and oppressive measures serving to degrade them in the scale of society? It should not be lost sight of that the position of India is very different from that of Ireland, to

any quarter of which an English fleet may suddenly convey a body of troops that may force its way in the requisite direction and succeed in suppressing every effort of a refractory spirit. Were India, to share one-fourth of the knowledge and energy of that country, she would prove from her remote situation, her riches and her vast population, either useful and profitable as a willing province, an ally of the British Empire, or troublesome and annoying as a determined enemy.

পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এলে ভারতবাসীরা ভবিষ্যতে যে আত্মমর্যাদা ও আত্মাধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে রামমোহন সুনিশ্চিত ছিলেন। সেদিন সে ইংরেজদের অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে, সে বিষয়েও তাঁর সন্দেহ ছিল না। আর ভারতবাসীরা বিদ্রোহ করলে, ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি চাইলে ইংরেজদের পক্ষে তা রোধ করাও যে অসম্ভব হবে, সে বিষয়টিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। তাঁর দৃষ্টি যে কত গভীর ও সূক্ষ্ম ছিল, তা বোঝা যায় আয়ার্ল্যাণ্ড ও ভারতের অবস্থানগত পার্থক্য এবং ভারতের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের অসুবিধার সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ থেকে। আমরা দেখেছি, রামমোহনের এই প্রবন্ধ রচনার ত্রিশ বছরের মধ্যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটেছিল, তা দমন সম্ভব হয়েছিল এদেশীয় সৈন্য ও এদেশীয় লোকদের সাহায্যের দ্বারা। এদেশীয় জনসাধারণ ও সৈনিকরা যদি সম্পূর্ণরূপে বিরূপ হ'তো, তবে ইংলণ্ড থেকে জাহাজ-জাহাজ গোরা সৈন্য এনে সে বিদ্রোহ মোটেই দমন করা সম্ভব হ'তো না। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে ইংরেজরা যখন দেখেছিল যে, এদেশীয় বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনীতে মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে এবং ইংরেজরা জনসাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছে, তখনই তারা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতাদান অপরিহার্য বুঝেছিল। সুতরাং এদেশে ইংরেজ শাসন যে এদেশীয়দের বন্ধুত্বের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, রামমোহন তা সম্পূর্ণরূপে বুঝতেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির দম্ভে তা সেদিনও যেমন বোঝে নি, পরেও তা বোঝে নি।

রামমোহন ভারতে বৃটিশ শাসন কিছুদিন স্থায়ী হ'ক, তা কেন চাইতেন, সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, এর ফলে ভারতবাসীর উপকার হবে। এই উপকার হ'লো পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনৈতিক চেতনা, কুসংস্কার থেকে মানসিক মুক্তি ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ। মনে রাখা দরকার, মুঘল যুগের অবসানকালে দেশে অরাজকতা, অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, আত্মকলহ, অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা, কুসংস্কার ও ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দিয়েছিল, রামমোহনের জন্ম হয়েছিল সেই দুঃসহ অবস্থার মধ্যে। বৃটিশ শাসনের

কয়েক বছরে তিনি দেখেছিলেন দেশে রাজনৈতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দূরীভূত হয়েছে, ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে ভারতীয়রা পাশ্চাত্যের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, তার কুসংস্কার ও কূপমণ্ডূকতার দাসত্ববন্ধন অনেকটা শিথিল হয়েছে। সুতরাং তিনি ভারতে বৃটিশ শাসন অন্ততঃ কিছুকাল স্থায়ী হ'ক, তা সর্বান্তঃকরণে চাইতেন। কিন্তু বৃটিশ শাসন যখন তাঁর দেশবাসীর হিতসাধনের পরিবর্তে তাদের প্রগতির অন্তরায় সৃষ্টি করতো, তখন তিনি সর্বাধিক মর্মাহত হতেন এবং প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতেন। মিঃ ক্রফোর্ডকে তিনি ঐ পত্রে তাই লেখেন :

> In common with those who seem partial to the British rule from the expectation of future benefits arising out of the connection, I necessarily feel extremely grieved in often witnessing Acts and Regulations passed by Government without consulting or seeming to understand the feelings of its Indian subjects and without considering that this people have had for more than half a century the advantage of being ruled by and associated with an enlightened nation, advocates of liberty and promoters of knowledge.

রামমোহনের কাছে ইংরেজ জাতি ছিল আলোকপ্রাপ্ত, জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষতঃ যন্ত্রশিল্পে সর্বাধিক অগ্রণী। কেবল তাই নয়, স্বাধীনতার চেতনা-সৃজনে ও জ্ঞান-বিস্তারে উৎসাহী। মুঘল যুগের অবসানকালের অন্ধকার প্রেক্ষাপটে বৃটিশ শাসনের অনেকগুলি দিক উজ্জ্বলভাবেই রামমোহনের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তখনও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা এদেশে তাদের অধিকার বিস্তার ও ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দেশীয় জনসাধারণের প্রতি তাদের আকর্ষণীয় দিকগুলিই অত্যুজ্জ্বল আলোকে তুলে ধরেছিল। তখনও সে তার সাম্রাজ্যবাদী নখদন্ত উলঙ্গ ক'রে প্রকাশ করে নি। তাই বৃটিশ শাসনে ভারতবাসীর মঙ্গলই হবে এবং ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটি স্বেচ্ছায় অধীন অংশরূপে (Willing Province) থাকবে, রামমোহন এই ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু কয়েক দশকের মধ্যে বৃটিশ অধিকার যখন সারা ভারতবর্ষে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী রূপ নগ্নভাবে প্রকাশ করেছিল। অবশ্য, ইতিমধ্যে রামমোহনের স্বপ্নও অনেকখানি সার্থক হয়েছিল,—ইংরেজের শাসনে ও সংস্পর্শে ভারতবাসী পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক চেতনা যথেষ্ট পরিমাণে আয়ত্ত করেছিল এবং রামমোহনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ইংরেজদের আচরণ তাকে ক্রমেই determined enemy-তে পরিণত ক'রে তুলছিল। রামমোহন এই

পত্রে ইংরেজদের consulting its Indian subjects-এর প্রয়োজনীয়তার কথাই বলেছিলেন। অর্থাৎ, ইংরেজ সরকার এদেশের শাসন-বিষয়ে এদেশবাসীর মতামত গ্রহণ ক'রে চলবে—ভারতবাসীকে রাজনৈতিক অধিকার দিতে থাকবে, এ আশাও তিনি পোষণ করতেন। তাঁর মতো স্বাধীনতার ও গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী মানুষের পক্ষে এই ছিল স্বাভাবিক।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুন তারিখে মিঃ উইন-ই হাউস্ অব কমন্‌সে জুরি আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে প্রেরিত আবেদনটি উত্থাপন করেন। তখনকার বোর্ড অব কণ্ট্রোলের অন্যতম কমিশনার লর্ড অ্যাশ্‌লে এ বিষয়ে সরকার বিবেচনা করবেন ব'লে আশ্বাস-ও দেন। পরবর্তী কালে জুরি আইন পরিবর্তিত হয়েছিল এবং ভারতীয়-গণকে জাতিধর্মনির্বিশেষে জুরিতে স্থান দেওয়া হয়েছিল।

রামমোহন ইংরেজ শাসনের উষালোকই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তার সুসহ রঙিন দিকটাই তাঁকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু বৃটিশ শাসনের মধ্যাহ্নকালীন অগ্নিস্রাবী প্রচণ্ডতার কথা তিনি কল্পনা করেন নি—যা ভারতবাসীকে একদিন শোষণ ও শুষ্ক ক'রে ফেলেছিল—তা করা তাঁর মতো অতিমানবের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর কতকগুলি প্রস্তাব ও পরিকল্পনা একালীন মানুষের কাছে অদ্ভুত ঠেকে। কিন্তু তখনকার প্রগতিশীল মানুষরা সেগুলিকে অত্যন্ত প্রগতিশীল ব'লেই মনে করছিলেন। সেগুলির মধ্যে একটি—এদেশে ইউরোপীয়দের স্থায়িভাবে বসবাস।

রামমোহন দেখেছিলেন, প্রতি বছর বহু কোটি টাকা এদেশ থেকে ইংলণ্ডে চ'লে যাচ্ছে। ঐ টাকা এদেশের অর্থনীতিতে বিনিযুক্ত হয় না, এদেশে কোনক্রমে ফিরেও আসে না। ভারতবর্ষের সম্পদ্ যাতে প্রতি বছর এইভাবে দেশ থেকে বাইরে চ'লে না যায়, তার জন্য তিনি বলেন যে, ইউরোপীয়রা এদেশে বহু অর্থ উপার্জন করেন এবং কার্যকালশেষে প্রচুর অর্থ নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান। তাঁরা যদি ঐ অর্থ স্বদেশে নিয়ে না গিয়ে এদেশে স্থায়িভাবে সপরিবারে বসবাস করেন, তা হ'লে ঐ সম্পদ্ এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যই ব্যবহৃত হ'তে পারে। এই ব্যবস্থার দ্বারা এদেশীয়দের সঙ্গে ইউরোপীয়দের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ঘটবে এবং তাতে এদেশীয়দের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে দ্রুত পাশ্চাত্যীকরণ সম্ভব হবে, একথাও তিনি মনে করতেন। তিনি মনে করতেন, ইংরেজরা এদেশে জমির মালিক হ'লে তারা এদেশের কৃষি-ব্যবস্থায় আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে এদেশীয় কৃষি-ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটাবে। এতে এদেশীয় কৃষকদেরও উন্নতি ঘটবে, কারণ তারা এদেশীয় জমিদারদের কাছে যে প্রায় ভূমিদাসত্ব করছে, তা থেকে মুক্তি পেয়ে অধিকতর সুবিধা ও উন্নততর পরিবেশে কাজের সুযোগ পাবে। ইংরেজরা এদেশের

ভূমিতে ও শিল্পে অর্থ লগ্নী করায় এই সুযোগ-সুবিধা যে সাময়িকভাবে ঘটেছিল, তা নিঃসন্দেহ। এদেশের অর্থনীতির বিকাশের পক্ষে তা সহায়কও হয়েছিল। কিন্তু রাম-মোহন যে কারণে এই প্রস্তাব করেছিলেন—এদেশ থেকে সম্পদের বহির্গমন প্রতিরোধ—ইংরেজ সরকার তা না করায়, বরং তার বহির্গমনের পথকে নানাভাবে প্রশস্ততর করায় রামমোহনের এই পরিকল্পনা ও প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। কেবল ব্যর্থই হয় নি, এদেশে ইংরেজদের পুঁজির বিনিয়োগ এদেশ শোষণের প্রধানতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। ইংরেজরা এদেশে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছিল, এদেশকে শোষণ করবার জন্যই, তারা এদেশে স্থায়িভাবে বসবাস ক'রে এদেশের অধিবাসী হয় নি। তারা যদি এদেশের স্থায়ী অধিবাসী হ'তো, অর্থাৎ ভারতবাসী হয়ে যেতো, তবে নিঃসংশয়ে তা ভারতের দ্রুত উন্নতিসাধনে সহায়ক হ'তো।

রামমোহন তাঁর এই পরিকল্পনার সূত্র ভারতের ঐতিহাসিক নজির থেকেই পেয়েছিলেন। ভারতবর্ষ বার বার বহিরাক্রমণকারীদের দ্বারা পদানত হয়েছিল এবং ঐসব বহিরাক্রমণকারীরা এদেশেই স্থায়িভাবে বসবাস ক'রে এদেশের মানুষই হয়ে গিয়েছিল। যে মুসলমান আমলের অবসানকালে রামমোহনের জন্ম হয়েছিল, সেই মুসলমানরা এদেশের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে তাদের অর্জিত অর্থকে এদেশেই ব্যয়িত বা সঞ্চিত করতো। ফলে, এইসব বহিরাক্রমণকারীরা কিছুদিনের মধ্যেই ভারতবাসী হয়ে যাওয়ায়, ভারতবাসীরা এদের অধীনতাকে বেশিদিন পরাধীনতা মনে করে নি, এদের সঙ্গেই তারা একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজদের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের এইরূপ পুনরাবৃত্তি ঘটবে, তা-ই ছিল রামমোহনের আশা।

কিন্তু ইংরেজরা সে পথে অগ্রসর হয় নি; তারা পূর্ববর্তী বহিরাক্রমণকারীদের মতো এদেশে স্থায়িভাবে সপরিবারে বংশপরম্পরায় বাস করে নি; তারা এদেশে সুদীর্ঘকাল বাস করলেও তাদের Home ছিল ইংলণ্ড। ফলে, তারা চিরকাল বিদেশীয়ই রয়ে গিয়েছিল, ভারতবাসীও তাদের শাসনকে পরাধীনতা ব'লেই গণ্য করেছিল, এবং সে পরাধীনতার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম ছিল অনিবার্য।

সুতরাং রামমোহনের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবের মধ্যে কোন ত্রুটি ছিল না। কেবল ইংরেজের ক্ষেত্রে ভারতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে নি—ইংরেজরা চিরদিন ভারতবাসীর কাছে বহিরাক্রমণকারী রয়ে গেছে, ভারতবাসী তাদের কাছে রয়েছে পদানত পদাহত ঘৃণ্য Native—রামমোহনের বিশ্বমানবতার মহান্ ঐক্যবোধকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে ইংরেজরা। তাই ভারতবাসীরা হয়ে উঠেছে তার 'determined enemy'। তাই রামমোহনের Settlement of Europeans in India-র প্রস্তাবের পরিবর্তে

তারা পেয়েছে Quit India-র প্রস্তাব। রামমোহনের প্রদর্শিত সুমহান্ পথে তারা অগ্রসর না হওয়ার যোগ্য প্রতিফল পেয়েছে অনিবার্যভাবেই।

ইংরেজদের সম্পর্কে তাঁর এই আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুসারেই রামমোহন নীলকরদেরও এদেশে আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'সম্বাদ-কৌমুদী'তে লিখেছিলেন যে, নীলকররা এদেশে বহু পতিত জমিকে কৃষিযোগ্য করেছে, তারা দরিদ্র লোকদের কাজ দিয়েছে এবং তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছে। চাষীরা নীলকরদের কাছে বেশি বেতন পাওয়ায় তারা জমিদার ও মহাজনদের খেয়ালখুশির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ নভেম্বর এ-বিষয়ে অনুসন্ধানেব জন্য কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরে তিনি মিঃ নাথানিয়েল আলেকজাণ্ডারকে লেখেন :

> The advance made to ryots by the indigo planters having increased in most factories in consequence of the price of indigo having risen, and in many, better prices than formerly are allowed for the plant. . . . I am positively of opinion that upon the whole the indigo planters have done more essential good to the natives of Bengal than any other class of persons.

তবে নীলকরদের মধ্যে অনেকেই যে অবিবেচনাপ্রসূত কাজ ক'রে থাকেন, তা-ও তিনি স্বীকার করেন। তিনি সে সম্পর্কে বলেন, ভালো জিনিসের মধ্যে কিছু কিছু মন্দ থাকেই। তবে নীলকরদের দ্বারা অমঙ্গলের চেয়ে মঙ্গলই সাধিত হয়েছে বেশি। বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যা থেকে বলা যায় যে, নীলকররা জমিদারদের জুলুম ও অত্যাচার থেকে রায়তদের রক্ষা করেছে। তাই নীলকররা যদি কারও স্বার্থহানি ক'রে থাকে, তারা হ'লো এদেশীয় জমিদার। এই জমিদার-ই নীলকরদের এদেশ থেকে বিতাড়নে সবচেয়ে সুখী হবে।

> But, my dear sir, you are well aware that no general good can be effected without some partial evil, and in this instance I am happy to say that the former greatly preponderates over the latter. If any class of the natives 'would gladly see them all turned out of the country', it would be the zemindars in general, since in many instances the planters have successfully protected the ryots against the tyrrany and oppression of their landlord.

রামমোহন নিজে জমিদার ছিলেন। তবু জমিদার-শ্রেণী সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টির মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্বচ্ছতা বা আবিলতা ছিল না। সাময়িকভাবে নীলকররা এদেশীয় জমিদারদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে এসে কিছুটা মঙ্গল সাধন করলেও, তাদের লালসা ও এদেশীয়দের প্রতি ঘৃণা তাদের এদেশীয়দের চক্ষে একটি ঘৃণ্য শ্রেণীতে পরিণত করেছিল। তাতেও ইংরেজদের অদূরদর্শিতাই প্রমাণিত হয়েছিল—রামমোহনের অদূরদৃষ্টি নয়।

১১

বিপ্লবী রামমোহন

আমরা সাধারণত রামমোহনের ধর্মচিন্তা ও সমাজচিন্তার জন্যই তাঁকে স্মরণ ক'রে থাকি। কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তায় যে তিনি তাঁর সমকালীন মানুষদের তুলনায় কতখানি অগ্রসর ছিলেন, তা ভাবলেও বিস্মিত হ'তে হয়। রামমোহন জন্মেছিলেন এমন একটি দেশে ও কালে যা আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে ছিল অনেক দূরে। কিন্তু এই মহাবিহঙ্গ তাঁর প্রতিভার ঊর্ধ্বলোক থেকে স্থান ও কালের সকল গণ্ডিকে সহজেই অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।

তিনি যখন শিশু, তখন পৃথিবীর অপর গোলার্ধে মার্কিন মুলুকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বাণী উদ্‌ঘোষিত হয়েছিল। তিনি যখন কিশোর, তখন ফ্রান্সে ঘোষিত হয়েছিল স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের বাণী। কিন্তু তখনও ভারতের সুদূর ভূখণ্ডে তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি পৌঁছে নি। তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক পত্রে লিখেছিলেন যে, কৈশোরে ইংরেজ শাসনের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিরূপ ভাবই তাঁর গৃহত্যাগের অন্য কারণ ছিল। ঐ পত্রেই তিনি লিখেছিলেন যে, তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরে ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ইংরেজদের গুণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং ইংরেজ শাসনের সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। ইংরেজ শাসন যে এদেশের পক্ষে কল্যাণকর হয়েছে এবং হবে, এ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছিল। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসেই তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা ছিলেন ঐ সময়ে আমেরিকা ও ফ্রান্সের সর্বাধুনিক মতবাদ—স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরোধী। ইংরেজদের সঙ্গেই যুদ্ধ ক'রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার স্বাধীনতা লাভ করতে হয়েছিল। ফ্রান্সে যখন বিপ্লব ঘটেছিল, তখনও ইংলণ্ড অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে তার প্রতিরোধে অগ্রসর হয়েছিল। সুতরাং এদেশীয় ইংরেজ রাজপুরুষদের বা সাধারণ ইংরেজদের চিন্তাধারা —স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের—স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের বাণীর সমর্থক ছিল না।

রামমোহনকে এইসব ইংরেজদের সঙ্গেই মেলামেশা করতে হ'তো, এঁদের সঙ্গেই ছিল তাঁর হৃদ্যতা, এমনকি এঁদের অধীনেই তাঁকে চাকরি-ও করতে হয়েছিল। সুতরাং ইংরেজদের চিন্তাধারার সঙ্গেই রামমোহনের চিন্তাধারা একান্বিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু রামমোহন ছিলেন এমন মানুষ, এমনই ছিল তাঁর প্রতিভা ও দূরদৃষ্টি

যে, ইংরেজদের অন্যান্য গুণাবলী এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞানে ও যন্ত্রবিদ্যায় অতুলনীয় অগ্রসরতা তাঁকে মুগ্ধ করা সত্ত্বেও তাদের চিন্তার সীমাবদ্ধতা তাঁর চিন্তা, অনুভূতি ও দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নি।

ইংরেজী শিক্ষার ফলে তিনি ইউরোপের ইতিহাস ও চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। ইংরেজদের সাহচর্যেই তা সম্ভব হয়েছিল। তাই ইংরেজদের সঙ্গে যেমন তাঁর সৌহার্দ্য গ'ড়ে উঠেছিল, তেমনি ইউরোপীয় চিন্তাধারা ও আদর্শ-ও তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

ইউরোপে যুক্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মঁতেস্‌ক্যু, দিদেরো, ভল্‌তের, রুশো, টম পেইন, প্রিস্টলি প্রভৃতি মহামনীষীরা। ইউরোপীয় এই যুক্তিবাদী চিন্তাধারার ফল কিন্তু সর্বাগ্রে ভোগ করেছিল উত্তর আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশগুলি।

উত্তর আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশগুলি মিলিতভাবে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু করেছিল এবং ইংলণ্ডের অধীনতা ও রাজতন্ত্রকে অস্বীকার ক'রে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিল। রামমোহনের বয়স যখন এগারো বা নয়, তখন ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তারা ঘোষণা করেছিল :

> We hold these truths to be self evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with inalienable rights, that among these are life and liberty and the pursuit of happiness, that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed.

কতকগুলি সত্য স্বতঃপ্রকাশ ; সেগুলি হ'লো এই যে—সকল মানুষই সমান হয়ে সৃষ্ট হয়েছে ; তাদের সৃষ্টিকর্তা তাদের কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য অধিকার দিয়েছেন ; এই অধিকারগুলির মধ্যে আছে বাঁচবার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ও সুখার্জন প্রয়াসের অধিকার , এই অধিকারগুলির রক্ষার জন্যই মনুষ্যসমাজে সরকার সৃষ্টি হয়েছে এবং সরকার তার ক্ষমতাগুলি শাসিতদের সম্মতি অনুসারেই পেয়েছে।

এর ছ বছর পরে (১৭৮৯) ফরাসী বিপ্লবকালে—ফ্রান্সের জাতীয় সভা মানবাধিকারের ঘোষণা প্রচার করলো। তাতেও প্রায় ঐ কথাই বলা হ'লো :

> Men are born and remain equal in rights Social distinctions can only be founded upon general good . . Law is the expression of the general will Every citizen has a right to take part, personally or through his representative, in its formation. It must be the same for all. . . . Society has the right to require of every public agent an account of his administration..

অধিকারের ক্ষেত্রে মানুষ সমান হয়েই জন্মেছে এবং সমানই আছে। সর্বসাধারণের হিতের ভিত্তিতেই কেবল সামাজিক পার্থক্য সৃষ্ট হ'তে পারে।· ·সর্বসাধারণের ইচ্ছার প্রকাশই আইন, আইন প্রণয়নে প্রত্যেক নাগরিকেরই ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণের অধিকার আছে। এই আইন সকলের জন্য সমান হবে।··· প্রত্যেক সরকারী ব্যক্তির কাছ থেকে শাসন সম্পর্কে কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকার সমাজের আছে। এই ঘোষণা ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের সময় পর্যন্ত বার বার ঘোষিত হয়েছিল।

এই বিপ্লবী আদর্শ ও চিন্তাভাবনা যে রামমোহনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে, তা-ই ছিল স্বাভাবিক। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও ফরাসী বিপ্লবের প্রধান বিরোধী ছিল ইংলণ্ড। তা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থাকে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা ব'লে মেনে নিয়েছিলেন, কারণ ইংলণ্ডই তার নিজস্ব শাসন-ব্যবস্থায় এই আদর্শ ও সত্যকে ফরাসী বিপ্লবের এক শ বছর পূর্বেই স্বীকার ক'রে নিয়েছিল তার ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দের Bill of Rights-এর মাধ্যমে। Bill of Rights-এ যেসব অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল, তার মধ্যে একটি ছিল হাউস অব কমন্সে প্রতিনিধিদের নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করবার অবাধ অধিকাব; রাজা ঐ অধিকারে হস্তক্ষেপ কবতে পারবেন না, পার্লামেণ্টের বাইরেও ঐসব উক্তি সম্পর্কে বিচার বা প্রশ্ন উত্থাপন চলবে না, এক কথায় বাক্-স্বাধীনতা। রাজা পার্লামেণ্টের সম্মতি ছাড়া প্রজাদের ওপব কর স্থাপন করতে পারবেন না, Bill of Rights-এ তা-ও বলা হয়েছিল। এইভাবে রাজার ক্ষমতাকে ক্রমেই সীমাবদ্ধ কবা হচ্ছিল এবং পার্লামেণ্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যদিও Bill of Rights-এর দ্বারা ইংলণ্ডের জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীই লাভবান্ হয়েছিল, তবু তা যে ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের পথই প্রশস্ত করেছিল, তাতে সন্দেহ ছিল না। ইংলণ্ডে জন লকের মতো চিন্তানায়করাও শাসিত বা প্রজাসাধারণের অধিকারকেই তুলে ধরেছিলেন। জন লক বলেছিলেন, রাজার ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত নয়; জনসাধারণই তাঁকে সে ক্ষমতা জনসাধারণের হিতসাধনের শর্তসাপেক্ষে দিয়েছে। ইংলণ্ডে প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার পেতে জনসাধারণকে আরও অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল সত্য। কিন্তু Bill of Rights-এব মধ্যে যে মার্কিন স্বাধীনতা-যুদ্ধের ও ফরাসী বিপ্লবের মূল আদর্শই নিহিত ছিল, তা-ও সত্য। তাই রামমোহন বিপ্লবী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়েও ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থাকে প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থা যে ত্রুটিপূর্ণ ছিল, এবং জনসাধাবণের অধিকার যে আরও সম্প্রসারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, তা-ও তিনি বুঝতেন। তাই ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে Reform Bill উত্থাপিত হয়েছিল, তখন তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা

সীমাহীন হয়ে দেখা দিয়েছিল। তা তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারার সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা ছিল।

সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হ'লেও ইংলণ্ডই ছিল তৎকালীন পৃথিবীতে আধুনিক বিজ্ঞানে, যন্ত্রবিদ্যায় ও যন্ত্রশিল্পে সর্বাগ্রণী। কেবল শক্তিতে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনায়, যন্ত্রশিল্পে—যা-কিছু আধুনিক যুগ ও আধুনিক সভ্যতার জন্ম দিয়েছে, তাতেই ইংলণ্ড ঐ সময়ে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী ছিল না, আধুনিক বিপ্লবী ধ্যান-ধারণার জন্মও হয়েছিল ইংলণ্ডে। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ক'রে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার চিন্তা ও চেষ্টা ইংলণ্ডই সর্বপ্রথম করেছিল, গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার উদ্ভবও ইংলণ্ডেই সর্বপ্রথম হয়েছিল। সুতরাং ইংলণ্ড সম্পর্কে রামমোহনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেক। তাই তিনি বিপ্লবী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ও অনুপ্রাণিত হয়েও ইংলণ্ডের প্রতি বিরূপ ছিলেন না—ইংলণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগই ভারতবর্ষকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও আধুনিক সভ্যতার অধিকারী ক'রে তুলবে, সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই যাঁরা রামমোহনের ইংরেজ শাসন ও ইংলণ্ডের প্রতি আনুগত্যকে বিপ্লবী চিন্তাধারার বা দেশপ্রেমের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন মনে করেন, তাঁরা ভুলই করেন। তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারা ও স্বদেশপ্রেমই তাঁকে ইংলণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী উইলিয়ম অ্যাডাম তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন: He would be free or not be at all.···Love of freedom was perhaps the strongest passion of his soul,—freedom, not of action merely, but of thought." তাঁর এই কথাগুলি অত্যুক্তি ছিল না।

রামমোহন যখন ইংরেজদের অধীনে চাকরি করতেন, তখনও তিনি চিন্তার ও কর্মের স্বাধীনতাকে বিন্দুমাত্র বিসর্জন দেন নি। ঐ সময়ে বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের চলছিল কঠিন সংগ্রাম। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অধীনে বিপ্লবী ফ্রান্স এক দুর্ধর্ষ শক্তিরূপে দেখা দিয়েছিল। নেপোলিয়নকে ইংলণ্ড ও ইংরেজরা তাদের পরম শত্রুরূপে দেখলেও, রামমোহন তাঁর ফরাসী-প্রীতি ও নেপোলিয়ন সম্পর্কে উচ্চ ধারণা ইংরেজ প্রভু ও বন্ধুদের কাছে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করতে কখনও সঙ্কুচিত ছিলেন না।

পরে নেপোলিয়ন শক্তির মদে মত্ত হয়ে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লব যে-রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ক'রে প্রজাতন্ত্রের ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিল, নেপোলিয়ন নিজেই সম্রাট হয়ে সেই বিপ্লবী চিন্তাভাবনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। তিনি নাপল্‌সে ও স্পেনে তাঁর ভাই জোসেফকে, নেদারল্যাণ্ডস্ ও হল্যাণ্ডে ভাই লুইকে এবং জার্মানির ওয়েস্টফালিয়ায় ভাই জেরোমকে রাজা ক'রে বসিয়েছিলেন। যে স্বাধীনতার বাণী নিয়ে ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা

উড্ডীন হয়েছিল, নেপোলিয়নের বিজীগিষা অন্যান্য দেশের সেই স্বাধীনতা হরণের জন্যই শেষে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল।

ইউরোপ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে থেকে নেপোলিয়নের চরিত্রের এই দ্রুত পরিবর্তন এবং বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সত্যটিকে বুঝতে বিলম্ব হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কারণ, যে ইংরেজী সংবাদপত্রগুলির মারফত তিনি ইউরোপের সংবাদ পেতেন, সেগুলি যে নেপোলিয়ন-বিরোধী এবং নেপোলিয়নের কার্যকলাপ ও নেপোলিয়ন-চরিত্রকে মসীলিপ্ত ক'রে দেখাতে বদ্ধপরিকর, তা-ও তাঁর অজানা ছিল না। সুতরাং নেপোলিয়নের পতন তাঁর কাছে প্রথমে মর্মান্তিকই ছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের শেষজীবনের কার্যাবলীকে তিনি যখন ঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন—বুঝেছিলেন, তখন বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকার জন্যই নেপোলিয়নকে তিনি ঘৃণা না ক'রে পারেন নি। কিন্তু ফ্রান্সের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল।

রামমোহন সম্পর্কে জন ডিগ্‌বির কথাগুলি তাই বর্ণে বর্ণে সত্য :

> He was also in the constant habit of reading the English newspapers, of which the Continental politics chiefly interested him and from thence he formed a high admiration of the talents and prowess of the late ruler of France and was so dazzled with the splendour of his achievements as to become sceptical as to the commission, if not blind to the atrocity of his crimes, and could not help deeply lamenting his downfall, notwithstanding the profound respect he ever professed for the English nation; but when the first transport of his sorrow had subsided, he considered that part of his political conduct which led to his abdication to have been so weak, and so madly ambitious, that he declared his future detestation of Buonaparte would be proportionate to his former admiration.

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের শেষজীবনে শক্তির মদমত্ততায় আদর্শচ্যুতি এবং বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা রামমোহনকে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ ক'রে তুললেও, বিপ্লবের প্রতি, মানুষের স্বাধীনতা-প্রীতির প্রতি তাঁর বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ছিল। নেপোলিয়নের পতনের পর ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা হয়ে উঠেছিল এবং ইউরোপ থেকে বিপ্লবকে, মানুষের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল। নেপোলিয়ন তাঁর ভাই জোসেফকে নাপল্‌সের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। পরে জেনারেল মুরা ঐ সিংহাসনে বসেন। নেপোলিয়নের পতনের পর তাঁকে বিতাড়িত ক'রে বুরবোঁ-বংশীয় ফার্ডিনাণ্ডকে নাপল্‌সের সিংহাসনে বসানো হয়।

ফার্ডিনাণ্ড ছিলেন অত্যন্ত স্বৈরাচারী, তিনি নাপল্‌স্‌বাসীদের সকল রাজনৈতিক অধিকার হরণ করেন এবং দেশে স্বৈরতন্ত্র প্রবর্তন করেন। নাপল্‌স্‌বাসীরা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকে। নাপল্‌স্‌বাসীদের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি রামমোহনের ছিল পূর্ণ সমর্থন। নাপল্‌স্‌বাসীরা তাদের স্বৈরাচারী রাজার কাছ থেকে একটি সংবিধান আদায় করতে সমর্থ হয়। কিন্তু নাপল্‌স্‌বাসীদের এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না। রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও সার্ডিনিয়ার মিলিত চেষ্টায় এবং অস্টীয় বাহিনীর সশস্ত্র হস্তক্ষেপেব ফলে নাপল্‌সবাসীদের দমন করা হয় এবং তাদের নবলব্ধ রাজনৈতিক অধিকারগুলি হরণ করা হয়। এই ঘটনাটি রামমোহনের কাছে ছিল অত্যন্ত বেদনা-দায়ক। তিনি এই ঘটনার সংবাদে কতখানি মর্মাহত হয়েছিলেন, তা ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ আগস্ট তারিখে তাঁর সাংবাদিক বন্ধু মিল্‌ক্‌ বাকিংহামকে লেখা পত্র থেকে বোঝা যায়:

> I am afraid I must be under the necessity of denying myself the pleasure of your society this evening; more especially as my mind is depressed by the late news from Europe. . . . From the late unhappy news I am obliged to conclude that I shall not live to see liberty universally restored to the nations of Europe, and Asiatic Nations, especially those that are European colonies, possessed of a greater degree of the same blessing than what they enjoy.
>
> Under these circumstances I consider the cause of the Neapolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies of liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful.

নাপল্‌স্‌বাসীদের সংগ্রাম কেবল নাপল্‌স্‌বাসীদেরই সংগ্রাম ছিল না, তা ছিল পৃথিবীর সকল স্বাধীনতায় ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষের সংগ্রাম। তাই নাপল্‌স্‌-বাসীদের সংগ্রাম রামমোহনের নিজেরও সংগ্রাম ছিল—I consider the cause of the Neapolitans as my own, and their enemies as ours. সাময়িকভাবে নাপল্‌স্‌বাসীদের সংগ্রাম ব্যর্থ হ'লেও এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রচক্র জয়ী হ'লেও শেষ পর্যন্ত মানুষের স্বাধীনতা-স্পৃহা ও গণতান্ত্রিক দাবিই যে জয়যুক্ত হবে, সে বিষয়ে রামমোহনের বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। তাই তিনি নির্ভীক কণ্ঠে বলেছিলেন, স্বাধীনতার শত্রু ও স্বৈরতন্ত্রের বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত কখনই জয়ী হয় নি, কখনও জয়ী হবেও না; স্বাধীনতার বন্ধু ও স্বৈরতন্ত্রের শত্রু যারা, তাদেরই জয় শেষ পর্যন্ত অবশ্যম্ভাবী—Enemies of liberty and friends of despotism have never been and never will be

ultimately successful. বিপ্লব একদিন না একদিন সফল হবেই, এমন সুদৃঢ় প্রত্যয় পৃথিবীতে সেদিন যে কয়জন মানুষের ছিল, রামমোহন ছিলেন তাঁদেরই একজন।

ইউরোপীয়রা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে উপনিবেশ স্থাপন করায় সেই সব অংশের মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, এ-কথা রামমোহন বিশ্বাস করতেন। কিন্তু এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই যথেষ্ট ছিল না। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে তারা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে, যন্ত্রবিদ্যায় ও শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত হয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলির সমকক্ষ হয়ে উঠবে, রামমোহন এই আশা ও আদর্শই পোষণ করতেন। কিন্তু রামমোহন যখনই দেখতেন যে, পাশ্চাত্য শক্তিগুলি তাদের উপনিবেশকে কেবল পদানত রাখতে চায়, তখনই তিনি কাতর হয়ে পড়তেন। তিনি এ-ও বিশ্বাস করতেন, চিরদিন এভাবে কাউকে পদানত ক'রে রাখা সম্ভব নয়। যারা আজ পদানত, তারা একদিন না একদিন আপন অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হবেই—কিন্তু তিনি তা তাঁর জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারবেন না, এ-ই ছিল তাঁর দুঃখ।

যে ইংলণ্ডের প্রতি রামমোহনের আস্থার অভাব ছিল না, সেই ইংলণ্ড যখন আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় অনিচ্ছুক হয়ে তাকে পদানত রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল, তখনও তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের সমর্থনে ইংলণ্ডের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ অক্টোবর তাঁর 'মিরাত্-উল্-আখবার' কাগজে আয়ার্ল্যাণ্ডের দুঃখ ও অসন্তোষের কারণ কি তা বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছিলেন। আইরিশ সমস্যা ইংলণ্ডের সকল রাষ্ট্রনায়কের কাছেই কণ্টকতুল্য ছিল। রামমোহন এই সমস্যা সমাধানের যে পথ নির্দেশ করেছিলেন, দীর্ঘকাল সে পথে কেউ অগ্রসর হন নি। অবশেষে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের উদারপন্থী প্রধানমন্ত্রী মিঃ গ্ল্যাডস্টোন এই সমস্যার কিছুটা সমাধান করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আয়ার্ল্যাণ্ডের অসন্তোষের প্রধান কারণ ছিল আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রতি ইংলণ্ডের ধর্মীয় পক্ষপাত এবং আইরিশ জনসাধারণের দারিদ্র্য। এই দুই কারণই তাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। রামমোহন এই ধর্মীয় পক্ষপাত সম্পর্কে যা লিখেছিলেন, তার মর্মার্থ হ'লো, ইংলণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ড, দুই দেশই খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী। আইরিশরা রোমান ক্যাথলিক এবং ইংরেজরা প্রোটেস্ট্যাণ্ট। রোমান ক্যাথলিক মতবাদ যেহেতু ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠিত চার্চের ধর্মীয় মতবাদের বিরোধী, সেইজন্য সরকার থেকে রোমান ক্যাথলিক যাজকদের ভাতা দেওয়া হয় না, তাদের আইরিশ জনসাধারণের ব্যক্তিগত দানের উপর নির্ভর করতে হয়। অন্যপক্ষে, আয়ার্ল্যাণ্ডে যেসব প্রোটেস্ট্যাণ্ট যাজক আছে, তাদের ভাতা ইংরেজ সরকার দেয় এবং সেই ভাতার জন্য সরকার আইরিশ ক্যাথলিকদের কাছ থেকে কর আদায় করে। রামমোহন ইংরেজ সরকারের এই

নির্লজ্জ ধর্মীয় পক্ষপাতের তীব্র সমালোচনা করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, রামমোহনের সমালোচনার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে, মিঃ গ্ল্যাডস্টোন আইন ক'রে এই ব্যবস্থা রদ করেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসীদের শতকরা মাত্র বিশজন প্রোটেস্ট্যান্ট হওয়া সত্বেও আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চই—অ্যাংলিকান চার্চ অব আয়ার্ল্যাণ্ড—হাউস্ অব লর্ড্‌সে প্রতিনিধি প্রেরণ করতো, গ্ল্যাডস্টোন তা-ও বন্ধ ক'রে দেন। এইভাবে আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংলণ্ডের ধর্মীয় পক্ষপাতের কিছুটা প্রতিকার হয়।

ইংলণ্ড আইরিশ ক্যাথলিকদের কাছ থেকে পক্ষপাতদুষ্ট হারে যে রাজস্ব ও কর আদায় করে, তার সমালোচনা ক'রেও তিনি ইংরেজ শাসকদের তাঁর প্রিয় সাদীর একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেন। ঐ উদ্ধৃতির মর্মার্থ হ'লো :

বলো না এইসব অর্থলোলুপ মন্ত্রীরা রাজার হিতৈষী। কারণ, তারা যে পরিমাণে রাজার রাজকোষ পূর্ণ করে, সেই পরিমাণে তারা রাজার জনপ্রিয়তা হ্রাস করে; রাষ্ট্র-ধুরন্ধরগণ, আপনারা রাজার অর্থ প্রজার সুখের জন্য ব্যয় করুন। তাহ'লে তারা যতদিন বাঁচবে, ততদিন রাজার অনুগত থাকবে।

ইংলণ্ডের রাজপুরুষরা রামমোহনের এই উক্তিতে কর্ণপাত করেন নি।

রামমোহন আয়ার্ল্যাণ্ডের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ সম্পর্কে বলেছিলেন যে, আয়ার্ল্যাণ্ডের অভিজাত ও অন্যান্য জমিদাররা রাজদরবারে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির আশায় বা সাধ্যমতো ভোগবিলাস চরিতার্থ করবার জন্য ইংলণ্ডেই বাস করেন। তাঁরা তাঁদের নায়েব বা জমিদারির তত্ত্বাবধায়কদের দ্বারা ভূমি থেকে যে পর্যাপ্ত রাজস্ব সংগ্রহ করেন, তা ইংলণ্ডেই ব্যয় করেন। ফলে, তাঁরা দুহাতে যা ব্যয় করেন, তাতে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীরাই লাভবান হয়, আয়ার্ল্যাণ্ডের কোনও লাভ হয় না। আর জমিদারদের নায়েব বা যারা জমিদারি দেখাশোনা করে, তারা তাদের প্রভুদের স্বার্থরক্ষার অত্যুৎসাহে ভূমির রাজস্ব নির্মমভাবে বৃদ্ধি ক'রে তা কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করে। ফলে, কৃষকরা এদের অন্যায় আচরণের ফলে জীবিকা থেকেও বঞ্চিত হয়।

গ্ল্যাডস্টোন ভূমি-ব্যবস্থার কিছু সংস্কার করেছিলেন। কিন্তু তাতে কৃষকরা বিশেষ উপকৃত হয় নি। রামমোহন আয়ার্ল্যাণ্ডের অর্থ বাইরে চ'লে যাওয়াকে আয়ার্ল্যাণ্ডের দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ ব'লে নির্দেশ করেছিলেন। ভারতের কোটি কোটি টাকা ভারত থেকে ইংলণ্ডে চ'লে যাওয়াতেও তিনি অধীর হয়ে উঠেছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর অর্থনৈতিক দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও স্বচ্ছ ছিল, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর অঙ্গুলিসঙ্কেত হয়েছিল ব্যর্থ।

স্পেন দক্ষিণ আমেরিকায় বিশাল সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলেছিল। আমেরিকায় যেসব স্পেনিয়ার্ড জন্মগ্রহণ করেছিল, তারা 'ক্রেওল' নামে পরিচিত ছিল। আমেরিকার

ইংরেজ উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিল। আমেরিকার স্পেনিশ ও পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিও তাই স্বাধীনতালাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুত উন্নতি ও সমৃদ্ধিলাভ এ-বিষয়ে তাদের উৎসাহিত করেছিল সন্দেহ নেই। স্পেনিশ উপনিবেশগুলি জোসে ডে স্যান মার্টিন ও সাইমন বলিভারের নেতৃত্বে স্বাধীনতা-সংগ্রাম করতে থাকে। অবশেষে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তারা স্বাধীনতা লাভ করে। স্পেনিশ উপনিবেশগুলির স্বাধীনতালাভের সংবাদ কলকাতায় এসে পৌঁছলে রামমোহনের আনন্দের সীমা রইলো না। পৃথিবীর কোনও অংশে কোথাও মানুষের বন্ধনমুক্তি যে রামমোহনকে কিভাবে উল্লাসে উদ্বেলিত ক'রে তুলতো, তার একটি সুন্দর বিবরণ Edinburgh Magazine and Literary Miscellany পত্রিকায় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকায় 'রামমোহন রায়' শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয়:

> But the lively interest he took in the progress of South American emancipation, eminently marks the greatness and benevolence of his mind, and it was created, he said, by the perusal of the detestable barbarities inflicted by Spain to subjucate and afterwards continued by the inquisition to retain in bondage that unhappy country.

দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনিশ উপনিবেশগুলির স্বাধীনতালাভের সংবাদে আনন্দ প্রকাশের জন্য তিনি তাঁর গৃহে একটি ভোজসভার আয়োজনও করেন। সমস্ত গৃহ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। তিনি প্রায় ষাটজন ইউরোপীয় বন্ধুকে এই ভোজ-সভায় আমন্ত্রণ ক'রে আপ্যায়িত করেন এবং ভোজসভায় একটি মনোজ্ঞ ভাষণও পাঠ করেন। তাঁকে কোনও আমন্ত্রিত বন্ধু প্রশ্ন করেন যে, সুদূর দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনিশ উপনিবেশগুলির এই স্বাধীনতালাভে তাঁর আনন্দের কারণ কি। তিনি তখন ব'লে ওঠেন, "কি! পৃথিবীর যে-কোনও অংশেই হোক না কেন, তাদের সঙ্গে আমার স্বার্থ, ধর্ম, ভাষার সম্বন্ধ নেই বা রইলো, মানুষ যখন দুঃখভোগ করে, তখন আমি কি সে সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকতে পারি!"

> 'What!' replied he, (upon being asked why he had celebrated by illuminations, by an elegant dinner to about sixty Europeans and by a speech composed and delivered by himself, at his house in Calcutta, the arrival of important news of the success of the Spanish Patriots), 'What! Ought I to be insensible to the sufferings of my fellow-creatures wherever they are, or howsoever unconnected by interests, religion and language?'

পর্তুগালে গৃহযুদ্ধকালেও রামমোহনকে অনুরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করতে দেখা যায়। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে পর্তুগাল প্রায় ইংলণ্ডের আশ্রিত হয়ে পড়ে। পর্তুগালের বহু পরিবার আমেরিকার পর্তুগীজ উপনিবেশ ব্রেজিলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নেপোলিয়নের পতনের পর পর্তুগালের রাজা হলেন জন, কিন্তু রাজা জন ব্রেজিলেই রয়ে গেলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজরা তাঁকে দেশে ফিরে আসবার জন্য আন্দোলন করতে লাগলো। ফলে, তিনি ব্রেজিলের শাসনভার পুত্র পেড্রোর হস্তে দিয়ে পর্তুগালে ফিরে এলেন। রাজা জন পর্তুগালে ফিরে এলে তাঁকে দেশবাসীর অনুমোদিত সংবিধান মেনে নিতে হ'লো। তাতে তিনি আপত্তিও করলেন না। এদিকে ব্রেজিলের পর্তুগীজ উপনিবেশ পর্তুগালের শাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইলো। দু বছর পরে ব্রেজিল স্বাধীন হ'লো। ব্রেজিলের রাজা হলেন পেড্রো। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজা জনের মৃত্যু হ'লো। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র পেড্রো ব্রেজিলের রাজা থাকায়, ব্রেজিলের সংবিধান অনুসারে তাঁর পর্তুগালেরও রাজা হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই পেড্রো তাঁর বালিকা কন্যা মারিয়া ডা গ্লোরিয়াকে পর্তুগালের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী করলেন। পেড্রোর ভ্রাতা মিগুয়েল হলেন মারিয়া ডা গ্লোরিয়ার অভিভাবক। মিগুয়েল মারিয়ার অধিকার অস্বীকার ক'রে নিজেই সিংহাসন অধিকার করলেন। মিগুয়েল ছিলেন স্বৈরতন্ত্রী। তিনি পর্তুগালের গৃহীত সংবিধানকে অগ্রাহ্য করলেন। এখন সংবিধানপন্থীরা মারিয়া ডা গ্লোরিয়ার পক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন। ফলে, পর্তুগালে গৃহযুদ্ধ বাধলো।

রামমোহনের মৃত্যুকালেও এই গৃহযুদ্ধ চলছিল। রামমোহন উদ্‌গ্রীব আগ্রহের সঙ্গে এই সংগ্রামের ফলাফল লক্ষ্য করছিলেন। স্বভাবসিদ্ধভাবেই তাঁর সমর্থন ছিল প্রগতিপন্থী মারিয়া ডা গ্লোরিয়ার পক্ষে। রামমোহন তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে এই গৃহযুদ্ধে সংবিধানপন্থীদের একটি জয়ের সংবাদ পেয়ে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২ আগস্ট একটি পত্রে মিঃ উড্‌ফোর্ডকে লেখেন : The news from Portugal is highly gratifying, though another struggle is expected—পর্তুগালের সংবাদ অত্যন্ত সন্তোষজনক, যদিও আরও লড়াই আশা করা যাচ্ছে।

মনুষ্যজাতির সকল অংশের সঙ্গে তাঁর এই একাত্মতা, এই বিশ্বমানবতাবোধ, রামমোহন চরিত্রের এক অনন্যসাধারণ দিক। নাপল্‌স্‌বাসীদের ব্যর্থতায় যেমন তাঁর বেদনার সীমা ছিল না, তেমনি দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনিশ উপনিবেশগুলির সাফল্যে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। মিস্ কোলেট যে বলেছেন, রামমোহন কবি রাসেল লাওয়েলের মতোই অনুভব করতেন : In the gain or loss of one race all

the rest have equal claim, তা একান্তই সত্য। কবি রাসেল লাওয়েলের মতোই তিনি অনুভব করতেন :

Wherever wrong is done
To the humblest and the weakest,
'neath the all-beholding Sun
That wrong is also done to us.

রামমোহনের এই বিশ্বমানবতাবোধ—মানবজাতির যে-কোনও অংশের মুক্তিতে উল্লাস এবং পরাধীনতায় ও দুঃখে বেদনা—সম্পর্কে বহির্বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষরা যে সচেতন ছিলেন, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নিচের ঘটনাটি থেকে।

নেপোলিয়ন তাঁর ভাই জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনেও বসিয়েছিলেন। স্পেনের অধিবাসীরা কিন্তু তাঁকে রাজা ব'লে স্বীকার ক'রে নেয় নি। তারা ফরাসীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে এবং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে তারা কাডিজে স্বাধীন স্পেনের জন্য একটি সংবিধান ঘোষণা করে। এই সংবিধানটিকে বিখ্যাত দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচে 'নব স্পেনিশ জাতির গঠনের সূচনা' আখ্যা দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল এই সংবিধানটি। রামমোহনের প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ইউরোপের মানুষরাও সচেতন ছিল। তাই লা কম্পানিয়া ডে ফিলিপিনাস (ফিলিপিন কোম্পানি) স্পেনিশ ভাষায় মুদ্রিত এই সংবিধানের একটি সংস্করণ রামমোহনের নামেই উৎসর্গ করেছিল। প্রাচ্যের কোনও ব্যক্তি এ ধরনের সম্মান ইতিপূর্বে পান নি। পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বিপ্লবী মানুষরা যে রামমোহনকে তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার জীবন্ত প্রতীক মনে করতেন, এ থেকে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। আর এ-ও প্রমাণিত হয় যে, তাঁর এ বিপ্লবী মতবাদের খ্যাতি সারা বিশ্বেই ব্যাপ্ত হয়েছিল। ঐ উৎসর্গপত্রে রামমোহনকে সর্বাধিক উদারপন্থী (liberalissimo), মহৎ (noble), সুপণ্ডিত (sabio) ও সৎ (virtuoso) ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষণগুলি যে সুপ্রযুক্ত হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য।

যিনি বিশ্বের যে-কোনও দেশের, যে-কোনও জাতির মুক্তিতে এতো আনন্দিত হতেন, তাদের পরাধীনতার গ্লানি যাঁকে বিমর্ষ ও ব্যথিত করতো, তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য উদ্‌গ্রীব হন নি কেন, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না ক'রে তাকে সমর্থন করেছিলেন কেন—এ প্রশ্ন সহজেই আসতে পারে। এ প্রশ্নের উত্তর—রামমোহনের স্বদেশপ্রেম ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতাই এর একমাত্র কারণ ছিল।

রামমোহনের দেশপ্রেম কারো চেয়ে কম ছিল না। ভারতের গৌরবময় অতীতের মধ্যেই তিনি সত্যের সন্ধান করেছিলেন এবং আলোক ও উদ্দীপনা লাভ করেছিলেন।

তাই ডঃ টিটলার যখন হিন্দুদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন, বলেছিলেন, হিন্দুরা যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করছে, তার আস্বাদ তারা খ্রীষ্টানদের কাছেই পেয়েছে। তাদের যে বুদ্ধির উদ্রেক হয়েছে, তা-ও খ্রীষ্টানদের কৃপায় হয়েছে। তখন রামমোহন তাঁকে দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছিলেন, বুদ্ধির আলোক (Ray of Intelligence) বলতে যদি তিনি প্রয়োজনীয় যন্ত্রশিল্পের (us.ful mechanical arts) কথা বলেন, তবে আমি তা মেনে নিতে রাজী আছি, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করছি। কিন্তু বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ধর্মের কথা যদি বলেন, তবে আমরা কারো কাছে কোনো কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে রাজী নই। কারণ, ইতিহাস থেকেই প্রমাণ ক'রে দেখানো যাবে যে, জ্ঞানের প্রথম উষাকাল থেকে বিশ্ব আমাদের পূর্বপুরুষের কাছেই ঋণী হয়ে আছে। ইউরোপীয়দের তুলনায় ভারতবাসীরা বুদ্ধিবৃত্তিতে বা অন্যান্য মানবিক গুণাবলীতে হীন, তা-ও তিনি কখনো স্বীকার করতেন না। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা অধিগত করতে পারলে ভারতীয়রা যে ইউরোপীয় জাতিগুলির সমকক্ষ হয়ে উঠবে, সে-বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন।

রামমোহন তার সমকালে দেখেছিলেন, ভারতবর্ষ তার অতীতের গৌরবময় উচ্চ শিখর থেকে অধঃপতনের গভীরতম অন্ধকার গহ্বরে পতিত হয়েছে। সে অতীতকেও হারিয়েছে, বিস্মৃত হয়েছে, বর্তমানের জ্ঞান-বিজ্ঞান যা পাশ্চাত্য দেশগুলিকে দ্রুত অগ্রসর ক'রে নিয়ে চলেছে, সে সম্পর্কেও তার কোনও চেতনা নেই। সুতরাং অধঃপতিত জাতিকে তার আত্মচেতনায়, সম্বিতে ও শক্তিতে ফিরিয়ে আনতে হ'লে প্রয়োজন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তার রাজনৈতিক চেতনা, তার জাতীয় চেতনা, তার ঐক্যবোধ ইংরেজ শাসনই তাকে দিতে পারে। বহু জাতিতে, বহু ধর্মে ও ভাষায় বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীকে একতাবদ্ধ করবার জন্য রামমোহন ধর্ম ও ভাষার একটি ঐক্যসূত্রের সন্ধানে ছিলেন। একেশ্বরবাদই হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানকে একটি ধর্মীয় স্বর্ণসূত্রে বাঁধতে পারে, এ ধারণা যেমন তাঁকে একেশ্বরবাদ প্রচারে এমন উৎসাহী ক'রে তুলেছিল, তেমনি বহু ভাষায় বিভক্ত ভারতবাসীকে ইংরেজী-ই যে সরকারী ভাষারূপে ঐক্যসূত্রে বাঁধতে পারে, সে-বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই ইংরেজ সরকারকে রামমোহন ইংরেজী ভাষাকেই আদালতের ভাষা ও সরকারী ভাষা করতে বার বার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কেবল পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্যই তিনি যে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন তা নয়; ইংরেজী ভাষাই ভারতবর্ষকে বহু ভাষার বিচ্ছিন্নতা ও গণ্ডির ঊর্ধ্বে একটি সুদৃঢ় জাতীয় সংহতি দিতে পারবে, এই ধারণা তাঁকে ইংরেজী শিক্ষায় এমন উৎসাহী ক'রে তুলেছিল। ইংরেজরা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকার করেছিল।

সুতরাং প্রশাসন, ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে ইংরেজ শাসনই যে ভারতবর্ষকে একটি জাতীয় অখণ্ডতা দিতে পারবে, ইংরেজ শাসনই তাকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত করবে, শিল্পে, কৃষিতে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিশ্বের অন্যান্য জাতিসমূহের সমকক্ষ ক'রে তুলতে পারবে, সে-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন।

তাঁর এই ধারণা যে নির্ভুল ছিল, তা পরবর্তী শতাব্দীকালের ইতিহাসই প্রমাণ করেছে। ধর্মীয় সমস্যার সমাধান হয় নি সত্য, ইংরেজী ভাষাই ভারতীয় জাতীয়তার এক ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড চেতনার জন্ম দিয়েছে, ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজ শাসনই ভারতবাসীকে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা, শিল্প-বাণিজ্য অধিগত ক'রে আধুনিক বিশ্বে আপন আসন অধিকার করতে সমর্থ করেছে। তাই রামমোহন আজ আধুনিক ভারতের জনক—Father of Modern India নামে দেশে-বিদেশে সর্বত্র স্বীকৃতিলাভ করেছেন।

ভারতবর্ষ একদিন পাশ্চাত্য দেশগুলির সমকক্ষ হবে এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে তার স্বাধীন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হবে, এ ধারণা রামমোহনের ছিল। ভাবীকালের একটি স্বাধীন সার্বভৌম ভারতের স্বপ্নময় রূপ তাঁর অন্তর্লোকে যে সর্বদাই বিরাজিত ছিল, তা তাঁর বহু লেখার মধ্যেও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর হিতার্থেই অন্ততঃ কিছুদিন ইংরেজ শাসন অপরিহার্য। তাই ভারতে বৃটিশ শাসনকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন, বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য তিনি ক্ষুদ্রতর অমঙ্গলকে সানন্দে বরণ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন :

> At present the whole empire (with the exception of a few provinces) has been placed under the British power, and some advantages have already been derived from the prudent management of its rulers, from whose general character a hope of future quiet and happiness is justly entertained. The succeeding generation will, however, be more adequate to pronounce on the real advantages of this government.

তিনি ফরাসী বিজ্ঞানী ও পর্যটক মঁসিয়ে ভিক্তর জাকর্মকে বলেছিলেন :

> India requires many more years of English domination so that she might not have to lose many things while she was *reclaiming her political independence.*

Reclaiming her political independence—ভারতবর্ষ যে একদিন তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবে, সে সম্পর্কে রামমোহনের যে কোনও সংশয় ছিল না, তা এই উক্তি থেকে সুস্পষ্ট। ভারতে বৃটিশ শাসন যে চিরস্থায়ী হবে, এ-কথা তিনি

কখনও বিশ্বাস করতেন না। তাঁর কিছুকালীন সেক্রেটারি ও সাংবাদিক স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট লিখেছেন যে, রামমোহন সর্বদাই বলতেন যে, ভারতবাসীদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যই অন্ততঃপক্ষে আরও চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর তাদের বৃটিশ শাসনে থাকা দরকার—"He …always contended…for the necessity of continuing British rule for at least forty or fifty years to come for the good of the people themselves."

ভারতবাসীরা অধঃপতনের যে নিম্নতম স্তরে নেমে এসেছিল, তা থেকে উদ্ধারের জন্য তার কিছুদিন বৃটিশ শাসনে থাকা প্রয়োজন, এ-কথা রামমোহন দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করলেও ইংরেজ শাসনের অনিষ্টকর দিকগুলি সম্পর্কে তিনি যে অন্ধ ছিলেন, তা নয়। তিনি ছিলেন ইতিহাসের ছাত্র। ইংলণ্ডের শাসন থেকে আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশগুলিকে সংগ্রাম ক'রেই স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছিল। আমেরিকার স্পেনিশ উপনিবেশগুলি স্পেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রেই স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। আয়ার্ল্যাণ্ড ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল—ইংরেজদের অবিচার সম্পর্কে রামমোহন নিজেও নীরব থাকতে পারেন নি। সুতরাং ভারতবাসীরা যে ইংরেজদের কাছে সুবিচার পাবে, এমন ধারণা পোষণ করবার মতো নির্বোধ তিনি ছিলেন না। তাই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রসঙ্গে তিনি এই সতর্কবাণীই উচ্চারণ করেছিলেন যে, ইংলণ্ড তার সামরিক শক্তি দিয়ে আয়ার্ল্যাণ্ডকে পদানত রাখতে সমর্থ হ'লেও ভারতবর্ষকে সামরিক শক্তি দিয়ে সে কখনও পদানত রাখতে পারবে না। তাকে ভারতে তার অধিকার ও শাসন অব্যাহত রাখতে হ'লে ভারতবাসীর শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার উপরই নির্ভর ক'রে চলতে হবে।

> It should not be lost sight of that the position of India is very different from that of Ireland, to any quarter of which an English fleet may suddenly convey a body of troops that may force its way in the requisite direction and succeed in suppressing every effort of a refractory spirit. Were India to share one-fourth of the knowledge and energy of that country she would prove from her remote situation, her riches and her vast population, either useful and profitable as a willing province, and all of the British Empire or troublesome and annoying as a determined enemy.

ভারতের বিপুল সম্পদ, বিশাল জনবল পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তা পেলে ভারতবাসীকে যে একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতিতে সহজেই পরিণত করবে—ইংরেজরা তাকে যে কোনও মতেই পদানত রাখতে পারবে না—রামমোহনের এই দূ-

প্রত্যয়ই তাঁকে ভারতে বৃটিশ শাসনের সমর্থক ক'রে তুলেছিল। আর এই সমর্থনের পশ্চাতে ছিল সুপরিকল্পিত দেশপ্রেম—দেশপ্রেমের অভাব নয়।

দেশ বলতে রামমোহন কেবল দেশের বিত্তবান্ মানুষদেরই বুঝতেন না, দেশ বলতে বুঝতেন দেশের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণকে। বৃটিশ শাসনে এদেশের বিত্তবান্ ব্যক্তিরাই সর্বাধিক উপকৃত হয়েছিল। দেশের জনসাধারণও যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অংশভাগী হ'তে পারে, সে বিষয়ে তাঁর চিন্তা ও আগ্রহের অভাব ছিল না। জনসাধারণকে উদ্‌বুদ্ধ করবার জন্যই তিনি মাতৃভাষায় লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাই তিনি শিক্ষার বিষয়ে তাঁর শিষ্যদের বলতেন, রান্নার জন্য যেমন কড়াইয়ের তলায় আগুন জ্বালাতে হয়, তেমনি জাতির জাগরণের জন্যও চাই নিচের তলার মানুষদের মধ্যে উত্তাপ সৃষ্টি করা। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। সাধারণ মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা ও আত্মচেতনাই গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে। তাই তিনি জনসাধারণের সমস্যাগুলি সর্বদাই সরকারের চোখে তুলে ধরতেন।

তিনি নিজে জমিদার ছিলেন। কিন্তু জমিদার-শ্রেণী দেশের কৃষকদের উপর যে জুলুম ও অত্যাচার করে, সে সম্পর্কে তিনি নীরব ছিলেন না। নীলকরদের সমর্থনে তিনি যেসব যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিল এতে দেশীয় কৃষকরা এদেশীয় জমিদারদের দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্তি পাবে। এদেশে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়দের স্থায়িভাবে সপরিবারে বসবাস সম্পর্কে তিনি যেসব যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তারও অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিল কৃষিতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলাকৌশলের প্রয়োগ ঘটবে এবং কৃষকরা উন্নততর পরিবেশে জীবনযাপনের সুযোগ পাবে।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে হাউস্ অব কমন্স্ যখন কোম্পানির সনদ নবীকরণের জন্য একটি সিলেক্ট কমিটি নিয়োগ করেছিল, তখন তিনি কোম্পানির বোর্ড অব কণ্ট্রোলের কাছে পত্রযোগে যেসব প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেগুলির অন্যতম ছিল দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে রাজস্বভার ও করভার থেকে মুক্ত করা। তিনি বলেছিলেন, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (Permanent Settlement) ফলে দেশের জমিদারদের প্রভূত উপকার হয়েছে। তাদের ধনসম্পদ্ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশি রাজস্ব দেওয়ার ভয়ে পূর্বে জমিদাররা যেসব জমি অনাবাদী বা পতিত ফেলে রাখতো, সেগুলিকে কৃষিযোগ্য ক'রে তুলে এখন দেশের সম্প বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু কৃষকদের অবস্থার এতে উন্নতি হয় নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু প্রজাদের কাছ থেকে জমিদাররা যে রাজস্ব আদায় করে, তা নির্দিষ্ট করা হয় নি বা তাদের রাজস্ববৃদ্ধিও নিষিদ্ধ করা হয় নি। ফলে, জমিদাররা কৃষকদের কাছ থেকে ইচ্ছামতো রাজস্ব আদায়

করে। এই রাজস্বের পরিমাণ এতই বেশি যে, কৃষকদের দুর্দশার সীমা নেই। সুতরাং কৃষকদের রাজস্ববৃদ্ধি নিষিদ্ধ করা এবং কৃষকদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করা একান্ত প্রয়োজন। কৃষকদের রাজস্ব যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করলে জমিদারদের দেয় রাজস্ব দিতে যাতে না অসুবিধা হয়, সেজন্য তিনি জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণও হ্রাস করতে বলেন।

জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করলে সরকারের আয় হ্রাস পাবে, সরকার যাতে এই যুক্তি না দেখাতে পারেন, সেজন্য তিনি সরকারকে বিলাসদ্রব্যের উপর কর বসিয়ে সরকারের আয় বৃদ্ধি করতে এবং অত্যধিক বেতনে নিযুক্ত ইউরোপীয় কালেক্টরদের পরিবর্তে অল্প বেতনে ভারতীয় কালেক্টরদের নিযুক্ত করতে পরামর্শ দেন। রাজস্ব-বিভাগে ভারতীয়রা দক্ষতার সঙ্গেই কাজ করতে পারবেন, তাঁদের কর্মদক্ষতা যে ইউরোপীয়দের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, রামমোহন ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার সেই সূচনার যুগেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন।

রামমোহন কেবল কৃষকদের রাজস্ব হ্রাসের প্রস্তাবই করেন নি। তিনি প্রজাদের সঙ্গে সরাসরি বন্দোবস্তেরও পক্ষপাতী ছিলেন। এখন থেকে দেড় শ বছর পূর্বেও তাঁর এই ধরনের চিন্তা যে কতখানি বিপ্লবাত্মক ছিল, যাঁরা জমিদারী প্রথা বিলোপের জন্য আন্দোলন করেছিলেন, তাঁরা বিশেষভাবে অনুধাবন করতে পারেন।

এদেশে কোম্পানি সরকার লবণের একচেটে ব্যবসায় করতো। কোনও দেশে কোনও সভ্য সরকার ব্যাপকভাবে ব্যবসায়ের নামে এই ধরনের ঘৃণ্য শোষণ করে নি। কোম্পানি সরকার যতগুলি একচেটে ব্যবসায় করতো, সেগুলির মধ্যে এই লবণ ব্যবসায় ছিল ঘৃণ্যতম। বাংলা দেশে অগণিত মানুষ নুন মেরে জীবিকা উপার্জন করতো। তারা 'মলঙ্গা' নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লবণের ব্যবসায়কে একচেটে ক'রে নিলো। এর ফলে বাংলা দেশে প্রায় ১২,৫০০ মলঙ্গা কোম্পানির ক্রীতদাসে পরিণত হ'লো। এখন কোম্পানি দেশে লবণ উৎপাদনের জন্য নিজস্ব এজেন্টদের নিযুক্ত করতে লাগলো। তারা কোম্পানির পক্ষ থেকে কলকাতার বাজারে লবণ বিক্রয় করতো। কোম্পানি লবণের একচেটে ব্যবসায় করলেও এই ব্যবসায় তারা এদেশীয় ধনী ব্যবসায়ীদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিল। ঐসব ব্যবসায়ী উৎপন্ন লবণের বেশির ভাগ গোলাজাত ক'রে বাজারে অতি অল্প পরিমাণ লবণ ছাড়তো এবং অত্যধিক মূল্যে লবণ বিক্রয় ক'রে প্রচুর মুনাফা করতো। লবণের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি ক'রে কেবল ব্যবসায়ীরা অত্যধিক মুনাফাই করছিল না, লবণের সঙ্গে নানা অভক্ষ্য দ্রব্যও ভেজাল দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত বাজারে লবণ দুষ্প্রাপ্য ক'রে চোরাকারবারীদের হাতেই লবণ ব্যবসায় তুলে দেওয়া হয়েছিল।

ব্যাপারটা এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, এদেশের ইউরোপীয় অধিবাসীরাও এর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। এদেশীয়দের প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'লো রামমোহনের লেখনীতে। রামমোহন 'রামহরি দাস' এই ছদ্মনামে একটি পত্র ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১ নভেম্বর গভর্নমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করলেন :

I proceed without further preface to address the covenanted Salt Officer, Times, Senior, Junior, etc., etc.

My name is Ram Horee Dass. I pay annually to government a sum of Rs. 120. I am therefore a ten pound freeholder, as you could call it . Did it never occur to you that Rs. 325 per hundred maunds or 3¼ per maund was somewhat too dear when smugglers would furnish it at one rupee eight annas? . . . Did it never occur to you sir, while sporting with our miseries, that it might be therefore the H. C.'s salt Golahs contained so many maunds of unsold salt? We have therefore enough . . . Fie upon you, sir! . . . . Show the period when salt has been sold at its natural price. Supply ten families in any village with it. Give your starving workmen at home a full supply of bread and meat at the price they would obtain it without your Corn Laws, and see then if they would consume more of it or not. . . . And bear ever in mind that at fifty miles only from Calcutta one-third of what is sold to us as salt is dirt and is swallowed as salt. If you continue your mistimed levity, I will publish an analysis of it according to your science of Chemistry and some of the smuggled salt with it.

কোম্পানির লবণ ব্যবসায়ের এই একচেটে অধিকার এবং ব্যবসায়ে দুর্নীতি ও লক্ষাধিক শ্রমিক ও জনসাধারণকে এইভাবে শোষণ ও বিপন্নকরণের প্রতিবাদে রামমোহন বার বার প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকেন। ইংলণ্ডের উদারনীতিক ব্যক্তিরাও চঞ্চল হয়ে ওঠেন। মিঃ জে. ক্রফোর্ড, মিঃ রবার্ট রিচার্ড্স্ প্রভৃতি ইংরেজ ভদ্রলোকরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটে ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওঠেন। বৃটিশ সংবাদপত্রগুলিও কোম্পানির কাজের সমালোচনা করতে থাকে। পুস্তিকা, নিবন্ধ প্রভৃতি মুদ্রিত ও বিতরিত হ'তে থাকে। রামমোহনের মত সর্বত্রই সমাদর পায়। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ নিজেদের লবণ নীতির সমর্থনে একটি দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করে। তারা প্রমাণ করতে চায় যে, রামমোহনের সমালোচনা ভিত্তিহীন। লবণের দুষ্প্রাপ্যতাকে তারা অলীক ব'লেও বর্ণনা করে।

রামমোহন তাতে নিরস্ত হলেন না। বিলাতী লবণ—সস্তা হওয়ায় তা জনসাধারণের ক্রয়-মূল্যের মধ্যে সরবরাহ করা যেতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। তাতে যেসব লবণ-শ্রমিকের চাকরি যাবে, তাদের কৃষির উন্নতি ক'রে তাতে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে বললেন। কারণ, মলঙ্গারা বর্তমান অবস্থায় শোচনীয় দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে আছে, তাদের শোষণ চরমে এসে পৌঁছেছে। তাদের যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে হয়, তা-ও তাদের জীবন ও জীবিকা দুইয়ের পক্ষেই মারাত্মক। দেশে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হ'লেও এদের চেয়ে শোচনীয় নয়।

আবার পরিচালক-সভা ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২ এপ্রিল তাঁদের লবণ নীতির সমর্থনে একটি দীর্ঘ উত্তর প্রকাশ করলেন। তাতে তাঁরা বললেন, লবণ দুষ্প্রাপ্য নয়, দুর্মূল্যও নয়। রামমোহন কিন্তু কোম্পানির একচেটে ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা ও আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর সুযোগ্য সহযোগী ও অনুগামী দ্বারকানাথ ঠাকুর-ও এই বিষয়ে আন্দোলন চালাতে লাগলেন। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারি সিলেক্ট কমিটি শেষ পর্যন্ত রামমোহনের মতামতকেই গ্রহণ করলেন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লবণ ব্যবসায়ের একচেটে অধিকার বিনষ্ট হ'লো।

এই ঘটনা থেকে রামমোহনের সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ববোধের ও অর্থনৈতিক দৃষ্টির গভীরতাই প্রমাণিত হয়। দেশ থেকে খাদ্য বাইরে রপ্তানির ফলে দেশের মানুষের যাতে অন্নাভাব না ঘটে, সে-বিষয়েও তাঁর দৃষ্টি সজাগ ছিল। বাংলা দেশের চাল যাতে বাংলা দেশের বাইরে কোন বন্দরে রপ্তানি বা খালাস করা না হয়, সে-বিষয়ে তিনি তাঁর সম্বাদ-কৌমুদী পত্রিকায় দীর্ঘ সমালোচনা করেন। রামমোহনের বিপ্লবাত্মক চিন্তা কোনরূপ উত্তেজিত মনোভাবের মধ্যে প্রকাশিত হয় নি সত্য, তা তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল —যা পরবর্তী কালে ভারতবর্ষকে এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী জাতিরূপে গ'ড়ে তুলতে সমর্থ করেছিল।

রামমোহন আভিজাত্যের উর্ধ্বলোক থেকে সাধারণ দীনদরিদ্র মানুষের জন্য করুণা বর্ষণ করেন নি। তিনি নিজে ধনী জমিদার ও অভিজাত-বংশীয় ছিলেন। তাঁর জীবনযাত্রাও ছিল অভিজাতসুলভ। কিন্তু তাঁর এই বাহ্যিক রূপ তাঁর অন্তরকে কখনই সাধারণ মানুষ থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে নি। তাই সাধারণ মানুষকে তিনি সর্বদা আপনজন মনে করতেন এবং তাদের সাহায্য করবার সামান্যতম সুযোগ পেলেই আভিজাত্যের আবরণ ত্যাগ ক'রে তাঁর সাদর হস্ত প্রসারিত করতেন।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে রামমোহন কি ধরনের ব্যবহার করতেন, তার একটি সুন্দর

বর্ণনা দিয়েছেন রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণবাবু তাঁর পিতা নন্দকিশোরবাবুর কাছে কাহিনীটি শুনেছিলেন।

রামমোহন একদিন বহুবাজার স্ট্রীটে সকালে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, একজন সব্‌জিওয়ালা রাস্তার এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছে, কাউকে পাওয়া যায় কিনা যে বোঝাটা তার মাথায় তুলে দেবে। রামমোহন থেমে দাঁড়ালেন। তিনি খুব মহার্ঘ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকলেও বিন্দুমাত্র ইতস্তত না ক'রে বোঝাটা সব্‌জিওয়ালার মাথায় তুলে দিলেন। দেশের সাধারণ মানুষটির জন্য তাঁর কত দরদ ও অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল, এ ঘটনা থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

রামমোহন রাজতন্ত্রী ছিলেন, না প্রজাতন্ত্রী ছিলেন, এ নিয়ে তৎকালেও অনেক মতদ্বৈধ দেখা দিয়েছিল। রামমোহন যে Republican বা প্রজাতন্ত্রী ছিলেন, তা তাঁর চিন্তাধারা থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তবে তিনি রাজতন্ত্রের প্রতি উগ্র বিরোধী মনোভাব নিশ্চয় পোষণ করতেন না। নেপোলিয়ন সম্রাট উপাধি গ্রহণ করায় তাঁর প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা দেখা দেয় নি, তিনি পরে-নেপোলিয়নেব প্রতি আস্থা হারিয়েছিলেন, যখন জেনেছিলেন নেপোলিয়ন ক্ষমতার দম্ভে মত্ত হয়ে জাতিব পর জাতিকে, দেশের পর দেশকে পদানত করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পরে যখন লুই ফিলিপ ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, তাতেও তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন নি। ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের প্রতিও তাঁর কোন বিরূপ মনোভাব ছিল না। রাজতন্ত্র যদি স্বৈরাচাবী না হয়, যদি তা জনসাধারণের মনঃপূত সংবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে তাকে তিনি প্রজাতন্ত্রের মতোই শ্রদ্ধা দিতেন। কারণ, জনসাধারণের ইচ্ছাই তাঁর কাছে ছিল মুখ্য। জনসাধারণ যদি দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে অভীপ্সিত মনে করতো, তবে তাই ছিল তাঁব কাছে কাম্য। জনসাধাবণ দেশে রাজতন্ত্রের সমর্থন করলেও তাতে তাঁর আপত্তি ছিল না। তাই তিনি প্রজাতন্ত্রী ছিলেন, না রাজতন্ত্রী ছিলেন, এই প্রশ্ন অবান্তর। জনসাধারণেব মঙ্গলই ছিল তাঁর লক্ষ্য। প্রজাতন্ত্র যদি স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হ'তো, যেমন হয়েছিল হিটলার-শাসিত জার্মানিতে, তবে তিনি নিশ্চয় তার প্রতিবাদ করতেন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে রাজা আছেন, কি প্রেসিডেণ্ট আছেন, সেটা তাঁর কাছে বড় ছিল না, তাঁর কাছে বড় ছিল ঐ সর্বোচ্চ ব্যক্তি প্রজার মঙ্গল করছেন কিনা! সে অর্থে রামমোহন *ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজাতন্ত্রী।* প্রজাই তাঁর কাছে মুখ্য ছিল—রাজা বা প্রেসিডেণ্ট নয়।

কোনও প্রচলিত বৈপ্লবিক সংজ্ঞা দ্বারা রামমোহনকে আখ্যাত করা না গেলেও, রামমোহন ছিলেন মনেপ্রাণে বিপ্লবী। ধর্মে, সমাজে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে—সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন বিপ্লবী। তিনি দ্রুত ও আমূল না হ'লেও

চেয়েছিলেন পরিবর্তন। ভারতের ব্যাপক এই পরিবর্তন তাঁর নির্দেশিত পথেই সংঘটিত হয়েছিল। ভারতে বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত থেকেই বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসংখ্য বিদ্রোহ ঘটেছিল। কিন্তু রামমোহন সে সকল বিদ্রোহে সায় দেন নি। সে সকল বিদ্রোহের সাফল্যের অর্থ ছিল স্বাধীনতা নয়, ভারতবর্ষকে আরও আরও দীর্ঘকাল সামন্ততান্ত্রিক পঙ্কশয্যায় শায়িত রাখা। রামমোহন বৃটিশ শাসনের মধ্যে এই সামন্ততন্ত্র থেকে মুক্তির আলোক দেখেছিলেন—এবং এই আলোকের মধ্যেই দেখেছিলেন ভাবী ভারতের সমুজ্জ্বল মূর্তি। তার প্রদর্শিত পথেই ভারতের ইতিহাস রচিত হয়েছিল। ইংরেজ শাসনের পথেই ভারতবাসী পেয়েছিল তার জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা, জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধ, স্বাধীনতা সম্পর্কে চেতনা ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের শক্তি। রামমোহন-প্রতিভার অনন্যতা এখানেই। তাই রামমোহন ছিলেন যেন ভারত ইতিহাসের নিয়ন্তা পুরুষ—ভারত-ইতিহাসের Man of Destiny.

১২

ইংলণ্ড যাত্রা

রামমোহনের জীবনের অনেকগুলি স্বপ্নই সার্থক হয়েছিল। সরকার সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাঁর একেশ্বরবাদী হিন্দু ধর্ম স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষা সরকারের অনুমোদন ও পূর্ণ সাহায্য না পেলেও হিন্দু কলেজ (তখনও প্রকৃতপক্ষে স্কুল, হিন্দু কলেজ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়েই প্রকৃত কলেজের মর্যাদা পায়), রামমোহনের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল, এবং আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী মিশনারিদের চেষ্টায় দেশে মূল সঞ্চারিত করছিল। রামমোহনের বিরুদ্ধে যেসব মামলা চলছিল, সেগুলিও ছিল নিষ্পত্তির পথে। বর্ধমানের মহারাজা তাঁর বিরুদ্ধে যে তিনটি মামলা এনেছিলেন, সেগুলি তখনও সদর দেওয়ানী আদালতে চলছিল। তবে এ মামলাগুলিতে রামমোহনের জয় যে সুনিশ্চিত, তা বর্ধমানের মহারাজাও বুঝেছিলেন। নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় রামমোহনের পারিবারিক কাহিনীগুলি নিয়ে যে বই লিখেছেন, তাতে তিনি বলেছেন, শেষ পর্যন্ত বর্ধমানের মহারাজার বোধোদয় হয়েছিল এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে রামমোহনের সঙ্গে আলাপ ক'রে এইসব মামলার নিষ্পত্তি চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এই মামলা তিনটির একটির রায় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর এবং অন্য দুইটির রায় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর বেরিয়েছিল। রামমোহন তিনটি মামলাতেই বিজয়ী হয়েছিলেন।

তাই এই সময়ে রামমোহনের মন যে ভারমুক্ত হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এখন তাঁর জীবনের আর একটি স্বপ্ন তাঁকে পেয়ে বসেছিল। এই স্বপ্ন সুদীর্ঘকাল তাঁর মনের নিভৃতে বাসা বেঁধে ছিল। তিনি ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দেই মিঃ জন ডিগ্‌বিকে লেখা পত্রে তাঁর ইংলণ্ড ভ্রমণের সুতীব্র ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন। এখন তিনি সেই ইচ্ছাটিকেই কার্যে পরিণত করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন।

কিছুদিন যাবৎ ইংলণ্ডে যাওয়ার একটি সুযোগ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং নিজের ব্যক্তিগত ঝামেলা তাঁকে এই সুযোগ গ্রহণের অবকাশ দিচ্ছিল না। এখন তিনি সেই সুযোগ গ্রহণে অগ্রসর হলেন।

রামমোহনের আরবী-ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় গভীর জ্ঞান, কূটনীতি সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা এবং এদেশের ও ইংলণ্ডের উচ্চপদস্থ ও প্রভাবশালী

ইংরেজদের সঙ্গে পরিচয় ও হৃদ্যতার কথা কারো অবিদিত ছিল না। কেবল তাই নয়, রামমোহন ছিলেন তৎকালীন ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। রামমোহনের এই গুণাবলীর কথা দিল্লীর বাদশাহের কাছেও অজ্ঞাত ছিল না।

দিল্লীর বাদশাহ্‌রা ঐ সময়ে নামমাত্র বাদশাহ্‌ ছিলেন। ভারতবর্ষের সামান্য কিছু অংশ ছাড়া প্রায় সর্বত্রই ইংরেজ শাসন প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দিল্লীব বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় আকবর শাহ্‌ ইংরেজদের বৃত্তিভোগী ছিলেন। তাঁর পিতা বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমের সঙ্গে কোম্পানির যে চুক্তি হয়েছিল, ইংরেজ কোম্পানি তাদের ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা পদে পদে ভঙ্গ করছিল। বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় আকবর শাহ্‌কে কোম্পানি বছরে বারো লক্ষ টাকা বৃত্তি দিচ্ছিল' কিন্তু তাতে বাদশাহ্‌, তাঁর পুত্রকন্যাগণ, ভগিনীগণ এবং আশ্রিতগণের ব্যয় সঙ্কুলন অসম্ভব হযে উঠেছিল। বাদশাহের পারিবারিক দুর্দশার কথা গাল-গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর শাহ কোম্পানির বিরুদ্ধে তাঁব অভিযোগগুলি ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজা চতুর্থ জর্জের কাছে উত্থাপিত করবার জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান কবছিলেন। রামমোহন যে এ-বিষযে সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন, তাতে কারো সন্দেহ ছিল না। তাছাড়া, দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে রামমোহনের পারিবারিক সম্পর্কও ছিল পূর্ব থেকে। বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় আকবর শাহ্‌ তাঁর পত্রে সেই সম্পর্কের কথাও রামমোহনকে স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর পিতা বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম যখন তাব সিংহাসনলাভেব কালে ও প্রাক্কালে তাঁব সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে এসেছিলেন, তখন বামমোহনেব পিতামহ ব্রজবিনোদ রায় তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। সেদিক থেকেও রামমোহনের সাহায্য নেওয়াই বাদশাহ্‌ সমীচীন মনে করেছিলেন।

তাই ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় আকবব শাহ্‌ তার কলকাতাস্থ প্রতিনিধিকে বামমোহনেব সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিব বিরুদ্ধে তাঁর অনুযোগগুলি ইংলণ্ডেশ্বরের কাছে উত্থাপিত ক'রে প্রতিকারেব ব্যবস্থা করবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে যাওয়ার জন্য অনুবোধ করতে নির্দেশ দেন। ইংলণ্ড যাওয়াব ইচ্ছা রামমোহনের বহুদিন থেকেই ছিল। তিনি বাদশাহের এই দৌত্যকার্য করতে সহজেই স্বীকৃত হলেন। তখন বাদশাহ্‌ তাঁকে ইংলণ্ডেশ্বরের কাছে একটি আবেদনপত্র ইংরেজী ও ফারসী ভাষায় মুসাবিদা করতে অনুরোধ করলেন। ইংলণ্ডেশ্বর রাজা চতুর্থ জর্জের উদ্দেশে রামমোহন দিল্লীব বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় আকবর শাহের আবেদনপত্রের যে খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন, তার ইংরেজী অনুলিপিটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায অনুসন্ধান ক'রে আবিষ্কার করেছেন। ফারসী ভাষায় রচিত আবেদনপত্রটির কোনও অনুলিপি পাওয়া যায় নি। এই ইংরেজী আবেদনপত্রটি যুক্তির বিন্যাসে, ভাষার লালিত্যে, ভাবের সৌন্দর্যে ও শালীনতায়

রামমোহনের রচনাবলীতে কেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পত্র-সাহিত্যে সহজেই স্থান পেতে পারবে।

রামমোহন তাঁর রচিত এই আবেদনপত্রটি এইভাবে আরম্ভ করেছিলেন :

To

His Majesty the King of British Empire, Etc, etc., etc.

Sire! My Brother! It is with a mingled feeling of humility and pride that I approach your majesty with the language of fraternal equality at the very time that the occasion of my addressing your Majesty compels me to consider myself rather as a supplicant at the footstool of your Majesty's throne than as a monarch entitled to assume the style, and claim the privileges of royalty.

2 Sire! I do not forget who or what I am, I cannot forget that I am a King only in name, and that I have nothing in common with your majesty and the other sovereigns of the earth but a little conceded to me with no other effect than to aggravate the humiliation and unhappiness in which I am involved Yet low as is my condition I have not lost the feelings of humanity, and I claim from your Majesty that justice which is not denied to the meanest of your Majesty's subjects

রামমোহন আবেদনপত্রটি এইভাবে শুরু ক'রে ধীরে ধীরে বাদশাহের অনুযোগগুলি তথ্য ও যুক্তিসহ একে একে তুলে ধরলেন।

লর্ড লেকের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তৎকালীন সপারিষদ গভর্নর-জেনারেল বাদশাহ্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন, কোম্পানি এখন সেই চুক্তির শর্তগুলি একে একে লঙ্ঘন করছে। ঐ চুক্তির প্রথম ধারায় (article) বলা হয়েছিল, মৌজা কাবিলপুরের পশ্চিমে ও উত্তরে অবস্থিত যমুনার পশ্চিম তীরবর্তী সমস্ত মহলগুলি বাদশাহের খাস সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হবে। দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছিল, ঐ সকল মহলের তত্ত্বাবধান কোম্পানির আবাসিক প্রতিনিধি বা রেসিডেন্ট-ই করবেন। তবে ঐ সব মহলের সমস্ত রাজস্ব যাতে বাদশাহ্ হিসাবমতো পান, তা দেখাশোনা করবার জন্য তৃতীয় ধারায় বলা হয়েছিল যে, বাদশাহের মুৎসুদ্দি বা কর্মচারীরা কাছারিতে উপস্থিত থেকে রাজস্বের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখবে এবং সে সম্পর্কে বাদশাহ্কে জানাবে। চুক্তির সপ্তম ধারায় বলা হয়েছিল, বাদশাহ্ ও তাঁর পরিজনবর্গের জন্য যে মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত করা হয়েছে, তা মাসে মাসে কোম্পানির রাজকোষ থেকেই দেওয়া হবে—বৃত্তির জন্য নির্ধারিত টাকার সমস্তটা বাদশাহের ঐ খালসা জমির রাজস্ব

থেকে সংগৃহীত হ'ক বা না হ'ক। ঐ চুক্তিপত্রে এ-ও বলা হয়েছিল যে, যদি বাদশাহের খালসা জমিতে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ পরে কৃষির সম্প্রসারণ, ভূমির উন্নতি প্রভৃতির ফলে বৃদ্ধি পায়, তবে তা-ও বাদশাহের রাজকোষে জমা পড়বে, কোম্পানি তা নেবে না। ঐ খালসা জমির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সৈন্যদল, পুলিশ বাহিনী প্রভৃতি নিযুক্ত থাকবে, তাদের ব্যয়ভারও কোম্পানি বহন করবে, ঐ সংগৃহীত রাজস্ব থেকে বাদ দেওয়া হবে না, তা-ও চুক্তিপত্রে স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত ছিল। যতদিন বাদশাহের জন্য মাসিক নির্ধারিত বৃত্তির পরিমাণের চেয়ে ঐ খালসা জমির আয় কম ছিল, ততদিন কোম্পানি ঐ চুক্তি অনুযায়ী কাজ করেছিল। কিন্তু পরে ঐ খালসা জমির আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং তা বাদশাহ্‌কে দেয় বৃত্তির ন্যূনতম পরিমাণের চেয়ে বেশি হওয়ায়, কোম্পানি ঐ চুক্তিকে পদে পদে লঙ্ঘন করেছে। রামমোহন আবেদনপত্রে জানালেন, চুক্তিপত্রে ঐ শর্তগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল, তবু কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তা নির্দ্বিধায় লঙ্ঘন করেছেন। রামমোহন লিখলেন :

> What could be more clear and explicit than these provisions? What words could have more strictly guarded against the possibility of perversion or misapprehension? Yet the first and most important point has been since rendered a dead letter, as if neither honour nor justice demanded their fulfilment

আবেদনপত্রে রামমোহন লিখলেন, কিছুদিন পূর্বে বাদশাহ্ যখন এ-বিষয়ে বড়লাট লর্ড আমহার্স্ট'কে জানান, তখন লর্ড আমহার্স্ট উত্তরে বলেন যে, একথা সত্য, বাদশাহ ও তাঁর পরিবারের ভরণপোষণের জন্য বাদশাহ্‌কে যমুনা নদীর পশ্চিম তীরবর্তী কিছু মহল দেওয়ার ইচ্ছা সরকারের ছিল, কিন্তু অপরিহার্য কারণে তা কার্যকরী করা যায় নি। কিন্তু বড়লাটের উক্তি ভ্রমাত্মক ছিল। কারণ, সরকার বাদশাহ্‌কে ঐ সমস্ত মহল দিয়েছিলেন, বাদশাহের মুৎসুদ্দিরা ঐসব মহলের হিসাবপত্র নিয়মিত দেখতো। কিন্তু যখনই ঐসব মহলের আয় বাদশাহের জন্য নির্ধারিত বৃত্তির ন্যূনতম পরিমাণের চেয়ে বেশি হ'লো, তখনই সরকার বাদশাহের মুৎসুদ্দিদের হিসাবপত্র দেখতে দিলেন না। এইভাবে কোম্পানি সরকার চুক্তি অনুযায়ী দেয় ঐসব মহলের রাজস্ব থেকে বাদশাহ্‌কে বঞ্চিত করলেন। কেবল রাজস্ব থেকেই বঞ্চিত করা হ'লো না। ঐসব মহলের অধিবাসীদের কারো অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হ'লে তা পূর্বে কোম্পানির আবাসিক প্রতিনিধি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বাদশাহের কাছে পাঠাতেন। চুক্তির ষষ্ঠ ধারায় এই শর্ত স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত ছিল। কিন্তু এখন থেকে কোম্পানি সরকার চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন ক'রে ঐ নিয়ম তুলে দিলেন।

এইভাবে অবিচারের সঙ্গে অপমান-ও সংযোজিত হ'লো। রামমোহন আরও লিখলেন, লর্ড আমহার্স্টের পূর্বে যেসব বড়লাট এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই বাদশাহ

দ্বিতীয় আকবর শাহ্‌কে বা তাঁর পিতা দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমকে রাজসম্মান দিতে কার্পণ্য করেন নি। কিন্তু বড়লাট লর্ড আমহার্স্ট বাদশাহ্‌কে সেই সামান্য সম্মান থেকেও বঞ্চিত করেছেন।

> Lord Amherst however thought proper to reduce me in his form of communication to the footing of an equal, and thereby to rob me even of the cheap gratification of the usual ceremonials of address as to humble me as far as possible in the eyes of all ranks of people

কেবল তাই নয়, রামমোহন লিখলেন, চুক্তিতে বাদশাহ্‌ ও তাঁর পরিজনদের জন্য যে ন্যূনতম পরিমাণ বৃত্তি নির্ধারিত করা হয়েছিল, তা বাদশাহের সঙ্গে কোনও পরামর্শ না ক'রে তাঁর বিনা সম্মতিতেই হ্রাস করা হ'লো। তিনি দেখালেন, বড়লাট লর্ড ওয়েলেস্‌লির সময় থেকে এ পর্যন্ত কিভাবে বাদশাহ্‌কে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। চুক্তি অনুসারে, যমুনার পশ্চিম তীরবর্তী মহলগুলি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এখন ঐসব মহলের রাজস্বের পরিমাণ ত্রিশ লক্ষাধিক টাকা। অথচ তাঁকে মাত্র বাৎসরিক বারো লক্ষ টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। এর চেয়ে অন্যায় ও চুক্তিভঙ্গের দৃষ্টান্ত কি হ'তে পারে?

অবশেষে রামমোহন বাদশাহের আবেদনপত্রে লিখলেন:

> If I had any doubt of the justice of my claims, I might still rest them on an appeal to your Majesty's known generosity. I might remind your Majesty of time when my ancestors ruled supreme over these countries, where their wretched descendant and the sole representative of their dynasty is compelled to drag on a dependent existence in a dilapidated palace, exposed to the contempt or receiving the sympathy of the different classes of society, both Europeans and Asiatics, who resort to Dehlee, with means utterly inadequate to support the dignity even of a nominal sovereignty or to afford a scanty subsistence to the numerous branches of his family who look to him as their only stay. But I will not resort to such a plea. I will condescend to accept, and your Majesty will disdain to confer, as a favour, that which is due as a right. I rest my cause on your Majesty's high-minded sense of honour and justice. I cannot permit myself to suppose that your Majesty will lend a deaf ear to my complaints I address by this letter not only to your Majesty but the world at large and I anticipate the plaudits which present and future ages will bestow on

your Majesty's benevolent and enlightened sympathy with the unworthy representative of the once great and illustrious, though now fallen, House of Taimur. To your Majesty what need I say more?

রামমোহন বাদশাহের পক্ষে উত্থাপিত যুক্তি ও তথ্যগুলির সমর্থনে প্রয়োজনীয় কিছু সরকারী চিঠিপত্র ও দলিলদস্তাবেজের কপি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে চাইলেন। বাদশাহ্ নিজেও ঐসব চিঠিপত্র ও দলিলদস্তাবেজের কপি সংগ্রহের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিব কর্তৃপক্ষ তাঁদের কোনভাবেই সাহায্য করতে স্বীকৃত হলেন না। এমনকি, গোড়া থেকেই রামমোহনকে দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধি ব'লে স্বীকৃতি দিতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁরা বাদশাহ্কে জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠালেন, বাদশাহ্ রামমোহনকে রাজা চতুর্থ জর্জের কাছে তাঁর পত্রবাহকরূপে ("the bearer of a letter of complaint to our Gracious Sovereign King George IV") নিয়োগ করেছেন কিনা, তখন বাদশাহ্ দৃঢ়তার সঙ্গেই স্বীকৃতি-সূচক উত্তর দিলেন। বাদশাহ্ রামমোহনকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃতি দেওয়ায় বড়লাট দিল্লীব বাদশাহের প্রেরিত আবেদনপত্রের এক কপি কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের কাছে পাঠালেন।

ইতিমধ্যে বাদশাহ্ রামমোহনকে তাঁর "এল্‌চি" বা রাজদূতেব উপযুক্ত পদমর্যাদা দানের জন্য তাঁকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করলেন। এইভাবে রামমোহন "রাজা রামমোহন" হলেন। বাদশাহ্ রামমোহনকে বিশেষ পাঞ্জা বা সীলমোহরও দিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দেব ৮ জানুয়ারি রামমোহন সপারিষদ গভর্নর-জেনারেলকে বাদশাহ্ কর্তৃক তাঁকে "রাজা" উপাধিদানের কথা জানালেন এবং কোম্পানি সরকারকে এই খেতাবকে স্বীকৃতিদানেব জন্য অনুরোধ করলেন।

কিন্তু কোম্পানি সরকার অবিলম্বে রামমোহনকে জানালেন যে, তাঁরা বাদশাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত ঐ খেতাবকে এবং গ্রেট বৃটেনের রাজসভায় দিল্লীর বাদশাহের দূতরূপে তাঁর নিয়োগকে স্বীকৃতি দিতে পারেন না।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ রামমোহনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তবু তিনি রামমোহনকে বাদশাহের রাজদূতরূপে স্বীকৃতি দিতে বা বাদশাহ্-প্রদত্ত উপাধিকে স্বীকার ক'রে নিতে চান নি, তার কারণ ছিল রাজনৈতিক। কোম্পানি সরকার এখন আর বাদশাহ্কে রাজমর্যাদা দিতে চাচ্ছিলেন না। সুতরাং তাঁর প্রতিনিধিকে রাজদূতরূপে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব ছিল না। বাদশাহের সার্বভৌম রাজমর্যাদা অস্বীকার করার ফলে তাঁর প্রদত্ত কোনও খেতাবকেও স্বীকৃতি দেওয়া অসম্ভব ছিল। রামমোহন নিজেও এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

তাই তিনি সাধারণ নাগরিকরূপেই ইংলণ্ডে যেতে মনঃস্থ করলেন। তবে তিনি স্পষ্টভাবেই সরকারকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি সাধারণ নাগরিকরূপে ইংলণ্ডে গেলেও তিনি সেখানে বাদশাহের দৌত্যকার্য করবেন এবং বাদশাহ্ যাতে ইংলণ্ডেশ্বরের কাছে সুবিচার পান, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। তিনি লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক্‌কে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ পত্রে লিখলেন :

> Having at length surmounted all the obstacles of a domestic nature that have hitherto opposed my long cherished intention of visiting England, I am now resolved to proceed to that land of liberty by one of the vessels that will sail in November, and from a due regard to the purport of the late Mr. Secretary Stirling's letter of 15th January last, and other considerations, I have determined not to appear there as the Envoy of His Majesty Akbar the Second, but as a private individual.
>
> I am satisfied that in thus divesting myself of all public character, my zealous services on behalf of His Majesty need not be abated. I even trust that their chance of success may be improved by being thus exempted from all jealousy of a political nature to which they might by mis-apprehension be subjected.

বাদশাহ্‌-ও এই ব্যবস্থাতেই সম্মত হলেন। কোম্পানি তাঁকে বাদশাহের দূতরূপে স্বীকৃতি না দিলেও রামমোহন প্রকৃতপক্ষে বাদশাহের দূতরূপেই ইংলণ্ডে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। বাদশাহ্ রামমোহনকে তাঁর দূতরূপে ইংলণ্ডে যাওয়ার জন্য সত্তর হাজার টাকা দিলেন। তিনি রামমোহনকে এই প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে, রামমোহন যদি বাদশাহের বার্ষিক বৃত্তি আট লক্ষ বৃদ্ধি করতে পারেন, তবে বাদশাহ্ রামমোহনকে এককালীন বারো লাখ টাকা পারিশ্রমিক এবং মাসিক পাঁচ হাজার টাকা ভাতা দেবেন। বার্ষিক বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি হ'লে পারিশ্রমিক ও মাসিক ভাতা বর্ধিত বৃত্তির অনুপাতেই হবে।

রামমোহন ইংলণ্ড গমনের জন্য সকল ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ করলেন। তিনি তাঁর সাংবাদিক বন্ধু মণ্টগোমারি মার্টিনকে তাঁর এই দৌত্যকার্যে সাহায্য করবার জন্য নিয়োগ করলেন।

কিন্তু রামমোহন কেবল বাদশাহের দৌত্যকার্যের জন্যই ইংলণ্ডে যাচ্ছিলেন না। অন্য কয়েকটি কারণেও ঐ সময়ে তাঁর ইংলণ্ড গমনের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল। লর্ড

উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক্ সতীদাহ নিবারণ ক'রে যে আইন পাস করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে সনাতনী হিন্দুদের দ্বারা সংগঠিত 'ধর্ম সভা' নামে সংস্থার উদ্যোগে ইংলণ্ডে প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করা হয়েছিল। প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহ সম্পর্কে আলোচনা-কালে রামমোহন স্বয়ং উপস্থিত থেকে ধর্মীয়, সামাজিক, মানবিক, সকল দিক থেকে সতীদাহের নৃশংসতার দিকটিকে বিচারকমণ্ডলীর সম্মুখে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

বিশ বছর পর পর কোম্পানিকে বৃটিশ সরকার নূতন ক'রে সনদ দিতেন। ঐ সনদে প্রদত্ত অধিকারবলেই কোম্পানি এদেশে রাজত্ব করতো। সনদে কেবল কোম্পানিকে শাসনাধিকারই দেওয়া হ'তো না, শাসন সংক্রান্ত নীতিও নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হ'তো। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত সনদের কাল উত্তীর্ণ হ'লে কোম্পানিকে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নূতন সনদ দেওয়ার কথা। ঐ নূতন সনদ সম্পর্কে বৃটিশ পার্লামেণ্টে আলোচনাও আসন্নপ্রায় হয়েছিল। যাতে নূতন সনদে ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষিত হয়, সেজন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টের বিশিষ্ট সদস্যদের প্রভাবান্বিত করাও ছিল রামমোহনের ইংলণ্ড যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য।

তখন ইংলণ্ডে সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও তা নামমাত্র গণতন্ত্র ছিল। কারণ, ভোটাধিকার অত্যন্ত সীমিত ছিল এবং অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নবজাত ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তাই ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবি ইংলণ্ডে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্য একটি শাসন-সংস্কার বিল (Reform Bill) পার্লামেণ্টে আসবার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। ইংলণ্ডে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'লে তাতে ভারতবর্ষেরও যে উপকার হবে, এ-বিষয়ে রামমোহনের কোনও সংশয় ছিল না। তাই ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্য ইংলণ্ডে যে আন্দোলন চলছিল, তার প্রতি রামমোহনের ছিল পরিপূর্ণ সমর্থন। ঐ আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্যও রামমোহনের ইংলণ্ড যাত্রার ইচ্ছা প্রবলতর হয়ে উঠেছিল।

রামমোহন ছিলেন চিরদিনই বিপ্লবী। ফরাসী বিপ্লবের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ সমর্থন ছিল, এই সমর্থনই তাঁকে নেপোলিয়নের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ক'রে তুলেছিল। নেপোলিয়নের পতনের পরে ফ্রান্সে পুনরায় বুরবোঁ-বংশীয় রাজাদের স্বৈরশাসন শুরু হয়েছিল। বিপ্লবীদের হাতে ফ্রান্সের যে বুরবোঁ-বংশীয় রাজা ষোড়শ লুইয়ের মৃত্যু হয়েছিল, এখন তাঁরই ভাই অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের রাজা হয়েছিলেন। এখন ফ্রান্সে রাজতন্ত্রীরা প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং গণতন্ত্রীদের উপর নির্যাতন চরমে পৌঁছেছিল। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা অষ্টাদশ লুইয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হ'লে বোনাপার্টপন্থী ও গণতন্ত্রীদের উপর অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পায়। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যু হ'লে তাঁর ভাই দশম চার্ল্‌স্ ফ্রান্সের রাজা হন। দশম চার্ল্‌স্

দেশ থেকে সকল প্রকার প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে সমূলে উৎপাটনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু ফ্রান্সের বিপ্লবী জনগণ এই স্বৈরাচার নীরবে সহ্য করলো না। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্যারিসে বিপ্লবীদের পুনরায় অভ্যুত্থান ঘটলো। বিপ্লবীরা দশম চার্লস্‌কে সিংহাসনচ্যুত ক'রে লুই ফিলিপকে সিংহাসনে বসালো। লুই ফিলিপ ছিলেন ফ্রান্সের বিখ্যাত রাজা চতুর্দশ লুইয়ের ভাই আর্লেয়াঁর ডিউকের বংশধর। লুই ফিলিপের বাবা লুই ফিলিপ আর্লেয়াঁ ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম সমর্থক ছিলেন এবং তিনি "সাম্য লুই ফিলিপ" (লুই ফিলিপ 'ইগালিতে'—Equality) নামে পরিচিত ছিলেন। সাম্য লুই ফিলিপের পুত্র লুই ফিলিপকে জনসাধারণ ফ্রান্সের সিংহাসনে বসালে ফ্রান্সে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব সার্থক হ'লো এবং ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেব প্রতিষ্ঠা ঘটলো।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্যারিসে যে বিপ্লব ঘটলো, তার আগুন ইউরোপেব বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়লো। রামমোহন ইউরোপে বিপ্লবের এই পুনরভ্যুত্থানেব সংবাদ পেয়ে ইউবোপ গমনের জন্য আবও অধীর হয়ে উঠলেন।

•

রামমোহন যখন ইউরোপ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন সনাতনী হিন্দুরা তাঁর বিরুদ্ধে আরও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সনাতনী হিন্দুরা রামমোহনের 'ব্রাহ্ম সভা'র অনুকরণে 'ধর্ম সভা' নামে যে সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল, শোভাবাজারেব রাজা রাধাকান্ত দেব এবং রামমোহনের এককালীন সহকারী সাংবাদিক ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির মতো ব্যক্তিরা ছিলেন তার পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক। এই সময়ে হিন্দু সমাজ প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তার একটি সুন্দর চিত্র শিবনাথ শাস্ত্রী তার ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছেন :

সাধারণ মানুষ এই মহা সংঘর্ষে অংশ নিয়েছিল। সংস্কারকদের নিবন্ধাবলীর অধিকাংশ সহজ সরল বাংলাভাষায় লিখিত হওয়ায় সেগুলি শিক্ষিত ব্যক্তিদের মতোই সাধারণ মানুষের মনেও রেখাপাত করেছিল। তাই নদীতীরে স্নানের ঘাটগুলিতে, হাটে-বাজারে, বেড়াবার মাঠে ও বাগানে, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বৈঠকখানায়, সর্বত্রই দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা আলাপ-আলোচনা ও গাল-গল্পের বস্তু হয়ে উঠলো। মহান্‌ সংস্কারকের নীতিগুলিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ক'রে মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ কবিতা ও ছড়াগান রচিত হ'লো ; সেগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো। এইভাবে রাস্তাঘাট হাসিঠাট্টায় মুখর হয়ে উঠলো। আন্দোলন কলকাতা থেকে

মফস্বলেও প্রবেশ করলো। সর্বত্রই দুই দলের মধ্যে আলোচনা, তর্কবিতর্ক, বাগবিতণ্ডা চললো। বহু ব্রাহ্মণকে যাঁরা ব্রাহ্ম সভার সদস্যদের কাছ থেকে উপহার নিয়েছিলেন, তাঁদের একদল সমাজচ্যুত ক'রে দিলো, ফলে রামমোহনের ধনী অনুরাগীদের ওপর তাঁদের সমর্থন ও সাহায্য করবার গুরু দায়িত্ব এসে পড়লো। তাঁরা সানন্দেই তা বহন করতে লাগলেন।

কিন্তু রামমোহনের বিরোধীরা রামমোহন সম্পর্কে নানা কুৎসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ প্রচার ক'রেই ক্ষান্ত হ'লো না। 'ধর্ম সভা'-র উদ্যোগে সনাতনী হিন্দুরা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিল। তারা প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহ নিরোধক আইনের বিরুদ্ধে আপীল করেছিল। রামমোহন নিজে ইংলণ্ড যাচ্ছেন শুনে তারা ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। তারা রামমোহনের প্রাণনাশের জন্য ভাড়াটে গুণ্ডা পর্যন্ত নিয়োগ করলো।

তাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা রামমোহন জানতে পারলেন। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে এই ষড়যন্ত্রের কথা তাঁর সাংবাদিক বন্ধু মিঃ মার্টিনকে জানালেন। মিঃ মার্টিন রামমোহনের জীবন-রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করলেন। তিনি নিজে রামমোহনের বাড়ীতে এসে থাকলেন এবং পরেবাটে আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রামমোহনের সঙ্গী হলেন। রামমোহনকে হত্যার জন্য তাঁর উপর দুবার আক্রমণ হয়েছিল ব'লে জানা যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "ব্রহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" নিবন্ধে অবশ্য রামমোহনের উপর একবার আক্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন।

ঐ সময়ে, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'জন বুল' পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ থেকে রামমোহনের উপর আক্রমণ ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়। এই বিবরণটি অতিরঞ্জিত ও ব্যঙ্গাত্মক হ'লেও এর মধ্যে কিছুটা সত্য যে নিহিত আছে, তা নিঃসন্দেহ। বিবরণে বলা হয়েছে :

> On or about 2nd January, a new danger assailed the envoy (Rammohun Roy) and the presence of Mr. Martin at the house of Rammohun Roy became necessary, to protect him from assassination. . . . . Mr. Martin proposed to occupy the spare rooms of his house and to arm the household in his defence. . . . Fire arms, gunpowder, and daggers were immediately procured and burkendauzes were employed to gaurd the premises. Mr. Martin, it appears, procured a double-barrelled gun, a single-barrelled gun, three pair of pistols, a sabre and three sword-sticks etc. The burkendauzes were duly exercised in firing and one was armed with a kind of battle-axe, and thus the whole garrison was equipped and

ready for defence. When the envoy (Rammohun) during these perilous days, came into the town, Mr Martin accompanied him armed at his special desire with a brace of pistols and a sword-stick, Rammohun himself having a naval dagger in his pocket, and a sword-stick in his hand, and his attendants also well-armed . . . . the anti-Suttee-abolitionists were the dreaded enemies ; and the cause of their enmity, the part that the envoy had taken in obtaining from government the suppression of this most cruel and horrid custom.

সনাতনী হিন্দুরা রামমোহনের জীবননাশের জন্যই লোক নিযুক্ত করে নি। তাঁর প্রতিটি কার্য, প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করবার জন্য—হিন্দু সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি-বিরোধী কোন কাজ তিনি করেন কি না, তা দেখবার জন্য—গোয়েন্দা দলও নিয়োগ করেছিল। তারা তাঁর বাড়ীর দেওয়ালে গোপনে ফুটো ক'রে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে বাড়ীর ভেতরের কার্যকলাপ লক্ষ্য করতো—যাতে তাঁর ব্যবহারে ও জীবনযাত্রায় অহিন্দু কিছু ধরতে পারে। তাতে রামমোহনকে সমাজচ্যুত করা সহজ হবে। কিন্তু রামমোহন হিন্দু সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির অনেক কিছুকেই বিশ্বাস না করলেও সেগুলিকে তিনি কঠোরভাবেই মেনে চলতেন।

ঐ সময়ে সনাতনী হিন্দুদের কাছে সমুদ্রযাত্রাও ছিল ধর্মবিরোধী। রামমোহন কিন্তু অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের মতোই এই কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিলেন না। একদিন যে ভারতবর্ষ সমুদ্রযাত্রায় পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের সমকক্ষ ছিল, যার বাণিজ্যপোত ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে অবলীলায় পাড়ি দিতো, আজ সেই ভারতবর্ষের হিন্দুদের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ও অধর্মীয়, তা রামমোহনকে মানাবে কে? কিন্তু রামমোহনের কালে এই কাজ যে অত্যন্ত দুঃসাহসিক ছিল, তা সহজেই বলা যায়। রামমোহনের বহু পরেও হিন্দুদের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা করলে বিনা প্রায়শ্চিত্তে হিন্দু সমাজে তার স্থান হ'তো না। সম্ভবতঃ রামমোহনই ছিলেন একালের সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ যিনি সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন। রামমোহনের এই সমুদ্রযাত্রা তাই কেবল ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়, সারা প্রাচ্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই সমুদ্রযাত্রাই ইউরোপের সঙ্গে ভারতের পূর্ণ সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সেতু রচনা করেছিল। রামমোহনের পরে তাঁর অনুগামী অনেকে, এবং আরও পরে শিক্ষিত ভারতবাসীরা অনেকে, ইউরোপে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের পরে জাপান ও চীন এবং জাপান ও চীনের পরে এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিও ইউরোপের পথে ধাবমান হয়েছিল। এইভাবে রামমোহনই সমুদ্রযাত্রা ক'রে প্রাচ্যের কাছে প্রতীচ্যের তোরণ-দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন।

রামমোহনের ইউরোপ যাত্রা তাই ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। ইতিপূর্বে ইউরোপ থেকে বহু লোক, বহু ব্যবসায়ী, বহু পণ্ডিত, বহু ধর্মপ্রচারক প্রাচ্যে এসেছিলেন। এখন থেকে ভারতবর্ষ তথা এশিয়া থেকে দলে দলে লোকে ইউরোপে যেতে লাগলেন এবং ইউরোপীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরি-বিদ্যা, শিল্প-সাহিত্য এদেশে তথা এই সমগ্র মহাদেশে আনতে শুরু করেছিলেন। তাই রামমোহনের সমুদ্রযাত্রা কেবল প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনের নয়, সমগ্র মানবজাতির মিলনের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছিল। ভারতবর্ষের 'নেটিভ' ও এশীয়দের সম্পর্কে ইউরোপে যে ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল, রামমোহনের ইউরোপ যাত্রা সেই ভ্রান্ত ধারণা নিরসনেও বহুল পরিমাণে সহায়ক হয়েছিল।

'জন বুল' পত্রিকার বিবরণ থেকে জানা যায়, রামমোহন ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট-সেপ্টেম্বরেই কটক, মাদ্রাজ ও বোম্বাই হয়ে ইংলণ্ড রওনা হবেন স্থির করেছিলেন। কিন্তু নানা কারণেই ঐ সময়ে তাঁর ইংলণ্ড যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়েছিল। কিন্তু ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ইংলণ্ড যাত্রার পথে দুস্তর কোনও বাধা ছিল না। ঐ সময়ে ইংলণ্ড যাত্রার জন্য নানা কারণেই তাঁব উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই কারণগুলি সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। পরে তিনি এলাহাবাদের পথে রণজিৎ সিংহ-শাসিত স্বাধীন শিখ রাজ্য অতিক্রম ক'রে ইংলণ্ড যাত্রা করবেন স্থির করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের নিয়োজিত গুপ্তঘাতকের ভীতি তাঁকে এই সিদ্ধান্ত ত্যাগ করতে বাধ্য করলো। তারপর তিনি কলকাতা থেকেই ইংলণ্ড রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। এই বিবরণ কতখানি নির্ভুল, তা বলা কঠিন। যাই হ'ক, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর তিনি "অ্যাল্‌বিয়ন" জাহাজে ক'রে ইংলণ্ড যাত্রা করলেন। ইংলণ্ডের কাব্যিক নাম "অ্যাল্‌বিয়ন"। সুতরাং জাহাজের নামটিও যে তাঁর খুবই মনঃপূত হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

বিলাত যাত্রাকালে তিনি তাঁর জীবিতা কনিষ্ঠা পত্নী ও দুই পুত্রের কাছে বিদায় নিয়ে যান। তাঁর আত্মীয়রা, বিশেষতঃ ভ্রাতুষ্পুত্রেরা যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, তিনি তাদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ না হওয়ার জন্য পুত্রদের বিশেষভাবে উপদেশ দেন। তিনি তাঁর প্রবাসের প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য মানিকতলার প্রিয় ভবনটিও বিক্রয় ক'রে দেন।

সমুদ্রযাত্রাকালেও তিনি হিন্দু ধর্মের রীতিনীতিগুলি যথাসম্ভব রক্ষা ক'রে চলেন। তিনি জাহাজে পৃথকভাবে তাঁর রান্না-বান্না ও পরিচর্যার জন্য দুজন হিন্দুকে সঙ্গে নিয়ে যান। একজন—ভৃত্য রামহরি দাস, অন্যজন পাচক রামরতন মুখোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে দুগ্ধের জন্য জাহাজে নেন দুটি গরু। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

রামমোহন একজন মুসলমান ভৃত্যও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার নাম শেখ বক্স্। এ ছাড়া রামমোহন সঙ্গে নিয়েছিলেন তাঁর আশ্রিত প্রায় দ্বাদশ বছর বয়স্ক এক বালক রাজারাম বা রাম রায়কে।

এই বালক কে ছিল, তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। রামমোহনের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কর্দম লেপনের চেষ্টাও হয়েছে অনেক। মিস্ কোলেট তাঁর জীবনীতে পত্রলেখক জনৈক আর. ডি. এচ.-এর (সম্ভবতঃ রাখালদাস হালদার) বিবরণীর উল্লেখ ক'রে লিখেছেন যে, রামমোহনের মৃত্যুর ত্রিশ বছর পরে রামমোহনের জনৈক শিষ্য—চন্দ্রশেখর দেব—বর্ধমানে রাজারাম সম্পর্কে পত্রলেখককে বলেছেন যে, এইরকম জনরব প্রচলিত ছিল যে, একসময় রামমোহনের এক মুসলমানী রক্ষিতা ছিল, রাজারাম তারই গর্ভজাত রামমোহনের পুত্র। এইরকম প্রচলিত জনরবের উল্লেখ করলেও তিনি নিজে বলেছিলেন যে, রাজারাম ছিল এক সাহেবের দারোয়ানের পিতৃমাতৃহীন পুত্র, রামমোহন তাকে পালন করেছিলেন।

রামমোহনের মৃত্যুর ত্রিশ বছর পরে এই ধরনের কুৎসিত ইঙ্গিত সর্বপ্রথম করা হয়। কিন্তু এর স্বপক্ষে কণামাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় নি। চন্দ্রশেখর দেব একদা রামমোহনের অনুগত শিষ্য থাকলেও, তাঁর এই আনুগত্য শেষ পযন্ত অক্ষুন্ন ছিল না। তাই রামমোহনের শত্রুরা যেসব মিথ্যা কুৎসা প্রচার করতো, তা উচ্চারণ করতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। সনাতনী হিন্দুরা, যারা তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করতেও পশ্চাদ্‌পদ হয় নি, তারা যে তাঁর চরিত্রহননের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেবে, তাতে সন্দেহের বা বিস্ময়ের কি আছে! কিন্তু সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, ইউরোপীয় মিশনারিরা, সকলেই তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উল্লেখ ক'রে গেছেন। এমন কি যে ট্রিনিটারিয়ান পাদরিদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল, তাঁরাও রামমোহনের চরিত্র সম্পর্কে কণামাত্র হীন ইঙ্গিত করেন নি। সুতরাং এই কুৎসা যে সনাতনী হিন্দুদের পক্ষ থেকে রামমোহনের নির্মল চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টা মাত্র ছিল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

রামমোহনের বন্ধু ডঃ ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার রাজারাম সম্পর্কে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুসন্ধান ক'রে যা জেনেছিলেন, তা তাঁর কন্যা মেরী কার্পেণ্টারের Last Days in England of Raja Rammohun Roy গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। তাতে ল্যাণ্ট কার্পেণ্টারকে তাঁর পত্রলেখক জানিয়েছিলেন, বালক রাজারাম রামমোহনের পুত্র বা দত্তকপুত্র কিছুই ছিল না। এই অনাথা বালককে ঘটনাচক্রে রামমোহন আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তাকে সস্নেহে পালন করেছিলেন। মিঃ ডিক নামে কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হরিদ্বারের এক মেলায় একটি শিশুকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। ঐ

শিশুর পিতা হিন্দু বা মুসলমান ছিল মিঃ ডিক তা জানতে পারেন নি। শিশুটি মেলায় হারিয়ে গিয়েছিল কিংবা তার পিতামাতা তাকে ইচ্ছা ক'রে ফেলে গিয়েছিল, তা-ও তিনি জানতে পারেন নি। তিনি শিশুটিকে দয়াপরবশ হয়ে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দেন এবং তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন। মিঃ ডিক যখন স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশে ইংলণ্ডে যান, তখন তিনি এই অনাথ শিশুটিকে নিয়ে কি করবেন এই সমস্যায় পড়লেন। তিনি এ-বিষয়ে রামমোহনের পরামর্শ চাইলে রামমোহন ব'লে ওঠেন, "আমি যখন দেখছি যে একজন ইংরেজ খ্রীষ্টান আমার দেশের এক অনাথ শিশুকে এইভাবে যত্ন করছেন, আমি তখন একজন ভারতবাসী হয়ে কি তার যত্ন ও ব্যবস্থা করতে পারি না?" রামমোহন শিশুটিকে স্বগৃহে নিয়ে আসেন এবং পিতৃস্নেহে পালন করতে থাকেন।

ডঃ কার্পেণ্টার-প্রদত্ত এই সুনির্দিষ্ট বিবরণকে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। রাজারাম সত্যই যদি কোনও মুসলমানীর গর্ভজাত সন্তান হ'তো, তবে তাকে স্বগৃহে সস্নেহে পালনের অপরাধে সনাতনী হিন্দু সমাজ নিশ্চয় রামমোহনকে জাতিচ্যুত করতো। রামমোহন তাকে এমন নিঃসঙ্কোচে স্বগৃহে পালন করতে বা সঙ্গে নিয়ে ইংলণ্ড ভ্রমণে যেতে সাহস পেতেন না। সুতরাং রামমোহনের চরিত্রহননের এই চেষ্টা এক শ্রেণীর লোকে করলেও কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তাতে বিশ্বাস করেন নি।

রাজারাম যে মুসলমান ছিলেন, তা প্রমাণের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও চেষ্টা করেছেন। তিনি জাহাজে রামমোহনের সঙ্গীদের নামের তালিকা পরীক্ষা ক'রে দেখে তাতে রাজারামের নাম পান নি। তাই তিনি বলেছেন, রামমোহনের সঙ্গীদের তালিকায় যে শেখ বক্‌সুর নাম আছে, সেই শেখ বক্‌সু ও রাজারাম অভিন্ন ব্যক্তি। সুতরাং রাজারাম মুসলমান ছিলেন। আপাতঃদৃষ্টিতে তাঁর এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে হ'তে পারে। কিন্তু ডঃ জে. কে. মজুমদার শেখ বক্‌সুর প্রত্যাবর্তনের একটি সার্টিফিকেট আবিষ্কার করেছেন। ঐ সার্টিফিকেট দিয়েছেন "জেনোবিয়া" জাহাজের ক্যাপ্‌টেন ডাব্‌লিউ. আওয়েন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে বা ঐ তারিখের আগে 'জেনোবিয়া' জাহাজে শেখ বক্‌সু লণ্ডন থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছিল। ক্যাপ্‌টেন আওয়েন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি ঐ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। অন্যপক্ষে, রামমোহনের মৃত্যুকালেও (২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩) রাজারাম রামমোহনের কাছে ছিলেন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, রামমোহনের মৃত্যুর পরও কয়েক বছর রাজারাম ইংলণ্ডে ছিলেন এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে "জাভা" জাহাজে চ'ড়ে ভারতে এসেছিলেন। ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসার পর রাজারাম সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। ইংলণ্ডে থাকাকালে তিনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের অধীনে অতিরিক্ত কেরানীর কাজ করতেন। ঐ পদে তিনি তিন বছর

ছিলেন। ভারতে ফিরে আসার পর তিনি সরকারের সিক্রেট অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টে মাসিক দু শ টাকা বেতনে চাকরি করতেন। কিছুদিন ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন, তারপর সম্ভবতঃ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবতঃ অল্প-বয়সেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। সুতরাং রাজারাম ও শেখ বক্সু যে ভিন্ন ব্যক্তি, তাতে সন্দেহ নেই।

রাজারামকে রামমোহন পুত্রস্নেহেই পালন করেছিলেন। তাঁকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করবার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত তিনি নিজে না জানায় তাঁকে এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজের হিংস্র বিবরে নিঃসহায় ফেলে যেতে পারেন নি। তাই তিনি তাঁকে নিজের সঙ্গেই সর্বদা রাখতেন।

তাছাড়া আমাদের মনে হয়, রাজারামের জন্মবৃত্তান্ত অজ্ঞাত থাকায় তাঁর প্রতি রামমোহনের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। রাজারাম না ছিলেন হিন্দু, না ছিলেন মুসলমান, না ছিলেন খ্রীষ্টান—ছিলেন জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষ। তিনি ছিলেন রাম-মোহনের কাছে জাতি ও ধর্মের গণ্ডিতে বিভক্ত এই যুধ্যমান মানব-সমাজের ঊর্ধ্বে এক অখণ্ড মানবতার প্রতীক—যে অখণ্ড মানবতাই ছিল রামমোহনের জীবনের আদর্শ।

যাই হ'ক, রামমোহন তাঁর হিন্দুত্ব পূর্ণ বজায় রেখে ইংলণ্ড যাত্রা করলেন। জাহাজে তাঁর দিনগুলি সাধারণতঃ কিভাবে কাটতো, তার একটি সুন্দর চিত্র তাঁর সহযাত্রী ও বন্ধু জেম্‌স সাদারল্যাণ্ড রেখে গেছেন। তিনি লিখেছেন:

> জাহাজে রামমোহন রায় তাঁর নিজের কেবিনে ব'সে আহার করতেন; গোড়ার দিকে জাহাজে একটিমাত্র চুল্লি থাকায় উনুনের অভাবে তাঁর বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। তাঁর ভৃত্যরা সমুদ্রপীড়ায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল। (এই রোগ তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নি, যেন তাঁর অত্যুৎসাহই এই রোগের বিরুদ্ধে তাঁকে শক্ত রেখেছিল।) সমুদ্রপীড়ায় কাতর তাঁর ভৃত্যরা সকলেই তাঁর কেবিনে এসে আশ্রয় নিয়েছিল; তারা সেখান থেকে মুহূর্তের জন্যও নড়তো না। সহজেই অনুমান করা যায়, এই অবস্থায় কেবিনটা তাঁর পক্ষে কতখানি বাসোপযোগী ছিল। প্রকৃতপক্ষে, তারা তাঁকে কেবিনের এক কোণে বাক্স-পেঁটরার উপর আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর স্বাভাবিক করুণা তাঁর ভৃত্যদের কেবিন থেকে সরাতে দিতে চাইতো না। দিনের অধিকাংশ সময় তিনি পড়াশুনা করতেন, আমার মনে হয়, সংস্কৃত ও হিব্রু বই। সকালে ও সন্ধ্যায় তিনি জাহাজের ডেকে ঘুরে বেড়াতেন এবং প্রায়ই উৎসাহের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় মেতে উঠতেন। দিনের প্রধান আহারের পর···তিনি কেবিনের বাইরে আসতেন এবং আলাপ-আলোচনায় যোগ দিতেন ও এক গেলাস মদ খেতেন। তিনি সর্বদাই প্রফুল্ল

থাকতেন এবং জাহাজের সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। কে তাঁর কতখানি যত্ন-আত্তি করবে, তা নিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হ'য়ে যেতো। এমনকি জাহাজের মাঝী-মাল্লারাও তাঁর সামান্য কাজে আসবার জন্য সর্বদা চেষ্টা পেতো।... তাঁর প্রশান্ত ভাবটি ছিল সত্যই বিস্ময়কর। একাধিকবার তাঁর কেবিনের সব-কিছুই সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাতে জলে ভেসে গেছে, কিন্তু তাতেও তাঁর সৌম্য প্রসন্নতাটুকু বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। কেবল একটিমাত্র জিনিসে তাঁর মেজাজের প্রশান্তি ও প্রসন্নতা বিঘ্নিত হ'তো। সেটি হ'লো প্রতিকূল বায়ু। কারণ, তাতে জাহাজের যেতে দেরি হবে এবং কোম্পানির সনদ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হওয়ার আগে তিনি ইংলণ্ডে পৌঁছতে পারবেন না, তাঁর এই ভয়।

ঐ সময়েও সুয়েজ খাল কাটা হয় নি। তাই ইংলণ্ডগামী জাহাজগুলিকে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে যেতে হ'তো। জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপে এসে পৌঁছলে রামমোহন দুয়েক ঘণ্টার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ভূমিতে নেমেছিলেন। কিন্তু জাহাজে ফিরে আসার সময়েই একটি বিশ্রী দুর্ঘটনায় পড়েন। সিঁড়িটি ঠিক না থাকায় তিনি পড়ে যান এবং গুরুতররূপে আহত হন। এই পতনের ফলে তাঁকে দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকতে হয়, এবং পরেও প্রায় দেড় বছর তাঁকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই আঘাত থেকে তিনি জীবনে কোনদিনই সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি।

সাদারল্যাণ্ড লিখেছেন :

কিন্তু কোনও দৈহিক যন্ত্রণাই তাঁব মানসিক শক্তি ও উদ্যমকে দমিত করতে পারে নি। ঐ সময়ে দুটি ফরাসী যুদ্ধজাহাজ টেব্‌ল্ উপসাগরে বিপ্লবের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়িয়ে নোঙর ক'রে ছিল। তিনি তখনও চলচ্ছক্তিহীন ছিলেন, তবু ঐ জাহাজে একবার যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বিপ্লবের ঐ পতাকা দেখে তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনার বহ্নিশিখা যেন প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল, এবং দৈহিক জ্বালা-যন্ত্রণার কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছিলেন।...ফরাসী জাহাজে তাঁর অভ্যর্থনা অবশ্য ফরাসীদের ও তাঁর চরিত্রের উপযুক্তই হয়েছিল। তাঁকে জাহাজগুলির উপর দিয়ে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হ'তে লাগলো ; তিনি দোভাষীর সাহায্যে বোঝাতে চাইলেন যে, ঐ জাহাজগুলিতে যে পতাকা উড়ছে, তার তলায় দাঁড়াতে তাঁর কী গভীর আনন্দই না হচ্ছে—কারণ, ঐ পতাকাগুলি শক্তির বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয়ের প্রতীক! এবং তিনি যখন জাহাজগুলি ত্যাগ ক'রে এলেন, তখন উচ্চকণ্ঠে বার বার বলতে লাগলেন, "জয়, জয়, জয়, ফ্রান্সের জয়!"

জাহাজ যতোই ইংলণ্ডের কাছাকাছি এলো, ইংলণ্ডে এখন কি ঘটছে, তা জানবার জন্য তাঁর আগ্রহ ততোই তীব্র হয়ে উঠলো। ইংলণ্ড থেকে যেসব জাহাজ আসছে, তাদের কাছ থেকে সংবাদ নেওয়ার জন্য তিনি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। অবশেষে বিষুবরেখার কাছে আমাদের সঙ্গে একটি জাহাজের দেখা হ'লো। ঐ জাহাজ আমাদের কিছু সংবাদপত্র দিলো। ঐ সংবাদপত্রে ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের সংবাদ ছিল।[১] ঐ সংবাদে রামমোহনের যে আনন্দের সীমা ছিল না, তা সহজেই অনুমেয়। আমরা কয়েকদিন ঐ ব্যাপারটি ছাড়া আর অন্য কিছুই আলাপ করলাম না। ঐ ঘটনাটি ভারতের ভাগ্যে সুফলপ্রসূ হ'তে পারে মনে ক'রে ঐটিকে তিনি একপ্রকার জয় ব'লেই মনে করছিলেন। আমরা যখন ইংলিশ চ্যানেল থেকে মাত্র কয়েকদিনের পথ দূরে ছিলাম, তখন ইংলণ্ড থেকে চারদিন আগে রওনা হয়েছে এমন একটি জাহাজের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'লো। ঐ জাহাজ আমাদের খবর দিলো যে, হাউস্ অব কমন্সে টোরি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও রিফর্ম বিলের দ্বিতীয় রীডিং[২] অসাধারণ এক ঘটনাচক্রে মাত্র এক ভোটে পাস হয়েছে। রামমোহন আবার রিফর্ম বিল পাস হওয়ার সম্ভাবনায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন।...কয়েকদিন পরে, আমাদের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটময় মুহূর্তে রামমোহন ইংলণ্ডে পদার্পণ করলেন।

রামমোহন জাহাজে চার মাস অতিবাহিত ক'রে অবশেষে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল ইংলণ্ডের মাটিতে—লিভারপুলে—পদার্পণ করেন।

ইংলণ্ডে পদার্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ উইলিয়ম র‍্যাথবোন তাকে তাঁর গ্রীন ব্যাঙ্কের ভবনে থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। রামমোহন স্বাধীনভাবে থাকাই অধিকতর পছন্দ করায় তিনি র‍্যাড্‌লিজ হোটেলে উঠলেন। এইভাবে ইংলণ্ডে তাঁর প্রবাস-জীবন শুরু হ'লো।

১ রক্ষণশীল টোরি দলের ডিউক অব ওয়েলিংটনের স্থলে হুইগ দলের লর্ড গ্রে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

২ প্রকৃতপক্ষে প্রথম রীডিং। দ্বিতীয় রীডিংয়ে হুইগ দলের পরাজয় হয় এবং গ্রে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

১৩

প্রবাসে

রামমোহন যখন ইংলণ্ডে পদার্পণ করেছিলেন, তখন এক নূতন ইংলণ্ডের জন্মলাভ ঘটছে। যে রাজা চতুর্থ জর্জের কাছে রামমোহন বাদশাহের আবেদন পাঠিয়েছিলেন, কিছুদিন পূর্বে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর স্থলে রাজা হয়েছেন চতুর্থ উইলিয়ম। চতুর্থ জর্জের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডে যে সাধারণ নির্বাচন হয়, তাতে পার্লামেণ্টের সংস্কারসাধনের প্রশ্নটিই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডে অভিজাততন্ত্রই প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ দূরের কথা, নবজাত বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত ছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্যারিসে বিপ্লবের যে পুনরভ্যুত্থান ঘটেছিল, তার তরঙ্গাঘাত ইউরোপের অন্যান্য বহু দেশের মতোই ইংলণ্ডের জনমানসেও প্রতিফলিত হয়েছিল। জনসাধারণ তাই রাজনৈতিক অধিকার, অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব ও ভোটাধিকার, লাভের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। এদের নেতৃত্ব করছিল ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। হুইগ দল ক্ষমতাসীন টোরি দলকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য জনসাধারণের এই দাবিকে নির্বাচনে নিজেদের সমর্থনে লাগিয়েছিল, যদিও হুইগ দলও প্রকৃতপক্ষে অভিজাতদেরই অন্যতম রাজনৈতিক সংস্থা ছিল। তাই হুইগ দল ধনিক ও মধ্যবিত্তকে ক্ষমতার অধিকারী করতে রাজী হ'লেও দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক অধিকার লাভের ব্যাপারে অনিচ্ছুক ছিল।

রাজা চতুর্থ জর্জের মৃত্যুর পর যে সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল, তাতে পূর্বের মতোই টোরি দল আবার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এবার তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সামান্যমাত্রই ছিল। টোরি দলের মধ্যে মতবিরোধের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ডিউক অব ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে গঠিত টোরি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। এই মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের সংবাদই রামমোহন জাহাজে পেয়েছিলেন। তখন লর্ড গ্রে-র নেতৃত্বে হুইগ দলের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১ মার্চ হুইগ দলের রাসেল হাউস্ অব কমন্সে বিখ্যাত রিফর্ম বিল উত্থাপন করেন। এই বিলে কুখ্যাত বরোগুলি ভেঙে দেওয়ার এবং অন্যান্য নির্বাচনক্ষেত্রের প্রতিনিধির সংখ্যা হ্রাস করবার প্রস্তাব ছিল। ঐসব শূন্য সদস্য-পদ এখন ম্যাঞ্চেস্টার, বার্মিংহাম ও অন্যান্য বড় বড় শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বণ্টন ক'রে নবজাত ধনিক শ্রেণী ও মধ্যবিত্তকে রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার করবার প্রস্তাব ছিল। জনসাধারণকে রাজনৈতিক ক্ষমতাদানের কোনও ইচ্ছা বা

প্রস্তাব হুইগ দলের ছিল না। ভোটদানের যোগ্যতার জন্য প্রয়োজন ছিল নির্দিষ্ট কর ও রাজস্ব দানের পরিমাণ। সুতরাং এই রিফর্ম বিল পাস হ'লেও যে ইংলণ্ডে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'তো, এমন নয়। তবু এই বিল ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে পদক্ষেপ। তাই এই বিলের সমর্থনে দেশের জনসাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনা বিপুলভাবে দেখা দিয়েছিল। রামমোহনের প্রগতিশীল মন ও গণতান্ত্রিক চেতনা এই উৎসাহ-উদ্দীপনায় স্বাভাবিক-ভাবেই সাড়া দিয়েছিল এবং রিফর্ম বিলের জয়-পরাজয় তাঁর কাছে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠতা ও অপকৃষ্টতা বিচারের মানদণ্ড হয়ে উঠেছিল। তিনি এমন কথাও প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে, যদি পার্লামেণ্টে রিফর্ম বিল পাস না হয়, তবে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে পৃথিবীর কোনও গণতান্ত্রিক দেশে গিয়ে বাস করবেন। এমনই ছিল তাঁর বিপ্লবী মন, এমনই ছিল তাঁর গণতান্ত্রিক চেতনা।

রিফর্ম বিলে জনসাধারণকে ভোটাধিকার দেওয়া না হ'লেও, কেবলমাত্র ধনী ও মধ্যবিত্তদের ভোটাধিকাব দেওয়ার প্রস্তাব থাকলেও, টোরিদের কাছে তা অভিজাত-শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল্য ছিল। তাই টোরিরা রিফর্ম বিলের বিরোধিতা করতে লাগলেন পদে পদে। বিলটি প্রথম রীডিংয়ে মাত্র একভোটে গৃহীত হ'লো। এই সংবাদই রামমোহন জাহাজে পেয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় রীডিংয়ে বিলটি অগ্রাহ্য হ'য়ে গেল। ফলে, হুইগ দল পদত্যাগ কবলো এবং পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লো। এই নির্বাচনে হুইগ দলেব সদস্য সংখ্যা হাউস্ অব কমন্সে বৃদ্ধি পেলো। এখন হুইগ দল হাউস অব কমন্সে দ্বিতীয় রিফর্ম বিল উত্থাপন কবলো এবং সংখ্যাধিক্যে বিলটি হাউস্ অব কমন্সে গৃহীত হ'লো। কিন্তু হাউস্ অব লর্ড্সে টোরি দলের বিপুল সংখ্যাধিক্য থাকায় হাউস্ অব লর্ড্স্ বিলটিকে অগ্রাহ্য কবলো। দেশে পুনরায় প্রবল উত্তেজনা দেখা দিলো—সারা দেশ যেন গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো।

ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের এমনি এক সঙ্কটময় মুহূর্তে বামমোহন ইংলণ্ডের ভূমিতে পদার্পণ করেছিলেন। এই সঙ্কটময় মুহূর্ত ছিল প্রকৃতপক্ষে নূতন ইংলণ্ডের জন্মলগ্ন।

কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও নূতন ইংলণ্ডের জন্ম হচ্ছিল। দেশের শিল্পায়নকে পূর্ণতাদানের জন্য প্রয়োজন ছিল পরিবহণ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর ডিউক অব ওয়েলিংটন তাঁর প্রথমবার পদত্যাগের প্রাক্কালে লিভারপুল থেকে মাঞ্চেস্টার পযন্ত বিস্তৃত ইংলণ্ডের প্রথম রেলপথের উদ্বোধন করলেন। ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রেও এ ছিল এক যুগান্ত-কারী ঘটনা। এই রেলপথ প্রতিষ্ঠার আট মাস পরেই রামমোহন লিভারপুলেই ইংলণ্ডের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করলেন। মিস্ কোলেট ঠিকই বলেছেন:

He was here, in a word, when the New England was being born out of the heart of Old England,—the England of democracy, of social and industrial reform, of Anglican revival, and of Imperial policy tempered by Nonconformist Conscience. And at that decisive era, he was present as the noble and precocious type of the New India which has been growing up under British rule.

রামমোহন ইংলণ্ডের মাটিতে পদার্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ইংলণ্ডের জনসাধারণের একজন হয়ে গেলেন, ইংলণ্ডের অধিবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ-উত্তেজনা তাঁকে মুহূর্তে সংক্রামিত করলো। জেম্‌স্‌ সাদারল্যাণ্ড তাঁর বিবরণীতে (১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত তাঁর নিবন্ধে) লিখেছেন :

The effect of this contagious enthusiasm of a whole people in favour of a grand political change upon such a mind as his was of course electrifying, and he caught up the tone of the new society in which he found himself with so much ardour that at one time I had fears that this fever of excitement . . . would prove too much for him.

রামমোহন লিভারপুলে নামার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়াম রস্‌কো বহুদিন শয্যাশায়ী ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি মৃত্যুশয্যাতেই ছিলেন। তিনি রামমোহনের আগমনবার্তা পেয়ে তাঁর দুই পুত্রকে রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পাঠালেন। রস্‌কো পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন নি। তিনি পুত্রদের হাতে রামমোহনের কাছে সাক্ষাতের জন্য সাদর আমন্ত্রণ পাঠালেন। রামমোহন রস্‌কোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে রস্‌কো তাঁকে তাঁর রোগশয্যায় থেকেই অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁদের মধ্যে বহুক্ষণ ধ'রে হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ হ'লো। আলাপকালে রসকোর এক পুত্র উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই স্মরণীয় সাক্ষাৎকার সম্পর্কে লিখে গেছেন যে, রামমোহন ভাবোদ্দীপ্ত মুখে ও অশ্রুসিক্ত চোখে রস্‌কোর কাছে বিদায় নিলেন। রস্‌কোর পুত্র লিখেছেন :

The interview will never be forgotten. . . . After the usual gesture of Eastern salutation, Rammohun said: 'Happy and proud am I, proud and happy, to behold a man whose fame has extended not only over Europe but over every part of the world.' 'I bless God,' replied Mr. Roscoe, 'that I have been permitted to live to see this day.'

রামমোহন সাক্ষাৎকার ও আমন্ত্রণরক্ষায় এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি তাঁর বিন্দুমাত্র বিশ্রাম রইলো না। অনেক সময় একই সন্ধ্যায় তাঁকে ছ-সাতটি আমন্ত্রণ রক্ষা করতে হ'তো। প্রাতরাশ বা আহারের সময়-ও তাঁর সঙ্গে বহু লোক সাক্ষাতের জন্য সমবেত হতেন। তিনি সবসময়ই সাক্ষাৎকারীদের সঙ্গে হয় রাজনীতি না হয় ধর্মনীতি নিয়ে উৎসাহপূর্ণ আলোচনা করতেন। তিনি লিভারপুলে সর্বপ্রথম যে প্রকাশ্য সমাবেশে যোগ দিলেন, সেটি ছিল ইউনিটারিয়ান চ্যাপেলের উপাসনা-সভা। উপাসনা-সভায় সাধারণতঃ উপাসনাশেষে সকলে চ'লে যান, কিন্তু উপাসনাশেষে রামমোহনকে দেখবার জন্য পথে পথে লোক ভীড় ক'রে এলো। ঐদিন রাত্রিতে তিনি একটি অ্যাংলিক্যান চার্চেও গেলেন। সর্বত্রই মানুষের ভীড়, এই আশ্চর্য মানুষটিকে দেখে মানুষের সীমাহীন বিস্ময়।

সরকারীভাবে বা শাসক ইংরেজদের পক্ষ থেকে ভারতবাসী সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করা হ'তো, রামমোহন ছিলেন তার জীবন্ত প্রতিবাদ। দীর্ঘকায় গৌরকান্তি এই পুরুষ, যিনি ইংরেজদের চেয়েও বিশুদ্ধভাবে অনর্গল ইংরেজী বলতে পারেন—এ ধরনের কোনও ভারতবাসীকে ইতিপূর্বে ইংরেজ জনসাধারণ দেখে নি। কেবল তাই নয়, এই ভারতবাসী যখন ইংরেজী ভাষায় ইংরেজ জনসাধারণের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, রিফর্ম বিলের সমর্থনে কথা, বলতেন, তখন জনসাধারণের বিস্ময়ের সীমা থাকতো না। দীর্ঘকাল ধ'রে ভারতবাসীদের সম্পর্কে যে মিথ্যা শাসক-গোষ্ঠী প্রচার ক'রে এসেছিল, ইংরেজ জনসাধারণ তার ভিত্তিহীনতা দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়তো।

রামমোহন কয়েকদিন মাত্র লিভারপুলে ছিলেন। তিনি রিফর্ম বিলের আলোচনা-কালে পার্লামেণ্টে উপস্থিত থাকবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিলেন। মিঃ উইলিয়াম রস্‌কো রামমোহনকে পার্লামেণ্টে দর্শকদের একটি আসন ক'রে দেওয়ার জন্য তাঁর বন্ধু অন্যতম মন্ত্রী লর্ড ব্রুহামকে একটি অনুরোধপত্র লিখে দিয়েছিলেন। তাই রামমোহন এপ্রিলের শেষাশেষি লিভারপুল থেকে লণ্ডনের উদ্দেশে রওনা হলেন। যাওয়ার পথে তিনি শিল্পনগরী মাঞ্চেস্টার হয়ে গেলেন। কারণ, যে আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার তিনি এতই উৎসাহী সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন, মাঞ্চেস্টার ছিল তার একটি প্রধান কেন্দ্র। মাঞ্চেস্টারে তিনি বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন। মিঃ সাদারল্যাণ্ড তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। মাঞ্চেস্টারের কারখানাগুলি তিনি দেখতে গেলে কারখানাগুলির শ্রমিকরা সবাই কাজ বন্ধ ক'রে দেয় এবং স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সকলেই ভীড় ক'রে ভারতের রাজাকে (The King of Ingee) দেখবার জন্য ছুটে আসে। তাদের অনেকেই তাঁর সঙ্গে করমর্দন করবার জন্য চেষ্টা করে। অনেক মহিলা তাঁকে আলিঙ্গন করতে চায়। তাদের সকলকে এড়াতে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়। কারখানাগুলিতে

যাওয়ার পথ ক'রে দেওয়ার জন্য পুলিশের সাহায্য নিতে হয়। তিনি কারখানাগুলিতে প্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে কারখানার গেটগুলি ভীড় ঠেকাবার জন্য রুদ্ধ ক'রে দিতে হয়।

রামমোহন শত শত শ্রমিকের সঙ্গে করমর্দন করেন এবং তাদের উদ্দেশে বলেন যে, তারা যেন রিফর্ম বিল পাস করবার জন্য তাদের রাজা ও তাঁর মন্ত্রীদের সাহায্য করে। শ্রমিকরাও দলে দলে তাঁকে চীৎকার ক'রে জানায় রাজা ও রিফর্ম বিল চিরজীবী হ'ক। লণ্ডনের পথে রামমোহন যেখানেই সরাইখানায় উঠলেন, সেখানেই সরাইখানাগুলিকে জনতা ঘিরে রাখলো।

ইংলণ্ডে কোন একজন এশীয়কে তো বটেই, অন্য কোনও-দেশীয়কেও, দেখবার জন্য জনসাধারণের এমন প্রবল আগ্রহ দেখা যায় নি।

রামমোহন কবে কখন লণ্ডনে এসে পৌছবেন, তা পূর্ব থেকে তিনি তাঁর বন্ধুদের জানান নি। তাই তিনি একদিন রাত্রিতে যখন লণ্ডনে এসে পৌছলেন, তখন তাঁর জন্য নিউগেট স্ট্রীটের একটি নোংরা সরাইখানায় থাকবার ব্যবস্থা হ'লো। কিন্তু এই সরাইখানাটি তাঁর মনঃপূত না হওয়ায় তিনি এডেল্‌ফি হোটেলে গিয়ে রাত দশটায় উঠলেন। তিনি আসবার সংবাদ না দিলেও, তাঁর বন্ধুরা তাঁর জন্য বণ্ড স্ট্রীটে এই হোটেলটিতে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু ঐ গভীর রাত্রিতেও তাঁর জন্য এক অপ্রত্যাশিত সম্মান অপেক্ষা ক'রে ছিল।

তিনি রাত্রিতে যখন শুয়ে পড়েছেন, তখন তাঁর লণ্ডনে আসবার সংবাদ পেয়ে সেই গভীর রাত্রিতেও ইংলণ্ডের বিখ্যাত দার্শনিক বৃদ্ধ জেরেমি বেন্থাম তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য ছুটে এলেন। এই বৃদ্ধ বহু বছর যাবৎ কারও সঙ্গে কখনো দেখা করতে যান নি, এমন কি নিজের বাগানে বেড়াবার জন্য ছাড়া স্বগৃহ ত্যাগ ক'রে একপা বার-ও হন নি। তিনি সন্ধান ক'রে এডেল্‌ফি হোটেলে এসে পৌছলেন এবং রামমোহন শুয়ে পড়েছেন জেনে তাঁর উদ্দেশে একটি ক্ষুদ্র পত্র রেখে গেলেন। তাতে লেখা ছিল "Jeremy Bentham to his friend Rammohun Roy."

জেরেমি বেন্থামের সঙ্গে বহু পূর্ব থেকেই রামমোহনের পত্রযোগে আলাপ ছিল। দার্শনিক বেন্থাম রামমোহনের অত্যন্ত গুণগ্রাহী ও অনুরাগী ছিলেন। রামমোহন-ও এই বৃদ্ধ ইংরেজ দার্শনিককে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। একটি পত্রে রামমোহনকে বেন্থাম লিখেছিলেন ঃ

> Your character is made known to me by our excellent friends, Colonel Young, Colonel Stanhope and Mr. Buckingham. Your works by a book in which I read, a style which

but for the name of a Hindoo, I should have ascribed to the pen of a superiorly well-educated and instructed Englishman.

ইংলণ্ডে থাকাকালে জেরেমি বেন্থামের সঙ্গে রামমোহনের হৃদ্যতা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ও পত্রালাপ চলতে থাকে।

রামমোহন কয়েকদিন মাত্র হোটেলে ছিলেন। তারপর তিনি ১২৫ রিজেণ্ট স্ট্রীটের একটি প্রাসাদোপম গৃহে গিয়ে বাস করতে থাকেন।

তাঁর লণ্ডনে আসার সংবাদ পেয়ে ইংলণ্ডের অসংখ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য আসতে থাকেন। তাঁর রিজেণ্ট স্ট্রীটের বাসার সামনে বেলা এগারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত অগণিত গাড়ি ভীড় ক'রে থাকতো। এই সময়ে রামমোহনের দিনগুলি দিবারাত্রি নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজনার মধ্যে কাটছিল। এতে তাঁর শরীর সত্যই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাঁর চিকিৎসকরা তাঁর বাড়ীর দারোয়ানকে শেষ পর্যন্ত কোনও অতিথিকে বাড়ীতে ঢুকতে না দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বিখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিকরূপে রামমোহন ইংলণ্ডে তথা ইউরোপে সুপরিচিত হ'লেও, এই সময়ে ইউরোপীয় রাজনীতি, ভারতীয় সমস্যা এবং সর্বোপরি ইংলণ্ডের রিফর্ম বিল সম্পর্কেই আলোচনায় অধিক সময় কাটাতেন। তিনি রিফর্ম বিলের ঘোর সমর্থক হ'লেও, রিফর্ম বিলের বিরোধীরাও তাঁর অনুরাগী সুহৃদ্ ছিলেন। বরং রিফর্ম বিলের প্রবল বিরোধী যে টোরিরা, সেই টোরিদের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই ছিলেন তাঁর বন্ধু। বৃদ্ধ ঐতিহাসিক উইলিয়াম রস্‌কো রামমোহনকে হাউস্ অব কমন্সে একটি উপযুক্ত অতিথির আসন সংগ্রহ ক'রে দেওয়ার জন্য যে লর্ড ব্রুহামকে পত্র লিখেছিলেন, তিনিও ছিলেন একজন টোরি। এই লর্ড ব্রুহামের সঙ্গে রামমোহনের গভীর বন্ধুত্ব গ'ড়ে উঠেছিল। যিনি রামমোহনকে হাউস অব লর্ড্‌সের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই ডিউক অব কাম্বারল্যাণ্ড-ও ছিলেন টোরি-দলভুক্ত। বহু বিশিষ্ট টোরি তাঁর বন্ধু হ'লেও রিফর্ম বিল সম্পর্কে তাঁর মতামত এই বিশিষ্ট টোরিদের সমক্ষেও প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। রামমোহনের মতামত ও রিফর্ম বিলের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানা সত্ত্বেও এই সব নেতৃস্থানীয় টোরিরাও রামমোহনকে গভীর বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখতেন।

রামমোহনের চরিত্রের এটি ছিল একটি অনন্যসাধারণ দিক। তাঁর বন্ধুত্ব ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক যেমন তাঁর নিজস্ব আদর্শ ও বিশ্বাস থেকে তাঁকে এক চুলও কখনও বিচ্যুত করতে পারে নি, তেমনি অন্য আদর্শ ও বিশ্বাসে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের প্রতিও তাঁর বন্ধুত্ব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হ'তো না। তাঁর চাকরি-জীবনেও আমরা লক্ষ্য করেছি, যখন তিনি ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ঘোর বিরোধী ইংরেজ সরকারের বা ইংরেজ

মনিবের কাছে চাকরি করছেন, তখনও তিনি ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণা, সমর্থন ও সহানুভূতি উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি।

ইংলণ্ডে যেমন বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গ'ড়ে উঠেছিল, তেমনি গ'ড়ে উঠেছিল তাঁর বন্ধুত্ব একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী বহু ব্যক্তি ও পরিবারেব সঙ্গে। এঁদের মধ্যে এস্‌ট্‌লিন, কার্পেণ্টার, ফক্‌স্‌ প্রভৃতি পরিবারগুলির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলকাতায় ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছিল। ইংলণ্ডে এই হেয়ার-পরিবারও ছিল তাঁর একান্ত আপন জন। তাই ইংলণ্ডে রাম-মোহনের প্রবাস জীবন ঠিক প্রবাস-জীবন ছিল না। যেসব মানুষের দেশে দেশে ঘর থাকে, রামমোহন ছিলেন তাঁদেরই একজন।

রামমোহন দিল্লীর বাদশাহের দূত হয়ে ইংলণ্ড যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোম্পানি সরকার দিল্লীর বাদশাহের সার্বভৌমত্ব স্বীকার না কবায, তাঁর উপাধি বিতরণের বা দূত প্রেরণের অধিকার স্বীকার করে নি। তাই রামমোহন ভারতীয় নাগরিকরূপেই ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে তিনি জনসাধারণের কাছে হয়ে উঠেছিলেন ভারতের জনসাধাবণেব দূত। তাছাড়া, কোম্পানি তাঁকে রাজদূতের মর্যাদা না দিলেও ইংলণ্ডের রাজা ও তাঁর মন্ত্রীরা তাঁকে দিল্লীর বাদশাহের দূতরূপেই স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। রাজকীয় অনুষ্ঠানে বিদেশী দূতদের সঙ্গেই তাঁকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। তাই ইংলণ্ডে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ সমস্যায় পড়েছিল এবং রামমোহনের প্রতি তাদের সরকারী আচরণে পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হযেছিল। ইংলণ্ডে তাঁর বিপুল সংবর্ধনা সম্পর্কে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। তাই কোম্পানির যেসব পদস্থ কর্মচারী ভারতে তাঁর প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করতে বা অবহেলাপূর্ণ আচরণ করতে কুণ্ঠিত হয় নি, তারাও ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁর সঙ্গে হৃদ্য সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাঁর ইংলণ্ডে পৌঁছানোর তিন মাসের মধ্যেই, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জুলাই, তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে ভোজসভার আয়োজন করেছিল। ঐ ভোজসভায় কোম্পানির চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং প্রায় আশিজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। রামমোহন এই ভোজসভায় একটি ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি লর্ড কর্নওয়ালিস, লর্ড ওয়েলেস্‌লি, লর্ড হেস্টিংস, এবং সর্বোপরি লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের প্রশংসাসূচক উল্লেখ কবলেও লর্ড আমহার্স্টের নাম উচ্চারণ করেন নি।

রামমোহন ইংলণ্ডে যাওয়ার বহু পূর্ব থেকেই তাঁর খ্যাতি ইংলণ্ডে, ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকায় পৌঁছেছিল। সুতরাং তাঁর সম্মাননা অপ্রত্যাশিত না হ'লেও, তিনি যে বিপুল সম্মান ও সংবর্ধনা পেয়েছিলেন, তা অভাবিতপূর্ব। তাঁর এই সম্মাননার বিবরণ অনেকেই রেখে গেছেন।

বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ও মনীষী জেরেমি বেন্থামের জীবনীকার স্যার জন বাউরিং লিখেছেন :

> I am sure that it is impossible to give expression to those sentiments of interest and anticipation with which his advent here is associated in all our minds. I recollect some writers have indulged themselves with enquiring what they should feel if any of those time-honoured men whose names have lived through the vicissitudes of ages, should appear among them. They have endeavoured to imagine what would be their sensations if a Plato or a Socrates, a Milton or a Newton, were unexpectedly to honour them with their presence.

অর্থাৎ, অতীতের কল্পলোক থেকে প্লেটো, সক্রেটিস, মিল্টন, নিউটন যদি হঠাৎ এসে আবির্ভূত হতেন, মানুষ যে ধরনের বিস্ময়বিহ্বল হয়ে পড়তো, ইংলণ্ডের সাধারণ মানুষ কেবল নয়, শিক্ষিত মানুষও তেমনি বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। সুদূর অতীতের মতোই সুদূর ভারত ছিল ইংলণ্ডের সাধারণ মানুষদের কাছে একটি কল্পলোক। সুতরাং রামমোহনের ইংলণ্ডের ভূমিতে এই আবির্ভাব যেন একটা অলৌকিক ঘটনা ছিল। স্যার জন বাউরিং ঠিকই বলেছেন :

> In my mind the effect of distance is very like the effect of time ; and he who comes among us from a country thousands of miles off, must be looked upon with same interest as those illustrious men who lived thousands of years ago.

ইংলণ্ডের Court Circular থেকে জানা যায়, বৃটিশ সরকার রামমোহনের বাদশাহ্-দত্ত উপাধি ও দৌত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি চার্লস্ গ্র্যাণ্ট রাজা রামমোহন রায়কে রাজপ্রাসাদে রাজা চতুর্থ জর্জের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দেন। রামমোহন ভারতীয় পোশাকেই সজ্জিত ছিলেন, তাঁর গায়ে ছিল সোনার জরি দিয়ে কাজ-করা টকটকে লাল ভেলভেটের কাবা ও মাথায় পাগড়ি। রাজা চতুর্থ উইলিয়মের অভিষেক-উৎসবেও রাজা রামমোহনকে ইউরোপীয় রাজদূতদের সঙ্গে বসবার আসন দেওয়া হয়েছিল। বিখ্যাত লণ্ডন সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষে রাজা চতুর্থ উইলিয়ম যে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন, তাতেও তিনি রাজা রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

ইংলণ্ডের অভিজাত সমাজে, ধর্মীয় পরিমণ্ডলে, বিদ্বজ্জন সমাজে, সর্বত্রই ছিল রামমোহনের সমান মর্যাদা ও বিচরণাধিকার। সকলেই তাঁকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে যেন ধন্য বোধ করছিলেন। যেন পূর্বাকাশের এক বিরাট জ্যোতিষ্ক হঠাৎ অবতীর্ণ হয়েছিল

ইংলণ্ডের ভূমিতে। লণ্ডনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে ভোজসভায় আপ্যায়িত করেছিল। কবি রবার্ট ব্রাউনিংয়ের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক রেঃ ফক্‌স্ তাঁকে ভোজসভায় আপ্যায়িত করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সভাপতি ডঃ কার্কল্যাণ্ড বলেছিলেন : "The Raja is an object of lively interest in America, and he is expected there with the greatest anxiety."

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই রামমোহন ইংরেজ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সমমর্যাদার আসন পেয়েছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে তাঁর রিজেণ্ট স্ট্রীটের বাসা থেকে রিজেণ্ট পার্কের প্রাসাদোপম ভবনে—কাম্বারল্যাণ্ড টেরেসে—উঠে এসেছিলেন।

তাঁর সুদর্শন চেহারা, সুমধুর ব্যবহার ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং নারীজাতির জন্য তাঁর আজীবন সংগ্রাম তাঁকে ইংরেজ মহিলাদেব কাছেও আদরণীয় ক'রে তুলেছিল। তাঁদের অনেকেই রাজা রামমোহন সম্পর্কে সুন্দর স্মৃতিকথা রেখে গেছেন। রামমোহন কোনদিন নিজেকে ধর্মগুরুর আসনে বসান নি ; ধর্মগুরুদের মতো কৃচ্ছ্র জীবনেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর জীবনযাত্রা স্বদেশের মতোই প্রবাসেও ছিল রাজসিক। তিনি লণ্ডনেব অভিজাতমহলের বহু পার্টিতে, এমনকি বল-নাচেও, যোগ দিতেন। তিনি প্রায়ই অভিনয় দেখবার জন্য থিয়েটাবে যেতেন। এই সূত্রে তিনি অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীব সঙ্গেও সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেত্রী ফ্যানি কেম্ব্‌ল্ তাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন। মিঃ বেসিল মণ্টেগু ছিলেন রামমোহনের বন্ধু। ফ্যানি কেম্বলের সঙ্গে মিঃ মণ্টেগু-র হৃদ্যতা ছিল। মিঃ মণ্টেগু-র গৃহে রামমোহনের সঙ্গে ফ্যানি কেম্ব্‌লেব আলাপ হয়। রামমোহন দেখলেন, মিস্ কেম্ব্‌ল্ ভারতীয় নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী, এবং ভারতীয় কিছু কিছু নাটকের সঙ্গে ইতিপূর্বেই তাঁর পরিচয় হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি কালিদাসের "শকুন্তলা" নাটক সম্পর্কে কিছুই জানেন না। রামমোহন নিজে "শকুন্তলা" নাটকের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। ইউরোপেও এই নাটকের খ্যাতি কম ছিল না। মহাকবি গ্যেটে নিজে এই নাটককে "The most wonderful production of human genius" আখ্যা দিয়েছিলেন। সুতরাং এই নাটকের সঙ্গে পরিচয় নেই দেখে রামমোহন তাঁকে স্যার উইলিয়ম জোন্‌সের "শকুন্তলা"র অনুবাদ এক কপি পাঠিয়ে দেন। নাটক ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কে রামমোহনের অনুরাগ কত গভীর ছিল, তা ফ্যানি কেম্বলের মন্তব্য থে'ক জানা যায়। ফ্যানি কেম্ব্‌ল তাঁর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ২২ ডিসেম্বর তারিখের ডায়েরিতে লিখেছেন :

"In the evening the play was Isabella ; the house very bad ; I played very well. The Raja Rammohun Roy was in the Duke

of Devonshire's box, and went into fits of crying, poor man!" সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পের প্রতি অনুরাগ যে রামমোহনের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, তা এই উক্তি থেকে সহজেই প্রমাণিত হয়।

এই তরুণী অভিনেত্রী রামমোহনের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তাঁর Record of a Girlhood গ্রন্থের প্রথম খণ্ডেও লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ মার্চ মিঃ মণ্টেগু-র বাড়ীতে যে ভোজসভার আয়োজন হয়, সেখানেও ফ্যানি কেম্ব্‌লের সঙ্গে রামমোহনের সাক্ষাৎ ঘটে। মিস্ কেম্ব্‌ল্ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন:

> We presently began a delightful nonsense conversation, which lasted a considerable time, and amused me extremely. His appearance is very striking. His picturesque dress and colour make him, of course, a remarkable object in a London ball-room. His countenance, besides being very intellectual, has an expression of great sweetness and benignity.

ইংলণ্ডে মহিলাদের সঙ্গে রামমোহনের সৌজন্যপূর্ণ প্রীতির সম্পর্কের কথা সম্ভবতঃ ভারতেও পৌঁছেছিল। সেই সূত্রে ভারতে রামমোহনের বিরোধীরা তাঁব বিরুদ্ধে নানা কুৎসা প্রচার করতে কসুর করে নি। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ নভেম্বর এই ধরনের একটি জনরব সম্পর্কে 'সমাচার-দর্পণে' মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়:

> শ্রীরামমোহন রায়।—আমাদের দৃষ্ট হইতেছে যে অনেকেই উন্মত্ততাপূর্বক লিখিয়াছেন যে শ্রীযুত রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ডীয় এক বিবিসাহেবকে বিবাহকরণার্থ উদ্যত হইয়াছেন! কলিকাতায় রায়জীর এক স্ত্রী আছে এবং তিনি প্রকাশরূপে হিন্দু শাস্ত্রের কোন বিধি উল্লঙ্ঘন করাতে জাতিভ্রংশ বিষয়ে নিত্য অতি সাবধান হইয়া আছেন অতএব আমরা বোধ করি যে, এই জনরব সমুদায়ই অমূলক ও অগ্রাহ্য। তিনি ঈদৃশাবস্থা অর্থাৎ স্ত্রী থাকিতে যদি কোন বিবিসাহেবকে বিবাহ করিতে চেষ্টিত থাকেন তবে আমরা বোধ করি যে তাঁহার দৃঢ়তব বিপক্ষেরা রাগপূর্বক তাঁহার প্রতি যত গ্লানি তিরস্কার করিয়াছেন সে সমস্তরই তিনি উপযুক্ত পাত্র বটেন।

রামমোহন ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ অভিজাত পুরুষ ও মহিলাদের সঙ্গে থিয়েটার দেখছেন জানলে, রামমোহন-বিরোধীরা আরও কতখানি উল্লসিত হয়ে উঠতেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ইংলণ্ডে থাকাকালে রামমোহন ঐ যুগের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি রবার্ট আওয়েন—যাঁকে বৃটিশ সমাজতন্ত্রবাদের জন্মদাতা বলা হয়। রবার্ট আওয়েন লানার্কের ধনী কারখানা-মালিক ছিলেন। কারখানা থেকে তিনি যেমন

প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, তেমনি তাঁর কারখানার শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা করেন, তাদের কাজের সময় হ্রাস করেন, তাদের বেশি পারিশ্রমিক দেন, তাদের জন্য স্বাস্থ্যকর গৃহ ও বিদ্যালয় প্রভৃতি নির্মাণ ক'রে দেন। পরে তিনি মানুষের সুখী সমাজ গড়বার পরিকল্পনায় মেতে ওঠেন এবং শ্রমিকদের নিয়ে আদর্শ কলোনি গ'ড়ে তোলেন। পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা ও উপায় সম্পর্কে যাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অগ্রণী ছিলেন, রবার্ট আওয়েন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। স্মরণ রাখা দরকার, তখনও কার্ল্ মার্ক্স-প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের উদ্ভব হয় নি, তখন কার্ল্ মার্ক্সের বয়স মাত্র তেরো-চোদ্দ বছর। রামমোহন রবার্ট আওয়েনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর মানবতা ও সমাজবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে রবার্ট আওয়েন তাঁর পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থায় ধর্মকে প্রাধান্য না দেওয়ায় রামমোহনের সঙ্গে তাঁর কিছুটা মতদ্বৈধ ঘটে। তাতে রামমোহনের সমাজবাদের প্রতি সমর্থন বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি, কেবল আওয়েন ধর্মকে প্রাধান্য দিলে আরও ভালো করতেন, তিনি এই কথা বলেছিলেন। আওয়েনের সমাজতন্ত্রবাদ রামমোহনকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও তাঁকে আওয়েনপন্থী ব'লে বর্ণনা করতে কুণ্ঠিত হন নি। রামমোহনের মৃত্যুর পর ডেভিড হেয়ারের ভ্রাতা জন হেয়ার ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ মার্চ রামমোহনের চিকিৎক মিঃ এস্ট্লিনকে লেখা এক পত্রে রামমোহনকে "a poor Owenite" ব'লে বর্ণনা করেন।

পূর্বেই বলেছি, ইংলণ্ডের রিফর্ম বিল সম্পর্কে রামমোহনের আগ্রহ এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত ছিল না। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১ মার্চ, রামমোহনের ইংলণ্ডে অবতরণের পূর্বেই, লর্ড জন রাসেল কর্তৃক আনীত প্রথম রিফর্ম বিলটি অগ্রাহ্য হয়েছিল। ফলে, মন্ত্রিসভার পতন এবং সাধারণ নির্বাচন ঘটে। নবনির্বাচিত হাউস্ অব কমন্সে দ্বিতীয় রিফর্ম বিল উত্থাপিত হ'লে ২২ সেপ্টেম্বর তা গৃহীত হয়, ৮ অক্টোবর হাউস্ অব লর্ড্স্ তা অগ্রাহ্য করে। হাউস্ অব লর্ড্সের এই কাজে ইংলণ্ডের জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সারাদেশ গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হয়। হুইগ দল রাজা চতুর্থ উইলিয়মকে হাউস্ অব লর্ড্স্-এ হুইগ লর্ড-এর সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রে রিফর্ম বিল পাসের ব্যবস্থা করতে বললে তিনি তা অগ্রাহ্য করেন। হুইগ দল হাউস্ অব কমন্সে তৃতীয় বার রিফর্ম বিল আনে এবং পুনরায় রিফর্ম বিল ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কমন্সে গৃহীত হয়। বিলটি আবার হাউস্ অব লর্ড্স্-এ প্রেরিত হয়। হাউস্ অব লর্ড্স্ এখন কি করে, তা দেখবার জন্য সারা দেশ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে থাকে।

ব্রিস্টলে রামমোহনের গুণগ্রাহী বন্ধুরা তাঁর আগমনের জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন। কিন্তু এই উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে রামমোহন রাজধানী লণ্ডন ছেড়ে ব্রিস্টলে

যেতে পারলেন না। তিনি ৩১ মার্চ (১৮৩২) এক পত্রে মিস্ কিডেলকে জানালেন যে, I should have long ere this visited Bristol and done myself the honour of paying you my long promised visit, but I have been impatiently waiting in London to know the result of the Bill.

হাউস্ অব লর্ড্সে টোরিদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁদের অনেকের বোধোদয় হ'লো। ১৪ এপ্রিল ৯ ভোটে বিলটির দ্বিতীয় রীডিং গৃহীত হ'লো। রামমোহন মিসেস উড্ফোর্ডকে লেখা এক চিঠিতে জানালেন:

> It must have afforded Mr. Woodford and yourself much gratification to learn by the first conveyance the division on the second reading of the Reform Bill The struggles are not merely between the reformers and the anti-reformers; but between liberty and oppression throughout the world; between justice and injustice, and between right and wrong. But from a reflection on the past events of history, we clearly perceive that liberal principles in politics and religion have been long gradually but steadily gaining ground, notwithstanding the opposition and obstinacy of despots and begots.

অবশেষে দেশের জনসাধারণের ক্রুদ্ধ দাবির কাছে হাউস্ অব লর্ড্স্ মাথা নত করলো এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রিফর্ম বিল হাউস্ অব লর্ড্স্-এ গৃহীত হ'লো। রামমোহন আনন্দিতচিত্তে লিভারপুলে মিঃ উইলিয়ম র‍্যাথবোনকে ৩১ জুলাই (১৮৩২) এক পত্রে লিখলেন:

> I am now happy to find myself fully justified in congratulating you and my other friends at Liverpool on the complete success of the Reform Bills, notwithstanding the violent opposition and want of political principle on the part of the aristocrats. The nation can no longer be a prey of the few who used to fill their purses at the expense, nay, to the ruin of the people, for a period of upwards of fifty years....
>
> I publicly avowed that in the event of the Reform Bill being defeated I would renounce my connection with this country. I refrained from writing to you or any other friend in Liverpool until I knew the result. Thank Heaven, I can now feel proud of being one of your fellow subjects, and heartily rejoice that I have the infinite happiness of witnessing the salvation of the nation, nay, of the whole world.

এই সময়ে রামমোহনের ইংলণ্ডে যাওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পার্লামেন্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যে নূতন সনদ দেবেন, পার্লামেণ্টে তার আলোচনাকালে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকা। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে হাউস্ অব কমন্‌সে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদের নবীকরণের প্রশ্নটি উত্থাপিত হ'লো। ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত দানের যে যোগ্যতম অধিকারী ছিলেন রামমোহন, তাতে কারো কোনও সংশয় ছিল না। তাই এ-বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য জুন মাসে (১৮৩১) হাউস অব কমন্‌স্ যে সিলেক্ট কমিটি নিয়োগ করলো, তার সম্মুখে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য রামমোহনকে আমন্ত্রণ জানানো হ'লো।

মিস্ কোলেট বলেছেন, রামমোহন কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সশরীরে উপস্থিত হন নি, তিনি তাঁর মতামত লিখিতভাবে কতিপয় পত্রাকারে কোম্পানির বোর্ড অব কণ্ট্রোলকে জানিয়েছিলেন। সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যদানের জন্য রামমোহন কেন উপস্থিত হ'তে রাজী হন নি, তার কারণ অবশ্য মিস কোলেট জানান নি। অন্য-পক্ষে, মিস্ মেরী কার্পেণ্টার তাঁর Last Days of Raja Rammohun Roy in England (১৮৬৬) গ্রন্থে লিখেছেন যে, রামমোহন ঐ কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সাক্ষ্য-ও দিয়েছিলেন। মিস্ কার্পেণ্টার লিখেছেন :

> . . . his time and thoughts were continually occupied with the proceedings of the Government, and affording information and advice whenever they were required. Everything else was made subservient to this great object. Frequently was the noble form of the illustrious stranger seen within the precincts of our Houses of Parliament, as those still remember who were there 35 years ago.

মিস্ কার্পেণ্টারের কথাই সত্য মনে হয়। রামমোহন কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্যও দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর সুচিন্তিত মতামতগুলি পত্রাকারে লিখিতভাবে পেশ-ও করেছিলেন।

ঐসব পত্রাকারে প্রেরিত অভিমতগুলি সরকারী কাগজে (Blue Books) লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং রামমোহন নিজেও সেগুলিকে পৃথকভাবে পুস্তকাকারে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করেছিলেন। তবে রামমোহনের সমস্ত মতামত যা তিনি পত্রাকারে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের কাছে পাঠিয়েছিলন, তা ঐ পুস্তকে নেই ব'লেই অনেক রামমোহন-বিশেষজ্ঞ মনে করেন। যাই হ'ক, ডঃ ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার রাম-মোহনের ঐসব পত্রাকারে লিখিত অভিমতসমূহ সম্পর্কে লিখেছেন :

. . . his communications to our Legislature show with what closeness of observation, soundness of judgement and comprehensiveness of views he had considered the various circumstances which interfered with its improvement or which on the other hand tended to promote it. They show him to be at once the philosopher and the patriot. They are full of practical wisdom ; and there is reason to believe that they were highly valued by our Government, and that they aided in the formation of the new system by which the well-being of our vast dependencies in India must be so greatly affected for good or for ill. . .

রামমোহন ভারত শাসন বিষয়ে যেসব সুপারিশ করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে জুরির দ্বারা বিচার, ভারতীয়দের জুডিসিয়াল অ্যাসেসর-রূপে নিয়োগ, যুগ্ম বিচারপতিরূপে নিয়োগ, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন বিধিবদ্ধকরণ ও সঙ্কলন, রাজস্ব-ব্যবস্থার উন্নতি, ভূমিতে প্রজার মালিকানা ব্যবস্থা, কৃষক ও জনসাধারণের জীবনের মান উন্নয়ন, ভারতীয় অর্থ যাতে ভারতের বাইরে না যায় সেজন্য ভারতে ইংরেজদের স্থায়িভাবে বসবাসের ব্যবস্থা, আইন প্রণয়নকালে বিশিষ্ট ভারতীয়দের সঙ্গে পরামর্শ ইত্যাদি।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ সম্পর্কে অনুসন্ধানের বিবরণী-রচনা সমাপ্ত হ'লে তা ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে পার্লামেণ্টের সুপারিশ বোর্ড অব কণ্ট্রোলের কাছে পাঠানো হ'লে বোর্ড অব কণ্ট্রোল তাতে সম্মতি দেন। জুন মাসে ঐ সুপারিশগুলি একটি বিলের আকারে পার্লামেণ্টে উত্থাপিত ও গৃহীত হয় এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্ট তারিখে রাজসম্মতি পেলে ঐ বিল আইনে পরিণত হয়।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত এই সনদে রামমোহন আদৌ সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি। রাজার সুপারিশগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান্ বলা হ'লেও তাঁর সুপারিশগুলি এই আইনে স্থান পায় নি। বিশেষতঃ, কোনও নূতন আইন প্রণয়নকালে তিনি যে বিশিষ্ট ভারতীয়দের পরামর্শ নিতে বলেছেন, তা এই আইনে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। তবে এই সনদে ভারতবাসীরা যেটুকু সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল, তা রামমোহনের চেষ্টাতেই হয়েছিল। রামমোহনের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে (১৮৪২) 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' কাগজের সম্পাদক লিখেছিলেন যে, "it is to him that we are in great measure indebted for the concessions in regard to the privileges of Native contained in the late Charter (1833)." রাজা রামমোহন রায়ের উদ্দেশে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ এপ্রিল কলিকাতা টাউন হলে যে স্মৃতিসভা হয়েছিল, তাতে রসিকলাল মল্লিক বলেছিলেন:

He went to England ; to his going there we are in a great measure indebted for the best clauses in the Charter, bad and wretched as the Charter is. Though it contains few provisions for the comfort and happiness of millions that are subject to its sway . . . . the few provisions that it contains for the good of our countrymen, we owe to Rammohun Roy.

রিফর্ম বিলের আলোচনার শেষ পর্বে রামমোহন তাঁর ব্রিস্টলে বন্ধুদের লিখেছিলেন, রিফর্ম বিল পাস না হওয়া পর্যন্ত তিনি ব্রিস্টলে যেতে পারছেন না। কিন্তু রিফর্ম বিল পাস হওয়ার পর তিনি ব্রিস্টলে গেলেন না, গেলেন তাঁর আর একটি অতিপ্রিয় স্থানে—বিপ্লবের জন্মভূমি ফ্রান্সে। ফ্রান্স সম্পর্কে রামমোহনের যেমন ছিল শ্রদ্ধা ও আগ্রহ, তেমনি ফরাসী পণ্ডিতমহলেও রামমোহন সম্পর্কে ছিল শ্রদ্ধা ও কৌতূহল। কলকাতায় 'দি টাইম্‌স্' কাগজের সম্পাদক এম. দ্'আকোস্তা (D'Acosta) ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্লোয়ার বিশপ আবে গ্রেগোয়ারকে রামমোহনের রচিত কিছু গ্রন্থ ও তাঁর সংক্ষিপ্ত একটি জীবনকথা পাঠিয়েছিলেন। মিস্ মেরী কার্পেন্টার বলেছেন, আবে গ্রেগোয়ার একটি পুস্তিকার মাধ্যমে রামমোহনকে ফরাসী দেশে সুপরিচিত ক'রে তোলেন। আবে গ্রেগোয়ার রামমোহন সম্পর্কে লিখেছিলেন :

The moderation with which he (Rammohun) repels the attacks on his writings, the force of his arguments, and his profound knowledge of the sacred books of the Hindoos, are proofs of his fitness for the work he has undertaken ; and the pecuniary sacrifices he has made, show a disinterestedness which cannot be encouraged or admired too warmly.

আবে গ্রেগোয়ারের এই রচনা ফরাসী ভাষায় 'ক্রনিক রিলিজিউস্' পত্রিকায় এবং ইংরেজীতে Monthly Repositoryতে-ও প্রকাশিত হয়।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে 'রেভ্যু আঁসাইক্লোপেদিকে' রামমোহনের পুস্তকাবলীর একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ফরাসী লেখক সিস্‌মঁদি রেভ্যু আঁসাইক্লোপেদিকে রামমোহন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি হিন্দুদের বর্ণভেদ ও সতীদাহ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন :

A glorious reform has, however, begun to spread among the Hindoos. A Brahmin, whom those who know India agree in repesenting as one of the most virtuous and enlightened of men, Rammohun Roy, is exerting himself to restore his country-men to the worship of true God, and to the union of morality

and religion. His flock is small, but increases continually. He communicates to the Hindoos all the progress that thought has made among the Europeans.

ফ্রান্সের 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্' সংস্থার মুখপত্র 'জুর্নাল আসিয়াতিক্' কাগজে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে রামমোহনের পুস্তকাবলীর একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। ঐ বছর অক্টোবর মাসে ঐ কাগজে মঁ. লাঁঝুইনে রামমোহন ও রামমোহনের রচনাবলী সম্পর্কে একটি বিশদ ও দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশ করেন। কিছুদিন পরে সোসিয়াতে আসিয়াতিক্—Asiatic Society of India ও Asiatic Society of Great Britain-এর ফরাসী অংশ—রামমোহনের পাণ্ডিত্য ও তাঁর সম্মানিত সদস্য-পদ লাভের যোগ্যতা বিচারের জন্য মঁ. লাঁঝুইনে, মঁ. ক্লাপরথ্ ও মঁ. ব্যরহুফ্‌কে নিযে একটি কমিশন গঠন করেন। ঐ কমিশন সর্বসম্মতিক্রমে রামমোহনকে সদস্য-পদ দানের জন্য সুপারিশ করলে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন 'সোসিয়েতে আসিযাতিক্' সংস্থার সম্মানিত সদস্য-পদ লাভ করেন। এইভাবে ফ্রান্স-ই সর্বপ্রথম রামমোহনকে তাঁব অগাধ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করে। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ও লেখক মঁ. গারনেঁ দ্য তাসি-ও রামমোহন সম্পর্কে বিদিত ছিলেন এবং রামমোহনের কাছ থেকে তিনি ইংরেজী ও হিন্দুস্থানীতে লেখা বহু পত্র পেয়েছিলেন ব'লে তিনি তাঁর হিন্দু ও হিন্দুস্থানী সাহিত্যের ফরাসী ভাষায় লিখিত ইতিহাসে লিখে গেছেন। ফরাসী বিজ্ঞানী ভিক্‌তর জাক্‌ম-ও রামমোহনের পাণ্ডিত্যের কথা জানতেন। তিনি ভারত ভ্রমণকালে রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং রামমোহনের অতিথি হয়েছিলেন। সুতরাং ফ্রান্সের বিদ্বৎ সমাজে রামমোহন বহু পূর্ব থেকেই সুপরিচিত ছিলেন। সেখানে তাঁর সুহৃদ্ ও অনুরাগীর সংখ্যা ইংলণ্ডের চেয়ে কম ছিল না।

তাই ইংলণ্ডে পদার্পণ করবার পর থেকেই তিনি যে ফ্রান্সে যাওযার জন্য আগ্রহী থাকবেন, তা-ই ছিল স্বাভাবিক। ফ্রান্সের বিখ্যাত বিপ্লবী জেনারেল লাফায়েতের কাছে একটি পরিচয়-পত্রও তিনি স্যার ফ্রান্সিস বার্ডেটের কাছ থেকে নিযে এসেছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সে অবতরণের জন্য যে পাসপোর্টের প্রয়োজন ছিল, তা তাঁর না থাকায় তিনি ফ্রান্সে অবতরণ করতে পারেন নি।

ইংলণ্ডে অবতরণের কিছুদিন পরেই তিনি ফ্রান্সে যাওয়ার জন্য উদ্যোগী হন। তিনি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর ভারতীয় বিষয়ে বোর্ড অব কমিশনার্সের সেক্রেটারি মিঃ টি. হাইড ভিলিয়ার্সকে পত্র লিখে জানান যে, তিনি ফ্রান্সে যেতে চান এবং তিনি জেনেছেন যে ফ্রান্সে যাওযার জন্য পাসপোর্টের প্রয়োজন, সুতরাং তাঁরা এ-বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন কিনা। তিনি ভিলিয়ার্সকে এই পত্রে লেখেন :

Such restrictions against foreigners are not observed even among the Nations of Asia (China excepted). However their observance by France may perhaps be justified on the ground that she is surrounded by Governments entirely despotic on three sides and nations kept down merely by the bayonet or by religious delusion.

রামমোহন ফ্রান্স সম্পর্কে কী উচ্চ ধারণা এবং কী গভীর সহানুভূতি পোষণ করতেন এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ, এমনকি ইংলণ্ড সম্পর্কেও তাঁর অভিমত কী কঠোর ও নির্ভীক ছিল, পত্রের ঐ উক্তি থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

অতঃপর রামমোহন ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রিন্স তালির্যাঁর উদ্দেশে একটি পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি দীর্ঘকাল ধ'রে তাঁর প্রিয় ফ্রান্স দেখবার পোষিত আকাঙ্ক্ষার উল্লেখ ক'রে ফ্রান্সে যাওয়ার অনুমতিই কেবল প্রার্থনা করেন না, সেই সঙ্গে তাঁর পরিকল্পিত একটি বিশ্বরাষ্ট্র-ব্যবস্থারও কথা বলেন। তিনি লেখেন, তিনি বিগত বারো বছর ধ'রে ফ্রান্স পরিদর্শনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ ক'রে এসেছেন। অবশেষে বহু ধর্মীয় ও জাতীয় প্রতিকূলতা এবং অন্যান্য অন্তরায় অতিক্রম ক'রে ফ্রান্সের পার্শ্ববর্তী একটি দেশে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু এসে জেনেছেন, এতো নিকটে থেকেও ফরাসী সরকারের বিনা অনুমতিতে ফরাসী ভূমিতে পদার্পণ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

তিনি ঐ পত্রে ফ্রান্সের মতো সভ্য দেশে পাসপোর্ট প্রথা চালু রাখার অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, চীনদেশ ছাড়া এশিয়ার অন্যান্য দেশে ঐ ধরনের বাধানিষেধ নেই, যদিও ঐসব দেশের মধ্যে ধর্মীয় কুসংস্কার ও রাজনৈতিক বিরোধের ফলে বৈরিভাব যথেষ্ট রয়েছে। "I am, therefore, quite at a loss to conceive how it should exist among a people so famed as the French are for courtesy and liberality in all other matters." অবশ্য, দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বা শত্রুতা থাকলে এরকম ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন হ'তে পারে। কিন্তু যেহেতু এখন বহু বছর ইউরোপে সাধারণভাবে শান্তি অক্ষুণ্ণ রয়েছে, এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বর্তমান সরকারগুলির মধ্যে হৃদ্যতা আছে, তখন এই ধরনের বিধিনিষেধ থাকার কি প্রয়োজন, তা বোঝা দুষ্কর। তবে শান্তিপূর্ণ অবস্থাতেও কিছু কিছু এ-ধরনের বিধিনিষেধ থাকতে পারে। যেমন—দুর্বৃত্তদের পক্ষে, বিচার এড়াতে চায় এমন বিদেশী অপরাধীর ক্ষেত্রে, মহাজনদের ফাঁকি দিতে চায় এমন খাতকের ক্ষেত্রে, কিংবা রাজনৈতিক ব্যাপারের ক্ষেত্রে।

অতঃপর ঐ পত্রে রামমোহন যা বলেন, তা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর পক্ষে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শতাব্দীকাল পরে যা লীগ অব নেশন্‌স্‌ ও রাষ্ট্রসংঘের মতো বিশ্বসংস্থার

মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। তিনি বলেন, দুটি নিয়মতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে যদি বিরোধ থাকে, তবে ঐ দুই দেশের পার্লামেন্টের মধ্য থেকে সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি সভা গঠিত ক'রে তার উপরও বিরোধ মীমাংসার ভার দেওয়া যেতে পারে। ঐ সভায় দুই দেশের সদস্যদের মধ্য থেকে পালা ক'রে এক-একজন সভাপতিত্ব করবেন, এবং ঐ সভার অধিবেশন ঐ বিবদমান দুই দেশের মধ্যে পালাক্রমে অনুষ্ঠিত হবে। সংখ্যাধিক সদস্যের সিদ্ধান্তই দুই দেশের পক্ষে অবশ্যগ্রহণীয় হবে। এইভাবে দুই দেশের বিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসিত হ'তে পারবে।

> . . . on general grounds I beg to observe that it appears to me, the ends of constitutional Government might be better attained by submitting every matter of political difference between two countries to a Congress composed of an equal number from the parliament of each; the decision of the majority to be acquiesced in by both nations and the Chairman to be chosen by each Nation alternately, for one year, and the place of meeting to be one year within the limits of one country and next within those of the other; such as at Dover and Calais for England and France.

রামমোহন দুটি দেশের পক্ষে যা বলেছিলেন, তা-ই পরবর্তী কালে বহু দেশের পক্ষে প্রয়োগ ক'রে লীগ অব নেশন্স্ ও পরে রাষ্ট্রসংঘের উদ্ভব হয়েছিল। রামমোহনের পূর্বে এ ধরনের বিশ্বসংস্থা প্রতিষ্ঠার কথা কেউ চিন্তা করেন নি।

ফরাসী সরকার সানন্দেই রামমোহনকে পাসপোর্ট দিয়েছিলেন। রামমোহন রিফর্ম বিল পাস হওয়ার পরেই ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে প্যারিসে গিয়ে পৌঁছলেন। প্যারিসে রামমোহনকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। ফ্রান্সের পণ্ডিত ও রাজনৈতিক মহলে সাড়া প'ড়ে যায় এবং সকলে রামমোহনকে সংবর্ধনা ও আপ্যায়ন করবার জন্য প্রতিযোগিতা করতে থাকেন। ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। রাজা লুই ফিলিপের হৃদ্য ব্যবহারে রামমোহন মুগ্ধ হন।

রামমোহন কয়েক মাস প্যারিসে থাকেন। ঐ সময়ে তিনি ফরাসী ভাষাও শিখতে থাকেন। ফ্রান্সে রামমোহনের অবস্থানকালের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় নি। তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের মামলা ও পত্নী-বিয়োগের সময় থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন হ'তে শুরু করেছিল। তার ওপর জাহাজে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তিনি দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী ছিলেন। ইংলণ্ডে এসে তাঁর বিরাট কর্মব্যস্ততা তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের অনুকূলে ছিল না। তাই ফ্রান্সের বন্ধুসমাজ ও ফ্রান্সের জলবায়ু তাঁকে কিছুটা বিশ্রাম ও ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের সুযোগ দিয়েছিল মনে হয়। কারণ ফ্রান্স থেকে

প্রত্যাবর্তনের কয়েক দিন পরে তিনি ব্রিস্টলের মিস্ অ্যান কিডেলকে লেখা এক পত্রে লেখেন: "My health is, thank God, thoroughly established."

ফ্রান্স থেকে রামমোহনের ইতালি যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তা হয়ে ওঠে নি। তিনি ইংলণ্ডে ফিরে এসে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি মিঃ উড্‌ফোর্ডকে যে পত্র লেখেন, তাতে জানান:

> I was detained in France too late to proceed to Italy last year; besides, without a knowledge in French, I found myself totally unable to carry on communications with foreigners, with any degree of facility. Hence I thought I would not avail myself of my travels through Italy and Austria to my own satisfaction. I have been studying French with a French gentleman, who accompanied me to London, and is now living with me.

ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স যাওয়ার আগেই রামমোহন সম্ভবতঃ তাঁর ব্যয়বহুল রিজেণ্ট পার্কের প্রাসাদোপম বাসভবনটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফ্রান্স থেকে এসে তিনি কলকাতার বন্ধু ডেভিড হেয়ারের ভাই জন হেয়ার ও জোসেফ হেয়ারের ৪৮ বেডফোর্ড স্কোয়ারের বাড়ীতে এসে বাস করতে থাকেন। ফ্রান্সে যাওয়ার পূর্বেও তিনি কিছুদিন এই বাড়ীতে বাস করছিলেন। তা জানা যায়, ৪৮ বেডফোর্ড স্কোয়ার থেকে মার্কুইস অব ল্যান্সডাউনকে লেখা তাঁর ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুন তারিখে লেখা পত্র থেকে।

ফ্রান্সে যাওয়ার পূর্বেই রামমোহন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনদ সম্পর্কে তাঁর অভিমত ও পরামর্শগুলি দিয়ে গিয়েছিলেন এবং সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পার্লামেণ্টে প্রেরিত হয়েছিল। রামমোহন ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ডে ফিরে আসবার মাস তিনেকের মধ্যেই তা আইনে পরিণত হয়েছিল। সতীদাহ নিরোধক আইনের বিরুদ্ধে যে আপীল সনাতনী হিন্দুদের পক্ষ থেকে প্রিভি কাউন্সিলে করা হয়েছিল, তাতে রামমোহন উপস্থিত থাকবার সঙ্কল্প নিয়েই ইংলণ্ডে এসেছিলেন। ফ্রান্সে যাওয়ার পূর্বেই রামমোহন প্রিভি কাউন্সিলের বিচারসভায় উপস্থিত থাকবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত তাঁর একখানি পত্র পাওয়া গেছে। পত্রটি মার্কুইস অব ল্যান্সডাউনকে লেখা। ঐ পত্রটি রামমোহন ৪৮ বেডফোর্ড স্ট্রীট থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুন লিখেছিলেন। তাতে তিনি মার্কুইস অব ল্যান্সডাউনকে প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহ নিরোধক আইনের আপীল আলোচনাকালে তাঁর উপস্থিতির কথাই কেবল জানান নি, কোনও কোনও উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ খ্রীষ্টান সতীদাহ প্রথার,

অর্থাৎ আত্মহত্যা ও হত্যার, সমর্থনে যে উপাসনা করবেন ব'লে শোনা যাচ্ছিল, সে সম্পর্কে তীব্র ঘৃণাও প্রকাশ করেন। ঐ পত্রে লেখা হয়েছিল :

> Raja Rammohun Roy presents his compliments to the Marquis of Lansdowne and feels very much obliged by his Lordship's informing of the day (Saturday next) on which the arguments on the Suttee question is to be heard before the Privy Council.
>
> R. R. will not fail to be present at 11 o'clock to witness personally the scene in which an English Gentleman (or Gentlemen) of highly liberal education professing Christianity is to pray for the re-establishment of suicide, and in many instances actual murder.

এই পত্র থেকে বোঝা যায়, সতীদাহ নিরোধক আইনের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানি রামমোহনের ফ্রান্স যাত্রার পূর্বেই শুরু হয়েছিল। রামমোহন দেশ থেকে আসবার সময়ে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে একটি আবেদন সঙ্গে এনেছিলেন এবং ইতিপূর্বেই তা হাউস অব কমন্সের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হোয়াইট হলের কাউন্সিল চেম্বারে সতীদাহ নিরোধক আইনের বিরুদ্ধে আপীল শুনবার যে অধিবেশন হয়েছিল, তাতে দি লর্ড প্রেসিডেণ্ট অব দি কাউন্সিল, দি লর্ড চ্যান্সেলর, মাস্টার অব দি রোল্স, দি ফার্স্ট লর্ড অব দি এ্যাডমির্যাল্টি, দি পে-মাস্টার অব দি ফোর্সেস্, দি মার্কুইস অব ওয়েলেস্লি, দি মার্কুইস অব ল্যান্সডাউন, লর্ড আমহার্স্ট, লর্ড জন রাসেল, স্যার জেম্স গ্রাহাম, স্যার এল. ম্যাডোএল, এবং স্যার ডাব্লিউ. এচ. ইস্ট উপস্থিত ছিলেন। আর ইংলণ্ডের এই সর্বোচ্চপদস্থ মহামান্য ব্যক্তিদের মধ্যে আসীন ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। প্রিভি কাউন্সিল এই অমানুষিক প্রথার বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছিলেন এবং ঐ রায় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ জুলাই প্রকাশিত হয়েছিল।

রামমোহন আরও যে একটি উদ্দেশ্য নিয়ে ইংলণ্ডে এসেছিলেন, যা তাঁর ইংলণ্ডে আসার প্রধান কারণরূপে দেখা দিয়েছিল, তা-ও আংশিকভাবে পূর্ণ হয়েছিল। তিনি ইংলণ্ডে অবতরণ করবার পর থেকেই দিল্লীর বাদশাহের যে দৌত্যকার্যের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন, তা পালনের জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ইংলণ্ডে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজা চতুর্থ জর্জের কাছে যে মর্মে আবেদন করেছিলেন, অনুরূপ মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ক'রে কোম্পানির পরিচালক-সভার কাছে ও ইংলণ্ডের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছেও পাঠিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে তিনি বিভিন্ন সূত্রে যথাসাধ্য সহায়তা লাভের চেষ্টা করেন এবং তাঁর সেই চেষ্টা ফলবতীও হয়। অবশেষে রামমোহন ফ্রান্স

থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি, কোম্পানির পরিচালক-সভা বাদশাহের বার্ষিক বৃত্তি তিন লাখ টাকা বাড়িয়ে ১২ লাখ টাকা থেকে ১৫ লাখ টাকা ক'রে দেন। কিন্তু রামমোহন এতে সন্তুষ্ট হন না। কোম্পানির পরিচালক-সভার সিদ্ধান্ত ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুলাই বড়লাট মারফত দিল্লীর বাদশাহ্‌কে জানানো হয়। রামমোহন ঐ বর্ধিত বৃত্তি গ্রহণে বাদশাহ্‌কে স্বীকৃত না হওয়ার জন্য লিখে পাঠান। বাদশাহ্-ও রামমোহনের পরামর্শমতো রামমোহনের পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে নির্দেশ আর আসে না। এর কয়েক মাস বাদেই ইংলণ্ডে রামমোহনের মৃত্যু ঘটে। বাদশাহ্ হতাশ হয়ে কোম্পানি-প্রদত্ত বৃত্তিগ্রহণে বাধ্য হন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কোম্পানি সরকার আত্মসম্মান রক্ষার জন্য এমন একটা ভাব দেখাতে থাকেন যে, বাদশাহের বৃত্তি তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই বৃদ্ধি করেছেন, এর পেছনে রামমোহনের কোনও হাত বা কৃতিত্ব নেই। বাদশাহ্ বর্ধিত বৃত্তি পেয়ে রামমোহনের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতিমতো রামমোহনের পুত্রদের মাসিক ১,৮৭৫ টাকা ভাতা দিতে চান এবং এ-বিষয় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (পরবর্তী কালের যুক্তপ্রদেশের) লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নরকে লিখে পাঠান। কিন্তু লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর এতে রাজী হন না; তিনি বলেন, রামমোহনের উত্তরাধিকারীদের ঐ ভাতা দেওয়ার কোনও কারণ নেই, কারণ বাদশাহের এই বৃত্তি বৃদ্ধি কোম্পানি নিজেই করেছেন, এতে রামমোহনের কোনও হাত ছিল না। কিন্তু বাদশাহ্ তাতে সন্তুষ্ট ও নিরস্ত হন না। তিনি তৎকালীন বড়লাট লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডকে এ-বিষয়ে অনুমতি চেয়ে একটি পত্র লেখেন (এপ্রিল, ১৮৩৭)। কিন্তু লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড-ও তাতে অস্বীকৃত হন। ফলে, নিরুপায় বাদশাহ্‌কে শেষ পর্যন্ত ক্ষান্ত হ'তে হয়।

.

রিফর্ম বিল পাস হওয়ায় রামমোহনের মনে বৃটিশ সংবিধানের প্রগতিশীলতা সম্পর্কে নিশ্চয় উন্নত ধারণা জন্মেছিল এবং বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারতের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরতে পারলে প্রতিকার মিলবে, এমন আশাও তাঁর মনে দেখা দিয়েছিল। তাই আমরা দেখি, রিফর্ম বিল পাস হওয়ার পরে এবং ফ্রান্স ভ্রমণে যাওয়ার পূর্বে রামমোহন বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য-পদে প্রার্থী হওয়ার কথা চিন্তা করছেন। কিন্তু একজন ভারতীয়ের পক্ষে বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য হওয়া যায় কিনা, সে বিষয়ে বৃটিশ সংবিধানের নিয়মকানুন কি, তা তিনি ঠিক না জানায় মিঃ সি. ডাব্লিউ. উইনকে একটি পত্র লিখে এ-বিষয়ে জানতে চান। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল রামমোহন একটি ক্ষুদ্র পত্রে মিঃ উইনকে লেখেন :

From the high opinion R. R. entertains of Mr. Wynn's Constitutional Learning, he feels a wish to know from him confidentially whether in Mr. Wynn's opinion R. R. is eligible to sit in Parliament. He begs to add that it is not from any ambition to assume so arduous an office but from a desire to pave the way of his countrymen for which object R. R. might for a few months, undertake the task.

রামমোহনের পত্রের উত্তরে মিঃ উইন লেখেন :

. . . I conceive generally that any person born within the British dominions is a British subject and as such heie entitled to all privileges of a native of Great Biitain.

উত্তরে ১৯ এপ্রিল রামমোহন জানান :

I will seriously rellect on your letter and shall not fail to communicate the result if I can come to any determination on the subject.

ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করবার জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারতবাসীর একজন মুখপাত্র থাকা প্রয়োজন এবং রামমোহন যে সে বিষয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি, ইংলণ্ডে রামমোহনের অনেক বন্ধুই তা অনুভব করতেন। বৃটিশ দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম রামমোহনকে বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। ম্যাক্স্ মুলার, মনিয়ের উইলিয়ম, কবি ক্যাম্বেল এবং লর্ড ক্রুহাম এ-বিষয়ে রামমোহনের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন।

রামমোহন যদি আরও কিছুদিন জীবিত থাকতেন, তবে হয়তো তিনি বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য-পদের জন্য প্রার্থী হতেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, তিনি তাঁর জীবনের শেষ অঙ্কে এসে পৌঁছেছেন। অসুস্থতা ও অকালমৃত্যু তাঁর এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত হ'তে দেয় নি। হয়তো কয়েক বছর জীবিত থাকলে তিনিই হতেন বৃটিশ পার্লামেণ্টের প্রথম ভারতীয় সদস্য। দাদাভাই নওরোজী ও সকলতওয়ালা তাঁর ইচ্ছাকেই পরবর্তী কালে রূপায়িত করেছিলেন বলা চলে।

বিভিন্ন কার্যে রামমোহন লণ্ডনেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ব্রিস্টল থেকে তাঁর অনুরাগী বন্ধুরা ক্রমাগত তাঁকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন। ডঃ ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার ছিলেন ব্রিস্টল শহরের লিউইন মীড চ্যাপেলের যাজক এবং রামমোহনের অত্যন্ত অনুরাগী সুহৃদ্। তিনি ধনী কন্যা মিস্ ক্যাথেরিন ক্যাস্‌লের অভিভাবকও ছিলেন। মিস্ ক্যাসলের পিসী ছিলেন মিস্ অ্যান্ কিডেল। মিস্ ক্যাস্‌ল্ ও মিস্ কিডেল-ও

ছিলেন রামমোহনের অতিশয় অনুরাগিণী। রামমোহন বালক রাজারামকে মিস্ ক্যাস্‌ল্ ও মিস্ কিডেলের কাছে রেখে তার পড়াশুনোর ব্যবস্থা করেছিলেন। রামমোহনও ব্রিস্টলে যাওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু লণ্ডনে একটির পর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য তাঁকে আটুকে রেখেছিল।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ মে তিনি মিস্ অ্যান্ কিডেলকে একটি পত্রে লেখেন :

> . . . important matters passing here daily have detained me and may perhaps detain me longer than I expect.

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জুলাই তিনি মিস কিডেলকে পুনরায় লেখেন :

> I know not how to express the desire I feel to proceed to Bristol to experience your further marks of attention and kindness, and Miss Castle's civil reception and polite conversation. But the sense of my duty to the natives of India has hitherto prevented me from fixing a day for my journey to that town, and has thus overpowered my feeling and inclination.

ঐ কাগজেই তিনি মিস্ ক্যাস্‌ল্‌কেও লেখেন :

> You will perceive from letter to Miss Kiddell that I am to be detained here a week longer at the sacrifice of my feeling.

পার্লামেণ্টে ঐ সময়ে কোম্পানির সনদ সংক্রান্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া বিলের আলোচনা চলছিল। পার্লামেণ্টারি পদ্ধতির বিলম্বিত লয় রামমোহনকে অধৈর্য ক'রে তুলেছিল। ২৪ জুলাই (১৮৩৩) রামমোহন মিস কিডেলকে লেখেন :

> To day is the third reading of the Indian Bill in the House of Commons, after long vexatious debates in the Committee, pending its progress under different pretensions. After the Bill has passed the Lower House, I will lose no time in ascertaining how it will stand in the Upper Branch, and will immediately leave London without waiting for the final result.

অবশেষে ইস্ট ইণ্ডিয়া বিল পাস হ'লো। ঐ বিল রাজসম্মতি পেলো ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্ট। নূতন সনদে কোম্পানি তার বাণিজ্যাধিকার হারালো এবং তা সম্পূর্ণরূপে একটি রাজনৈতিক সংস্থায় পরিণত হ'লো। কিন্তু ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধার জন্য যেসব সুপারিশ রামমোহন করেছিলেন এবং আশা করেছিলেন, তথাকথিত প্রগতিশীল হুইগ মন্ত্রিসভা তার কিছু কিছু পূরণ করবে, সে আশা তাঁর পূর্ণ হ'লো না। এই ঘটনাটি রামমোহনের পক্ষে মর্মান্তিক ছিল। ইংরেজদের রাজনৈতিক সংস্থা সম্পর্কে তাঁর যে উচ্চ ধারণা ছিল, তা সমূলে বিধ্বস্ত হয়েছিল। তিনি যদি আরও

কিছুদিন জীবিত থাকতেন, তবে তাঁর বিপ্লবী ব্যক্তিত্বে ও চেতনায় এর প্রতিক্রিয়া কী হ'তে পারতো তা অনুমানসাপেক্ষ মাত্র। তিনি ২২ আগস্ট (১৮৩৩) তারিখে মিঃ উড্‌ফোর্ডকে লেখেন :

> . . . I have been rather poorly for some days past ; I am now getting better, and entertain a hope of proceeding to the country in a few days . . . The reformed Parliament has disappointed the people of England ; the ministers may perhaps redeem their pledge during the next session. The failure of several mercantile houses in Calcutta has produced much distrust both in India and England

কিন্তু তখনও রামমোহন জানতেন না, এই failure of several mercantile houses in Calcutta তাঁর নিজের জীবনের পক্ষেও কী ভীষণ মারাত্মক ছিল। তিনি যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে ইংলণ্ডে এসেছিলেন, সেগুলিতে তিনি আশানুরূপ ফল না পেলেও সেগুলির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছিল। এক সতীদাহ নিরোধক আইনের বিরুদ্ধে আপীলের ক্ষেত্রে ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রেই তিনি প্রায় হতাশ হয়েছিলেন। ফলে, তাঁর দেহে ক্লান্তি ও মনে ব্যর্থতা বোধ আসাই ছিল স্বাভাবিক। এই সময়ে তিনি যে ব্যাঙ্কিং সংস্থা দুটির সঙ্গে আর্থিক ব্যবস্থা ক'রে এসেছিলেন, সেই ব্যাঙ্কিং সংস্থা দুটি—কলকাতার মেসার্স ম্যাকিণ্টশ অ্যাণ্ড কোম্পানি এবং লণ্ডনের রিকার্ড্‌স্ ম্যাকিণ্টশ অ্যাণ্ড কোম্পানি—হঠাৎ ফেল করলো। এই অবস্থায় তিনি রাতারাতি প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেলেন। তিনি কোম্পানির পরিচালক-সভার কাছে তাঁর ব্যক্তিগত জামিনে তাঁকে দু হাজার টাকা ঋণ দেওয়ার জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু কোম্পানি ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুলাই এক পত্রে রামমোহনকে তাঁর ব্যক্তিগত জামিনে টাকা ধার দিতে অস্বীকার করলো। ফলে, তাঁর মানসিক উদ্বেগের সীমা রইলো না। এই রকম মানসিক আঘাতে তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্য আরও ভগ্ন হয়ে গেল। এখন তাঁকে ইংলণ্ডে তাঁর ইংরেজ বন্ধুদের কাছে হাত পাততে হ'লো।

কেবল তাই নয়, স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট নামে যে সাংবাদিককে তিনি ইংলণ্ডে সেক্রেটারিরূপে নিয়োগ করেছিলেন, তিনি এখন বাকী বেতনের নামে রামমোহনের উপর প্রচুর টাকার জন্য চাপ দিতে লাগলেন। তিনি এই ভয় দেখাতেও লাগলেন যে, রামমোহন যদি তাঁকে ঐ টাকা না দেন, তবে ইংলণ্ডে রামমোহনের যেসব লেখা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি তিনি তাঁর লেখা ব'লে প্রচার করবেন এবং তার সমস্ত স্বত্বের উপর দাবি আনবেন। রামমোহন বুঝলেন, কী ধরনের ধূর্ত ও অসাধু ব্যক্তিদের সাহচর্যে *তিনি এতদিন ইংলণ্ডে কাটিয়েছেন।* মানুষের এই নীচতা তাঁকে স্তম্ভিত ক'রে

দিলো। তাঁর ঐশ্বর্যের দিনে যেসব ধনী ইংরেজ তাঁর বন্ধুত্বের কামনায় তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন নি, রামমোহনের এই দুর্দিনে তাঁরা-ও বিমুখ হলেন। রামমোহন যে স্বর্গের স্বপ্ন নিয়ে ইংলণ্ডে এসেছিলেন, তা যেন মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং নরকের এক বীভৎস দৃশ্য তাঁর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হ'লো, তাঁর দেহ ও মন দু-ই ভেঙে পড়লো।

রামমোহনের মৃত্যুর তিন মাস পরে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত হোরেস হেম্যান উইলসন কলকাতায় বাবু রামকমল সেনকে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে রামমোহনের শেষদিনগুলির একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছিলেন :

> Rammohun had grown very stout, and looked full and flushed when I saw him. It appears also that mental anxiety contributed to aggravate his complaint. He had become embarrassed for money, and obliged to borrow of his friends here; in doing which he must have been exposed to much annoyance, as people in England would as soon part with lives as their money. Then Mr. Sandford Arnot, whom he had employed as his secretary, importuned him for the payment of large sums which he called arrears of salary, and threatened Rammohun, if not paid, to do what he has done since his death—claim as his own writing all that Rammohun published in England. In short, Rammohun had got amongst a low, needy, unprincipled set of people, and found out his mistake, I suspect, when too late, which prayed upon his spirit and injured his health.

দেশ থেকে রামমোহনের এই আর্থিক অনটনের সময়ে তাঁর পুত্ররা টাকা পাঠান নি ব'লে, অনেকে তার পুত্রদের উপর দোষারোপ করেছেন। অনেকে বলেছেন, তাঁর পুত্ররা দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে প্রচুর মাসিক বৃত্তি পাওয়া সত্ত্বেও পিতাকে সাহায্য করতে অগ্রসর হন নি। এই ধরনের দোষারোপ যুক্তিসঙ্গত ছিল না। কারণ, তাঁরা দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে কোন বৃত্তিই কখনও পান নি ; রামমোহনের জীবদ্দশায় রামমোহনের কোন সম্পত্তির উপর তাঁদের কোনও অধিকার ছিল না এবং তাঁদের নিজেদের উপার্জনও ঐ সময়ে যথেষ্ট ছিল না। যাই হ'ক, রামমোহন তাঁর জীবনের শেষ তিন মাস যে ইংলণ্ডে অত্যন্ত আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়েছিলেন এবং এ ধরনের আর্থিক অনটন তাঁর জীবনে প্রথম ঘটায় তাঁর দেহ ও মন যে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এ সময়ে অন্যান্যরা তাঁর সাহায্যে বিশেষ অগ্রসর না হ'লেও ডেভিড হেয়ারের ভ্রাতারা ও ভগিনী মিস্ হেয়ার এবং তাঁর ইউনিটারিয়ান খ্রীষ্টান বন্ধুরা তাঁকে সর্বতো-

ভাবে সাহায্য করেছিলেন। রামমোহন অবশেষে ডঃ ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার, মিস্ ক্যাস্‌ল্, মিস্ কিডেল প্রভৃতির সনির্বন্ধ অনুরোধে লণ্ডন ছেড়ে ব্রিস্টলে এলেন। মিস্ ক্যাস্‌ল্ তাঁর স্টেপ্‌ল্‌টন গ্রোভের প্রাসাদোপম গৃহেই রামমোহনের থাকবার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। এখানেই মিস্ কিডেল ও মিস্ ক্যাস্‌লের তত্ত্বাবধানে আগে থেকেই রাজারাম ছিল। রামমোহন সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে স্টেপ্‌ল্‌টনের বাড়ীতে এসে পৌছলেন। তাঁর সঙ্গে এলো তাঁর ভৃত্য রামহরি দাস ও পাচক রামরতন মুখোপাধ্যায়। লণ্ডন থেকে মিস্ হেয়ার-ও রামমোহনের সঙ্গে এলেন। ডঃ ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার ঐ সময়ে ব্রিস্টলেই ছিলেন। এবং মিঃ এস্‌ট্‌লিন রামমোহনের চিকিৎসকরূপেও সঙ্গে ছিলেন।

আর্থিক দুশ্চিন্তা, স্যাণ্ডফোর্ড আর্নটের মতো সুবিধাবাদী লোকের জুলুম ও ঘৃণ্য ব্যবহার এবং ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও স্টেপ্‌ল্‌টন গ্রোভে এসে রামমোহন কিছুটা শান্তির সন্ধান পেলেন। এখানে তিনি এমন একদল নরনারীর মধ্যে এসেছিলেন, যাঁদের স্নেহ-যত্ন, শ্রদ্ধা-ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থ। মহানগরের কোলাহল থেকে দূরে এই গ্রামাঞ্চলের নিভৃত কুঞ্জটি তার জীবনে কয়েকদিনের জন্য সত্যই শান্তিকুঞ্জ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই শান্তি তাঁর জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হ'লো না।

কয়েকদিন স্টেপ্‌ল্‌টন গ্রোভে থাকবার পর ১৯ সেপ্টেম্বর রামমোহন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জ্বরের সঙ্গে ছিল মাথার দুঃসহ যন্ত্রণা। বন্ধু চিকিৎসক মিঃ এস্‌ট্‌লিন যকৃতের দোষ থেকে জ্বর হয়েছে ভেবে সেইমতো চিকিৎসা শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর মাথার যন্ত্রণা যে মস্তিষ্কের দীর্ঘ কর্মক্লান্তি বা অবসাদের ফল, এমন কথা কেউ ভাবলেন না। ঐদিন মিঃ এসট্‌লিন লক্ষ্য করলেন, জ্বরের সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা আছে এবং ঘুমোবার সময়ে রামমোহনের চোখ খোলা রয়েছে। পরদিন তিনি অত্যন্ত ছট্‌ফট করতে লাগলেন। তিনি একবার বিছানা, একবার সোফা করতে লাগলেন। মাঝ রাত্রিতে তাঁর হাত-পা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল, নাড়ী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লো, কিছুটা অসাড় ভাব দেখা দিলো। খাওয়ার ঔষধ, মালিস প্রভৃতি দেওয়া চললো। অবস্থার অনেক-খানি উন্নতি দেখা গেল।

মিঃ এসট্‌লিন রামমোহনের সেবার জন্য একজন সর্বক্ষণের নার্স রাখার কথা বললেন। ডেভিড হেয়ারের ভগিনী মিস্ হেয়ার লণ্ডন থেকে রামমোহনের সঙ্গে এসেছিলেন এবং সর্বদা সঙ্গে থেকে রামমোহনকে ভগিনী-স্নেহে সেবা করছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় এই কাজ করতে উৎসাহী হলেন। কিন্তু রামমোহন আপত্তি করতে লাগলেন. জিনিসটা লোকচক্ষে শালীন ও শোভন হবে ব'লে তাঁর মনে হ'লো না। যখন সকলেই বোঝালেন যে, ইংলণ্ডে এটা রীতিবহির্ভূত বা অসামাজিক নয়, তখন তিনি রাজী হলেন। এখন থেকে মিস্ হেয়ার সর্বক্ষণ রামমোহনের কাছে থেকে তাঁর সেবা করতে লাগলেন।

কিন্তু অবস্থার আর বিশেষ উন্নতি হ'লো না। তাই ২২ সেপ্টেম্বর সকালে ব্রিস্টলের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং 'দি ফিজিক্যাল হিস্টরি অব ম্যান' গ্রন্থের রচয়িতা ডঃ প্রিচার্ডকে আনা হ'লো। সন্ধ্যার দিকে রামমোহনের অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখা গেল। ব্রিস্টলের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসককে দেখানো হয়েছে জেনে রামমোহন খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর বন্ধুদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানালেন।

পরদিন, ২৩ সেপ্টেম্বর, কিন্তু আবার তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটলো। তিনি সারা-রাত্রি ছট্‌ফট ক'রে কাটালেন, মাঝে মাঝে তন্দ্রা এলেও চোখের পাতা কিন্তু বুজলেন না। ব্রিস্টলের আর একজন বড় ডাক্তার ডঃ গ্যারিফকে আনানো হ'লো। মাথারই পীড়া সর্বাধিক লক্ষ্য ক'রে কপালে জোঁক বসিয়ে রক্তের চাপ কমাবার চেষ্টা করা হ'লো। কিন্তু রোগ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগলো। রামমোহন অধিকাংশ সময় আচ্ছন্ন অবস্থায় রইলেন, মাঝে মাঝে দেহে আক্ষেপ দেখা গেল, মুখ আক্ষেপে বিকৃত হ'তে লাগলো, তাঁর বাঁ পা ও হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত মনে হ'লো।

কয়েকদিন রোগের সঙ্গে যুদ্ধ চললো। কিন্তু বিন্দুমাত্র উন্নতি ঘটলো না। ক্রমে রোগী দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। অবশেষে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর, এলো সেই কাল রাত্রি। ডঃ এসট্‌লিন ঐ সময়কার এইরকম বর্ণনা দিয়েছেন:

> প্রতি দুচার মিনিট ছাড়া তাঁর অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেল, তাঁর গলা ঘড়ঘড় করতে লাগলো, শ্বাসকষ্ট দেখা দিলো, নাড়ী প্রায় খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি ক্রমাগত তাঁর ডান হাতটা নাড়তে লাগলেন, মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁর বাঁ হাতটাও একটু নেড়েছিলেন।
>
> সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল বাইরে; জানালার একদিকে মিঃ হেয়ার, মিস্ কিডেল ও আমি বাইরে গ্রামাঞ্চলের মধ্যরাত্রির শান্ত দৃশ্যের দিকে তাকিয়েছিলাম। জানালার অপর পার্শ্বে এই অনন্যসাধারণ মানুষটির মৃত্যু ঘটছিল। আমি সেই মুহূর্তটি জীবনে বিস্মৃত হ'তে পারবো না। মিস্ হেয়ার হতাশ ও বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। যিনি এতদিন রাজাকে সেবা করেছেন, খাইয়ে দিয়েছেন, এখন তিনিও মৃত্যুপথযাত্রী রাজার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়বার মতো সাহস পেলেন না। তিনি কাছে একটি চেয়ারে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বালক রাজারাম রাজার হাত ধ'রে বসে ছিল।...রাত্রি আড়াইটার সময়ে মিঃ হেয়ার আমার ঘরে এসে বললেন, সব শেষ। রামমোহন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন রাত্রি ২টা ২৫ মিনিটে।

রামমোহন অসুস্থ অবস্থায় খুব কমই কথা বলতেন। তিনি প্রায় সর্বদাই নীরবে উপাসনা করতেন। মাঝে মাঝে তাঁর কণ্ঠ থেকে ওঁ ধ্বনি উচ্চারিত হ'তো। তিনি

তাঁর উপবীত মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করেন নি। মৃত্যুর পরও তাঁর শুভ্র উপবীত বক্ষলগ্ন ছিল।

মৃত্যুর পর সকালে রামমোহনের মাথা ও মুখের একটি ছাঁচ নেওয়া হয় এবং তাঁর সুন্দর রাজোচিত দেহ পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়। পরীক্ষা ক'রে ডাক্তাররা যে অভিমত দিয়েছিলেন, তা হ'লো—"brain was found to be inflamed containing some fluid and covered with a kind of purulent effusion: its membrane also adhered to the skull.···The case appeared to be one of fever producing great prostration of the vital powers."

এ যুগের চিকিৎসা-বিজ্ঞানে হয়তো মৃত্যুর কারণ ও রোগ অন্য কিছু ব'লে নির্ধারিত হ'তো। যাই হ'ক, এইভাবেই স্বদেশ থেকে বহু দূরে মাত্র ৬১ বা ৫৯ বছর বয়সে এক লোকোত্তর প্রতিভার জীবনাবসান হ'লো।

রাজার মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ কোথায় কিভাবে রাখা হবে, তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিলো। তাঁর অসুখ হঠাৎ এমন মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল যে, তিনি এ সম্পর্কে তাঁর শেষ ইচ্ছা জানাবার বা কোন নির্দেশ দেওয়ার সুযোগ পান নি। তবে এটা সকলেই জানতেন যে, তিনি হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতা ছাড়া অন্যান্য রীতিনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তার খ্রীষ্টান বন্ধুবা শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন যে, রামমোহনেব মরদেহকে খ্রীষ্টানদের সাধারণ সমাধিস্থলে সমাহিত করা উচিত হবে না। সেই সঙ্গে ডঃ কার্পেণ্টার জানালেন যে, রামমোহন এ-কথা বন্ধুদের কাছে বলতেন যে, যদি ইংলণ্ডে তার মৃত্যু ঘটে, তবে একখণ্ড জমি ক্রয় ক'রে সেখানে তাকে সমাহিত করা হবে, এবং সেই সমাধিস্থানে একটি কুটির নির্মাণ করা হবে; ঐ কুটিরে এমন কোন ভদ্র দরিদ্র ব্যক্তি থাকবেন, যিনি ঐ সমাধিস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

কিন্তু রামমোহন যখন এ ইচ্ছা প্রকাশ করতেন, তখন তিনি ছিলেন রাজা রামমোহন, একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি রাতারাতি প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং তাঁর এই ইচ্ছা পূরণ তাঁব বন্ধুদের কাছে একটি দুরূহ সমস্যারূপে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তাঁদের এই সমস্যার সমাধান ক'রে দিলেন মিস্ ক্যাস্‌ল্। তিনি তাঁর বাসভবন-সংলগ্ন প্রাঙ্গণের পার্শ্বে বৃক্ষরাজির মধ্যে একটি ছায়া-সুশীতল স্থান রামমোহনের সমাধির জন্য দিতে চাইলেন। সকলেই তাঁর এই প্রস্তাবকে সানন্দে অভিনন্দন জানালেন। সেই মতোই ব্যবস্থা হ'লো।

রামমোহনের মরদেহ সমাহিত করবার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ডঃ কার্পেণ্টারের কন্যা মিস্ মেরী কার্পেণ্টার। তিনি লিখেছেন:

অবশেষে সকল ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হ'লো। লণ্ডন থেকে মিঃ জন হেয়ার ও জোসেফ হেয়ার এসে পৌঁছলেন। রাজার সঙ্গে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত ছিলেন, কেবল তাঁদেরই আমন্ত্রণ জানানো হ'লো। মিস্ ক্যাস্‌লের অভিভাবক ও নিকট আত্মীয়রা, মিঃ হেয়ার ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী (ভগিনী) যিনি রামমোহনকে তাঁর অসুস্থতার সময়ে কন্যার মতো সেবা করেছিলেন এলেন; রামমোহনের পালিতপুত্র রাজারাম ও ব্রাহ্মণ ভৃত্যরা, রামমোহনের চিকিৎসকরা, তরুণী কন্যা ও মাতা সহ মিঃ এস্‌ট্‌লিন; ডঃ জেরার্ড, স্বনামখ্যাত জন ফস্টার, আমার বাবা ও আমি উপস্থিত ছিলাম। দুপুরের পরেই সেই গৌরবময় মানুষটির মরদেহ শবাধারে ধীরে ধীরে ভাবগম্ভীরভাবে, গভীর নীরবতার মধ্যে তোলা হ'লো; তারপর সেই শবাধার আমরা যাঁরা তাঁকে অল্পকাল পূর্বেও এই পৃথিবীতে দেখেছিলাম এবং পরলোকে আবার আমাদের স্বর্গীয় পিতার ভবনে যাঁর সাক্ষাৎ পাবো আশা করছি, উপলবিতত পথ দিয়ে বয়ে নিয়ে চললাম। এই ছায়াশীতল পথ দিয়ে, যে পথে তিনি কতবার না নিজে হেঁটে গিয়েছেন, শবাধার-বাহকরা এগিয়ে চললেন; তারপর তাঁরা সেই পবিত্র বোঝাটিকে তাঁর নির্ধারিত চিরবিশ্রামস্থলে পৌঁছে দিলেন। প্রত্যেকটি হৃদয়কে যে গভীর চিন্তাগুলি পূর্ণ ক'রে তুলেছিল, কোনও কণ্ঠস্বর তা প্রকাশ করতে সাহস পেলো না। পরে জন ফস্টার বলেছিলেন: "এ ধরনের একটি সমাধির কাছে কে কি বলতে পারে?"

এইভাবে স্টেপ্‌ল্‌টন গ্রোভের এল্‌ম্-ছায়াতলে রামমোহনের মরদেহ বিশ্রাম লাভ করলো। কিন্তু রাজার মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই স্টেপ্‌ল্‌টন গ্রোভ ক্যাস্‌ল্-পরিবারের হাত থেকে অন্যদের হাতে চ'লে গেল। ক্যাসল্-পরিবারের আমলে দর্শকরা সহজেই এই সমাধিস্থলে যেতে ও রামমোহনের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতে পারতেন। কিন্তু নূতন মালিকদের সময়ে তা সম্ভব হ'লো না। তাছাড়া, তাঁর অনুরাগীরা এ-ও অনুভব করলেন যে, রামমোহনের জন্য একটি যোগ্য সমাধি-মন্দির নির্মাণ করা দরকার।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের প্রিয় অনুগামী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলাতে গেলেন, তখন রামমোহনের স্বদেশবাসী অনুরাগীরা তাঁর মরদেহকে এই অবহেলার হাত থেকে উদ্ধার ক'রে উপযুক্ত স্থানে রক্ষা করবার এবং তার নূতন সমাধিস্থলে একটি স্মৃতি-মন্দির নির্মাণের ভার দিয়েছিলেন, যাতে ভারতবাসীরা ইংলণ্ড গেলে ভারতের এই মহত্তম বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারে।

দ্বারকানাথ ইংলণ্ডে গিয়ে স্টেপ্‌ল্‌টন গ্রোভ থেকে রামমোহনের মরদেহকে অপসারিত ক'রে ব্রিস্টল নগরীর উপকণ্ঠে আর্নোস্ ভেল্ সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে এলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মে এখানে রামমোহনকে পুনর্বার সমাহিত করা হ'লো। এবং এই সমাধিস্থলের

উপর হিন্দু মন্দিরের অনুকরণে সুন্দর একটি সমাধি-মন্দির নির্মাণ করা হ'লো। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের প্রথম জন্মশতবার্ষিকীতে, এই সমাধি-মন্দিরটিকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করা হয় এবং একটি স্মৃতিফলক খোদিত ক'রে দেওয়া হয়। এই স্মৃতিফলকে অমর অক্ষরে লেখা আছে :

BENEATH THIS STONE REST THE REMAINS OF

RAJA RAMMOHUN ROY BAHADOOR.

A CONSCIENTIOUS AND STEADFAST BELIEVER IN THE UNITY OF THE GODHEAD;

HE CONSECRATED HIS LIFE WITH ENTIRE DEVOTION TO THE WORSHIP OF THE DIVINE SPIRIT ALONE.

TO GREAT NATURAL TALENTS HE UNITED A THOROUGH MASTERY OF MANY LANGUAGES,

AND EARLY DISTINGUISHED HIMSELF AS ONE OF THE GREATEST SCHOLARS OF HIS DAY.

HIS UNWEARIED LABOURS TO PROMOTE THE SOCIAL, MORAL AND PHYSICAL CONDITION OF THE PEOPLE OF INDIA, HIS EARNEST ENDEAVOURS TO SUPPRESS IDOLATRY AND THE RITE OF SUTTEE, AND HIS CONSTANT ZEALOUS ADVOCACY OF WHATEVER TENDED TO ADVANCE THE GLORY OF GOD AND THE WELFARE OF MAN, LIVE IN THE GRATEFUL REMEMBRANCE OF HIS COUNTRYMEN.

THIS TABLET
RECORDS THE SORROW AND PRIDE WITH WHICH HIS MEMORY IS CHERISHED BY HIS DESCENDENTS.

HE WAS BORN IN RADHANAGORE, IN BENGAL, IN 1774, AND DIED AT BRISTOL, SEPTEMBER 27TH, 1833.

রামমোহনের প্রধান প্রধান রচনা প্রকাশের কালানুক্রমিক তালিকা

১।	তুহ্‌ফত্‌-উল্‌-মুওয়াহ্‌হিদিন	১৮০৩ (? ১৮০৪)	(ফারসী ভাষায় আরবী মুখপত্র সহ)
২।	মানাজরত-উল্‌-আদিয়ান		(ফারসী—এই গ্রন্থ আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা—জানা যায় নি)
৩।	বেদান্ত গ্রন্থ	১৮১৫	(বাংলা)
৪।	বেদান্তসার	১৮১৬	(বাংলা)
৫।	তলবকার উপনিষৎ (কেনোপনিষৎ)	"	(বাংলা)
৬।	ঈশোপনিষৎ	"	(বাংলা)
৭।	An Abridgment of the Vedant	"	(ইংরেজী)
৮।	Translation of Cena Upanishad	"	(ইংরেজী)
৯।	Translation of Ishopanishud	"	(ইংরেজী)
১০।	কঠোপনিষৎ	১৮১৭	(বাংলা)
১১।	মুণ্ডকোপনিষৎ	"	(বাংলা)
১২।	মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	"	(বাংলা)
১৩।	ভট্টাচার্যের সহিত বিচার	"	(বাংলা)
১৪।	A Defence of Hindoo Theism	"	(ইংরেজী)
১৫।	A Second Defence	"	(ইংরেজী)
১৬।	সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের—প্রথম সংবাদ	১৮১৮	(বাংলা)
১৭।	গায়ত্রীর অর্থ	"	(বাংলা)
১৮।	গোস্বামীর সহিত বিচার	"	(বাংলা)
১৯।	A Conference between an advocate for, and an opponent of, The Practice of Burning Widows Alive	"	(ইংরেজী)
২০।	সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের—দ্বিতীয় সংবাদ	১৮১৯	(বাংলা)
২১।	Translation of the Moonduck Opunishad	"	(ইংরেজী)

২২ ।	Translation of the Kuth-Opunishad	১৮১৯	(ইংরেজী)
২৩ ।	সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার	১৮২০	(বাংলা)
২৪ ।	An Apology for the Pursuit of Final Beatitude	”	(ইংরেজী)
২৫ ।	কবিতাকারের সহিত বিচার	”	(বাংলা)
২৬ ।	A Second Conference between an advocate for, and an opponent of, The Practice of Burning Widows Alive	১৮২০	(ইংরেজী)
২৭ ।	The Precepts of Jesus	”	(ইংরেজী)
২৮ ।	An Appeal to the Christian Public	”	(ইংরেজী)
২৯ ।	ব্রাহ্মণসেবধি ১, ২, ৩	১৮২১	(বাংলা)
৩০ ।	The Brahmunical Magazine I, II, III	”	(ইংরেজী)
৩১ ।	পাদরি ও শিষ্য-সংবাদ	”	(বাংলা)
৩২ ।	Second Appeal to the Christian Public	”	(ইংরেজী)
৩৩ ।	চারি প্রশ্নের উত্তর	১৮২২	(বাংলা)
৩৪ ।	Modern Encroachments on the Ancient Rights of Female	”	(ইংরেজী)
৩৫ ।	পথ্যপ্রদান	১৮২৩	(বাংলা)
৩৬ ।	Brahmunical Magazine, IV	”	(ইংরেজী)
৩৭ ।	Humble Suggestions	”	(ইংরেজী)
৩৮ ।	A Vindication	”	(ইংরেজী)
৩৯ ।	প্রার্থনাপত্র	”	(বাংলা)
৪০ ।	Petition Against the Press Regulations	”	(ইংরেজী)
৪১ ।	A Letter on English Education	”	(ইংরেজী)
৪২ ।	Final Appeal to the Christian Public	”	(ইংরেজী)

৪৩	A Dialogue between a Missionary and Three Chinese Converts	১৮২৩	(ইংরেজী)
৪৪	Different Modes of Worship	১৮২৫	(ইংরেজী)
।	ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ	১৮২৬	(বাংলা)
৪৬।	কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার	”	(বাংলা)
৪৭।	Bengali Grammar		(ইংরেজী)
৪৮।	বজ্রসূচী	১৮২৭	(বাংলা)
৪৯।	গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং		(সংস্কৃত)
৫০।	The Divine Worship		(ইংরেজী)
৫১।	ব্রহ্মসঙ্গীত	১৮২৮	(বাংলা)
৫২।	ব্রহ্মোপাসনা	”	(বাংলা)
৫৩।	Answer of A Hindoo	”	(ইংরেজী)
৫৪।	Petition Against Regulation III of 1828	”	(ইং)
৫৫।	সহমরণ বিষয় (তৃতীয় পুস্তক)	১৮২৯	(বাংলা)
৫৬।	অনুষ্ঠান	”	(বাংলা)
৫৭।	The Universal Religion	”	(ইংরেজী)
৫৮।	The Trust Deed of the Brahma Samaj	১৮৩০	(ইংরেজী)
৫৯।	The Burning of Widows	”	(ইংরেজী)
৬০।	Rights of Hindoos over Ancestral Property	”	(ইংরেজী)
৬১	Hindoo Law of Inheritance	”	(ইংরেজী)
৬২	Address to Lord William Bentinck for the Abolition of Suttee	”	(ইংরেজী)
৬৩	Counter-Petition to the House of Commons	১৮৩১	(ইংরেজী)
৬৪।	গৌড়ীয় ব্যাকরণ	১৮৩৩	(বাংলা)
৬৫।	কুলার্ণবতন্ত্র	?	(বাংলা)
৬৬।	ক্ষুদ্রপত্রী	?	(সংস্কৃত)
৬৭।	আত্মানাত্মবিবেক	?	(সংস্কৃত+বাংলা)

॥ ঘটনাপঞ্জী ॥

১৭৭২	রাধানগরে রামমোহনের জন্ম (২২ মে); ওয়ারেন হেস্টিংসের গভর্নর-রূপে আগমন
১৭৭৩	রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাস; হেস্টিংসের গভর্নর-জেনারেল-পদে নিয়োগ
১৭৮০-৮১	রামমোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিবাহ
১৭৮৮	পিতার সঙ্গে পৌত্তলিকতা সম্পর্কে মতবিরোধ ও গৃহত্যাগ; উত্তর ভারত ও তিব্বত ভ্রমণ
১৭৯০	স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন ও বিষয়কর্মে আত্মনিয়োগ
১৭৯২	পিতা রামকান্তেব পৈতৃক বাসস্থান রাধানগর ত্যাগ ও লাঙ্গুলপাড়ায় নূতন গৃহনির্মাণ ও সপরিবারে বাস
১৭৯৬	রামকান্ত কর্তৃক পুত্রদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ
১৭৯৭	রামমোহনেব লাঙ্গুলপাড়া ত্যাগ ও কলকাতা গমন, কলকাতায় তেজারতি কাববাব; গোলকনারায়ণ বায়কে কেরানীরূপে নিয়োগ
১৭৯৯	রামমোহন কর্তৃক গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুব তালুক দুটি ক্রয়; উত্তর ভারতে পাটনা, বেনারস প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ
১৮০০	রামমোহনের কলকাতা প্রত্যাবর্তন; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও সদব দেওয়ানী আদালতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন
১৮০১	মিঃ জন ডিগ্‌বির সঙ্গে পরিচয়
১৮০২	রামমোহনেব জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদের জন্ম
১৮০৩-০৪	রামমোহনেব চাকরি গ্রহণ (ঢাকা-জালালপুব বা বর্তমান ফরিদপুর জেলাব অস্থায়ী কালেক্টর টমাস উড্‌ফোর্ডের অধীনে দেওয়ানের কাজ); দু মাস বাদে (১৪ মে) চাকরি ত্যাগ; পিতা মুমূর্ষু এই সংবাদে কলকাতা হয়ে বর্ধমান গমন, বর্ধমানে পিতার মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদ গমন এবং মুর্শিদাবাদের আপীল আদালতের নবনিযুক্ত রেজিস্ট্রার উড্‌ফোর্ডের অধীনে তাঁর ব্যক্তিগত মুন্‌শিরূপে কার্যভার গ্রহণ; মুর্শিদাবাদে রামমোহনের প্রথম গ্রন্থ "তুফাত্‌-উল্‌-মুওয়াহ্‌হিদিন" বা একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার গ্রন্থ প্রকাশ
১৮০৫	বিহারের হাজারিবাগ জেলার সদর বামগড়ের ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে জন ডিগ্‌বির রেজিস্ট্রাব পদে নিয়োগ; রামগড়ে রামমোহনের ডিগ্‌বির ব্যক্তিগত মুনশিব পদ গ্রহণ
১৮০৬	ডিগবি রামগড়ের অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হ'লে রামমোহন তিন মাসের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরিতে ফৌজদারী আদালতের সেরেস্তাদাররূপে নিযুক্ত হন

১৮০৭ ভাগলপুর ও রংপুরে ডিগ্‌বির অধীনে ব্যক্তিগত দেওয়ান বা মুন্সীর পদে রামমোহনের কাজ; ভাগলপুরে ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেট স্যার ফ্রেডেরিক হ্যামিল্টন রামমোহনের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করলে রামমোহনের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও পরে গভর্নর-জেনারেল লর্ড মিণ্টোর নিকট এইরূপ অসৌজন্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, গভর্নর-জেনারেল লর্ড মিণ্টো কর্তৃক স্যার ফ্রেডেরিককে এ ব্যাপারে সতর্কীকরণ

১৮০৯-১৪ ডিগ্‌বি রংপুরের কালেক্টর নিযুক্ত হ'লে রামমোহনের অস্থায়িভাবে সরকারী "দেওয়ানের" পদে নিয়োগ, স্থায়িভাবে রামমোহনের দেওয়ান নিয়োগে রেভেনিউ বোর্ডের আপত্তি; ফলে, ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রামমোহনের দেওয়ানের পদ ত্যাগ; পরে সম্ভবতঃ স্থায়িভাবে নিয়োগ ও ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে বহাল; জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগৎমোহনের মৃত্যু (১৮১২), জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর নৃশংস সতীদাহ, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ডিগ্‌বির কালেক্টরের কার্যভার ত্যাগ; সীমান্ত বিষয়ে ভুটানে ও কোচবিহারে সরকারের পক্ষ থেকে দৌত্য

১৮১৫ কলকাতা আগমন ও কলকাতায় স্থায়িভাবে বাস; "আত্মীয়-সভা"র প্রতিষ্ঠা; বেদান্ত অনুবাদ—'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ

১৮১৬ 'বেদান্তসার' রচনা এবং বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজীতে (An Abridgment of the Vedant) প্রকাশ; কেনোপনিষৎ ও ঈশোপনিষৎ-এর বাংলা ও ইংরেজীতে অনুবাদ ও প্রকাশ

১৮১৭ মিঃ ডিগ্‌বিকে বিলাতে পত্র, রামমোহনের ইংলণ্ড গমনের ইচ্ছা প্রকাশ, জার্মান ভাষায় Auflosung des Wedant প্রকাশ; কেনোপনিষৎ-এর বাংলা ও ইংরেজীতে এবং মাণ্ডুক্যোপনিষৎ-এর অনুবাদ; রঘুনাথ-পুরের বাসভবনে গমন; রামমোহনের বিরুদ্ধে গোবিন্দপ্রসাদের মামলা

১৮১৮ সতীদাহ বিষয়ে প্রথম নিবন্ধ 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' প্রকাশ

১৮১৯ প্রতিবাদে কাশীনাথ তর্কবাগীশের 'বিধায়ক নিষধকের সম্বাদ' প্রকাশ; সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে বিচার; সহমরণ বিষয়ে দ্বিতীয় নিবন্ধ প্রকাশ

১৮২০ Precepts of Jesus (খ্রীষ্টবাণী) প্রকাশ; Friend of India কাগজে পাদরি ডেওকার স্মিট্ এবং ডঃ মার্শম্যান কর্তৃক Precepts-এর সমালোচনা; রামমোহনের An Appeal to the Christian Public প্রকাশ; ডঃ মার্শম্যান কর্তৃক Precepts-এর পুনরায় সমালোচনা; রামমোহন-জননীর পুরী গমন

১৮২১ রামমোহন কর্তৃক Second Appeal to the Christian Public প্রকাশ; রেঃ উইলিয়াম অ্যাডাম কর্তৃক রামমোহনের মত সমর্থন ও ট্রিনিটারিয়ান খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ ক'রে রামমোহন-প্রচারিত ইউনিটারিয়ান

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ; শ্রীরামপুর মিশনারিদের প্রকাশিত সমাচার-দর্পণে বেদান্তের নিন্দা এবং তার প্রতিবাদে রামমোহনের The Brahmunical Magazine ও 'ব্রাহ্মণসেবধি' পত্রিকা প্রকাশ এবং বেদান্তের সমর্থনে রচনা প্রকাশ, রামমোহন ও তাঁর বন্ধুদের উদ্যোগে ক্যালকাটা ইউনিটারিয়ান কমিটি গঠন, রামমোহন কর্তৃক বাংলা সংবাদপত্র 'সম্বাদ-কৌমুদী' প্রকাশ (৪ ডিসেম্বর) ও রামমোহনের বিরুদ্ধে জগমোহন-পত্নী দুর্গা দেবীর মামলা

১৮২২ রামমোহন কর্তৃক 'মিরাত্-উল্-আখবার' নামে উর্দু সংবাদপত্র প্রকাশ, Brief Remarks on Ancient Female Rights প্রকাশ, পুরীতে রামমোহন-জননী তারিণী দেবীর মৃত্যু (২১ এপ্রিল), অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল স্থাপন, সমাচার-দর্পণে প্রকাশিত 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী'-রচিত 'চারি প্রশ্ন' নিবন্ধের উত্তরে রামমোহন কর্তৃক 'চারি প্রশ্নের উত্তর' প্রকাশ

১৮২৩ Third and Final Appeal to the Christian Public প্রকাশ, 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী'-রচিত 'পাষণ্ড-পীডন' প্রকাশ, তদুত্তরে রামমোহনের 'পথ্যপ্রদান' প্রকাশ, সরকারের নূতন প্রেস আইনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ—প্রতিবাদে সরকারের নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ, 'মিরাত-উল্-আখবার' কাগজ বন্ধ, বর্ধমানের রাজা তেজচাঁদ কর্তৃক রামমোহনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু, লর্ড আমহার্স্টের নিকট পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন সমর্থনে বিখ্যাত পত্র 'Letter on English Education' প্রেরণ ; অদ্বৈতবাদী হিন্দুদের নিকট আবেদন, ব্রিটিশ প্রেস-বিটারিয়ান মিশনারিদের আবেদনে স্বাক্ষর দান

১৮২৪ দক্ষিণ ভারতের দুর্ভিক্ষে সাহায্যের জন্য আবেদন, সরকার কর্তৃক 'সংস্কৃত কলেজ' প্রতিষ্ঠা ; প্রেস আইনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ, রাধাপ্রসাদের বিরুদ্ধে মামলা, রামমোহনের দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যু

১৮২৬ বেদান্ত কলেজ স্থাপন

১৮২৭ ইউনিটারিয়ান উপাসনালয়ে যোগদান

১৮২৮ ইউনিটারিয়ান উপাসনালয়ের পরিবর্তে হিন্দুদের পৃথক উপাসনালয় স্থাপনের প্রস্তাব, লর্ড আমহার্স্টের বিদায়—গভর্নর-জেনারেল-রূপে উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের ভারত আগমন, জুরি-ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে রামমোহনের সমালোচনামূলক পত্র, ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা (২০ আগস্ট)

১৮২৯ সতীদাহ প্রথা নিরোধক আইন পাস

১৮৩০ বাদশাহ্ দ্বিতীয় আকবর শাহ্ কর্তৃক রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দান, বাদশাহের দূত ও বাদশাহ্-প্রদত্ত উপাধি সম্পর্কে সরকারের অসম্মতি ; সতীদাহ নিরোধের জন্য লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জ্ঞাপন, সনাতনী হিন্দুদের রামমোহন-বিরোধী 'ধর্ম সভা' স্থাপন ; ব্রাহ্ম

সমাজের নূতন ভবন নির্মাণ ও উদ্বোধন ; সতীদাহের সমর্থনে সনাতনী হিন্দুদের আবেদন এবং রামমোহনের সতীদাহ নিরোধের সমর্থনে যুক্তিসমূহের সঙ্কলন 'Abstracts of the Arguments' প্রকাশ ; রামমোহন কর্তৃক খ্রীষ্টান মিশনারি আলেকজাণ্ডার ডাফকে শিক্ষা-বিস্তারে ও তাঁর প্রথম বিদ্যালয় স্থাপনে সহায়তাকরণ ; রামমোহনের বিলাত যাত্রা (১৯ নভেম্বর)

১৮৩১ কেপ্ টাউনে জাহাজ থেকে অবতরণ (জানুয়ারি), জাহাজে সিঁড়ি থেকে পড়ে গুরুতর আহত ; লিভারপুলে অবতরণ (৮ এপ্রিল) ; মাঞ্চেস্টার পরিদর্শন ; লণ্ডন আগমন , মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত রিজেন্ট স্ট্রীটে বাস ; বেডফোর্ড স্কোয়ারের বাসায় আগমন ও বাস ; সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

১৮৩২ রিফর্ম বিল পাস ; ফ্রান্স সফর ; ফ্রান্সে অভ্যর্থনা ও সম্মান লাভ

১৮৩৩ লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন ; নূতন পার্লামেণ্টের প্রথম অধিবেশন ; সতীদাহ নিরোধক আইনের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে শুনানিকালে রামমোহনের হোয়াইট হলে উপস্থিতি ; ইস্ট ইণ্ডিয়া বিল পাস ও রাজসম্মতিদান (২০ আগস্ট)—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ লাভ ; ক্রীতদাস প্রথা নিরোধক আইন পাস ; কারখানা আইন পাস ; রামমোহনের লণ্ডন থেকে ব্রিস্টলের কাছে স্টেপ্লটন পাহাড়ে গমন (সেপ্টেম্বর) ; মিস্ কিডেল ও মিস্ ক্যাস্লের সঙ্গে স্টেপ্লটন গ্রোভে বাস ; ১৯ সেপ্টেম্বর রামমোহন জ্বরে অসুস্থ—মাথার যন্ত্রণা—মিস্ হেয়ার কর্তৃক নিরলস শুশ্রূষা—রোগের ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি—সঙ্কটজনক অবস্থা—মৃত্যু (২৭ সেপ্টেম্বর রাত্রি ২টা ২৫ মিনিট) ; স্টেপ্লটন গ্রোভে সমাহিতকরণ

১৮৪৩ ব্রিস্টলে আর্নোজ ভেলে পুনরায় সমাহিতকরণ ও সমাধি-স্থানে একটি সুরম্য স্মৃতি-মন্দির নির্মাণ

১৮৫৮ রামমোহনের বিধবা তৃতীয়া পত্নীর মৃত্যু

১৮৭২ সমাধি-স্থান সংস্কার ও উৎকীর্ণ সমাধি-ফলক স্থাপন